নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

মুদ্রণ সংখ্যা—২২০০

সম্পাদনা

আশা দেবী

অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন

গৌতম রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

রোমান্স

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। বিশেষ করে প্রথম গল্পটি লেখা হয়েছিল সাত বছর আগে—তার পাঁচ বছর পরে অন্য গল্পগুলোর জের টেনেছি। ফলে এই গল্পোপন্যাসটির চরিত্রগুলির নামে কিছু কিছু গণ্ডগোল রয়ে গেছে। দাঙ্গা, প্রেসের বিভ্রাট এবং নানা হাঙ্গামায় প্রুফ দেখায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যায়নি, এজন্যে আন্তরিক লজ্জিত। লেখক।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

উৎসর্গ

নবেন্দু ঘোষ

বন্ধুবরেষু

স্বাধীনতা এল, আকাশে জেগেছে নবজাতকের দিন,
ধন্য হল কি রক্তের অভিসার ?
তোমার আমার জীবনের 'পরে গুরুভার দুঃসহ
কাঁটাবন আর শঙ্খচূড়ের ফণা,
কিউ, কণ্ট্রোল, কালোবাজারের অযুত অক্টোপাস,
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা—ভারত—পাকিস্থান,
মাঝখানে বালুচর।
আমাদের বালুচর,
যূথীবন নেই, বিকচ কেতকী কোথা,
ভাগাড়ের হাড়ে হাতছানি দেয় প্রেত পঞ্চাশ সাল,
এল কি বন্ধু, নবজাতকের দিন ?

গুরু গুরু মেঘ কোথা ধমকায় কালবৈশাখী আসে,
ক্ষাত্র বিনাশ কোটি কোটি মুঠি মৌর্বী-কিণাঙ্কিত
তেলীঙ্গানায়, গোল্ডেন্ রকে, তে-ভাগার মাঠে মাঠে
কতদূরে স্বাধীনতা ?
মরা বালুচরে, ভাগাড়ের হাড়ে আমরা স্বপ্নাতুর :
তুমি আর আমি স্বাধীন মানুষ, আকাশে তুলেছি মাথা

আজো পথে পথে ফণিমনসায় শঙ্খচূড়ের ফণা—
আশা নেই—নেই আলো ?
ওই তো মেদিনীপুর।
পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়,
বুকের ভেতরে জ্বেলেছি মশাল—সমুখে ত্রিবাঙ্কুর।

তবু মনে কোরো কোনো শরতের রাতে,
হঠাৎ কখনো মেঘের আড়ালে খেয়ালী চাঁদের হাসি,
আকাশে কখনো ওড়ে বুনো হাঁস মানস তীর্থচারী,
কাঁটাবন হতে একটি ফুলের ক্ষণিক গন্ধ আসে।

যে জীবন ছিল প্রথম প্রভাতে—যে জীবন বহুদূরে,
তার খেয়ালের অকারণ খুশি যদি দুলে ওঠে বুকে,
কতটুকু তাতে ক্ষতি ?
নাচে ঝড়ো হাওয়া—আকাশে বজ্র হাঁকে,
সেই তো সত্য, সেই তো পথের সাথী।

তবু তো বন্ধু কোনো শিবিরের উচ্ছল অবকাশে
হালকা কথার মালা গেঁথে যদি বলি কারো কানে কানে,
নয় সে সত্য—তবু কি সত্য নয় ?
ওদিকে ঝড়ের শুব্ধ ইসারা—এদিকে চক্রবালে,
অস্তরবির রঙমাখা মেঘে তবু তো দেখেছ হাসি।
'এই সীমান্তে' চলেছ বন্ধু 'কালো রক্তের' পথে,
পারো যদি নিয়ো লঘু খুশিটুকু শিবিরের অবকাশে ॥

প্রীতিমুগ্ধ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায় : বৃক্ষারোহণ পর্ব

দেশে এলেই আমার বিশ্রী লাগে। তার কারণ এই নয় যে, দেশকে আমার ভাল লাগে না। আসল কথা, এখানে কারুর সঙ্গেই যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। জীবনের এই বাইশ বছরের মধ্যে আঠারো বছরই কাটিয়েছি পূর্ববঙ্গের বাইরে। সুতরাং এতদিন পরে, মাতৃভূমি বরিশালের এই অর্ধ দ্রাবিড় ভাষা বা ভাষীদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনাটা সহজও নয় স্বাভাবিকও নয় ; আরও বিশেষ করে আমার মত এমন অসামাজিক মানুষের পক্ষে।

তাই পূজোর সময় গ্রামে এসে দশ পনরো দিন বাড়ীতে থাকি। সে সময়ে কাজকর্মের অবসরে পুকুরঘাটেই বঁড়শি নিয়ে বসতে হয়। সান্ত্বনা এই, গ্রামে সঙ্গীর অভাব থাকলেও পুকুরে মাছের অভাব নেই।

কিন্তু এমন শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় জীবনকে আলোড়িত করে তুললেন দীনবন্ধু দাদামশাই। আর সত্যি বলতে কি, এই একটি মাত্র লোক ছাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন কাউকেই নানা কারণে আমি প্রীতির চোখে দেখতে পারি না এবং আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাবও এই কারণেই অনুকূল নয় ; কিন্তু দীনবন্ধু দাদামশাই এঁদের ব্যতিক্রম। প্রায় সত্তর বছর বয়সেও তিনি যে কেমন ক'রে তাঁর সাতাশ বছরের মনটি ধ'রে রেখেছেন, আমার কাছে সেটা ভারী বিস্ময়কর ঠেকত।

দুর্গোৎসব এবং লক্ষ্মীপূজোর পর্ব শেষ হয়ে গেলে ঘরে সাধারণত যে সমস্ত চাল কলা নারিকেল ইত্যাদি উদ্বৃত্ত থাকে, তাই দিয়ে খুব ঘটা ক'রে সত্যনারায়ণ সেবা করাটা এ দেশের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থেরই প্রথা। গ্রামে এ জিনিসটি এখনও একটা মস্ত আনন্দের ব্যাপার হয়ে আছে। ইতর-ভদ্র সবাই অকুণ্ঠিত ভাবে পাতা পেড়ে ব'সে যায়। পাল্লা দিয়ে সিন্নি খাওয়া চলে ; পরিণাম কারও কারও পক্ষে যে বিয়োগান্ত না হয় এমন নয়, কিন্তু সিন্নি খাওয়ার সময়ে উদরের স্বাস্থ্যের চিন্তা করাটা অবৈধ।

নিজের ঘরে ব'সে কি পড়ছিলুম। লাল চটির শব্দ করতে করতে দাদামশাই এসে হাজির। বললেন, ওঠ।

সবিনয়ে বললুম, মাপ করুন দাদামশাই, ও সব সিন্নি-টিন্নি খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই।

দাদামশাই ভ্রূকুটি করে বললেন, তবুও যেতে হবে। এ হচ্ছে সামাজিকতা, দেশে এলে এসব মানতে হয়, নইলে লোকে নিন্দে করে। শুনেছি তিন-চারটে পাস দিয়েছ, তবু এটুকু বুদ্ধি হ'ল না ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, আচ্ছা, চলুন। সত্যনারায়ণের কলরব শান্ত হয়ে গেলে গুড়গুড়িতে ধীরে-সুস্থে একটা টান দিয়ে দাদামশাই বললেন, দেখ রঞ্জন, তুমি নিতান্ত ঘরকুনো জীব। সামাজিকতার কথা আলাদা, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশতেও তো হয়।—নইলে বিষয়সম্পত্তিই বা রাখবে কি ক'রে? কি কর সমস্ত দিন?

কিছুই নয়।

কিছুই নয় কি? দিদিমণিকে ধ্যান কর বোধ হয়। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলুম। দাদামশাই মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, কি ভায়া, মনের কথাটি ঠিক ধ'রে নিয়েছি তো? কিন্তু এ তো ভাল কথা নয়। বিয়ে করার আগেই এতদূর, বিয়ে করলে বাইরের কারও সঙ্গে যে এতটুকু সম্পর্ক রাখবে, এমন ভরসাই তো দেখি না।

লজ্জায় মুখ লাল করে বললুম, কি সব যা তা বলছেন! আমি কারও ধ্যান করি না।

আহা-হা, কেন অস্বীকার করছ ভায়া, ওসব খবর আমরা জানি। কিন্তু তোমরা আজকালকার ছেলে প্রেমের কি বোঝ? একপাতা ইংরাজী পড়া মেয়ে, একটু কোর্টশিপ—এই তো? এতে কি আর পৌরুষ আছে ভায়া! তোমাদের প্রেম হচ্ছে মেয়েলী প্রেম।

আপনাদের প্রেম বুঝি পুরুষালি ছিল?

ছিল বই কি। ভয়ঙ্কর রকমের। একেবারে দাড়িওয়ালা প্রেম যাকে বলে। তুমি প্রেম করছ আমাদের দিদির সঙ্গে আর আমি প্রেম করেছিলুম বজ্রতারা, মানে তোমার ঠানদির সঙ্গে। নামেই বুঝতে পারছ, তফাৎ কত।

বজ্রতারা! প্রেমটাও তা হ'লে বজ্রের মতই বলুন?

সে তো নিশ্চয়। সে কি সোজা প্রেম? ন বছরের মেয়ে বিয়ে করেছিলুম, আমার তখন তেরো। কত মারামারি যে করেছে, তার হিসেব নেই। খুঁজে দেখলে আমার গায়ে এখনও হয়ত আঁচড়-কামড়ের দাগ বেরোতে পারে। আর দিদিমণি? শুধু চুমু খাওয়া ছাড়া—

থামুন থামুন, কি বিশ্রী অশ্লীল আপনি দাদামশাই! কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে এ সব মন্তব্য—

ভদ্রমহিলা! দাদামশাই হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

আচ্ছা থাক, ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আর করব না। কিন্তু যে কথা বলছিলুম। আমার নিজের জীবনের একটা প্রেমের গল্প শোন। তোমাদের এখনকার মোলায়েম কলেজী প্রেমের কাহিনী নয়। রীতিমত রুদ্ররসাত্মক আদিরসের ব্যাপার।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

তখনও আড়িয়াল খাঁ এত শান্ত হয়ে যায় নি—নদীর তখন বিক্রম ছিল কত! বর্ষায় তখন এপার ওপার কিছু দেখা যেত না, ধূ ধূ করতো শুধু। সে নদী এখন নিরীহ হয়ে গেছে! এখন তেমন ক'রে আকাশ দুলিয়ে সোঁ সোঁ করে ঝড়ও আসে না। অথবা সেই ঝড়ের ডাকে জলও মাতালের মত নাচতে শুরু করে দেয় না। তোমাদের আজকালকার মিহি প্রেমের অবস্থা আর কি।

তোমার ঠানদি, মানে বজ্রতারা দাসী ছিলেন কালান্তক সেনচৌধুরীর মেয়ে। নামটা খেয়াল রেখো। ব্যারিস্টার সেনের মেয়ে ডালিয়া সেনের সঙ্গে এ নামের ঢের তফাত, তা বোধ হয়—

আঃ, আবার বাজে কথা কেন টেনে আনছেন দাদামশাই? কালান্তক সেন-চৌধুরীর মেয়ের কথা বলছিলেন বলুন।

থাক ভায়া, মনে যদি কষ্টই পাও, তা হ'লে এসব তুলে তোমাকে আর দুঃখ দেব না। আচ্ছা, তোমার ঠানদির কাহিনীই শোন।

আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম করালীপুর। সেখানে যেতে হ'লে মাঝখানের ওই চড়াটা ঘুরে এখন তোমাকে প্রায় পনেরো মাইলের মত আড়িয়াল খাঁ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু এ অসুবিধে তখন ছিল না। পালে একবার বাতাস পেলে দুমাল্লাই নৌকা প্রায় জাহাজের মত ছুটে দুঘণ্টায় চৌধুরীবাড়ীর ঘাটে গিয়ে লাগত। সে-সব সুবিধা স্বপ্নের মত মনে হয়।

আমাদের বড় নৌকার যে মাঝি ছিল, তার নাম নাজির। তোমাদের যে সমস্ত কুস্তিগীর প্রফেসাররা আজকাল আড়াই ইঞ্চি মাস্‌ল ফুলিয়ে লোকের বাহাদুরি নেবার আশায় কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা নাজিরকে দেখলে হাঁ করে থাকবে। কালো মার্বেল পাথরে হাতুড়ি-বাটালি কুঁদে কে যেন তাকে তৈরী করেছিল। ঝড়ের সময় যখন আড়িয়াল খাঁর সংযম থাকত না, লাগাম ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত নৌকোটা ঢেউয়ের মুখে লাফালাফি করত, তখন তাকে সামলাতে পারত একমাত্র নাজির। হাতের পেশীগুলো তার লোহার বলের মত ফুলে উঠত, কালো মুখের ভেতর থেকে সাদা সাদা তীক্ষ্ণ দাঁত একটা হিংস্র হাসির ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকত।

বলেছি, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমরা দুজনেই নিতান্ত ছেলেমানুষ। সে বয়সে আর প্রেমের কি জানতুম, বল? দুজনে খিড়কির বাগানে গিয়ে ফলফুলারি চুরি করতুম, তোমার ঠানদি নালিশ করে দিলে বিনা বিচারে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তার পিঠে ঘাকতক বসিয়ে দিতুম। তা ছাড়া ঝগড়া মারামারি তো দিনরাত্তির চলতই।

কিন্তু সবদিন তো আর সমান যায় না ভায়া। দুরন্ত যৌবন একদিন এল। আমার তখন কুড়ি আর তোমার ঠানদির ষোল। নিজের ব'লে বাড়িয়ে বলছি না ভায়া, তোমার ঠানদি নামে বজ্রতারা হ'লেও সে যুগে অমন অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখা যেত। সে বয়সে তাঁকে দেখলে তোমরা, আজকালকার ছেলেরা, হয়তো রবি ঠাকুরের পদ্য আবৃত্তি করতে, কিন্তু আমরা সেকেলে মানুষ, তাই কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' থেকেই মনের আশ মিটিয়ে নিতুম।

উন্মিলিতং তুলিকয়েব চিত্রং সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।

বভূব ত্যাশ্চতুরস্রশোভি বপোবিভক্তং নব যৌবনেন॥

বলতে লজ্জা নেই, প্রেম কাকে বলে, সে জিনিসটা তখনই একটু একটু করে বুঝতে শিখছি। আর ব্যাপারটা বোঝ, এতদিন পরেই যেন হঠাৎ তোমার ঠানদির খেয়াল হ'ল যে, আমি তাঁর পতিদেবতা—বাস্, তার পরই সেই যে একদিন মাথায় হাত-তিনেক ঘোমটা টেনে আত্মীয়-পরিজনদের গভীর জলে তিনি ভুস্ করে তিমি মাছের মত ডুব মারলেন, রাত বারোটার আগে আর তাঁর দেখাই মিলত না। সমস্ত দিন যে আমার কি ভাবে কাটত, তা এক আমিই জানতুম, তবে বোধ হয় বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত—তুমিও কিছু কিছু বুঝতে পারছ ভায়া। তোমাদের সুবিধে আছে বিলক্ষণ, পড়া বুঝে নেবার অছিলায় দিদিমণি একবার এসে একটু ছুঁয়ে গেল, কিংবা মুখের কাছে মুখ এনে—

আবার দাদামশাই!

না ভায়া, তুমি ভারী বেরসিক। একটু আধটু এদিক ওদিক না করলে কি আর গল্প জমে! আর জিনিসটা নিজের সঙ্গে যত বেশী মিলিয়ে নিতে পারবে, তত উপভোগ করবে বেশী, বুঝলে রঞ্জন?

তার দরকার নেই আপনি ব'লে যান।

যাই হোক, ক্ষোভ তবুও ছিল না। সমস্ত দিন গভীর বিরহের পর রাত্রের নিবিড় মিলন যে কি বস্তু, তা বোধ হয় দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই। তা ছাড়া শুনেছি, তুমিও নাকি কবিতা-টবিতা লেখো।

তোমরা আজকালকার ছেলে বউকে কালেভদ্রে হয়তো ইংরাজী কেতায় ডার্লিং কিংবা ওই জাতীয় কিছু একটা ডাক, কিন্তু আমাদের সময়ে প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বরী বলে সম্বোধন না করলে একদম অচল। আর মান ভাঙাতে হ'লে সোজা শ্রী জয়দেব—স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি—তারপরে তো বুঝতেই পারছ।

আপনার গল্পটা বলুন দাদামশাই, টীকা করবেন শেষকালে।

আঃ, তোমার রসবোধের ওপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি রঞ্জন। গল্পটা এসব

ক্ষেত্রে গৌণ, টীকা-টিপ্পনীই আসল। শুনেছি তোমরা তো আজকাল গল্প বাদ দিয়ে মনস্তত্ত্ব নিয়েই উপন্যাস লিখছ, তবে এ ব্যাখ্যায় এমন অরুচি কেন? গল্প তো দুকথায় শেষ করে দেওয়া চলে, মনের রঙ না মেশালে তা যে রঙিন বা সরস কিছুই হয় না, সেটা তো মান।

আচ্ছা, যা বল্‌ছিলুম। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলেছি, তুমি আমার এমন চমৎকার বিশ্লেষণটা মাটি করে দিলে। পড়তে আমাদের পণ্ডিতমশাই দত্তধর চূড়ামণির হাতে, অলঙ্কারের দণ্ডাঘাত ধাঁই ধাঁই করে মাথার ওপর গোটাকয়েক পড়লেই বুঝতে, কাব্যপীঠ জিনিষটা মলয়-বাতাসের মত আদৌ সুখ-সেব্য তো নয়ই, সে লোহার কলাই চিবোতে গেলে দাঁত নড়ে ওঠে। চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল আর কপাল দিয়ে টস টস ক'রে ঘাম পড়ত তা হলে। শ্রুতিবোধ পড়াবার সময় তিনি যখন ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, দোধকবৃত্ত, শার্দূলবিক্রীড়িত, রথোদ্ধতা, ভুজঙ্গপ্রয়াত কিম্বা হরিণীপ্লুতার প্রভেদ বোঝাতেন, তখন হাতের কাছে মহাকবি কালিদাসকে পেলে আমরা তাঁকে অবধি খুন ক'রে বসতুম।

ওঃ, আবার বাজে কথা শুরু করেছি, বুড়ো মানুষ কিনা। বলছিলুম, আমাদের প্রথম যৌবনের সে-সব দিনগুলোকে গ্রাস করবার জন্য বিচ্ছেদের এক দারুণ রাহু হাঁ করে এগিয়ে এল। দুই বেয়াই কালান্তক সেনচৌধুরী আর রাঘব গুপ্তচৌধুরী রাতারাতি একদিন পরস্পরের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।

আড়িয়াল খাঁর ওপরে আমাদের মস্ত একটা চর ছিল, অজস্র ধান হত সেখানে। এক বর্ষার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, নদীর বুক থেকে সে চরের চিহ্ন লোপ পেয়েছে।

এসব নদীর একটা সাধারণ নিয়ম আছে, বোধ হয় তুমি তা জান। আজ এখানে চর ভেঙে নিলে তো, কাল কাছে দূরে যেখানে হোক, আর একটা নির্ঘাৎ ঠেলে উঠবেই, আইনের দিক থেকে এদের মালিক এক।

কিন্তু এত সব খুঁটিনাটি দিয়ে দরকার নেই, শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, এমনই একটা চরের মালিকানা নিয়ে বাবা আর শ্বশুরমশায়ের মধ্যে মতান্তর ঘটল। তারপর দেখতে দেখতে মতান্তরটা হ'ল মনান্তর এবং মনান্তর হ'ল মনোমালিন্য। এপার থেকে বাবার তিনশো লাঠিয়াল হেঁকে বললে, দেখে নোব; ওপার থেকে পঞ্চাশটা কড়া-নাকাড়ায় তার জবাব এল, কুচ পরোয়া নেই।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'লে বিপদে পড়তে হয় উলুখড়কেই। একদিন কালান্তক চৌধুরীর বজরা এল আমাদের ঘাটে। বেলা তখন ঠিক দুপুর। আমি তখন বহু চেষ্টার ফলে তোমার ঠানদিকে নির্জনে চিলে-কোঠায় গ্রেপ্তার করে ফেলেছি, এমন

সময় বাইরের কাছারি থেকে বাবা ডেকে পাঠালেন।

বাবাকে বাঘের মত ভয় করতুম। দুরু দুরু বুকে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বাবা তখন মোটা গির্দা বালিশে গা এলিয়ে দিয়ে আলবোলা টানছেন, মনে হল, তাঁর ভারী লাল মুখখানা যেন রক্তের রঙে টক টক করছে, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক।

সংক্ষেপে বললেন, দীনে, তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে বউকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বজরা পাঠিয়েছে।

আমি চুপ ক'রে রইলুম। বউকে দেওয়া নেওয়া ব্যাপারে কোন দিনই বাবা আমার সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা রাখেন নি ; আর তখন সে রকম প্রথা ছিলও না। কাজেই বাবার এই ভণিতাটুকু অদ্ভুত শোনাল।

বাবা আবার বললেন, আমিও এই মুহূর্তেই তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। জীবনে কোন দিন যাতে তাকে এ বাড়ির ছায়া মাড়াতে না হয়, তারও আয়োজন করব। ওই বউকে তোর ত্যাগ করতে হবে দীনে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—কথাটা শোনাই ছিল, সেটা কি জিনিস, তা এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। এর চেয়ে বাবা যদি তাঁর আলবোলা থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতেন, তা হ'লেও এতটা আশ্চর্য বোধ হ'ত না। উত্তর দোব কি, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বোকার মত খালি চেয়ে রইলুম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন মাথার মধ্যে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে।

একবার ক্ষীণস্বরে বলতে গেলুম, সেটা কি ভাল হবে?

বাবা অসন্তুষ্ট চোখে এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যে, প্রাণ উড়ে গেল। বললেন, লেখাপড়া শিখলে লোকের বুদ্ধি বাড়ে জানতুম, কিন্তু দেখছি, তোর সেটা ক'মে আসছে। ওই অপমানের পরেও ওই বাড়ির মেয়ে আমার ঘরে থাকবে? রাঘব চৌধুরী এখনও মরে নি, তোর আবার বিয়ে দোব।

মাথা নীচু ক'রে চলে এলাম। তোমরা আজকালকার ছেলে হ'লে খুব একচোট ইংরাজী বকুনি দিয়ে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিশ্চয়। কিন্তু দিনকাল তখন বেয়াড়া ছিল ভায়া, বাবার মুখের ওপর কথা কইলে ছেলেকেও তিনি রেয়াত করতেন না।

তখন লোক-লজ্জার বালাইটা অত্যন্ত বেশী ছিল, তাই যাওয়ার আগে তোমার ঠানদির সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। কিন্তু পাশের ঘরে তাঁর কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। কিন্তু আমার পক্ষে কিই বা তখন করা সম্ভব ছিল! মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টান্ত স্মরণ ক'রে নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইলুম।

তোমার ঠানদি চ'লে গেলেন, মানে তাঁকে চলে যেতে হ'ল।

চলে তো গেলেন, কিন্তু তারপর থেকে আমার মনের অবস্থা যে কেমন দাঁড়াল, তা তো অনুমানই করতে পার। মনে কর, এখন যদি একটা চিঠি আসে যে, অন্য জায়গায় দিদিমণির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে—

দাদামশাই !

তিষ্ঠ তিষ্ঠ দাদা, ঠাণ্ডা হও। সত্যিই তো তার কোনখানে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না—ওটা উদাহরণ মাত্র।

গল্প শুনতে চাও তো লক্ষ্মী ছেলেটির মত মুখ বুজে বসে থাকতে হবে, নিজের কথা দু'একটা এসে পড়লেও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না।

আচ্ছা বলুন, তারপর ?

তারপর দিনের পর দিন আমি মরীয়া হয়ে উঠতে লাগলুম। বাবা তো স্রেফ্ অগ্নিমূর্তি। বাড়িতে কড়া হুকুম জারী ক'রে দিয়েছেন, করালীপুরের বোয়ের নাম কেউ ঠোঁটের ডগাতেও আনতে পারবে না। আমাকে দিনের মধ্যে তিনবার করে সান্ত্বনা দিচ্চেন, এই কটা দিন একটু কষ্ট করে থাক দীনে, তোর নতুন বউ এল বলে।

বাবা এই বলে ছেলেকে সান্ত্বনা দিতেন ?

দিতেন বই কি। কেন দেবেন না ? তিনি তো পুরুষ ছিলেন না, ছিলেন পুরুষসিংহ। লুকোচুরির ব্যাপার তাঁর কাছে অচল। যা বলবেন, একেবারে পষ্টা-পষ্টি। কিন্তু মন কি আর মানে ? বুড়ো হয়েছি ভায়া, এখন আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কতদিন চোখের জলে বালিশ ভাসিয়ে দিয়েছি, স্বপ্ন দেখে আচমকা জেগে ওঠবার পরে শূন্য বিছানাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। এ ভাবে আর কতদিন চলে ! ভাবলুম, এবার একটা এস্পার ওস্পার যা হোক কিছু করতেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু কি করা যায় ?

অনেক ভেবে একটা মতলব বের করলুম। নাজিরকে বললুম, পারবি ?

নাজির সোজা বরিশালের বাংলায় জবাব দিলে, পারমু না ক্যান ?

তারও তখন জোয়ান বয়েস। সেও হালে বিয়ে করেছে, আমার মনের অবস্থাটা বুঝলে।

বললে, সেই ওই ভাল কত্তা। পুরুষ মানুষ হইয়া ঘরে বইয়া বউর লইগ্যা কাঁদবেন ক্যান ? লয়ন, আমি আপনারে পার কইরা দিমু।

বললাম বাবার সঙ্গে যে ঝগড়া চলেছে, তাতে তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠা যাবে না নাজির। অথচ—নাজির উৎসাহ দিয়ে বললে, আরে রাহেনছেন কত্তা। শ্বশুরবাড়ি ওডয়েন লইগ্যা আপনারে মাথায় কিরা দে কেডা ? ওপার আপনাগো কুটুম্ববাড়ি

আছে না? হেয়ানে গিয়া ওডবেন। ডরান কিয়া? মুই বউমণির ছাহা করোনের ব্যাবাক বন্দোবস্ত কইরা দিমু; আপনে হ্যানারে লইয়া আইয়া কত্তার পাও জড়াইয়া পড়বেন—হেইলেই কত্তার মেজাজ শীতল হইয়া যাবে। ঝগড়া তো বউমণির বাপের লগে, ত্যানার লগে কি?

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু বাবা যে রকম একরোখা লোক, তাতে বউকে নিয়ে এসে তাঁর পা জড়িয়ে পড়লেও যে ফলাফল কতদূর কি হবে, বুঝতে পারছিলাম না। তা সে যা হবার হবে, বউয়ের সঙ্গে এখন অন্তত দেখাটাও তো করা দরকার। নইলে আর তিনটে দিনও আমি বাঁচব না।

অগ্র-পশ্চাৎ ভাববার মত স্থির বুদ্ধি তখন কি আর ছিল? হাসছ ভায়া? তা হাসবেই। তোমরা আজকাল বিয়ের ডুমাস আগে থেকেই সেই যে নোটন পায়রার মত ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে বসে থাক, জোর করে সে জোড় কেউ না ভাঙলে আর বিচ্ছেদের বালাই নেই তোমাদের। নইলে বুঝতে, সে কি ভয়ানক জিনিস!

শেষ পর্যন্ত পালালুম। না পালিয়ে উপায় ছিল না। সেদিন সন্ধ্যার দিকেই বেশ বাতাস উঠেছে, আড়িয়াল খাঁ ঝড়ের ডাক ডাকতে শুরু করেচে। নাজির এসে বললে, চলেন কত্তা।

অন্ধকার কালো জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে পানসি পাড়ি জমাল, ক্ষ্যাপা ঢেউ কখন যে এক আছাড়ে তাকে ডুবিয়ে দেয় ঠিক নেই। কিন্তু নাজির পাঠানের ছেলে। গ্রামের মুসলমানদের আজকাল আর কি দেখছ, এক ভাগ ভাত আর তিন ভাগ পান্তার জল দিয়েই এখন ওদের পেট ভরাতে হচ্ছে। ঠিকমত খেতে পেলে দেখতে, তিন দিনে ওজাত বিশ্বজয় করত।

এলাম করালীপুরে, উঠলুম দূর সম্পর্কের এক পিসীর বাড়িতে। তিনচার কথাতেই তাঁর মুখ এবং কৌতূহল একসঙ্গে ঠাণ্ডা করে দিলুম।

নাজির পাকা লোক। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে সম্প্রতি এতবড় একটা বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও চাকর-বাকর আত্মীয়-কুটুম্বদের ঘনিষ্ঠতা লোপ পায় নি। তাদের অনেকের সঙ্গেই নাজিরের পরিচয় ছিল, অনায়াসে একজনকে যোগাড় করে আনলে।

যে এল, তার নাম নবীন। আমাকে দেখেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। বললে, জামাইবাবু এ সব কী ব্যাপার?

বললুম, দেখছই তো, কি বিশ্রী গোলমাল বেধে বসে আছে!

নবীন দু'হাতে একেবারে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরলে। বললে, দোহাই আপনার, আপনি একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন জামাইবাবু। দিদিমণির কান্না তো আর চোখে দেখা যায় না। দিন দিন সোনার অঙ্গ শুকিয়ে যে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলুম, খুব কাঁদে বুঝি ?

নবীন বললে, খুব। সে জল কেউ ধরে রাখে নি, রাখলে এতদিনে পুকুর হয়ে যেত।

তা তো বুঝতেই পারছি। নিজের অবস্থাও এর চাইতে এতটুকু আশাপ্রদ নয়। সমস্ত মনটা চিন্তায় যেন চরকিপাক খাচ্ছে। কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু চাকর-বাকরের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করাটা ঠিক নয় মনে করে সামলে গেলুম। নবীনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, আচ্ছা, দেখছি আমি।

দাদামশাই, গল্প তাড়াতাড়ি শেষ করুন। বিস্তর রাত হয়ে গেল, ঘুম পাচ্ছে আমার।

ঘুম পাচ্ছে ? ভায়া, ওই জন্যেই তো তোমাদের দিয়ে দেশোদ্ধার হবে না। রাতের পর রাত জেগে তোমরা বিলিতী উপন্যাস নিয়ে গোগ্রাসে প্রেমের গল্প গিলবে, অথচ একদণ্ড ঘরের কথা শুনতে বসলেই ঘুমে তোমাদের চোখ জড়িয়ে আসে ! এ তো অন্যায় কথা।

কিন্তু বুঝতে পারছি, নিজের প্রেম নিয়ে তোমরা এমন টইটম্বুর হয়ে আছ যে, এসব সেকেলে ধরণের ব্যাপার আর ভালো লাগছে না।

কিন্তু উদার হতে শেখো রঞ্জন, উদার হতে শেখো। শুনছি, তোমরা নাকি আজ-কাল বসুধৈব কুটুম্বকম্ করতে চাও, আমরা বুড়োরা তবে আর কি দোষ করলাম !

যাক্ যা বলছিলুম। নবীন সত্যিই যে হিতাকাঙ্ক্ষী, তার পরিচয় সে দিলে। বললে, দিদিমণির সঙ্গে এখন দেখা করাটা শক্ত ব্যাপার বটে। বাবু রেগে যে রকম কাঁই হয়ে আছেন, তাতে চাই কি আপনাকে সামনে পেলেই ঘা-কয়েক লাগিয়ে দেবেন। তবু ব্যবস্থা একটা হবেই।

হলও। কিন্তু তোমরা আজকালকার কাব্য-লেখা ললিতলবঙ্গলতা নায়ক হ'লে তা শুনেও মূর্ছা যেতে। নারকোল গাছে চড়েছ কখনও ? ঝড়ের সময় নদী সাঁতরে পার হয়েছ ? বুনো ঘোড়ায় চেপে সাঁ সাঁ করে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটেছ কোন দিন ? শিউলীর টেঁটার ভয় না রেখে কোনো সন্ধ্যায় খেজুরের নলেন-রস চুরি করেছ ? না তো ? কিন্তু আমাদের সময়ে এসব গুণের একটাও কম থাকলে নায়ক হওয়ার সাধ্যই ছিল না কারও। তোমাদের ব্যাপার তো কত সহজ হয়ে গেছে, এক পেয়ালা চা, একখানা কবিতার বই, লেকে এক পাক আর সিনেমায় এক শো,—তা হলেই কাজ হাঁসিল। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে প্রেম করতেই সে যুগে যা ধকলটা আমাকে সইতে হয়েছিল, তা শুনলে তোমাদের চোখ কপালে চড়ে যাবে। নারী সে যুগে বীর্যশুল্কা ছিল দাদা, অর্থশুল্কা নয়।

কলেজে এফ. এ. পড়বার সময় তোমাদের রোমিও জুলিয়েটের পাতা উল্টেছিলুম। প্রায় সেই ব্যাল্কনির ব্যাপার আর কি! পেছনের বাগানটা অন্ধকার, একটা সুপুরিগাছ একেবারে জানালার পাশ ঘেঁষে উঠেছে। নবীন আমাকে সেই সুপুরি গাছের গোড়ায় পৌছে দিলে। বললে, সোজা ওই সুপুরিগাছ বেয়ে উঠে যান, দোতলার জানালার কাছে গেলেই দিদিমণির সঙ্গে দেখা হবে।

ব্যাপারটা বোঝো। বিলক্ষণ ডানপিটে ছিলুম, কিন্তু জমিদারের ছেলে তো বটে। সুপুরিগাছে চড়াটা কখনও অভ্যাস করি নি, কারণ, নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে ও ফলটা একান্তই অবান্তর।

ভারী মুস্কিলে পড়লুম।

তোমরা হলে কী করতে? বুকে হাত দিয়ে ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলতে, তারপর বায়োস্কোপের নায়কের ভঙ্গিতে হয়তো বা ঘাড় নীচু করে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু সে ধাতুতে আমরা তৈরী হই নি। হঠাৎ ওপরের দিকে চোখ পড়ল। দোতলার শিক দেওয়া জানালাতে একখানা উজ্জ্বল সুন্দর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আর দেখেই চিনলুম। সেই মুহূর্তে সে মুখের ওপর বিরহবিশীর্ণতা এত প্রত্যক্ষ ফুটে উঠেছে বলে মনে হ'ল যে, আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। মালকোঁচা এঁটে সুপুরি গাছে চড়বার দুঃসাধ্য কাজে লেগে গেলুম। ভায়া, সেদিনের স্মৃতি আমি জীবনে ভুলব না। হাত পা ছ'ড়ে গেল, জামা কাপড় ছিঁড়ে একাকার। তখন কিন্তু সে সব অনুভব করবার মত অবস্থা আমার নয়। মনে মনে বললুম, যাক প্রাণ, থাক মান, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে যাবই।

অর্থ আরোহণ পর্ব। আমার মনে তখন এমন প্রেরণা এসেছে যে, নুনছালের জ্বালা আদৌ জ্বালাই নয়। ঝর ঝর করে সারা গাছটায় ঝাঁকুনি লাগতে লাগল, সুপুরির একটা শুকনো ডোঙা টকাস্ করে আমার নাক বরাবর খ'সে পড়ল। 'উঃ'-টা দাঁতের মধ্যে চেপে নিয়ে আমি গাছ বাইতে লাগলুম। আর সেই সঙ্গে অজস্র কাঠ-পিঁপড়ের দংশন। বিয়ে করা বউকে নিয়ে এমন মারাত্মক অ্যাড্ভেঞ্চার, নাঃ ভায়া, স্বীকার করতেই হ'ল, সে যুগেও এটা দুর্লভ ছিল।

অকৃত্রিম সাধনার সিদ্ধি আছেই। যথাস্থানে পৌছানো গেল শেষ পর্যন্ত। অস্ফুট-স্বরে ডাকলাম, তারা!

তোমার ঠানদির সে কি রূপ দেখলাম সেই মুহূর্তে! যেন উমা পঞ্চাগ্নি সাধনা করছেন। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ ব'সে গেছে,—বিরহের দশম দশা যাকে বলে। জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে উদাস দৃষ্টিতে সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।

সোল্লাসে আবার ডাকলুম, তারা!

তারা চমকে তাকালে। অন্ধকারে গাছের মধ্যে আমার সে মূর্তি দেখে বলতে গেল, ভূ—ভূ—

বাধা দিয়ে বললুম, ভূ—ভূত নয় তারা, আমি। তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি নি, বাড়ি থেকে পালিয়ে তোমায় দেখতে এসেছি। বহু কষ্টে এই সুপুরিগাছ বেয়ে শেষে—

তুমি!

তোমার ঠানদির মুখে সে-সময় যে ভাবের অভিব্যক্তি দেখলুম, তার আর তুলনা নেই ভায়া। ভাষা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। বিস্ময়, আনন্দ, ভয়, অনুরাগ, মান অথবা অভিমান কী যে ছিল না, আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি।

কিন্তু অতুলনীয় সে ভাবের অভিব্যক্তিই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষে। আমি যে কোথায়, কি ভাবে 'আকাশস্থ নিরালম্ব' হয়ে আছি তা খেয়ালই রইল না। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত বাড়িয়ে বললুম, হ্যাঁ প্রিয়ে, এই যে আ—

'মি' টা বলবার আগেই অনুভব করলুম, হঠাৎ আমার চারপাশের জগৎটা একদম ফাঁকা, ওপরে নীচে কোথাও কোনও অবলম্বন নেই। কানে বাতাসের একটা সোঁ সোঁ শব্দ,······

তারপরেই—বাস!

তারপর কী দাদামশাই?

বুঝতেই পারছ। বাঁ হাতটায় আজ পঞ্চাশ বছর পরেও তেমন জোর পাই না। জ্ঞান হ'লে দেখলুম, আমার পায়ের কাছে ম্লান মুখে ব'সে শ্বশুরমশাই, আর মাথার কাছে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে বাবা।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে শ্বশুরই প্রথম কথা কইলেন। করুণ স্বরে বললেন, সুপুরিগাছে যদি উঠতেই গেলে বাবাজীবন, তা হলে কোমরে একগাছা কাছি জড়িয়ে নিলে না কেন?

বাবা বললেন, ভবিষ্যতে গাছে ওঠবার সময় এই সাধারণ নিয়মটা মনে রেখো যে, একখানা হাত গাছের আর একখানা তোমার নিজের। দুখানাকে নিজের বলে ব্যবহার করতে গেলেই বিপদ।

শাপে বর হয়ে গেল। আমি বাবার একমাত্র বংশধর আর শ্বশুরমশাইও নিশ্চয় মেয়ের বৈধব্য চান না। সুতরাং অতি সহজেই একটা রফা হ'ল।

শ্বশুর বললেন, বেয়াই, আর ঝগড়া-বিবাদে কাজ নেই, ও অলক্ষুণে চর আমি জামাইকেই লিখে দোব।

বাবা বললেন, বাঃ, তুমি জামাইকে লিখে দেবার কে হে? আমার চর আমি লিখে দোব আমার বউমাকে।

শ্বশুর বললেন, কক্ষনো না, আমি।

বাবা বললেন, খবরদার, আমি।

হাতাহাতি বাধত, কিন্তু আমি ক্ষীণ-স্বরে বললুম, দোহাই, থামুন আপনারা, আমি এখন চীৎকার সহ্য করতে পারছি না।

দুই বেয়াই ঠাণ্ডা হলেন।

তারপর কতদিন কেটে গেল, বাবা আর শ্বশুরমশাই সেই কবে ম'রে গেছেন, তোমার ঠানদিও আজ দশ বছর হ'ল আমার মায়া কাটিয়েছে। কিন্তু আজ আমি সেই চর থেকে বছরে সাত-আটশো মণ ধান পাই।

দাদামশাই থামলেন।

দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করে এগারোটা বাজল। বললুম, আচ্ছা দাদামশাই, উঠি এবারে।

দাদামশাই উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন দেওয়ালের গায়ে ঠানদির বড় অয়েল-পেন্টিংটার দিকে স্থিরনিবদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কাঁটাল পর্ব

দীনবন্ধু দাদামশাই বললেন, কি ভায়া, আজকাল যে দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চাও না। বলি, সায়েব হয়ে গেলে নাকি?

আমি বললাম, ভুল করলেন দাদু। সাহেবরা বরং দেশকে অনেক বেশি ভালোবাসে। 'হোম স্যুইট হোমে'র কথা মনে পড়লে তাদের আর মাথা ঠিক থাকে না।

গড়গড়ায় একটা হালকা টান দিয়ে দাদামশাই মিষ্টি তামাকের গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন। সাদা কালোয় মেশানো ভ্রূ-জোড়ার নীচে দুটি প্রসন্ন চোখ স্নিগ্ধ কৌতুকে জলজল করতে লাগল। বললেন, তা হলে ব্যাপারটা কি? 'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্ম-পর?' শুনলাম নাকি আজকাল তুমি মাঝে মাঝে গল্প-টল্প লেখো?

বললাম, তা লিখি। সম্পাদকেরা পাতা ভরাবার জন্যে ছাপে। কিন্তু কেউ পড়ে না দাদু। কেউ যদি হঠাৎ ভুল করে পড়ে ফেলে তা হলে সে অনুতাপ করে।

গড়গড়ার নল নামিয়ে দাদামশাই হেসে উঠলেন। বললেন, করে নাকি? তা হলে তো ঠিকই করে। তোমরা কি আজকাল আর গল্প লিখতে পারো ভায়া? তোমাদের পৃথিবী থেকে গল্প ফুরিয়ে গেছে। শুধু রয়েছে কণ্ট্রোল, কিউ আর কালোবাজার। মানুষের জীবনে দুঃখ তো আছেই, প্রত্যেক দিনই তা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে ফলাও করবার কি দরকার? লোকে সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্যে, নিজেকে ভোলাবার জন্যে, কেবল খোঁচা খাওয়ার জন্যে তো নয়।

বললাম, হঠাৎ অনেক কথা এনে ফেলেছেন দাদামশাই। এটা যে যুগের দাবী। সাহিত্যের সংজ্ঞা যে কি—

দাদামশাই বাধা দিলেন, থামো রঞ্জন, থামো। তোমরা আজকালকার ছেলে, চার-চারটে পাস দিয়েছ, তার ওপরে কলেজের মাস্টার। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে আমরা পারব কেন। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব দাদা। তোমার গল্প সম্বন্ধে আমার দিদিমণি কি বলে?

আপনার দিদিমণি? তার কথা আর বলবেন না। আমি গল্প শোনাতে বসলেই হাই তোলে, তারপর—

তারপর দু হাতে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, ওসব ছাইপাশ থাক এখন, তার চাইতে আমাকে একটা—কেমন এই তো?

আপনার টিপ্পনীগুলো কিন্তু আপত্তিকর দাদু।

দাদামশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—না, তোমাদের কালের সঙ্গে আমাদের কালের আর মিল ঘটল না রঞ্জন। আমাদের বয়েস যত বাড়ে, মনে তত বেশী রঙ লাগে। আর কুড়িতে পা দিতে-না-দিতেই তোমরা হয়ে ওঠো টাকমাথা অঙ্কের মাস্টার, একটুখানি চটুলতা বরদাস্ত করতে পারো না। আচ্ছা ভায়া?

বলুন।

মনে করো পূর্ণিমার রাত। পৃথিবী ধুয়ে গেছে শরতের জ্যোৎস্নায়। বাইরে থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। তুমি আর দিদিমণি আছো ছাতের ওপরে। ঠিক সেই মুহূর্তটার একটা প্রোগ্রাম দাও দিকি।

আপনিই বলুন।

আচ্ছা শোনো। তুমি দিদিমণিকে বলবে, ওই যে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, ওর মধ্যে রোমান্টিক কিছুই নেই। ওটা হচ্ছে স্রেফ বিশুদ্ধ পাথর আর মরুভূমি। ওর আলোটা ধার করা। ও হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতীক। বাইরে থেকে ঝিমল্যাও বলে মনে হয় আর কাছে এলে দেখা যায় খালি দারিদ্র্য আর রিক্ততা। অতএব ওই চাঁদকে দেখে শিক্ষালাভ করা গেল। সেটা হচ্ছে এই যে জীবনটা নিছক

ডিসেপ্‌টিভ্‌—তাতে আশা নেই, আনন্দ নেই, ভালোবাসা নেই। সুতরাং এসো কমরেড, দুজনে মিলে একটা দুরূহ কাজে লেগে যাই। কেমন এই তো?

আমি হাসলাম, অতটা গন্তময় এখনো হয়ে উঠতে পারি নি। তবে এটা ঠিক যে চাঁদের আলোয় এখন আর উহু-উহু করে বুক চেপে ধরতে হয় না, কিংবা গায়ে ফোসকাও পড়ে না। কিন্তু আপনাদের কালের কথাই বলুন।

আমাদের কাল? সে কি ব্যাখ্যা করবার দরকার আছে? তোমার দিদিমা আর আমি হয়তো সমস্বরে গান জুড়ে দিতাম। অবশ্য চাপা গলাতেই—বাড়ির কেউ শুনতে না পায়। সে গান শুনলে তোমরা এখন কানে আঙুল দেবে হয় তো, নিতান্তই নিধুবাবুর টপ্পা।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আপনাদের কালটাই ভালো ছিলো বলে মনে হচ্ছে।

বোধ হয়। তোমাকে আমার সেই প্রেমের কাহিনী বলেছিলাম, মনে পড়ে? তোমাদের যা কিছু রোমান্স বিয়ের আগে, তিনদিন পরেই ফিকে মেরে যায়। কিন্তু আমাদের সময় সর্দা আইন পাস হয় নি তো, পাঁচবছরের কনেবউ ঘরে নিয়ে আসতাম। তারপরে বয়েস বাড়ত আর আস্তে আস্তে চোখে রঙ ধরত। আজকালকার দিদিমণিরা বড্ড হিসেবী, ঘরে ঢুকতেই মোজা বোনার পর্ব শুরু হয়, নয়তো দুধের দাম নিয়ে গয়লার সঙ্গে বাধে মল্লযুদ্ধ। কিন্তু—

দাদামশাই থামলেন। তারপর একবার তাকালেন দেওয়ালের দিকে। বড় অয়েল-পেন্টিংটার গায়ে দিদিমার শান্তসুন্দর মুখখানা হাসছে—আজ বারো বছর হ'ল পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন তিনি। পলকের জন্যে মনে হ'ল, দাদামশাইয়ের চোখের কোণ দুটো যেন চক চক করে উঠেছে।

বহুদিন পরে দেশে ফিরেছি। এমন নামজাদা গাঙ্গুলীবাড়ি আমাদের, অথচ এখন শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। কেউ থাকে না বাড়িতে। চাকরি-বাকরির খাতিরে বাংলা বিহার আসামের নানা জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরিসীম একটা শূন্যতার মধ্যে মনটা হু-হু করে ওঠে। যতক্ষণ ধৈর্যে কুলোয় পুকুরে মাছ ধরি আর বাকী সময়টা এসে আড্ডা দিই দীনবন্ধু দাদামশাইয়ের ওখানে। গ্রামের মধ্যে এই একটা মানুষ, সরসতায় আর সজীবতায় যে টল-টল করছে, আর একমাত্র যার সঙ্গে আমার মন মেলে।

গড়গড়ায় কয়েকটা মৃদুমন্দ টান দিয়ে দাদামশাই বললেন, গল্পের কথা বলছিলে। আচ্ছা দাদা, এমন গল্প কেন লেখো না, যাতে মিষ্টি হাসি, হালকা আনন্দ? যার

ভেতরে জীবনটা শুধু তেতোই নয়, মানুষ শুধু সাপের মতো হিংস্রই নয়?

বললাম, আপনি জমিদার, মন্বন্তরের দিনেও সুখেই আছেন। কিন্তু আমাদের মত রেশন কার্ড নিয়ে কণ্ট্রোলের দোকানে ছুটতে হলে বুঝতে পারতেন। মিষ্টি করে লিখতেই তো চাই, কিন্তু একখানা কাপড়ের জন্যে যখন আট ঘণ্টা ধরে কিউ করতে হয়—

দাদামশাই বললেন, তাই হয় তো হবে। তোমাদের জীবন থেকে গল্প বোধ হয় ফুরিয়েই গেছে। হয়তো পূর্ণিমা রাতে দিদিমণি তোমার বুকে মাথা রেখে আবেগ-বিহ্বল স্বরে বলে না—

না, অগ্নিমূর্তি হয়ে গর্জন করে, রেশন কার্ডের কোটায় যে চিনি ছিল, তা দুদিনের মধ্যেই ফুরিয়েছে, অতএব সপ্তাহের বাকী পাঁচ দিন চা বন্ধ।

সত্যি দুঃসময় যাচ্ছে তা হলে। যুদ্ধের আগুনে এবার মদন পর্যন্ত ভস্ম হয়ে গেছে, কি বলো? 'কর্পূরঃ ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে' নয়, নিজেই কর্পূরের মতো দগ্ধ হয়ে গেছে।

সেইজন্যেই তো আধুনিক লেখায় 'রতি-বিলাপ' শুনতে পাচ্ছেন দাদু।

রতি বিলাপ? না শৃগাল-বিলাপ?

আমি হেসে ফেললাম—আপনি আধুনিক সাহিত্যের নিন্দে করছেন?

নিন্দে? সর্বনাশ।—দাদামশাই তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন—তোমাদের 'যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে' ভাই? তোমরা প্রাণ খুলে যা খুশি লেখো। কিন্তু একটা কথা আমি বলবই। তোমাদের যুগে গল্প নেই, তোমাদের যুগে প্রেমও নেই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে গেছে। আজ বঙ্কিমের বই পড়ে তোমরা বলো রোমান্স, তোমরা বলো এমন হতে পারে না। হতে যে পারে না কী করে জানলে? বঙ্কিম যে যুগের কথা লিখেছেন, সে-যুগে তোমরা তো জন্মাও নি।

কিন্তু আপনার দিদিমণি জন্মেছিল। সে সারাক্ষণ সূর্যমুখী আর ভ্রমরের মতো তটস্থ হয়ে আছে, কখন কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণী এসে দেখা দেয়।

দাদামশাই বললেন, দিদিমণিকে ভালো মানুষ পেয়েছ কি না, তাই তার নামে যা নয় তাই বলে বেড়াও। কিন্তু চাঁদ, তুমিই বা এমন কোন্ নগেন্দ্র দত্ত কিংবা গোবিন্দলাল শুনি?

বললাম, থাক দাদু, থাক। আপনার দিদিমণির ব্রীফ আর আপনাকে নিতে হবে না। তার একার পরাক্রমেই আমি হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই, তার সঙ্গে আপনি জুটলে তো—

অপরিমিত খুশি হয়ে উঠলেন দাদামশাই—কেমন ভায়া, এইবারে পথে এসো।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবধি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কূল পেলেন না তো রঞ্জন শর্মা কোন ছার! ওদের টুকটুকে রাঙা পা ছাড়া তোমাদের আর গতি আছে নাকি!

শেষ কথাটা কিন্তু বঙ্কিম থেকে চুরি করলেন দাদু।

করলাম নাকি? উপায় কী বলো। তোমাদের যেমন রবি ঠাকুর ছাড়া গতি নেই, আমাদেরও তেমনি বঙ্কিমই সম্বল ছিল। তা ছাড়া বঙ্কিমের গল্প আমাদের জীবনে একেবারে মিথ্যেও ছিল না ভাই। আমি নিজেই তার প্রমাণ পেয়েছিলুম।

গল্পের গন্ধে আমি নড়েচড়ে বসলুম: বলুন দাদু বলুন।

চাকর এসে গড়গড়ার কলকেটা বদলে দিয়ে গিয়েছিল। অম্বুরী তামাকের মাদকগন্ধে ঘরটা আকুল হয়ে উঠেছে, আর বাইরে দেখতে পাচ্ছি সিঁড়ির নীচেই একটা গোলাপজাম গাছ ফুলে ফুলে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে। একটা মস্ত ভোমরা তার নীল রঙের পাখা আমার কানের কাছে বার কয়েক কাঁপিয়ে উড়ে গেল। খালের দিক থেকে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস এসে দুলিয়ে দিচ্ছে দাদামশাইয়ের শুভ্র চুলগুলোকে। সুন্দর শান্ত পৃথিবীতে যেন অপরিসীম ভালোবাসা আর স্নিগ্ধতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দিদিমার ছবিখানার দিকে একবার তাকালেন দাদামশাই।

আমার শ্বশুরমশাইয়ের নাম বলেছি তোমাকে? কালীকান্ত সেনশর্মা। যেমন নাম, তেমনি শক্তিমান পুরুষ। বাঘ আর ছাগলকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। তোমার দিদিমার নাম দিয়েছিলেন বজ্রতারা, তোমাদের এখনকার আইভি রায় আর স্থূলতা সেন যা উচ্চারণ করতে ফিট হয়ে পড়বে।

অতিশয়োক্তি হ'ল দাদু।

গল্পে একটু রসান দিতে হয় ভায়া, উকিলের মতো অমন জেরা করো না।

আচ্ছা বলে যান।

সেই বাপেরই তো মেয়ে। যেমন জেদী, তেমনি একরোখা। যা ধরবে তা করে তবে ছাড়বে। কতবার আমাকে আঁচড়ে কামড়ে যে বিব্রত করে তুলেছে ঠিক নেই।

আপনি সয়ে যেতেন?

পাগল? দাদু হাসলেন: তোমাদের মতো পোশাকুরগু ফিনফিনে যুগে তো জন্মাই নি। চুল ধরে দমাদম্ শব্দে কিলিয়ে দিতুম। আজকাল হলে হয়তো নারী-নিগ্রহের রোমাঞ্চকর খবর হিসেবে বড় বড় হরফে কাগজে বেরিয়ে যেত। চাই কি তোমাদের মতো পরহিতব্রতীর দল আমার নামে এক নম্বর মামলাই রুজু করে বসতে।

আমি বললাম, সেটা আশ্চর্য নয়।

কিন্তু আমাদের কাল আলাদা ছিল ভাই। দুতরফেই একটু-আধটু বাহুবল প্রয়োগ না করলে কাব্য জমতো না। গোঁফকামানো পুরুষ আর লতিয়ে পড়া মেয়েদের নিয়ে মেট্রো বায়োস্কোপে চকোলেট চিবোনোর কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না।

দাদু, গল্পের চাইতে পরচর্চাটাই বেশি হয়ে যাচ্ছে।

নাঃ ভায়া, তোমার ওপরে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। কালিদাসের মালিনীর মতো তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না। পূর্বমেঘেই দমে যাচ্ছ, উত্তরমেঘের রসলোকে পৌঁছুবার জন্যে একটু পরিশ্রম করবে না?

আচ্ছা, বলুন।

তোমার সেই দিদিমা তো? বজ্রতারা তাঁর নাম, একেবারে 'ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন'-এর জলজ্যান্ত প্রতিবাদ। সেদিন জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, এমন সময় তোমার দিদিমা, অর্থাৎ সংক্ষেপে তারা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। তারপর আবেগবিহ্বলকণ্ঠে বললে, গন্ধ পাচ্ছ?

বাঃ, বেশ জমছে দাদামশাই।

দাঁড়াও ভায়া, একটু দাঁড়াও। তোমার মতো আমারও মনটা তখন বেশ কাব্যরসে থই থই করে উঠেছে। আমি বললাম, 'কিসের গন্ধ প্রিয়তমে?'

প্রিয়তমে!

আল্‌বাৎ প্রিয়তমে। কেন নয়? তোমাদের যাবনিক 'ডার্লিং' আর 'মন-আমি'র চাইতে প্রিয়তমা শুনতে খারাপ নাকি?

অস্বীকার করছি না দাদু।

আমি তোমার দিদিমাকে বললাম, 'কিসের গন্ধ তোমাকে ব্যাকুল করেছে প্রাণসখি? রজনীগন্ধার! তারা বললে, 'না পাকা কাঁটালের।'

পাকা কাঁটাল!

হাঁ, পাকা কাটাল। রজনীগন্ধা নয়, হাস্নুহানা নয়, নিদেনপক্ষে কাঁটালি-চাঁপাও নয়, একেবারে বিশুদ্ধ পাকা কাঁটাল। শুনে আমি বললাম, 'প্রাণেশ্বরি, কাঁটাল পেকেছে তাতে তোমার কি? এমন প্রাণকাড়া জ্যোছ্‌নায় এসো আমরা দুজনে বরং চাঁদের গন্ধ শুঁকতে থাকি।' তারা বললে, 'ওসব চাঁদ-টাঁদ আমি বুঝি না। আমি কাঁটাল খা বা। ভারী মিষ্টি গন্ধ, নিশ্চয় খাজা কাঁটাল।'

আমি বললাম, দাদামশাই, আপনার এ গল্প এ যুগে অচল।

থামো রঞ্জন। শুনে যাও, বাধা দিয়ো না। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'এই মাঝরাত্তিরে তুমি কাঁটাল খাবে কি রকম? তা ছাড়া এখন বাগানেই বা যাবে কে?'

তোমার দিদিমা বললে, 'কেন তুমি?'

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'হৃদয়েশ্বরি, তোমার জন্যে সব করতে পারি, দরকার হলে প্রাণও দিতে পারি। কিন্তু কাঁটাল আনতে পারব না। সকালে বরং যত খুশি—'

তারা মাথা নেড়ে বললে, 'সকালে আমার কিচ্ছু চাই নে। আর প্রাণও তোমাকে দিতে হবে না, তা হলে আমি বিধবা হবো। কথা হচ্ছে এক্ষুনি আমাকে কাঁটাল এনে দাও, নইলে কাল আমি বাপের বাড়ী যাবো।'

ভেবে দেখো ভায়া আমার অবস্থাটা। এক কথাতেই চরম পত্র। অথচ ফলটা হচ্ছে দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিত দর্শন—ভ্যাবাচ্যাকা গোছের কাঁটা-ওয়ালা একটা বিকট ব্যাপার। কাব্যের নায়িকারা কখনো কিছু খায় কিনা জানি না। যদি খায় তা হলে হয়তো একটি দাড়িম্ব-বীজ, একটি আঙ্গুর অথবা একটা মহুয়া ফল দাঁতে কাটে। আর আমার নায়িকা কিনা সেই চমৎকার মধু যামিনীতে কাঁটাল খাওয়ার বায়না ধরে বসল। রাত্রির কাব্যে দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ যাকে বলে।

দিলেন কাঁটাল এনে ?

শোনোই না। আমি বললুম, 'একা নয়, তা হলে দুজনেই বাগানে যাই চলো।' দু-একবার আপত্তি করে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বেলায় তারাও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নেমে এলুম বাগানে। পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার ছবি আঁকা, আমাদের এতবড় বাড়ীটা ঘুমে নিস্তব্ধ। শুধু বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। রাত জেগে বোধ হয় জমিদারীর কাগজপত্র দেখছিলেন তিনি।

কোন্ গাছে কাঁটাল পেকেছে বুঝতে দেরি হ'ল না। মালকোঁচা মেরে গাছে উঠে পড়লাম। তারপর খুঁজতে খুঁজতে সেই গন্ধেশ্বরীর সন্ধান মিলল। বিরাট ওজনের কাঁটাল, অন্তত সের পনেরো যে হবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অত বড় কাঁটাল নিয়ে গাছ থেকে নামি কি করে। ভাবতে ভাবতে যেই বোঁটা ধরে টান দিয়েছি, অমনি সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। কাঁটালটা একটু বেশিমাত্রায় পেকেছিল, ফলের টানের সঙ্গে সঙ্গে বোঁটার মাথার শুধু মুষলটা রইল ঝুলে, আর বাকীটা বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল ঠিক তারার মাথাতেই। তারা তো এক প্রকাণ্ড চীৎকার করে কুপোকাৎ, আর হৈ-হৈ করে জেগে গেল সমস্ত বাড়ি। বাবা তাঁর ঘর থেকে হুঙ্কার দিলেন, আর আমিও তৎক্ষণাৎ একলম্ফে পগার পার। বাড়ীর লোকজন এসে দেখে সারা গায়ে কাঁটালের রস আর আঠা মেখে তারা বোকার মতো বসে আছে।

আমি বললাম, দাদামশাই, আপনি কাপুরুষ। অবলাকে ওভাবে ফেলে পালালেন ?

পালাব না? বাবার হাতে খালি খালি খড়মপেটা খাই আর কি! আর তা ছাড়া সত্যি বলতে কি ভাই, মনে মনে খুশিই হয়েছিলুম। যেমন মাঝরাত্তিরে বেখাপ্পা বায়নাক্কা, তেমনি বোঝো তার ঠ্যালাটা।

কেলেঙ্কারি যা হওয়ার তা তো হ'ল। বাবা বললেন, 'বৌমা, কাঁটাল খাওয়ার এত ইচ্ছে হয়েছিল তো আমাকে বললেই পারতে। যাও, এখন স্নান করে শুয়ে পড়ো গে। কাল সকালে ক'টা কাঁটাল তুমি খেতে পারো দেখব।'

প্রকাণ্ড একটা বিলেতী বেগুনের মতো মুখ করে তারা ঘরে এল। 'দেহি পদবল্লব' করেও সুবিধে করতে পারলাম না। পাশবালিশ আঁকড়ে সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইল তো রইলই। আর তার সঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে কান্না। একেবারে পুরোপুরি নন-কো-অপারেশন—পরের দিন থেকে কথাই বন্ধ।

কিন্তু তারাও প্রতিশোধ নিলে। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন তামাক টানা শিখছি, আমাদের বাড়ির মাঝি নাজির ছিল আমার দীক্ষাগুরু। চিলেকোঠার ছাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে নাজির হুঁকো নিয়ে বসে থাকত আর আমি যথাসময়ে গিয়ে তার রসাস্বাদ করে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের গুণকীর্তন করতুম। অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে কথাটা তারাকে বলেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে যথানিয়মে তামাকের তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠল। চুপি চুপি গেলাম ছাতের ওপরে। দেখি নাজির বসে বসে নিজেই হুঁকো টানছে। আমি চটে বললাম, 'হতভাগা, আমার আগেই হুঁকোটা এঁটো করে দিলি?'

আর যাবে কোথায়! নাজির উঠে দাঁড়ালো। পা থেকে খড়ম খুলে নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে বসালো আমার পিঠে। বললে, 'হারামজাদা, লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক টানা শিখছ।' আমি শুধু খড়মাহত নয়, বজ্রাহত হয়ে মাটিতে বসে পড়লাম।

নাজির মারলে খড়ম দিয়ে?

আরে নাজির কোথায়? সাক্ষাৎ বাবা। ব্যাপারটা বিশুদ্ধ চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়! আর এর মূলে হচ্ছেন তোমার দিদিমা।

যাক্, **tit for tat**! মন্দ হয় নি দাদামশাই।

দাদামশাই গড়গড়ার ধোঁয়া ছাড়লেন: তুমিও এই কথা বললে। কিন্তু আমার দোষটা কী, বলো। আমি তো আর মাঝরাতে কাঁটাল খেতে চাই নি, কিংবা তারার মাথায় যে কাঁটাল পড়েছিল, তার জন্যেও দায়ী নই। তবু কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা!

বললাম, তা বটে। কিন্তু ঝগড়াটা মিটে গেল তো?

মিটবে? কেন মিটবে? এ কি তোমার আধুনিক যুগ যে একটুখানি ফোঁস-ফোঁসানি আর দিদিমণিকে একটি চুমু দিলেই ঝামেলা শেষ হয়ে গেল। আমরা

সে ধাতেই তৈরী হয় নি। খড়ম-পেটা খেয়ে আমার সুপ্ত পৌরুষ সিংহের মতো গর্জন করে উঠল। বললে, প্রতিশোধ চাই, এর নির্মম প্রতিশোধ। এ অপমান সয়ে বেঁচে থাকার চাইতে গাঙে ডুবে মরা অনেক ভালো।

প্রতিশোধ নিলেন তা হলে।

চেষ্টা করেছিলাম বই কি। কিন্তু 'বিধি যখন বাম কী করবেন বলরাম' জানো তো? যাক শোনো।—

পরের দিন থেকে তেমনি অসহযোগ চলতে লাগলো। আগে ছিল একতরফা, এখন দুপক্ষেই। এতদিন যে পাশবালিশ দুটো পায়ের কাছে পড়ে থাকত কিংবা থাকত খাটের নীচেই, তারাই এবার পরস্পরের বিরহ-জ্বালা দূর করতে লাগল। যেন আমাদের কেউ কাউকে চেনেই না। তারা যেন একটা কলাগাছ আর আমি একটা নৌকোর মাস্তুল—সারারাত জগদ্দল পাথরের মতো চুপ মেরে পড়ে থাকি দুপাশে। তারা বোধ হয় ছারপোকার কামড়ে ঘুমুতে পারে না আর আমি প্রাণপণে মশারির ভেতর কল্পিত মশা মারবার চেষ্টা করি।

এ অবস্থা কতকাল চলত জানি না, কিন্তু 'হেন কালে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশিলা পিতা'। বললেন, 'দীনে, আমি বুঁচিকে (আমার পিসীমা) আর বৌমাকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে রসুলগঞ্জের কাছারীতে যাচ্ছি। বৌমা কাঁটাল খেতে ভালোবাসে, ওখানে অঢেল কাঁটাল। তুইও একটু বেড়িয়ে আসবি নাকি? কোনোদিন তো যাস নি।'

আমি সোজা বললাম, 'না।' তারপর ভীমরুল-চাকের মতো মুখ করে চলে এলাম।

রসুলগঞ্জে একটা নূতন জমিদারী কেনা হয়েছে কয়েক মাস আগে। শুনেছি মস্ত ফুলের বাগান আছে—চমৎকার জায়গা। যাওয়ার লোভ আমার অনেক দিন থেকেই ছিল, কিন্তু বৌমার সঙ্গে কাঁটালের যোগাযোগের কথা ভাবতে গিয়েই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। দুম দুম করে পা ফেলে শোবার ঘরে চলে এলাম।

তিনদিন পরে তারা এসে প্রথম সম্ভাষণ করলে: 'কাল রসুলগঞ্জে যাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'বেশ।'

'তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে।'

আমি মেঘমন্দ্রস্বরে বললাম, 'না!'

'না কেন! রাগ হয়েছে! তুমি আমার মাথায় কাঁটাল ফেললে কেন?'

আমি আরো চটে গেলাম। বললাম, 'বেশ করেছি! তাই বলে তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে! তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—যেখানে খুশি যাও।'

এবার তারাও ক্ষেপে গেল: 'বটে, এত অহঙ্কার। দেবী চৌধুরাণীর সাগর-বৌ

ব্রজেশ্বরকে দিয়ে পা টিপিয়েছিল, জানো?'

আগুন হয়ে বললাম, 'আমি ব্রজেশ্বর নই।'

'ব্রজেশ্বর নও! আচ্ছা দেখা যাবে। যদি তোমার ঘাড় ধরে আমার কাছে টেনে নিয়ে যেতে না পারি, তা হলে আমিও কালীকান্ত সেনশর্মার মেয়ে নই।'

আমি বললাম, 'এ কাঠামে নয়।' তারপর জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে ছাতে চলে এলাম।

বাঃ দাদামশাই, এ যে রীতিমত নাটক জমে উঠেছে।

দীনবন্ধু দাদামশাই একবার স্বপ্নাতুর চোখ মেলে তাকালেন বাইরের দিকে। গোলাপজামের মুকুলগুলো মধুগন্ধে যেন আকাশপাতালকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। একটা প্রজাপতি উড়ে এসে দিদিমার অয়েল-পেন্টিংটার উপরে বসল।

তারা তো রসুলগঞ্জে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমার সব উৎসাহে মন্দা পড়ে গেছে। যতক্ষণ সামনে ছিল, ততক্ষণ ঝগড়া করেও একটা আনন্দ বোধ করতে পারতাম। কিন্তু কাছ থেকে যখন চলে গেল, তখন মনে হ'ল আমি হেরে গেছি। একটা হিংস্র বিদ্বেষ আমাকে পীড়া দিতে লাগল। মনে হ'ল ও ইচ্ছে করে এই যন্ত্রণা আমাকে দিচ্ছে, যেমন করে হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

একা বাড়ীতে মন-মরার মতো ঘুরে বেড়াই। প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? রাত্রে ঘুমের মধ্যে অভ্যাসবশে বিছানা হাতড়াই, পরক্ষণেই লজ্জায় অপমানে ভরে যায় মনটা। যে আমাকে এমন করে ছেড়ে চলে গেল তার জন্যে কিসের দুর্বলতা?

তবু কি মনকে মানাতে পারি ভায়া? বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করে কান্না পায়। ভাবি, ছুটে যাই রসুলগঞ্জেই। হাসছ! তা তো হাসবেই। দিদিমণি কখনো এমন দাগা দিয়ে চলে যেত, তা হলে টের পেতে।

ছুটেই গেলেন শেষ পর্যন্ত?

উঁহু! ধিক্কার দিলাম নিজের দুর্বল মনকে। তারপর একটা মারাত্মক প্ল্যান নিয়ে ফেললাম। মোহ-মুদ্গর তো পড়াই ছিল 'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা' স্মরণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম।

সন্ন্যাস?

স্রেফ সন্ন্যাস। ঠাকুরঘর থেকে হাতসাফাই করলাম পিসিমার গেরুয়া থানখানা। তারপর রাতের বেলায় সাংসারিক বেশ-বাস ত্যাগ করে পরলাম সেই কাপড়। একখানা কাগজে লিখলাম: গৃহাশ্রমে অরুচি ধরিয়াছে। এ সংসার শুধু আমড়ার ন্যায় আঁঠি ও চামড়া মাত্র, তাহাতে সারবস্তু কিছুই নাই। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান

লাভের নিমিত্ত আমি সন্ন্যাসী হইলাম। ইতি—শ্রীশ্রী ১০৮ ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

একেবারে ব্রহ্মানন্দ ?

নিশ্চয়। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, ভজনানন্দ, ভোজনানন্দ, এসব ছোটখাটো আনন্দ হয়ে আর লাভ কী। সন্ন্যাসী হলে একদম চূড়ান্ত করে হওয়াই ভালো। একেবারে 'ব্রহ্মকর্মসমাধীনঃ' !

তারপর ব্রহ্মলাভ হ'ল নিশ্চয় ?

হ'ল বই কি। বাড়ী থেকে রাত্রে 'তাতলসৈকতে বারিবিন্দুসম' গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কিছু নেই, শুধু সেই হুঁকোটা। শুনেছি সাধু-সন্তদের গাঁজা ছাড়া মনটা আত্মস্থ হয় না। তা আমার তো আর নওগাঁ-ব্র্যাণ্ড অভ্যেস নেই, কাজেই বিকল্পে দা-কাটা।

ভেবেছিলাম নাজিরকেও সঙ্গে নিই, আমার ছন্দকের কাজ করবে। কিন্তু তামাক-ট্র্যাজেডির ব্যাপারে ব্যাটাও ছিল ষড়যন্ত্রের মধ্যে। সুতরাং 'একলা চল্ রে'। সোজা ঘাটে চলে গেলাম, দিলাম এক-মাল্লাই নৌকো খুলে।

কোথায় চললেন ?

তা কি আমিই জানি ভায়া! সন্ন্যাসীর তো 'বসুধৈব'—কাজেই যেখানেই যাই না, মাধুকরী জুটবেই। বোটে ধরে রইলাম, ভাঁটার টানে নৌকো চলল। তারপরে তর তর করে এসে নামল আড়িয়াল খাঁর জলে।

মস্ত নদী অন্ধকারে আর তারার আলোয় একটা বিস্ময় বিচিত্র বিশাল রূপ নিয়েছে। নাচতে নাচতে ডিঙ্গি চলে এল মাঝগাঙে। একটা নৌকো নেই, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। শুধু কল কল করে জলের শব্দ আর ক্ষেপা বাতাস। এতক্ষণে ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল সন্ন্যাসের চাইতে তারার কাছে গিয়ে মান-ভঞ্জনের ব্যাপারটাই বোধ হয় ছিল ভালো।

কিন্তু আর তো উপায় নেই। ভুললে চলবে না আমি ব্রহ্মানন্দ। সংসারে কে কার! সবই তো মায়া প্রপঞ্চ। নশ্বর দেহ ধুলোতেই মিলিয়ে যাবে।

নেশাখোরের মতো নৌকো বেয়ে চলেছি তো চলেইছি। নদীর বাতাসে শীত ধরে গেল। এতক্ষণে আর একটা সত্যও বুঝতে পারলাম—খালি গেরুয়াতেই কুলোয় না, সন্ন্যাসীর একটা কম্বলও সম্বল করা দরকার। তা পরের ভাবনা পরে হবে, আপাতত এই রাতটা তো কাটুক।

কোথায় চলেছি জানি না। নৌকো নিজের খেয়ালে ভেসে চলেছে। চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে এসেছে, হাত দুটো টন টন করছে ব্যথায়, তখন আকাশে ভোরের আলো সোজা ছড়িয়ে ফুটে উঠল।

পাঞ্চ-ভৌতিক দেহধারণের বিড়ম্বনা যে অনেক তাতে আর সন্দেহ কি? ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু কোথায় খাবার মিলবে? নদীর জলে তো কচুরিপানা ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাবলাম, কাছাকাছি একটা গ্রাম পেলেই বম্ বম্ শব্দে গালবাদ্য করে গোটাকয়েক শাঁসালো শিষ্য জুটিয়ে ফেলব। তার পর একটা ব্যবস্থা হতে আর কতক্ষণ!

দুর্বলতা অস্বীকার করব না ভায়া, তারার জন্যে বুকের ভেতরটা কাঁদছিল। যে আমাকে সংসারে বীতরাগ করে দিয়েছে তাকে যে এতখানি ভালোবাসি, এ কি আগে বুঝতে পেরেছিলাম? তা হলে রসুলগঞ্জেই চলে যেতাম। দূর ছাই, সন্ন্যাস নেবার পরে কেন এমন মোহ? মনকে কষে ধমকে দিলাম। বুদ্ধদেব পেরেছেন, আমি পারব না? নতুন উৎসাহে বুক ভরে গেল। জোরে জোরে বোটেতে টান দিলাম আর তারস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলাম। 'ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা—'

কিন্তু ক্ষিদের কষ্ট তো আর সয় না। পেটের মধ্যে যেন তিন-তিনটে উনুন জ্বলছে। খাঁ-খাঁ-খাই-খাই। সামনেই নাম না-জানা গ্রাম। নৌকো ঘাটে ভিড়িয়ে ফেললাম, রওনা দিলাম গ্রামের উদ্দেশেই।

কয়েক পা এগোতেই বড একটা বাগান। আম আর কাঁটালের গাছ। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে পেটটা চমকে উঠল। পাকা কাঁটালের গন্ধ।

কাঁটাল! তারার সেই কাঁটাল! মুহূর্তের জন্য আন্‌মনা হয়ে গেলাম, কিন্তু পেটের মধ্যে ব্রহ্মা তখন নাচতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে নয়— একেবারে উদ্দাম হুলাহুল্লা ছন্দে। আর থাকা গেল না। কাঁটাল—কাঁটালই সই। গাছে উঠে পড়লাম।

সবে পাকা কাঁটালটি খুঁজে বের করেছি—এমন সময় সেই 'দুই বিঘে জমি'! সুমিষ্ট শ্যালক সম্বোধনে আত্মীয়তার আমন্ত্রণ জানিয়ে দুটি দাড়ি-ওয়ালা মূর্তির প্রবেশ। হিড় হিড় করে গাছ থেকে টেনে নামাল।

হাত জোড় করে বললাম, বাবা সকল, আমি সন্ন্যাসী—

কিন্তু যবনে কি করে জানবে সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য! আমি যে এক নয় দুই নয়, একেবারে শ্রীশ্রীমৎ ১০৮ ব্রহ্মানন্দ স্বামী, সে কথা ওদের বোঝাবেই বা কে। কপালে চোরের মার ছিল খেতেই হ'ল।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভাবলাম, সাধনার পথ বড় কঠিন—দুস্তর কণ্টকাকীর্ণ।

তবু কি রক্ষা আছে। যমদূত দুজন আমাকে বাবুর কাছে টেনে নিয়ে চলল। আমি সরোদনে দুর্গানাম জপতে লাগলাম। সন্ন্যাসের আরম্ভেই বুঝি জেল খাটতে হয়।

বললাম, 'কেন এত জুলুম ! মাত্র একটা কাঁটালের জন্যে—'

ওরা বললে, 'একটাই তো। কেন, তোমার বাবার গাছ নাকি ?'

কথাটার মধ্যে যে কি পরিমাণে আইরনি আছে তা কি ওরাই জানত, না আমিই কল্পনা করতে পেরেছিলুম !

দাদামশাই থামলেন। গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন, কেমন লাগল গল্পটা রঞ্জন ?

আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, বাঃ শেষ করলেন না তো ?

এখনো বুঝতে পারো নি ? তা হ'লে বৃথাই সাহিত্যিক তুমি। টানতে টানতে একেবারে বাবুর কাছারীতে নিয়ে হাজির করলে। বললে, হুজুর এই চোর কাঁটাল চুরির জন্যে গাছে উঠেছিল—

বাবু আমার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন : অ্যাঃ ! কাকে ধরে নিয়ে এলি ! এ যে তোদের ছোটবাবু, আমার ছেলে !

হায় রে দুর্ভাগা, সন্ন্যাস নিয়ে শেষকালে রসুলগঞ্জের ঘাটেই এসে ভিড়লাম। তাকিয়ে দেখি, জানলার ফাঁকে তারার মুখ দেখা যাচ্ছে। আর তার চোখের দৃষ্টি ! ভাষায় কি তার ব্যাখ্যা সম্ভব ! আমি শুধু সীতার ভাষায় দেবী ধরিত্রীর কাছে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম।

বাবা আর কী বললেন আমি শুনতেও পেলাম না। সেই লোক দুটো যে আমার দু' পা জড়িয়ে ধরেছে সে খেয়ালও রইল না। আমার কানের মধ্যে তখন খালি ঝিঁ ঝিঁ করে একটানা একটা তীব্র স্বর বাজছে।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলাম : তারপরে দাদু, তার পরে ?

দাদু একবার দিদিমার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, তারার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল। পেট ভরে কাঁটাল খেলাম। তারও পরে ? সে তো রাত্রির কাব্য—বুকে বুকে মুখে মুখে সন্ধিস্থাপন। সে গল্প না বললেও বুঝতে পারবে ভাই।

দেওয়ালের গায়ে দিদিমার ছবিটা হাসছে। সুন্দর প্রসন্ন চোখ দুটো যেন জীবন্ত।

তৃতীয় অধ্যায় : গুম্ফ পর্ব

দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্ষুরটা ঠোঁটের ওপরে খানিকটা বসে গিয়েছিল।

সেফ্‌টি রেজরে আমি কামাতে পারি না—ওর প্রতি আমার একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে। ওর চেহারাটাই কেমন অহিংস আর অমায়িক, কেমন যেন ছেলে-মানুষি বলে মনে হয়। কিন্তু একখানা ঝকঝকে বাট্‌লারের ক্ষুর—তার আভিজাত্যই

আলাদা। উজ্জ্বল দীর্ঘ ফলা, আলো পড়লে ঝিকিয়ে ওঠে—যেন একটা শক্তি আর মনীষার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে তার থেকে। তা ছাড়া নিরুপদ্রব শান্ত জীবনে মাঝে মাঝে যখন বীররস চাগিয়ে উঠতে চায় তখন হাতে একখানা ধারালো ক্ষুর পেলে নিজেকে অত্যন্ত বেশি সামরিক বলে বোধ হয়। কামানোর স্বচ্ছন্দ আরামের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু সামরিক হতে গেলেই রক্তপাতের আশঙ্কা আছে। যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি—দাড়ি বনাম ভব্যতার যুদ্ধ। তাই বেমক্কা ক্ষুরের টানে ঠোঁটের খানিকটা খচ্ করে কেটে বসল। ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে দিনকয়েকের মধ্যেই মুখের ওপর সুস্পষ্ট নীলিম-রেখায় একজোড়া গোঁফ আত্মপ্রকাশ করলে। বাটারফ্লাই নয়—আগণ্ড।

বৈঠকখানা ঘরে দীনবন্ধু দাদামশাই তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। শান্ত অলস দুপুর, বাইরের মুকুলিত গোলাপজাম গাছ থেকে মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া। খালের ওপারে দত্তদের বাড়িতে বিয়ে—স্নিগ্ধ ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেখানে চমৎকার সানাই বাজছিল। দাদামশাইয়ের ঝিম আসাটা অসম্ভব মনে হ'ল না।

আমার পায়ের শব্দে দাদামশাই চোখ মেলে তাকালেন।

রঞ্জন নাকি? এসো ভায়া, এসো।

আপনি ঘুমুচ্ছিলেন দাদু, তা হলে আমি যাই।

না, না ভায়া এসো, বোসো একটুখানি। বুড়ো মানুষের ঘুম হচ্ছে কাবলী-বেড়ালের মতো, ফাঁক পেলেই একটুখানি ঝিমিয়ে নিই। সে ছেড়ে দাও। আর তোমার মতো মহাজনের আবির্ভাব—সেও তো একটা মস্ত কথা। জানোই তো, 'ক্ষণমিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব—।'

সজ্জন চাচ্ছেন? তা হলে কবিরাজ মশাইকে ডেকে দিচ্ছি।

ওরে বাবা! দাদু সভয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন: ডাক্তার কবিরাজ মানেই তো পরলোকের পাসপোর্ট পকেটে করে বয়ে আনে। কবিরাজ মশাইয়ের কথা শুনলেই মনে হবে আমার অপস্মার আসন্ন অথবা জরাতিসারের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বয়েস হয়েছে বলেই সবসময়ে যমরাজকে স্মরণ করতে আমি রাজী নই ভায়া। তার চাইতে তোমাদের মতো টাটকা তরুণদের দেখলে আনন্দ হয়, মনে হয় পৃথিবীটা এখনো মোহমুদ্গর হয়ে যায় নি, পুষ্পবাণ-বিলাসের কাল আজো রয়েছে।

দাদামশাই শেষ কথাটা ঠাট্টা করে বললেন কিনা বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল এর মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন একটুখানি বেদনা রয়েছে। যৌবনের দিক্‌চক্রের দিকে অস্তচারী জরার বিদায়-মলিন দৃষ্টি। খালের ওপারে দত্তবাড়ির সানাইটা তেমনি অপরূপ মধুর হয়ে বেজে চলেছিল।

দাদু মিনিট-খানেক চোখ বুজে গড়গড়ার ধোঁয়া টানলেন। তারপরে এতক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়েই চমকে উঠলেন যেন।

'করেছো কী ভায়া! আরে আরে, এতক্ষণ দেখি নি তো?'

বললাম, 'কী করেছি?'

'ওই গোঁফ? হঠাৎ চৌগোঁপ্পা হওয়ার সাধ গেল যে? যদ্দূর জানি অনেক পুরোনো আবর্জনার সঙ্গে ওটাকেও তো তোমরা বহুকাল আগে নিকেশ করেছো।'

আমি হাসলাম: 'ওটা রাখতে হয়েছে বাধ্যতামূলক ভাবে। কিন্তু রাখলেই বা ক্ষতি কী। গোঁফ-দাড়ি তো পৌরুষের বিধিদত্ত অধিকার। ওটাকে বর্জন করে সব সময়ে মেয়েদের মতো পেলবগণ্ড হয়ে থাকতে হবে তার কী মানে আছে।'

দীনবন্ধু দাদামশাই চোখ দুটো বিস্ফারিত করলেন: 'অ্যাঁ, এ কি কথা শুনিলাম মন্থরার মুখে! কলেজে প্রাচীন-সাহিত্য পড়াতে গিয়ে তুমি কি প্রাচীন-পন্থী হয়ে গেলে নাকি! তা এ সম্বন্ধে আমার দিদিমণি কী বলেন? কোনো একটি কাব্য-মণ্ডিত অবকাশে দুটি পেলব-ওষ্ঠে ওই ঝাঁটা গোঁফের সংঘাত কি রক্তপাত ঘটায় না?'

'সেটা এখনো পরীক্ষা হয় নি। গোঁফ ওঠবার আগেই দিদিমণি বাপের বাড়ি গেছেন।'

'হুঁ!' দাদু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন: 'তাই পরমানন্দে স্বেচ্ছা-ভোজন মানে স্বেচ্ছা-গুম্ফন করে বেড়াচ্ছো। একবার দিদিমণি আসুন, মুখের ওপর বিজয়-গর্বে ওই পৌরুষের ঝাণ্ডা উড়োনো বেরিয়ে যাবে।'

'দাদু, আপনি কাপুরুষের মতো কথা বললেন। জানেন, এ নতুন যুগ? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর যে দাসত্ব আমরা স্বীকার করে এসেছি, এবার তার প্রতিবিধান করব। আমি ঠিক করেছি এবারে আমি গোলগাল একজোড়া গোঁফ তো রাখবই, দরকার হলে কবিগুরুর মতো দাড়িও রাখতে পারি। তিনি তো এদের 'পুরুষজাতের মুখ্য বিজয়কেতু' বলে উদ্দীপনাই জানিয়ে গেছেন।'

'থামো ভায়া থামো। তোমার বক্তৃতা কলেজের বহুশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনেক শক্তির জন্যেই তুলে রেখে দিয়ো। যথাসময়ে দেখা যাবে এই বক্তৃতা কোথায় গিয়ে ঠেকে।'

আমি সহর্ষে বললুম, 'দেখবেন।'

'দেখব আবার কী। ভায়া হে, এই দীনবন্ধু সেনশর্মাই তল পড়ে গেলেন তো শ্রীমান রঞ্জন কোন্ ছার। গল্পের নামে আজকাল দু'চারটে অপাঠ্য প্রলাপ লেখো শুনতে পাই, তাইতেই বুঝি নিজেকে দিগ্‌গজ ঠাউরে বসে আছো? নারীজাতিকে চিনতে তোমার এখনো দেরি আছে। দিদিমণি ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি বলে করে

খাচ্ছো, তোমার দিদিমা হলে 'নাচে ভাল্লু ভাল্' বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত।

'আপনাকে ঘুরিয়েছেন বুঝি ?'

'ঘোরান নি আবার। সেদিন কাঁটালের গল্প তো শুনেছো, আজ গোঁফের গল্প শোনো। শুনলে মন পবিত্র হবে, নিজের ধৃষ্টতার পরিমাণও বুঝতে পারবে। নিতান্ত একজোড়া নিরীহ গোঁফ নিয়ে মেয়েরা যে কী ঘটিয়ে বসতে পারে, সেটা জানলে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তোমার খানিকটা ধারণা এসে যাবে আর গল্পগুলোও ভদ্রলোকের পাতায় পরিবেশনের যোগ্য হবে।'

আমি খুশি হয়ে ঘন হয়ে বসলুম। 'বেশ, গলবস্ত্র হয়ে পবিত্র চিত্তেই শুনছি।'

'নিশ্চয়, গুম্ফবিদ্যা প্রায় ব্রহ্মবিদ্যার কাছাকাছি। ওরে ভৈরব, তামাক দে।'

দীনবন্ধু দাদামশাই শুরু করলেন :

আমাদের ছেলেবেলায় দেশের হাল-চাল আলাদা ছিল ভায়া। তখনকার মানুষগুলো এমন করে ম্যালেরিয়ায় জ্বলে ভদ্রলোক হয়ে যায় নি তো, কাজেই দেওয়ানির চাইতে সে-সময়ে ফৌজদারীর দাপটটাই ছিল বেশি। তা ছাড়া আমাদের এই বরিশাল জেলায় যাদের চরের জমিদারী রাখতে হ'ত, জোর যার মুলুক তার নিয়মটা জানা না থাকলে তিনদিনেই তাকে সব লাটে তুলে দিয়ে সন্নিসি হতে হত, এর অন্যথা ছিল না। আজকের দিনেও এটা যে পুরোপুরি পাল্টে গেছে তা নয়, বরিশালের ছেলে হয়ে এ খবর বোধ করি তুমি জানো।

আমার বাবা রাঘবেন্দ্র সেনশর্মা মারমূর্তি জমিদার ছিলেন। নিজের হাতেই যে লাঠি ধরে কবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছেন তার ঠিক নেই। এমন কি আমার শ্বশুর-মশাই করালীকান্ত গুপ্তচৌধুরীর সঙ্গেও তাঁর একবার ভালো করেই জমে উঠেছিল, বৃক্ষারোহণে সে গল্প তোমায় বলেছি।

সে যুগের আরো দশজন জমিদারের মতো, বাবাও লাঠিয়াল পুষতেন। আর সেই লাঠিয়ালদের মধ্যমণি ছিল সানাউল্লা ওরফে সানু সর্দার। যেমন বুক, তেমনি হাতের গুল, আর তেমনি পায়ের জাং। আড়িয়াল খাঁ'র এপার থেকে তার সাধা গলার হাঁক শুনলে ওপারের মানুষের পিলে চমকে উঠত। পশ্চিমী মুসলমান, বাবা কোথা থেকে তাকে জুটিয়ে এনেছিলেন, তিনিই জানতেন।

বেশিদিনের কথা নয়, মাত্র বছর চল্লিশেক হল। সত্যি, এর মধ্যেই ওসব মানুষ গেল কোথায়! চার-পাঁচশো ডন-বৈঠক দিতে পারত, লাঠি ঘুরিয়ে নাকি বন্দুকের গুলি ফেরাতে পারত, রণপায় চড়ে মাঠ-ঘাট খানা-খন্দলের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে পারত আর এক এক গ্রাসে আধসের করে ছোলার ছাতু গিলতে পারত। আজকাল চারদিকে একপাল ভেড়াই দেখতে পাই, বাঘেরা আর নেই।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, দাদু, ভুল উপমা দিলেন। বাঘেরা নেই তাতে আপত্তি করব না, বাঘ পশু-শক্তির প্রতীক। পশুর কাল এখন শেষ হয়ে গেছে, তাই মানুষ সভ্য হচ্ছে, মার্জিত হচ্ছে। তাদের ভেড়া বলাটা আপনার যুগ-বিদ্বেষ ছাড়া কিছু নয়।

'সভ্য ?' দাদামশাই ভ্রূকুটি করলেন: 'সভ্যতার মানে কী? ডায়বেটিস? ডিসপেপসিয়া ? চাঁদ আর এলোচুল ?'

'উঁহু। এখানেও ভুল। আধুনিক আকাশে যে চাঁদ ওঠে তা হরিণের শিঙের মতো বাঁকা আর নীলবর্ণ, আজকালকার এলোচুলে সমুদ্রপারের পাইন বন থেকে ভিজে ভিজে হলদে সাপের বেগুনে গন্ধ আসে।'

'ভিজে ভিজে হলদে সাপের বেগুনে গন্ধ!' দাদু খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন: 'রক্ষে করো ভাই, তোমাদের কাব্য আর সভ্যতা আমাদের পরম দুর্মেধস্ মগজে সেঁধোবে বলে মনে হয় না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও বোধ হয় এত দুরূহ নয়। অতএব এ তত্ত্ব থাক। আমাদের কালের গল্প বলছিলাম, তাই বলি।

সেই সানু সর্দার। তার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছিলাম, কিন্তু সবটা বলা হয় নি। তার সব চাইতে যে বিশেষত্ব ছিল, সে তার গোঁফজোড়া। গালের পাশ দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে দুদিকের কান পর্যন্ত গিয়ে উঠেছিল। সে গোঁফের মহিমা আমি ভাষায় বলে উঠতে পারব না। সানু দুবেলা তাতে তেল মাখাত, নাকের তলা দিয়ে টেরি কেটে দিত, আর যে যত্নটা করত অনেক বড়লোকের ছেলের বরাতেও তা জোটে না!

ওই গোঁফ দেখে ভয়ঙ্কর লোভ হ'ল আমার। নিজের দিব্যি চাঁছাছোলা পূর্ণিমার চাঁদের মতো মুখে গালে হাত বুলিয়ে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। ওই রকম এক-খানা গোঁফ না থাকলে আবার পুরুষ! সিংহের কেশর আর পুরুষের গোঁফ, এই হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম, এই জাতীয় একটা দার্শনিকতা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

মাথার মধ্যে ঘুরছিল সেটা ভালো কথা, কিন্তু কাজে লাগাতে গিয়েই গোল বাধল। তোমার দিদিমা বজ্রতারা ওরফে তারা বাপেরবাড়ি থেকে ফিরে এল। আমার মুখের ওপর তখন বেশ নধর একজোড়া কালো গোঁফের সূত্রপাত হয়েছে আর আমি দুবেলা সেটাকে টানাটানি করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তোলবার চেষ্টা করছি। এমন সময় সেই পৌরুষ-চর্চায় বিঘ্ন ঘটে গেল।

'দিদিমা ?'

'নিশ্চয়।' দাদামশাই গড়গড়ার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অমন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি আর কার হবে বলো? সাধে কি বুড়ো চাণক্য অমন বিধান দিয়ে গেছেন?

তিনিও নিশ্চয় আমার মতো একজোড়া দশাসই গোঁফ রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে সেটা বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

'নারীজাতির নিন্দে রেখে গল্পটা বলুন দাদু।'

'দাঁড়াও রঞ্জন, দাঁড়াও। প্রেমের গল্প বলছি বুঝতে পারছ না মূর্খ? তোমাদের এ দিনের পর দিন হল কী বলো দেখি? আজকাল কি দুদণ্ড বসে রসালাপও করো না তোমরা? এটুকু ধৈর্য নেই কেন? নাকি দিদিমণিকে কাছে পেলে প্রেমের অন্যান্য ব্যাপারে এত বেশি বিব্রত থাকো যে কথা বলে সময়টা অবান্তর নষ্ট করতে চাও না?'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'দাদু এ প্রসঙ্গ ব্যক্তিগত এবং ইঙ্গিতটা ভালো নয়।'

দাদু হেসে উঠলেন: 'তোমার কোনো কালে কিছু হবে না। কলেজে কাব্য পড়াও কী করে?'

'কাব্য পড়াইনা দাদু, কবিতাকে দর্শন আর ব্যাকরণ বানিয়ে ফেলি।'

'হুঁ—তাই দেখছি। আমাদের সেই দণ্ডধর চূড়ামণি পণ্ডিত মশাইকে মনে পড়ছে। কালিদাস পড়াতে গিয়ে মল্লিনাথের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন, আমরা অন্যমনস্ক হলে সাধুভাষায় অনুপ্রাস জুড়ে গর্জন করতেন: রে ব্যাল্লিক কুষ্মাণ্ড অপোগণ্ড! মৃৎ-ভাণ্ডের মতো তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। তোমাদের মাষ্টারদের জন্যে আমার দুঃখ হয়, ভায়া।'

আমারও হয়। কিন্তু গল্পটা চালিয়ে যান দাদু।

হ্যাঁ, শোনো।

তারা এল। দিন-মানে কিছু ঘটল না, মানে ঘটবার জো ছিল না। সে তো আর তোমাদের কাল নয় ভাই, নববধূর স্বামী-সম্ভাষণ বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের মতোই দুর্গম ব্যাপার ছিল তখন। দিনে দেখা হওয়া তো দূরের কথা, রাত্রেও সেই 'চলু গজ-গামিনী আরতি-বিথার'—তার শয়ন এবং উত্থান কাক-চিলেও জানতে পারবে না। জানলেও 'ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ'—অখ্যাতিতে দেশ ভরে উঠত।

রাত্রে যখন বাড়ি ঘুমিয়েছে, টিপিটিপি পায়ে তারা ঘরে এল। আমি তখন বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি। বহুদিন-বিচ্ছেদের পরে প্রিয়া-সম্মেলন, তুমি নিজেও তো বর্তমানে বিরহে জর্জরিত হয়ে আছো, সে যে কী ব্যাপার সে তো বুঝতেই পারছ।

ঘরে লণ্ঠনের আলো। রাজকন্যার মতো রূপের ঝলক দিয়ে তারা এসে দাঁড়াল। পানের রঙে ঠোঁট রাঙানো, পরনে নীলাম্বরী, একেবারে চমক লাগিয়ে দিলে। দু' হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে যাবো, তারা তিন পা পেছিয়ে গিয়ে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, খোয়াজ, খোয়াজ।

শেয়াল! আমি তো হতবাক। বললুম, কোথায় শেয়াল।

এই ঘরেই। দু'দুটো।

এই ঘরেই দু'দুটো! আবার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দিব্যি দোতলার ঘর, পঙ্খের কাজ করা মেজে, ময়ূরপঙ্খী মেহেগনির খাটের তলাটা ঝকঝকে পরিষ্কার, শেয়াল আসবে কোত্থেকে? আমি লণ্ঠনটা হাতে করে বোকার মতো খুঁজতে লাগলুম। তারা বললে, দেখতে পাচ্ছো না? গর্তে ঢুকেছে, শুধু লেজ দুটো বেরিয়ে আছে। আহা-হা, তবুও দেখতে পেলে না? তোমার নাকের মধ্যেই ঢুকেছে যে। ঠোঁটের দুপাশে একজোড়া লেজ, টের পাচ্ছো না?

অঃ, এতক্ষণে ঠাট্টাটা বুঝতে পারলুম। আক্রমণটা আমার গোঁফজোড়ার ওপরেই। হেসে জবাব দিলুম, ভুল দেখেছো, ওটা শ্যালের লেজ নয়, সিংহের কেশর।

ঠাট্টায় ঠাট্টায় ব্যাপারটা যদি মিটত তা হলে তো কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু অত সুখ ভগবান কি আর কপালে লিখেছেন। দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত বিরহের পরে মিলনের যে ঘনীভূত সান্নিধ্যটা কামনা করছিলুম, একজোড়া গোঁফ তার মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার তুলে দিলে।

তারা বললে, আমি ছিলুম না বলে রাজত্ব পেয়েছিলে, তাই না? কালই গোঁফ কামাতে হবে তোমাকে, নির্ঘাৎ।

আমি বললুম, কেন? গোঁফ তো পুরুষের অলঙ্কার, অহঙ্কারও বটে। আমাদের সান্নু সর্দারকে দেখেছ? কেমন গোঁফ! কেমন জোয়ান!

তারা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, হয়েছে, হয়েছে। কিসে আর কিসে! ওই তো চিংড়ি মাছের মতো চেহারা তার আবার আড়াই হাত গোঁফের শখ!

'দাদামশাই, দিদিমার কথাগুলো ঠিক আর্যনারীর মতো শোনালো না তো?'

'আলবৎ!' দাদামশাই জবাব দিলেন: তোমাদের আজকালকার মেয়েরা আর্যকন্যা-সুলভ সে ভাবামাধুর্যই ভুলে গেছে রঞ্জন। বড়জোর চোখ কপালে তুলে মিহি সুরে গানের মতো করে বলতে পারে: হাউ হরিবল! ইউ ব্রুট! কিন্তু আমাদের গিন্নীদের সেই 'মড়িপোড়া' 'অনামুখো' 'বাড়ুন খেগো' 'হাড় হাবাতে মিন্‌সে' সম্ভাষণের মধ্যে যে প্রাণান্তিক আর্যত্ব তোমরা তার কী বুঝবে ভায়া! বাঙালী মেয়েদের জিভ্ থেকে সেই ঝাল্-ঝাল্ টক্-টক্ রসটি সরিয়ে তোমরা এক-একটা করে চমচম বসিয়ে দিয়েছো। অত মিষ্টি আমাদের ভালো লাগে না ভাই, গা-বমি-বমি করে।

কিন্তু গাল-তত্ত্ব থাক। আসল ব্যাপার যা দাঁড়ালো, তা মর্মান্তিক দাম্পত্য-কলহ। সান্নু সর্দারের মতো গোঁফ রেখে আমি তারই মতো বীররসে সজাগ হয়ে উঠেছিলুম। চটে গিয়ে হিন্দী করে বললুম, কভি নেহি। মরেঙ্গা মরেঙ্গা, তবু জরুর গোঁফ রাখেঙ্গা।

তারা আমার মুখের দিকে মিনিট কয়েক অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, বটে ? আচ্ছা।

ভায়া হে, স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার সে তো জানো। একা দ্রৌপদীর জন্যে দুঃশাসনের রক্তপান হল, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হল, কুরুবংশ একেবারে গোল্লায় গেল। আর আমার গোঁফের বেলায় যে দস্তুরমতো একটা খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হবে তাতে আর সন্দেহ কী।

দু'তিন দিন যায়, তারা আর ওর সম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে না। মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠেছিলুম। বরাবরের আবদেরে মেয়েটিকে এবার একধমকেই ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। গোঁফ রাখবার ফলটা হাতেনাতেই প্রত্যক্ষ পাওয়া গেছে। পরমোৎসাহে আমি দুবেলা গোঁফের পরিচর্যা করে নিজেকে সাহু সর্দারের পর্যায়ে কল্পনা করতে লাগলুম।

কিন্তু স্তব্ধতাই যে ঝড়ের পূর্বাভাস সেটা মনে ছিল না। তা ছাড়া দর্প সম্বন্ধেও শাস্ত্রে একটা প্রবচনের উল্লেখ আছে। হাতে-হাতেই ফললাভ হল।

দুপুরবেলা এক ছিলিম তামাক নিরিবিলিতে সেবা করে চিলেকোঠায় খানিকটা নিশ্চিন্ত নিদ্রাদানের অভ্যাস আমার ছিল। বেশ নিরাপদ জায়গা—বাবার আসবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সেদিনও সেইরকম নির্বিবাদে তামাক টেনে একখানা মাদুরে পড়ে ঘুম দিয়েছিলুম।

* * * *

বেশ চমৎকার একটা দিবাস্বপ্ন আমাকে তখন মশগুল করে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখছিলুম, আমি স্বর্গে চলে গেছি। একেবারে নন্দনকাননে—হরিচন্দনের গন্ধে-ভরা মন্দাকিনী নদীর ধারে।

কোথা থেকে রূপের হিল্লোল ছড়িয়ে উর্বশীর আবির্ভাব। বঙ্কিমের আয়েষার ভাষায় তিনি বললেন, বীরবর, তোমার গোঁফ দেখে মোহিত হয়ে গেছি। আজ থেকে তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। নিগোঁফ দেবতাদের ওপরে আমার অরুচি ধরে গেছে। এসো একটু সুধা খাও।

উর্বশী আমার মুখে সুধাপাত্র ধরলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় সুধা পড়ছে, আমি পরমানন্দে চাটছি। কিন্তু কী যে হয়ে গেল—

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না। হঠাৎ মুখের ওপরে খানিকটা সুড়সুড়ি—তারপরেই জ্বালাময়ী অনুভূতি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। বাঁদিকের গোঁফ কোনো অদৃশ্য হাতের সূতীক্ষ্ণ কাঁচির ঘায়ে নির্মূল, আর ডানদিকের গালে গোঁফে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। কোনো একটা খাদ্যের প্রলোভন তাদের [illegible], কারণ

করে এসেছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকব, তারও জো নেই। লাল পিঁপড়েরা গালে-মুখে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি লাফাতে লাগলুম। তখনো বুঝতে পারছি না পৃথিবীতে এত সুখাদ্য থাকতে আমার গোঁফের ওপরেই পিঁপড়েদের এত লোভ কেন! কাব্যে ইতিহাসে কখনো এমন ঘটনার কথা তো পড়েছি বলে মনে হয় না।

'দিদিমার কাণ্ড নিশ্চয়ই?'

নিশ্চয়। কোনো সন্দেহ আছে সে বিষয়ে? স্বপ্নের মধ্যে আমি যে সুধা-পান করছিলুম সেটা উর্বশীর স্বর্গীয় শ্রীকরে পরিবেশিত নয়। তারা গোঁফে যখন মধু ঢালছিল তখন তারই দু'একটা ফোঁটা ঠোঁট বেয়ে মুখে পড়ছিল আর আমি তারই আনন্দে—

আমি হেসে উঠলুম।

'যাক দাদামশাই, গোঁফ গেল তা হলে।'

'না গিয়ে আর উপায় কী। একদিকের গোঁফ তো আগেই সাফ হয়ে গেছে, ওপাশটাও বাধ্যতামূলক ভাবে নির্মূল করতে হল।'

'অতঃপর শান্তিস্থাপন নিশ্চয়?'

'ক্ষেপেছ নাকি? আমিও দীনবন্ধু সেনশর্মা। ভাঙব তবু মচকাব না, ঠিক করলুম হয় আমি থাকব নইলে গোঁফ থাকবে। মরতে হয় সে ভি আচ্ছা, কিন্তু মরবার আগে এমন একখানা গোঁফ পৃথিবীতে রেখে যাব যা তাজমহলকেও লজ্জায় ম্লান করে দেবে। যুগে যুগে কবিরা তা নিয়ে অমর কাব্য রচনা করতে পারবে।

তিনদিন ধরে তারার সে কি হাসি! সারাক্ষণ সে-হাসি আমার গায়ে বিষের ছুরির মতো বিঁধতে লাগল। মনে হল এমন পরাজয় আমার কখনো হয়নি, সেবার সেই কাঁটালের ব্যাপারেও নয়। কিন্তু আর ি ছোলে চলবে না। গোঁফ রাখেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা।

বাবাকে গিয়ে বললুম—আমি দিনকয়েক রসুলগঞ্জের কাছারীতে গিয়ে থাকতে চাই।

বাবা একজোড়া তীব্র চোখ মেলে আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি যে? আড্ডাবাজী করে বেড়ানোতে অরুচি ধরে গেল?

আমি ভয়ে কাঠ। বাবা বললেন, আচ্ছা যা। কিন্তু বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করিস্‌নি তো হতভাগা? তা হলে কিন্তু জুতিয়ে গাল উড়িয়ে দেব।

আমি বললুম, না—, তারপর কম্পিত পদে প্রস্থান করলুম।

যাওয়ার আয়োজন শুরু হল। এক ফাঁকে ছোট ছোট পায়ে তারা এসে দর্শন

দিলে। বললে, আমার ওপরে রাগ করে যাচ্ছ বুঝি ?

সত্যি কথা সোজা করে বলাই ভালো। আমি চুড়িদার সিল্কের পাঞ্জাবিটা পরতে পরতে জবাব দিলুম, হুঁ।

কবে ফিরবে ?

মানুষের মতো মানুষ হয়ে।

তারা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, যেন হাসির ধমকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভায়া, ভেবে দেখো, কি নিষ্ঠুর নির্মমতা। মনের দুঃখে আমি যখন প্রায় বিবাগী হতে চলেছি, চোখের কোণ অভিমানে ভিজে এসেছে আর আশা করছি তারা এসে বলবে, হৃদয়েশ্বর, এবার দাসীকে মার্জনা করো—এমন সময় এ কি অমানুষিক নৃশংস হাসি!

তারা বললে, মানুষ হয়ে ? না, একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে জাম্বুবান হয়ে ?

রাগে যদি তখন ফেটে চুরমার হয়ে যাওয়া যেত তা হলে আমি তাই করতুম। কিন্তু ফাটতে পারলুম না। গোঁফ নেই বটে, তবু সাহু সর্দারের মতো গর্জন করে বললুম, দেখে নিয়ো। এবার শুধু গোঁফ নয়, দাড়ি নিয়েও ফিরব এবং তোমার হাসি বন্ধ করে ছাড়ব।

তারা বললে, আবার সন্ন্যাসী হয়ে কাঁটাল খেতে যাবে নাকি ?

এরপরে আর কথা বলবার ধৈর্য থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। বাবাকে আর পিসীমাকে প্রণাম করে আমি বাড়ির মাঝি নাজিরকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে চলে এলুম। বাবা বলে দিলেন, দিনরাত বখামি করে বেড়াসনে, বিষয়-সম্পত্তি একটু দেখাশোনা করিস।

নৌকো ছেড়ে দিল। সেন-বাড়ির দোতলাটা যতই চোখের আড়ালে সরে যেতে লাগল, মনটা ততই যেন বিশ্রী হয়ে উঠতে লাগল। এবারে মনে হতে লাগল, একেবারে অতটা না করলেও বোধ হয় চলত। গোঁফ তো আবার উঠত, তারা আর কতবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করে পারত ?

কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি আর ফিরে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া বাবাই বা কী বলবেন! আর বারে বারে তারার কাছে এমন করে বেকুব হওয়ারই বা কী মানে আছে! ও কি সাপের পাঁচখানা পা একসঙ্গেই দেখতে পেয়েছে যে আমাকে স্বামী বলে তো দূরের কথা, মানুষ বলেই গণ্য করে না! চোখের জল মনের উত্তাপে শুকিয়ে যেতে লাগল।

রসুলপুরে পৌঁছোনো গেল। সুন্দর জায়গাতে মস্ত কাছারীবাড়ী। সামনে তাকালেই নদীর স্বচ্ছন্দ বিস্তার চোখে পড়ে। প্রচুর মাছ, প্রচুর দুধ, প্রজাদের

অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, নজরানা, এটা-ওটার ভেট। হঠাৎ যেন অনুভব করা গেল আমিও জমিদারের ছেলে, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারার ভয়ে কেন আমি কেঁচো হয়ে থাকব ?

দিন ভালোই কাটতে লাগল। সঙ্গে বন্দুক ছিল, অবসর সময়ে শিকার করে বেড়াই, কাদাখোঁচা চখাচখী, আর কিছু না পেলে বক। কাগজপত্র বুড়ো নায়েব মশাই-ই দেখাশোনা করেন, ও সম্বন্ধে কোনো দায়িত্বও ছিল না, ভাবনাও ছিল না।

শুধু মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হয়ে যেত। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিছানাটাকে বড় বেশি চওড়া মনে হত—মনে হত বুকের ভেতরে সব যেন কেমন খালি খালি হয়ে গেছে। ভাবনা উড়ে চলে যেত সেখানকার সেই দোতলার ঘরটিতে—যেখানে পঙ্খের কাজ করা মেজে, ময়ূরপঙ্খী খাট আর দুধের মতো বিছানায় নীলাম্বরী পরে একটি সোনার মতো মেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

'দাদামশাই, কাব্য শুরু করলেন যে। আপনার গল্প কতদূর ?'

'হচ্ছে, হচ্ছে ভায়া, দাঁড়াও। একটু কি রসস্থ হতে দেবে না ? প্রেমের গল্প শুনতে হলে কি ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসতে হয় নাকি ?

—'আচ্ছা, বলে যান।'

দাদামশাই আধবোজা চোখ দুটো খুললেন। একবার ভালো করে তাকিয়ে নিলেন আমার মুখের নধর গুম্ফ-শ্রীর ওপরে। তারপরে সুরু করলেন :

হ্যাঁ, আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। সেই দোতলার ঘরে সোনার মতো মেয়েটির কাছে গিয়ে পৌঁছোনো এমন কোনো কঠিন কথা নয়, মাত্র এক জোয়ারের পথ। কিন্তু একজোড়া গোঁফ সব কিছুতেই বাগড়া দিয়ে বসে আছে। গোঁফে মধু মাখিয়ে পিঁপড়ে লেলিয়ে দেওয়ার কাহিনীটা যেই মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পিত্তি পর্যন্ত একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। নাঃ, অপমান আর সহ্য হয় না। আমি দাড়ি রাখব, গোঁফ রাখব, যা খুশি তাই রাখব। যতদিন অনুতাপ করে তারা আমার কাছে ক্ষমা না চায়, ততদিন কিছুতেই তার কাছে ফিরে যাব না।

সুতরাং দাড়ি বাড়তে লাগল—গোঁফ বাড়তে লাগল। যেমন করে উলুবন গজায়, তেমনি নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ ভাবেই গজিয়ে চলল। গোড়ার দিকে একটু একটু কুটকুট করত, তারপরে সব ঠিক হয়ে গেল। সেই রোমরাজিমণ্ডিত মুখশ্রী ক্রমশ এমন খোলতাই হয়ে উঠল যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠতে লাগলাম। মনে হল এখন শুধু নিজেকে পুরুষ-সিংহ বললেই যথেষ্ট নয়, সাক্ষাৎ সিংহ-অবতার বললেই ঠিক হবে।

রসুলপুরে কতদিন কাটিয়েছিলাম ঠিক নেই,—আন্দাজ মাস দুই হবে। একদিন

বিকেলবেলা আয়নার কাছে বসে বেশ দরদ দিয়ে গোঁফ পাকাচ্ছি—হঠাৎ হাউ-মাউ করে কান্না শোনা গেল। বাইরে এসে দেখি আমাদের পুরানো চাকর কৈলাস।

'কী হয়েছে রে কৈলাস, ব্যাপার কী?'

'শিগ্‌গির চলুন দাদাবাবু, সর্বনাশ। কাল রাত্রে বৌদিদি যেন কী দেখে ভয় পেয়েছে, সেই থেকে কেমন করছে। আপনি চলুন।'

'অবস্থা কেমন রে?'—আমার বুকের রক্ত ততক্ষণে বরফ হয়ে গেছে।

'কিছু বোঝা যাচ্ছে না দাদাবাবু, আপনি চলুন এখনি। কী হবে দাদাবাবু? বৌদিদি এমন লক্ষ্মী-পিতিমের মতো মেয়ে—ওহো—হো—হো—'

ডুকরে কাঁদতে পারলে তো আমিও বাঁচতুম ভাই। প্রাণের মধ্যে যে কী হচ্ছিল সে ভাষায় কী করে প্রকাশ করি। বুকের ভেতরটা যেন অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল। ছি ছি, কী করলাম। নিতান্ত একটা জেদের বশে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলাম! তারা যদি না বাঁচে, তারা যদি মারা যায়? ওঃ—তা হলে যে কী হবে সে আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা দুখানা হয়ে ভেঙে যাবে।

তারপরে কী হল ভালো মনে নেই। পাগলের মত চলে এলাম। এসে দেখি বাড়িতে কবিরাজের ভিড় লেগে গিয়েছে। পিসীমা কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, 'শিগ্‌গির যা দীনে, বার বার তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল। দোতলার সেই ঘরে—সেই খাটে শুয়ে আছে তারা। ঘোমটা নেই, মাথার চুল এলোমেলো, কেমন বিহ্বল ভাবে তাকাচ্ছে চারিদিকে। আমি ঘরে ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে বাবা, দাড়ি-গোঁফ—মস্ত ভূত! ওরে বাবা রে'—আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারা আবার মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল: ওরে বাবা ভূত রে—গেলুম—এবার বাবা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘাড় ধরে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিলেন আমায়। বললেন, 'ভাখো হতভাগার কাণ্ড—একমুখ জঙ্গল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ও দেখলেই তো ছেলেপুলে হার্টফেল করে। যা ওগুলো সাফ করে আয়—দেখছিস্ না বৌমা আরো বেশি ভয় পাচ্ছে?'

নিরুত্তরে বাইরে চলে গেলুম। ক্ষুরের তিন টানে মুখ পরিষ্কার করে এলুম তারার সেবা করতে। অনুতাপে আমার তখন অন্তর পুড়ে যাচ্ছে—যথাসর্বস্ব তারার জন্যে সমর্পণ করতে পারি—গোঁফদাড়ি তো সামান্য কথা।

দাদু থামলেন। গড়গড়ায় আর একটা টান দিলেন ধীরেসুস্থে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিদিমণির অসুখ সারল দাদামশাই?'

দাদামশাই হাসলেন: 'অসুখ হয়েছিল নাকি যে সারবে? সব মিথ্যে—আমাকে

বোকা বানাবার ফন্দি।'

'বোকা বানাবার ফন্দি?'—আমিও এবারে বোকা হয়ে গেলাম: 'তার জন্যে এত আয়োজন? অসুখ, ভূতের ভয়?'

নিশ্চয়। এ তো আমার তোমাদের কাল নয় ভাই। যে-যুগে নায়িকার নাম হত বজ্রতারা, সে-সময় দাড়ি-গোঁফ নিয়েও এই রকম নাটক হতে পারত। কিন্তু তারপরে সন্ধি হয়ে গেল—আর কোনোদিন গোঁফ রেখে পৌরুষ-সাধনার চেষ্টা করিনি।'

দাদু চুপ করলেন। দেওয়ালে দিদিমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন। তারপর হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে ভৈরব, কল্‌কেটা বদ্‌লে দে—'

চতুর্থ অধ্যায় : নৈশ পর্ব

দীনবন্ধু দাদামশাই বললেন, পুজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

জবাব দিলাম, দার্জিলিং।

কেমন লাগল?

বিশ্রী।

বিশ্রী কেন? শুনেছি সে এক আশ্চর্য জায়গা। পাহাড়, মেঘ, পাইনের বন, পাগ্‌লা ঝোরা, ম্যাল্ রোড্, জলাপাহাড়, বার্চ হিল, ভিক্টোরিয়া ফলস, লেবং—টাইগারহিলে সূর্য ওঠা—

আমি বললাম, সব বাজে। কন্‌কনে শীত, বিশ্রী বিষ্টি, পাহাড় ভাঙতে দম আটকাবার উপক্রম, আর সব চাইতে বিশ্রী কলকাতার নকল নবাবি, ম্যালের বেঞ্চিতে দল বেঁধে হাঁ করে বসে স্বাস্থ্যলাভের করুণ-চেষ্টা—

দাদামশাই গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, হুঁ, চটেছ বলে বোধ হচ্ছে। কপোত-কপোতীর আনন্দ-ভ্রমণটা তা হলে পুজোয় তেমন জমে ওঠেনি, কী বলো?

মোটেই না!

একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে দাদামশাই বললেন, আরে ভায়া, এ তো জানা কথা। তোমরা কি আর সত্যিকারের পাহাড়ে বেড়াতে জানো! তোমরা যাও প্রকৃতির ওপরে মানুষ কতখানি একহাত নিয়েছে তাই দেখতে। ওতে কি আর রস পাওয়া যায়? হ্যাঁ, হিমালয়ে বেড়িয়েছেন কালিদাস। যেখানে 'মন্দাকিনী নির্ঝরশীকরাণাং

বোঢ়াঃ মুহু কম্পিত দেবদারুঃ—', 'যেখানে বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগা' দেখে অকাল-সন্ধ্যা মনে করে 'বক্ষাঙ্গরোবিভ্রমমণ্ডনানাং', যেখানে দেবধূপ আর মৃগনাভির গন্ধে—

বাধা দিয়ে বললাম, দাদু, এও সত্যি নয়। কালিদাসও পাহাড়ে সত্যিকারের বেড়াননি, যা করেছেন সেটা মানস-ভ্রমণ। মন্দাকিনী শীকর বায়ুতে কম্পিত দেবদারু কোথাও দেখতে পাইনি, আর পাহাড়ী অপ্সরী যাদের দেখলাম, তাদের পূর্ণিমার চাঁদের মতো লেপা-পোছা গোলগাল মুখ, কানে আড়াইসেরী গিলটির গয়না, গলার খাঁজে খাঁজে ময়লা, গায়ে বোঁট্‌কা গন্ধ—

দাদু নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, থামো রঞ্জন, থামো। আচ্ছা ভায়া, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি তো বই-টই লেখো, তোমাদের হালের বইতে গলার খাঁজের ময়লা আর গায়ের বোঁট্‌কা গন্ধ ছাড়া আর কি কিছু তোমরা খুঁজে পাও না? একটা বাঁকা-আধখানা-দৃষ্টি নিয়ে জগৎটাকে দেখতে গিয়ে তোমরা একেবারে সব কিছুই নোংরা করে ফেলেছ!

আমি বললাম, দাদু, আপনি সেকেলে। আপনার মনটা পঞ্চাশ বছর আগে পড়ে আছে। নইলে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম, অনেক ভালো ভালো জিনিস বোঝাতে পারতাম। আধুনিক জীবন, আধুনিক সাহিত্য এবং আধুনিক দৃষ্টি—

পরাস্ত ভঙ্গিতে দাদু হাত তুললেন, বললেন, আর না, রক্ষা করো দাদা। আমরা দণ্ডধর চূড়ামণির দণ্ডাঘাতে জর্জরিত হয়ে কালিদাস পড়েছি, সেকেলে কলেজী মাষ্টারদের কাছে পড়েছি সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তোমাদের সঙ্গে তর্কে আমরা পারব কেন? তোমরা বলবে, আমরা ফুল্‌স প্যারাডাইজে বাস করি। তা আমাদের সেই ভালো—গলার খাঁজের ময়লায় ভরা বুদ্ধিমানের নরকের চাইতে আমাদের বোকার স্বর্গ নেহাৎ মন্দ জিনিস নয়। সুতরাং ওসব থাক। যা বলছিলাম—আনন্দ-ভ্রমণটা তাহলে এবার আর জমল না?

বললাম, নাঃ! শুধু কতগুলো টাকাই জলে গেল।

দাদু বললেন, তা তো যাবেই। ভায়া, তোমাদের একালে সব বদলেছে—তোমাদের একেলে প্রেমের রং একেলে মেয়ের ঠোঁটের বিলিতী রংয়ের মতো—একটা চুমু খেলেই ফিকে মেরে আসে।

আমি আপত্তি করলাম, দাদু, ভালগার হয়ে যাচ্ছেন—

দাদু বললেন, আরে থ্যাৎ। কলমের ডগায় তোমরা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যা খুশি তাই লিখবে, আর আমরা বুড়োরা একটু সোজাসুজি বললেই তা হয়ে গেল ভাল্‌গার! বাইরে ফিন্‌ফিনে ভদ্রতা, আর লেখবার সময় একেবারে আস্তাকুঁড় উজোড় করবে বলে বলে। আমাদের মনে মুখে এক—ওসব জোচ্চুরির কারবার নেই।

এ একেবারে বিশুদ্ধ গালাগালি হচ্ছে দাদু—এটা আন্‌-পার্লামেণ্টারী।

ওঃ বাবা! আচ্ছা, প্রত্যাহার করা গেল। কিন্তু কথাটা বলছিলাম এই, তোমরা আজকাল স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবার জন্যেও ছশো মাইল দূরে দৌড় দাও। মধুচন্দ্র যাপন করতে হয় পুরী চলো, নইলে ওয়ালটেয়ার, নয় সিমলা, নতুবা কাশ্মীর। আরে, প্রেম কি আর স্থানকালের অপেক্ষা রাখে? খাঁটি ভালোবাসা থাকলে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরেও তোমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অভিনব স্বর্গলোক করিবে রচন'। তা তো নয়—যে-রেটে ছুটোছুটি করছ, তাতে মনে হচ্ছে হনিমুন করবার জায়গা পৃথিবীতে তোমাদের আর মিলবে না, একেবারে পরলোকে প্রস্থান করতে হবে।

হুঁ, কথাটা ভাববার মতো।

তার চাইতে আমাদের কালের গল্প শোনো। আর কার গল্প? আমার, আর তোমার দিদিমা বজ্রতারা, মানে তারার। আমাদের এই বাড়ী, সামনের এই খাল, পেছনের এই বাগান—এতটুকু জায়গা বরিশালের এতটুকু ছোট এই গ্রামে প্রেম কেমন ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে, সেটা শুনলে মস্ত একটা শিক্ষালাভ করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে এও বেশ বুঝতে পারবে যে অমন পাগলের মতো প্রেম করার জন্যে হিল্লি-দিল্লি মথুরা ছুটে বেড়াবার কোনো মানে হয় না।

সামনে খালের ঘোলা জলে জোয়ার এসেছে, কচুরিপানাগুলো পাক খাচ্ছে সেখানে। ভিজে বাতাসে বাগানের সুপুরি গাছগুলো দুলছে চামরের মতো। কোথায় একটা দোয়েল শিস্ দিচ্ছে অনবরত। দাদুর পাকা চুলে সোনালি রোদ পড়েছে, গড়গড়ার ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে।

আমি ঘন হয়ে এগিয়ে বসলাম। দাদুর চোখ দুটি তখন স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে।

দাদু শুরু করলেন:

জানোই তো, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সর্দা আইন ছিল না। আট বছরের মেয়ে আর বারো বছরের ছেলে—দাম্পত্যজীবনটা বেশ কিছুদিন রাক্ষস-নীতিতেই চলেছিল। ভেংচি কাটা, চুলোচুলি, আঁচড়, কামড় ইত্যাদির পর্ব শেষ করে যখন যৌবন নিকুঞ্জে পাখী ডাকতে শুরু করলে, ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময়ে।

রসশাস্ত্রে নানারকম নায়িকার উল্লেখ আছে, মুগ্ধা, ধীরা, প্রগল্‌ভা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমার দিদিমাকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যেতে পারত ঠিক জানি না। পাড়াসুদ্ধ লোক আমার উপদ্রবে তটস্থ হয়ে থাকত, আর আমি হেন জানোয়ার সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম তোমার দিদিমার ভয়ে।

নানারকম আজগুবী আর ছুষ্টুমি খেয়ালে তোমার দিদিমার তুলনা ছিল না। ঝকঝকে স্বাস্থ্য ছিল, জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত। এখনকার মেয়েরা জাপানী ঘড়ির মতো; প্রত্যেকদিন তাদের কল-কব্জা বেকল হয়ে আছে। সে-যুগে মেয়েরা বাংলা দেশের উর্বর মাটিতে সতেজ লতার মতো ফুল-পল্লব নিয়ে বেঁচে থাকত, এ যুগের মেয়েরা টবে জীয়ানো বিলিতী মৌসুমী ফুল, ডাক্তারি ওষুধের রস-সিঞ্চনে কোনোমতে আত্মরক্ষা করে আছে—কদিনের জন্যে ফুল ফুটিয়েই একেবারে যবনিকা পতন। বীরাঙ্গনা নেই, বীরপুত্রও জন্মায় না।

আমি আবার প্রতিবাদ করলাম: দাদু, এটা বাজে কথা। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা যেভাবে আজ রাইফেল বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে তাতে—

দাদু বললেন, তা দিচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আরো অনেক বেশি দিতে পারত—আরো অনেক এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে সব আলোচনা থাক—পুরোনো নীতিকথা তোমাদের শুনতে ভালো লাগে না। পুরোনো কালের গল্পই বলি।

সেদিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু মাঝরাত্রে ভারী চমৎকার চাঁদ উঠেছিল। আমাদের বাগানের সুপুরিবনের ফাঁক দিয়ে এলোমেলো জ্যোৎস্না পড়েছিল ঘরে, একরাশ মল্লিকা-ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল বিছানায়। জানলার সামনে তারা দাঁড়িয়েছিল, আর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

তারা হঠাৎ বলে বসল, 'কী সুন্দর চাঁদ! যাবে?'

আমি বললাম, 'কোথায়? চাঁদে? ওখানে যাওয়া যায় না বোধ হয়। অন্তত সশরীরে।'

তারা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, 'ফাজলেমী কোরো না! চাঁদে কে যেতে চাচ্ছে।'

'তবে কোথায়?'

'খালে।'

'কেন? আত্মহত্যা করবে নাকি?'

'না, না। নৌকো করে একটু বেড়াব।'

'সর্বনাশ! এই রাত্রে! পাগল নাকি!'

'তুমি যাবে না?'

আমি বললাম, 'ক্ষেপেছ!'

তারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মনের ভেতরে বেশ করে শানিয়ে নিলে ব্রহ্মাস্ত্রটাকে। তারপর বললে, 'বেশ, কাল আমি বাপের বাড়ি যাবো।'

এর পরে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তবে চলো। কিন্তু এমন রাত্রিটা—খাসা ঘুমোনো যেত।'

তারা বললে, 'তুমি একটা ষাঁড়—খালি ঘুমোতেই ভালোবাসো।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'দাদু, এ কী হল? দিদিমার ভাষাটা তো ঠিক স্বামী-সম্ভাষণের মতো নয়!

দাদু বললেন, 'কেন ভায়া? দিদিমণি ইংরেজী করে তোমাকে স্লথ বললে সেটা বুঝি ভালো শোনাতো? আমার কিন্তু বাংলামতে ষাঁড়টাই পছন্দ হয়—অন্তত ষাঁড়ের ভেতরে পৌরুষের একটা কমপ্লিমেন্ট আছে।'

'কিন্তু ষাঁড় কি ঘুমের জন্যে বিখ্যাত?'

দাদু বললেন, 'আঃ' ভারী বেরসিকের পাল্লায় পড়লাম তো। গল্প শুনতে গিয়ে যদি ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক তোলো তো পারা যায় না। 'অরসজ্ঞ কাক খায় জ্ঞান নিম্ব ফলে'—ওরে মূর্খ, সেটাও বোঝো না?'

বললাম, 'বুঝি। আপনি গল্প চালিয়ে যান দাদু।'

দাদু বলে চললেন, বিয়ের সময় মন্ত্র পড়েছিলাম: তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক হোক। সুতরাং হৃদয়েশ্বরীর হৃদয়ের বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল। চুপি চুপি সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম দুজনে। একবার চোরের মতো দোতলায় বাবার ঘরের দিকে তাকালাম, কিন্তু সেখানকার আলো নিবেছে এবং ব্যাঘ্রপুরুষ রাঘবেন্দ্র সেন-চৌধুরীর বিখ্যাত নাসিকা-গর্জনে সমস্ত সেনবাড়ী মুখরিত হচ্ছে।

বাড়ীর নীচেই বাঁধাঘাটে নাজির একমাল্লাই নৌকোটা রেখে গেছে। তারা খুশি হয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ হয়েছে।'

আমি বললাম, 'বেশ তো হয়েছে। কিন্তু বৈঠা যে নেই। নৌকো বাইব কি করে?'

তারা সাফ জবাব দিলে, 'সে আমি জানি না। তুমি যোগাড় করে আনো।' বলে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলাম, নারীজাতি এইরকমই বটে। তুমি তার জন্যে ডুবজলে নামলেও সে হাঁটুজলে পর্যন্ত নামবে না, দিব্যি প্রজাপতির মতো ফুর ফুর করে পাখা উড়িয়ে চলে যাবে।

বৈঠা আর পাবো কোথায়, খুঁজেপেতে দুখানা চ্যাপ্টা বাঁখারি যোগাড় করে আনা গেল। তারপরেই আর কী? মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে ভাই। কিন্তু ওই পর্যন্তই—'আমি আর বাইতে পারলাম না' বলবার উপায় নেই।

খালের ঘোলা জল দুপাশের নারকেল-সুপারি আর হিজলের ছায়ায় কালো হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে পড়েছে জ্যোৎস্নার ছিটে। ভাঁটা শেষ হয়ে গিয়ে এসেছে প্রথম জোয়ার—জলের কোলে কোলে বেতবনের গায়ে মিষ্টি হাসির মতো শব্দ হচ্ছে। আর

অল্প হাওয়ায় জল মেতে উঠেছে,—দড়ির গোঁজটা তুলে নিতেই নৌকো দুলতে দুলতে এগিয়ে গেল। তারপর বাঁখারির বৈঠায় একটা টান দিতেই নৌকোটা একটা লম্বা বাঁক ঘুরে সেনবাড়ীর সীমা ছাড়িয়ে চলে এল।

আমি বললাম, 'কোথায় যেতে চাও ?'

তারা বললে, 'যেখানে খুশি।'

বললাম, 'একেবারে নিরুদ্দেশ ?'

তারার মুখে একটুকরো জ্যোৎস্না পড়েছিল। আধবোজা চোখে মুখের অপরূপ একটি ভঙ্গি করে বললে, 'ভাবনা কী, তুমি তো সঙ্গে আছ।'

তা বটে। আমার পৌরুষ জেগে গেল। ভায়া হে, নারীর একটি কটাক্ষ পাতে সুন্দ-উপসুন্দ বধ হল, বিশ্বামিত্রের মতো মিলিটারী মহর্ষির পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল, আমি দীনবন্ধু সেনশর্মা তো কোন্ ছার ! যা থাকে কপালে—বাঁখারির বৈঠাতেই হেঁইয়ো বলে টান দিলাম।

নিথর রাত। খালের দুপাড়ে গ্রামে একটি প্রাণীও জেগে নেই কোথাও। জলের রঙ যেন জরিদার নীলাম্বরীর মতো—মাঝে মাঝে কেউ তাতে রূপালি পাড় বসিয়ে দিয়েছে। কোথাও কোথাও ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। নৌকোর শব্দে চঞ্চল হয়ে এখান ওখান থেকে টুপটাপ করে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাং—পাতায় পাতায় ঘুমন্ত পোকারা চমকে উঠে ফর ফর করে নৌকোয় উড়ে এসে পড়ছে। আর বাতাসে ভাসছে জলের গন্ধ, কাদার গন্ধ, পচা কচুরিপানার গন্ধ। নৌকো তর তর করে এগিয়ে চলেছে।

আমার যেন কেমন নেশা ধরেছিল—রাত্রির নেশা। তোমরা দাদা শহরে থাকো, এমন রাত্রি তোমাদের জীবনে কখনো আসে না, এমন নেশার স্বাদ তোমরা কোনোদিন পাওনি। দিদিমণির সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করো পাঞ্জাব মেলে—কলের করুণার ওপরে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে। সেখানে তোমাদের কোনো নিজস্ব জগৎ নেই, সেখানে ভিড়—পৃথিবীশুদ্ধ বাজে মানুষের হট্টগোল। কিন্তু আমরা সত্যিসত্যিই একেবারে দুজনে চলেছি, 'এক তরীতে কেবল তুমি আমি।' যেখানে খুশি আমরা যেতে পারি—যতদূরে খুশি। এই খাল দিয়ে বেয়ে বেয়ে আড়িয়াল খাঁয়, সেখান থেকে আরো এগিয়ে—মিষ্টি জল ছাড়িয়ে নোনতা জলে, তারপরে আরো দূরে—সমুদ্রে। কূল নেই কিনারা নেই—নীলের মাথায় দুলে দুলে একেবারে সৃষ্টির শেষ প্রান্তে। আমি আর তারা—ধারেধারে কেউ নেই, আমরা দুজনে একান্তভাবে নিরুদ্দেশের পথিক।

তারা চুপ করে শুয়ে আছে, আমি নৌকো বাইছি। আমার মনে ঘোর লেগেছে, তারার চোখে ঘুমের আমেজ। স্বপ্নের মতো রাত্রি—ঘুমের মতো রাত্রি। পৃথিবী ঘুমুচ্ছে। দুধারে নারকেল-সুপুরির পাতায় বাতাসের শব্দ, যেন ঘুমের মধ্যে পৃথিবী

কথা কইছে। আশ্চর্য লাগছিল।

কিন্তু হঠাৎ রূঢ় জাগরণ!

খট্-খটাং করে নৌকোটা কিসের গায়ে ধাক্কা খেল, বৈঠার মুখে দড়ির মতো কী জড়িয়ে গেল খানিকটা। চমকে তাকিয়ে দেখি আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে নৌকো সোজা গিয়ে একটা ভেসালের মধ্যে ঢুকে বসেছে।

ভেসালের জাল পাতাই ছিল—বৈঠা জোর করে তুলতে গিয়ে খানিকটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবার খটাখট্ করে সেই বিশ্রী বাঁশের শব্দ।

আর যাবে কোথায়!

পরমুহূর্তেই একটা আকাশফাটানো চীৎকার উঠল পাশের অন্ধকার বাগান থেকে।

'ও কাছেম ভাই—কাছেম ভাই!'

'কী কও, কও কী?'

'কোন্ হালার পো হালায় বুঝি ভেসালের মাছ ব্যাবাক উড়াইয়া নেলে। আউগ্যা দেহি—'

'আইতে আছি ল্যাজা লইয়া—হালাগো এক্কালে ফুড়িয়া ফ্যালামু—'

শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বিশ্বাস নেই—কিছু দেখবার আগেই পাড় থেকে ঝাঁ করে ল্যাজা মেরে দেবে, আর সে মার মানেই মোক্ষম। বিদ্যুৎবেগে আমি নৌকো ঘুরিয়ে ফেললাম, তারপর সোজা উজান বাইতে শুরু করলাম।

কিন্তু খালে তখন ভরা জোয়ার। আমার সাধ্য কি নৌকো নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাই। দশ হাত নৌকো এগিয়ে নিতে গিয়ে আমার হাতের রগগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আর টের পেলাম, পেছনে চীৎকার উঠছে, 'ওই পালায়, হালারা পালায়। আউগ্যা কাছেম আউগ্যা—শোধ দিয়া থো—'

খালের জলে নৌকোর দ্রুত দাঁড়ের শব্দ। ওরা তাড়া করে আসছে।

আমি বললাম, 'তারা, সর্বনাশ! ওরা তো এসে পড়ল।'

তারা উঠে বসেছিল। ভীত কণ্ঠে বললে, 'এখন কী হবে?'

'চলো নৌকো ছেড়ে দিই। সামনেই একটা ছোট খাল আছে, তাই দিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যাব। নৌকো নিয়ে পালানো যাবে না, নির্ঘাৎ ধরা পড়বো।'

ঝুপ্ ঝুপ্। দুজনে জলে পড়লাম, পাশেই একটা ছোট অন্ধকার খাল—তাই দিয়ে তীরবেগে ভাঁটার জল নেমে যাচ্ছে। সবসুদ্ধ হাত চারেক চওড়া খাল, দুদিকে ঘন জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে আমরা সাঁতরে এগিয়ে চললাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিন্তু আপাতত অন্তত ওদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা দরকার।

ভাসতে ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এসে নুয়ে-পড়া একটা মোটা হিজলের ডাল

হাতে ঠেকল। সেইটে আঁকড়ে ধরে জলের ওপরে আমরা দুজনে ভাসতে লাগলাম। পারে ওঠা নিরাপদ নয়—যে জঙ্গল, বিষধর সাপ থাকবার প্রচুর সম্ভাবনা।

তারা ফিস ফিস করে বললে, 'এখন উপায় ?'

আমি বললাম, 'তোমার জন্যেই তো এই বিপত্তি। এখন বোঝো একবার মজাটা। কী সর্বনাশ হল দেখলে তো !'

তারা ফোঁস করে উঠতে গিয়েও চুপ করে গেল। বুদ্ধিমতী মেয়ে, নিজের অন্যায়টা বুঝতে পেরেছে। এর পরে সময় বুঝে প্রতিশোধ নেবে।

বুকের নীচ দিয়ে খরবেগে অন্ধকার জল বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে অচেনা জঙ্গল, কাল মধ্যরাত্রি। আর হিজলের ডাল আশ্রয় করে দুজনে জলের ওপরে ভাসছি—অ্যাড্‌ভেঞ্চারের একেবারে চরম ! এখন শেষ রক্ষা হবে কী করে সেইটেই সমস্যা। নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে বাড়িতে ফিরতে পারলে হয় !

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার আস্তে আস্তে সাঁতরে আমরা বড় খালে ফিরে এলাম। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর কালিয়ে আসছে, হাত পা অসাড় হবার উপক্রম। চাঁদ এখন একেবারে মাথার ওপর—জরিদার নীলাম্বরীর মতো জলটা একেবারে সোনা হয়ে গেছে। কোনোখানে আমাদের নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই, হয় স্রোতের টানে ভেসে গেছে, নইলে ওরা টেনে নিয়ে গেছে সেটাকে। তা সেজন্যে ভাবনা নেই—নাজির নৌকো কাল উদ্ধার করতে পারবে।

শরতের রাত—বেশ একটুখানি শীতের আমেজ লেগেছে। কাঁপতে কাঁপতে আমরা পারে উঠলাম।

তারার এতক্ষণে মুখ খুলল।

'অমন করে নৌকো ছেড়ে পালালে কেন ? আমাদেরই তো প্রজা ওরা'—

'তা বটে। আর কাল যখন বাবার কানে কথাটা তুলে দিত তখন খড়মের ঘায়ে আমার পিঠের চামড়া যে উড়ে যেত সে খেয়াল নেই বুঝি ? তুমি যে নাটের গুরু সে কথা তো আর বলা যেত না, দুর্বুদ্ধির খেসারতটা আমাকেই দিতে হত ভালো করে।'

তারা গুম হয়ে রইল।

অন্ধকার বাগান আর দীঘির ধার দিয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছি এমন সময় আরেক কাণ্ড !

'কেডা, ওহানে কেডা যায় ?'

হেঁড়ে গলার হাঁক উঠল। গ্রামের চৌকিদার বলাই মণ্ডল।

'সেরেছে !'

বলাই ফের হাঁক দিলে, 'কেডা, কথা কও না দেহি ?'

সভয়ে তাকিয়ে দেখি, এক হাতে বল্লম উঁচিয়ে আর এক হাতে লণ্ঠন বাগিয়ে বলাই আমাদের দিকেই নেমে পড়েছে—সদর রাস্তা ছেড়ে আগাচ্ছে বাগানের দিকে !

কেলেঙ্কারির আরেক পর্ব !

আমি বললাম, 'তারা, আর উপায় নেই ! এবার দৌড় দাও—'

ছুট্ ছুট্। বাগান ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম দুজনে।

বলাই চেঁচিয়ে উঠল : 'ধর্ ধর্—চোর পালায়—'

বল্লম বাগিয়ে সে আমাদের তাড়া করল।

আমরা প্রাণপণে ছুটছি—পেছনে পেছনে প্রচণ্ড চীৎকার করে তেড়ে আসছে বলাই। কী গলার জোর ব্যাটার ! হাঁক পাড়তে পাড়তে গলার স্বর-গ্রামটাকে উদারা-মুদারা-তারা পেরিয়ে ফেলেছে, তার হুঙ্কারে দু-মিনিটের মধ্যে গ্রাম জেগে গেল।

চারদিক থেকে সাড়া আসছে : 'কই, কোন্ দিকে চোর ?'

'ওই···ওই পালায়—'

আমাদের অবস্থা বোঝো ভায়া ! একেবারে ঘেরাও হবার উপক্রম। কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়, যেন মন্ত্রবলেই সামনে দেখা গেল সেনবাড়ীর ফটক ! বোঁ করে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম, আঃ, বাঁচা গেল।

কিন্তু দুঃখের তখনও অবশিষ্ট ছিল খানিকটা।

আমরা চমকে থেমে দাঁড়ালাম। বাবা ছুটে আসছেন, হাতে একটা মোটা লাঠি। পেছনে পেছনে বাড়ীতে যে যেখানে ছিল সকলে ! অর্থাৎ এই মুহূর্তেই ধরা পড়তে হবে।

বাবা হাঁক পাড়লেন, 'কোথায় চোর রে বলাই ?'

বলাই পাল্টা হাঁক দিলে, 'আপনার ফটকেই য্যান ঢোকতে ছাখলাম বড় কর্তা—'

'আমার ফটকে ! অ্যাঁ, কস্ কি রে !'

একটা বাতাবীলেবুর গাছের নীচে আমরা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর এক মিনিট—এখনি ধরা পড়তে হবে। আমাদের সর্বাঙ্গ ভিজে, গায়ে মুখে কাদা—কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নেই।

বললাম, 'তারা, এবারে গেলাম !'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারাই সব রক্ষা করলে। বিপদে পড়ে করালীকান্ত চৌধুরীর মেয়ের মাথা সাফ হয়ে গেছে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নামটা কি আর নিরর্থক !

'চোরে মেরেছে'—বলেই তারা বাঘিনীর মতো আমার মুখে নখ বসিয়ে দিলে। গালের একপর্দা ছাল নেমে গেল তার নখের আঁচড়ে। তারপর আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠবার আগেই একটা হ্যাঁচ্কা টানে আমাকে দিয়ে পাশের কাদাজলা পচা

ডোবাটার মধ্যে গিয়ে পড়ল। আমার কানে কানে বললে: 'এইবার তুমিও চোর চোর বলে ডাক ছাড়ো।'

দাদু থামলেন। গড়গড়ার নলটা আবার মুখে বসিয়ে তাকালেন দেওয়ালের গায়ে দিদিমার ছবিটার দিকে। দিদিমার প্রসন্ন-উজ্জ্বল দৃষ্টিটা যেন দাদুকে সেদিনের স্মৃতিটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, দাদু, গল্পের উপসংহার কই ?

দাদু আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

উপসংহারটা যে ভালো করে বলতে পারত, সে বেঁচে নেই দাদু। তাই আমাকেই বলতে হবে। বিশেষ কিছুই না—আমি চোরকে তাড়া করেছিলাম, ঝাপটে ধরেও ছিলাম। তারাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল। চোর আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে একধাক্কায় দুজনকে ডোবায় ফেলে দিয়ে চম্পট দিয়েছে। এদিকে গাল দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছিল—কাজেই প্রমাণটা পাকা হয়ে গেল।

সবাই বিশ্বাস করলে ?

বলাই নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সন্দেহটা প্রকাশ করবার সাহস তার কি হতে পারে ? তা ছাড়া আমরা দুজনে এমন একটা কীর্তি যে করতে পারি এও কি কারো কল্পনাতেও আসা সম্ভব ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গল্পের পরেও আরো একটু গল্প রইল দাদু। গালের আঁচড়টা শেষ পর্যন্ত কী হল ?

সেরে গেল। কিন্তু কী ওষুধে—তা বলব না। যারা আঁচড়াতে জানে, তারা সারাতেও পারে। দিদিমণি যদি কোনদিন তোমার গাল আঁচড়ে দেয় তবে সেদিনই সেই বিশল্যকরণীর সন্ধান পাবে।

পঞ্চম অধ্যায় : অশ্বারোহণ পর্ব

সামনে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে তড়বড় করে একটা ঘোড়া দৌড়ে গেল। বেশ চমৎকার একটি তেজী ঘোড়া, এ অঞ্চলে এ জাতের ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় না। সোয়ারীর চোখে মুখে বেশ একটা তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি, যেন মহারাণা প্রতাপ সিংহ তাঁর চৈতক হাঁকিয়ে চলেছেন। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম।

দীনবন্ধু দাদামশাই অখণ্ড মনোযোগে একখানা বৃহদাকার বৃহদারণ্যক পড়ছিলেন। ঘোড়ার শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। বললেন, কী দেখছিলে রঞ্জন ?

জবাব দিলুম, ওই ঘোড়াটা।

হুঁ, বেশ তেজী ঘোড়া। ওয়েলারের জাত।

কার ঘোড়া দাদামশাই ?

রমেশ সরকারের। কিন্তু ঘোড়া কিনলে কী হবে, চড়তে জানে না। আরে ওর নাম ঘোড়া দাবড়ানো, অশ্বারোহণ নয়।

আপনি অশ্বারোহণ করেছেন কখনো ?

চশমাটা খাপে মুড়তে মুড়তে দাদু বললেন, করিনি ? কী যে বলো ! পৃথিবীতে এমন কী আছে যা এই দীনবন্ধু সেনশর্মা করেনি ? তবে তোমাদের মোটর-ফোটর হাঁকাতে পারি না, ও বিদ্যেটা আয়ত্ত নেই।

কেন দাদু, মোটরই তো ভালো। যন্ত্রযুগের সার্থক দান, যেমন আরাম, তেম্নি গতি —

আরে দূর দূর—দাদু অবজ্ঞায় মুখ কুঞ্চিত করলেন : ওসবের কোনো মানে হয় ? কলের দয়ার ওপর নিজেদের ছেড়ে দেওয়া, একটা কিছু বিগড়ালো তো একেবারে চতুর্ভুজ !

কিন্তু ঘোড়াও তো ক্ষেপতে পারে।

তা পারে। কিন্তু সেই ক্ষ্যাপা ঘোড়াকে বাগাতে পারাই তো সত্যিকারের পৌরুষ। সেইখানেই তো শক্তির পরীক্ষা। আর তা ছাড়া—দাদু থামলেন।

আমি বললুম, থামলেন কেন ? তা ছাড়া আর কী ?

পৃথিবীর যত বাছা বাছা লোক ঘোড়ার পিঠে বসেই বলিষ্ঠভাবে প্রেম করেছে। পৃথ্বিরাজ সংযুক্তা, ব্রাউনিঙের লাস্ট রাইড টুগেদার—হুঁ হুঁ।

আর মোটরেই তো আধুনিক প্রেমের একেবারে পরাকাষ্ঠা। গতির মুখে দুলে উঠবে বুকের রক্ত—

কিসে আর কিসে ! আরে ভায়া, এ যুগের প্রেম আর সোনার পাথর বাটি একই কথা। একালের প্রেম তো স্রেফ ব্যবসা, পকেট প্যাক্‌ড না থাকলেই প্লাক্‌ড। কাঞ্চন-শুল্কাদের নিয়ে কি আর প্রেম হয় ! নারী হচ্ছে বীর্যশুল্কা। স্বয়ংবর সভা থেকে ধাঁ করে তুলে নাও, সাঁ সাঁ করে ছুটিয়ে দাও ঘোড়া—একেবারে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাও ! তা তো নয়, মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করে তোমরা বলো, প্রিয়া, তোমার জন্যে আমার প্রাণ একেবারে সাহারা হয়ে গেল। ট্যাকের ওজন বুঝে প্রিয়া হয় রাজী হয়ে গেলেন, নইলে জবাব দিলেন : আমার বয়েই গেল। তখন তোমরা নাকে কাঁদতে কাঁদতে প্রিয়া আর প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের আটনের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করো, দিব্যি গোলগাল একটা মেলোড্রামা সৃষ্টি হয়। মাঝখান

থেকে বেচারা রাইভ্যালের দিনকয়েক পুলিশের ঝামেলা !

দাদু, আধুনিক কালকে নিন্দে করতে বসলে আপনার রসনা একেবারে ক্ষুরধার হয়ে ওঠে।

চাকর গড়গড়া এনে দিয়েছিল। গোটাকয়েক টান দিয়ে দাদু বললেন, তবু তোমাকে সংশোধন করতে পারলাম কই। ওই সব হায় হায়, হু-হু-করা গল্পই তো এন্তার লিখছ দেখি। তার চাইতে আমাদের কালের শক্তিমান বীর্যবান প্রেমের গল্প শোনো।

অশ্বারোহণে প্রেম ?

আলবাৎ।

কাহিনীর নায়িকা ?

ওরে নির্বোধ, এতদিন আমার গল্প তাহলে শুনলে কী? আমার প্রেমের গল্পে তোমার দিদিমা বজ্রতারা ছাড়া আর কোনো নায়িকা নেই। আমরা সে যুগের পত্নীব্রত লোক—একালের ছোকরাদের মতো চরিত্রহীন নই।

দাদু, ছি ছি !

অ, চরিত্রহীন কথাটা বুঝি পছন্দ হল না? ডন জুয়ান বললে কমপ্লিমেণ্টের মতো শোনাতো, তাই না? কত জোচ্চুরিই শিখেছ তোমরা !

আপনার হল কি দাদামশাই? যত বয়স বাড়ছে, খিস্তিও বাড়ছে সেই পরিমাণে। আপনি ভদ্র সমাজে অচল।

তাতে আপত্তি নেই ভায়া। আমরা সে যুগের রাণীমার্কা টাকা। এযুগে অচল হলেও খাঁটি রূপো, হালের টাকার মতো নিকেলের চাকৃতি নই।

মূল্যবিচার পরে হবে দাদু, এখন গল্পটা চলুক।

আমাদের মূল্য না বুঝলে আমাদের কালের গল্পের মূল্য বুঝবে কী করে? যাক কাহিনীটা এবারে শোনো।

দাদু শুরু করলেন :

আমার শ্বশুরমশাইয়ের নামটা নিশ্চয় ভোলোনি, করালীকান্ত গুপ্তচৌধুরী। বাবার বেয়াই হওয়ার উপযুক্তই বটে। যেমনি গোঁয়ার, তেমনি ডাকসাইটে, তেমনি হুঁদে লোক। রাগ হলে আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, পাত্রাপাত্রও না। শ্বশুরের কন্যাটিকে আমি হৃদয় দান করেছিলুম বটে কিন্তু তাঁর পিতৃদেবকে সসম্মানে এড়িয়ে চলতুম। রূপকথার গল্পে আছে দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার কথা। সম্পর্কে বাধে, নইলে ভদ্রলোককে দৈত্য বলতে আমার আপত্তি ছিল না। একটা আস্ত পাঁঠা তাঁর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ ছিল এবং দু'হাতে দুটো একমণী মুগুর নিয়ে ব্যায়াম করতেন।

চোখ দুটো ছিল জবাফুলের মতো টকটকে লাল। শোনা যায় প্রথম যৌবনে তিনি একবার চণ্ডালের শবের ওপর আসন করে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মড়া তাঁকে পিঠের ওপর থেকে উলটে ফেলে দেয় এবং সাময়িক ভাবে তিনি পাগল হয়ে যান। মাথা ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু চোখ দুটো রইল ওইরকম রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর হয়ে। ওই চোখ দুটোর জন্যেও বোধ করি লোকটিকে অমন বিভীষিকাময় বোধ হতো।

আজকাল কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের বেওয়াজ হয়েছে। রেস খেলাটা নাকি সাহেব-বাবাজীদের ধর্মের অঙ্গ—ঘোড়া দৌড়োনোটা নাকি ওরাই এদেশে আমদানি করেছে। কিন্তু ভুল—একদম ভুল। আমাদের বাংলাদেশে, অন্তত এ বাঙাল দেশে ঘোড়া দৌড়োনোর ব্যাপারটা বহুকালের প্রথা। আজকাল অবিশ্যি এসব ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, লোকের পেটে ভাতই নেই তো ঘোড়া দাবড়াবে কোত্থেকে। এক সময় কিন্তু বেশ জাঁকিয়েই ঘোড়ার দৌড় হত। যে জিতত সে শাল-দোশালা পেত, ইনাম পেত। আমার শ্বশুরের এদিক থেকে খুব ঝোঁক ছিল। কোথায় দিনাজপুরের আলোয়াখোয়ার মেলা, সেখান থেকে গোটাকতক বেশ তেজী টাঙ্গন ঘোড়া তিনি আমদানি করেছিলেন।

সেবার জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ী গেছি। খাওয়া-দাওয়া এবং আদর-আপ্যায়নের ভেতর দিয়ে পরমানন্দে কালাতিপাত করছি, এমন সময় শ্বশুর ডেকে পাঠালেন।

শুনে হৃৎকম্প হল। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বলতে কোনোকালেই আমার বিশেষ কিছু ছিল না। যাবার এবং আসবার সময় টিপ টিপ করে গোটাদুই প্রণাম এবং 'কেমন আছ', 'ভালো আছি'—এইরকম দু'চারটে বাঁধা বুলির বিনিময়। 'হস্তী হস্তসহস্রেণ' —নীতিকথায় আছে, কিন্তু মত্ত হস্তী থেকে 'হস্তলক্ষেণ' এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই আমি করে নিয়েছিলুম। একালে জামাই-শ্বশুরে নাকি 'মাই ডিয়ার' হয়ে গেছে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের কালে ওসব বখামি চলত না।

সুতরাং শ্বশুরের এই আহ্বানে বেশ কম্পিত পদেই গিয়ে দর্শন দিলাম। গিয়ে দেখি একটা ছাই রঙের মস্ত তেজী ঘোড়া। শ্বশুর নিবিষ্ট চিত্তে ঘোড়াটার লেজ, দাঁত এবং পেট টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখছেন।

আমাকে দেখেই জবাফুলের মতো চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন, 'এসো বাবাজী'—স্বরটা স্নেহের, কিন্তু ছেলেপুলের পিলে যকৃৎ আঁতকে ওঠবার মতো।

আমি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

'ঘোড়াটা কেমন ?'

'চমৎকার'।

'আহা-হা, তা বলছি না। ঘোড়াটার পেট ভালো আছে তো?'

শোন একবার প্রশ্নের রকমটা। আমি কি এতকাল ওই ঘোড়াটার মাড়ি টিপে বড়ি খাইয়ে আসছি যে বলতে পারব! আমি কেমন করে জানব যে ওটার উদরাময় হয়েছে কিনা, কিম্বা স্রেফ জোলাপ দিয়ে এখন ওটার চিকিৎসা করতে হবে!

বললুম, 'ওর পেটের অবস্থা আমি কী করে বলব?'

সেইরকম স্নেহগর্ভ করাল স্বরে করালীকান্ত বললেন, 'আঃ, তা নয়, তা নয়। তুমি মোটেই ঘোড়া বোঝ না দেখতে পাচ্ছি। পেট বড় থাকলে ঘোড়া জোয়ান হয়, তেজী হয়। যদ্দুর মনে হচ্ছে এটা ভালোই—কী বলো?'

আমি আর কী বলব। বললাম, 'আমারও তাই মনে হয়।'

'বেশ, বেশ।' করালীকান্ত খুশি হয়ে উঠলেন: 'ঘোড়ায় চড়তে পারো বাবাজী?'

'পারি।'

'চড়ো দেখি এটায়।'

কথায় আছে 'অভাগার ঘোড়া নিয়ে অন্যেতে চড়ে।' এর উল্‌টো কথাও থাকা উচিত ছিল 'অন্যের ঘোড়া নিয়ে অভাগায় চড়ে।' আমারও তাই হল। পাগলের হাতে পড়েছি, চড়তেই হল ঘোড়ায়।

করালীকান্তের মনটা কী কারণে সেদিন একটু বেশি মাত্রায় খুশি ছিল। বোধ হয় কারণবারির মাত্রাটা চড়া ছিল কিছু পরিমাণে। হঠাৎ বলে বসলেন: 'বাঃ বাবাজী, তুমি তো পাকা ঘোড়সওয়ার দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঘোড়াটা তুমি নাও।'

সবিনয়ে বললাম, 'আজ্ঞে?'

করালীকান্ত ভ্রূকুটি করে বললেন, 'এই বয়সেই কানে কম শুনছ নাকি? বললাম, ঘোড়াটা তুমিই নাও। কিন্তু সাবধান বাপু, যত্ন আত্তি কোরো। ঘোড়াকে অনাদর করলে পরজন্মে ঘোড়েল হয়ে জন্মাতে হয়।'

ফলশ্রুতিটা শ্বশুর মশাই কোন্ শাস্ত্রে পেয়েছিলেন জানি না, কিন্তু আর কথা বাড়াবার সাহস ছিল না আমার। নিরুত্তরে ঘোড়ার লাগাম ধরে পা বাড়ালাম।

আর ঘোড়া নিয়েই দেখা দিল—গণ্ডগোল, তোমাদের একালের ভাষায় যাকে বলে 'পরিস্থিতি।' দাদু গড়গড়ায় টান দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আছাড় খেয়ে পা ভাঙলেন বুঝি?

—আরে না, না। ঘোড়ার থেকে সবাইই তো পড়ে—ওতে গল্প নেই। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসেও মানুষ আকাশ থেকে আছড়ে পড়ে—এমন শুনেছ কখনো?

বললাম, না, তা শুনিনি।

তা হলে শোনো:

দুনিয়ায় যা কিছু অঘটন ঘটছে, তার মূলে একটি মাত্র পদার্থ আছে তা হচ্ছে নারী। আর তোমার দিদিমা একেবারে এই নারীকুলের মধ্যমণি—সাক্ষাৎ প্রলয়ঙ্করী। ব্যাপারটা ঘটে গেল তারার জন্যেই।

রাত্রে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তারা বললে, 'আমাকে একটা জিনিষ দেবে?'

'কী জিনিষ?'

'বলো, দেবে?'

'নিশ্চয় দেব। তবে আকাশের চাঁদটা চেয়ো না, ওটা বোধহয় পাড়তে পারব না।'

'না, ঠাট্টা নয়। সত্যি দেবে তো?'

'কাঁটাল খাবে?'

তারা চটে বিদ্যুৎ বেগে পাশ ফিরলো।

অনেক সাধনার পরে রুদ্রাণীকে আবার দক্ষিণমুখিণী করা গেল। তারপর শুনলাম তার প্রার্থনা। আকাশের চাঁদের চাইতে নেহাৎ কম নয়। শুনে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। তারা ঘোড়ায় চড়তে চায়।

আমি বললাম, সর্বনাশ।

দাদু বললেন, কেন, ভয় পাচ্ছ কেন? চাঁদবিবি, দুর্গা বাই ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে পারলেন, আর তোমার দিদিমা বজ্রতারা পারবে না? তোমাদের একালের মেয়েরা বড্ড মেয়েলি হয়ে গেছে ভাই, গড়গড় করে হিষ্ট্রির বড় বড় যুদ্ধ মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু আরসোলা দেখলেই হিষ্টিরিয়া ধরে। কিন্তু আমাদের কালের মেয়েরা রক্ষাচণ্ডী হয়ে ঝাঁটা ধরতে পারত, তেড়ে আসতে পারত আঁশবঁটি নিয়ে, ঘোড়ায় চড়াটা তাদের পক্ষে এমন শক্তটা কী?

—তবে আপনি ভয় পেলেন কেন?

—আরে, লোকে কী বলবে? সমাজ বলে তো একটা জিনিস আছে।

—তা হলে!

—তা হলে আর কী? মেয়েদের আবদার কী বস্তু সে তো জানো। একেবারে এঁটুলির মতো, যার নাম বজ্রকামড়। অতএব—

—অতএব?

—অশ্বারোহণ।

—কেমন করে?

—আরে, সেইটাই তো গল্প। একটু ধৈর্য ধরো। শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্— অশ্বারোহণের জন্যেও একটু আয়োজন করা দরকার তো?

—আচ্ছা বলে যান।

গড়গড়ায় টান দিয়ে চোখ বুজে দাদু আবার স্বরু করলেন :

তার পরের দিন বাড়িতে যাত্রাগানের ব্যাপার ছিল। পালার নাম ছিল বোধ হয় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। অশ্বারোহণের পক্ষে এমন অনুকূল স্বযোগ আর কী হতে পারে ?

প্ল্যানটা নেহাৎ মন্দ হয়নি আমাদের। বাড়ির সবাই যাত্রা শুনতে বসবে, আমাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে না কারো। বাড়ির বাইরে অন্ধকার জায়গাটার নীচে ঘোড়া এনে আমি অপেক্ষা করব আর এক ফাঁকে চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে তারা। তারপর ? তারপর আর কী পিপলাকাঠির মস্ত মাঠের মধ্য দিয়ে একেবারে পৃথ্বীরাজ পর্ব। যাত্রা শেষ হওয়ার অনেক আগেই আমরা ফিরে আসব, কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

—প্ল্যানটা আপনিই করলেন দাদামশাই ?

—পাগল ! এ জিনিষ কি পুরুষের মোটা মগজ থেকে বেরোয় ! এ সব তোমার দিদিমার আইডীয়া। কিন্তু স্ত্রী-বুদ্ধি ! একটা কেলেঙ্কারী যে হবে সেটা আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল।

হলও।

রাত তখন গোটা বারো হবে। চারদিকে মেটে মেটে জ্যোৎস্না। জামগাছটার অন্ধকার ছায়ায় আমি ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরেই যাত্রার আসরে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ শোনা যাচ্ছে :

হায় পার্থ, হায় ধনঞ্জয় !
এই মহাপ্রস্থানের পথে
তোমারেও হারাইনু শেষে !
কী ছার জীবনে মম—কিবা স্বর্গলাভ !
ধর্মরাজ, স্বর্গ নাহি চাই—
ফিরে দাও প্রাণাধিক ফাল্গুনীরে মম—

যুধিষ্ঠিরের করুণ কান্না তখন বীররসাত্মক হয়ে উঠেছে, আসর একেবারে জম্ জমাট। এমন সময় দেখি আসরের দিক থেকে ফিকে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন এগিয়ে আসছে। একটি মেয়ে সন্দেহ নেই, এবং তারা ছাড়া যে আর কেউ হতে পারে না এও নিঃসন্দেহ।

ভাবলুম, তারাকে একটু চমক দেব। যেই জামগাছটার কাছাকাছি এসেছে অমনি আমি ছায়ার তলা থেকে এগিয়ে গেলাম। তারপর মাত্র এক মিনিট থেকে দেড়.

মিনিট। নক্ষত্রবেগে তারাকে পাঁজাকোলা করে ঘোড়ায় তুলে ফেললাম, আর চোখের পলক পড়তে না পড়তে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া।

তারা একটা অব্যক্ত শব্দ করলে, আঁ—আঁ—আঁ—

বললুম, ভয় নেই। এবারে সংযুক্তা হরণ পর্ব।

ঘোড়া ছুটল। সেকি রোমাঞ্চকর উন্মাদ অভিযান! আমার বুকের মধ্যে রক্তও ঘোড়ার শব্দের মতো টগবগ করে ফুটছে। আমার সংযুক্তা একেবারে বুকের ভেতরে এলিয়ে পড়ে আছে, অনুভূতির প্রগাঢ়তায় তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না। আমার খালি ব্রাউনিঙের লাইন মনে পড়ছিল, উই রাইড, উই রাইড—

—বাঃ, চমৎকার নাটক জমিয়েছেন দাদু মশাই।

দাদু বললেন, কিন্তু বিয়োগান্ত।

—কী রকম?

—তুমিই অনুমান করো।

—পারলাম না।

—নাঃ, মিথ্যেই গল্প লিখছ দাদা। কিচ্ছু হবে না তোমার।

—মেনে নিচ্ছি। আপনি বলুন।

—মাঠের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটছে। মরা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা আশ্চর্যভাবে ছায়াময় আর মায়াময় হয়ে গেছে। পশ্চিমে সুপুরিবনের মাথায় চাঁদের ফালিটা সকৌতুকে তাকিয়ে আছে যেন বাসর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে কোন সুরসিকার হাসিমুখ। ঘোড়াটা কী বুঝেছে সেই জানে, সেও ছুটেছে জোর কদমে। মাঠের মিষ্টি হাওয়া ঝলকে ঝলকে চোখেমুখে এসে পড়ছে আমাদের, ঘোড়ার চলার তালে তালে তারার আলগা শরীরটা আমার বুকের ভেতর দুলছে বসন্তের বাতাস লাগা ফুটন্ত গোলাপের মতো।

আমার রক্ত ফুটছে, নেশার ঘোর লেগেছে আমার বিহ্বল চেতনায়। তারপরে যা হল তা মাদক মধুর প্রেমের একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ঘোড়া থামিয়ে তারার মুখখানা দু হাতে ধরে আমার মুখের দিকে তুলে আনতে চাইলাম।

এবং, সেই মুহূর্তেই বজ্রাঘাত!

—বজ্রাঘাত!

—তা ছাড়া আর কী! গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে দাদু বললেন, হাত দিয়ে মুখখানা তুলতে গিয়েই টের পেলাম মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি!

—দাড়ি! দিদিমার মুখে দাড়ি!

—আরে, দিদিমা কোথায়? দ্রৌপদী!

—দ্রৌপদী!

—হ্যাঁ, যাত্রার দলের দ্রৌপদী। বিড়ি টিড়ি একটা টানবার উদ্দেশ্যে এসেছিল এদিকে। তারপর আমার সেই সংযুক্তা হরণের দাপটে বাক্যি হরে গিয়েছিল বেচারার। ওর আর দোষ কী!

আমি হেসে উঠলাম।

—শেষ রক্ষা হল কী করে দাদু?

—সেই অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়েই বাড়ি পালিয়ে এলাম।

—আর দিদিমা? দিদিমা কী বললেন?

—গাছে তুলে দিয়ে যে জাত চিরকাল মই সরিয়ে নেয়, তারা কী বলবে বুঝতে পারছ না? উত্তরটা বরং তুমি আমার দিদিমণিকেই জিজ্ঞেস কোরো, একালের কলেজে পড়া মেয়ে হলেও সেকালের দিদিমার হয়ে সেইই জবাব দিতে পারবে।

নিশি যাপন

—সূচনা—

বিমল দাস : দিল্লীতে বহুকাল সরকারী চাকরি করবার পর এখন অবসর নিয়েছেন। বয়েস ষাট পেরিয়েছে। স্নিগ্ধ-শান্ত চেহারার মানুষ, মাথায় শাদা চুলে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণে আর প্রসন্ন হাসিতে তাঁর চরিত্রকেও চিনতে দেরী হয় না। প্রায় পনেরো বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। অত্যন্ত পত্নীপ্রাণ ছিলেন। এখনো স্ত্রীর কথা উঠলে অন্যমনস্ক হয়ে যান! দর্শনের বই পড়েন, সাহিত্যে অনুরাগ আছে। খুব বেশি কথা বলেন না, কিন্তু অনেকের ভেতরে বসে থাকলেও তাঁর উপস্থিতির একটা উজ্জ্বলতা অনুভব করা যায়।

মেজর নির্মল দাস : বিমলবাবুর বড় ছেলে, মিলিটারীতে ডাক্তার, এখন পুণায় পোস্টেড্। ত্রিশ-বত্রিশ বয়েস। শক্ত শরীর, প্রবল কণ্ঠস্বর, হা হা করে অট্টহাসি হাসেন। হাসির আবেগ প্রবল হয়ে উঠলে চায়ের পেয়ালা আছড়ে ভেঙে ফেলবার অভ্যাস পর্যন্ত আছে। বাপের সঙ্গে রঙে আর মুখের আদলে মিল থাকলেও স্বভাবের অমিলটা সহজেই চোখে পড়ে।

অনীতা দাস : নির্মল দাসের স্ত্রী। বয়েস ছাবিশ-সাতাশ। খুব ফর্সা গোলগাল আদুরে ধরনের চেহারা—আরো বয়েস হলে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবনে তাঁকে সুখী বলে মনে হয়। খুব হৈ-হৈ করতে পারেন—স্বামীর সঙ্গগুণেই সেটা ঘটেছে। আত্মতৃপ্ত, জীবন সম্পর্কে তাঁর বাইরে অন্ততঃ কোনো অভিযোগ নেই।

শ্যামল দাস : বিমলবাবুর ছোট ছেলে—বয়েস অনীতার মতোই। কলকাতার কোনো কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। কবি হিসাবে কিছু প্রতিষ্ঠা আছে। অযত্নে এলোমেলো চুল, চশমার ভেতর দিয়ে উদাস ভাবে তাকায়, স্বভাবে অন্যমনস্ক। তবে সাহিত্যের আলোচনা উঠলে বুদ্ধি আর বাচনের প্রখরতা বোঝা যায়।

ব্রজেন ভৌমিক : টী-প্ল্যাণ্টার। অনেক পয়সার মালিক। পঞ্চাশে পা দিয়েছেন, কিন্তু দেখলে মনে হয় ত্রিশের ঘরে। বৈষয়িক মানুষ। মধ্যে মধ্যে বিমলবাবুর কাছে আসেন, প্রচুর চা আনেন সঙ্গে আর বাগানের কাঁচা এলাচ। কোনো উদ্দেশ্য নেই—দু একদিনের জন্যে এসে গল্প-গুজব করে যান। চায়ের ইন্‌ডাসট্রি ন্যাশানালাইজড্ হলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে, এইটিই তাঁর প্রধান থিয়োরী।

সুনীতা দত্ত : অনীতার বোন। কলকাতায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে সিক্‌স্‌থ ইয়ারের ছাত্রী। দিদির মতো গোলগাল নয়, দীর্ঘদেহিনী, রংও একটু শ্যামল। মঞ্জুভাষিণী এবং মধুহাসিনী। ভালো গান জানে। শ্যামলের সঙ্গে সুনীতার বিয়েটা ঘটানো সম্পর্কে একটি মনোগত বাসনা পোষণ করেন অনীতা—এবং বাড়ীর কারোরই তা

অজানা নেই। শ্যামলের প্রতিক্রিয়া এখনো ভাল করে জানা যায় না, কিন্তু সুনীতার গালে থেকে থেকে যে রং লাগে সেটা কারো চোখ এড়ায় না।

এ ছাড়া দুটি চরিত্র খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা যাবে। একজন কৈলাস, আর একজন রামবাহাদুর।

কাহিনীর পটভূমি, দার্জিলিং জেলার কোনো পাহাড়ী অঞ্চলের একটি নিরালা বাড়ী! আগে নাম ছিল ফরাসী ভাষায় 'Le Nid dela Paix' (অর্থাৎ শান্তিনীড়) —তার তলায় লেখা থাকত ইংরেজ মালিকের আত্মঘোষণা: জে, এল, পার্কিন্‌স্‌। এখন গেটের গায়ে নতুন করে শ্বেত পাথরে লেখা: 'গোধূলি'। যদিও এই নিঃসঙ্গ পাহাড়ী বাড়ীতে কখনো গোধূলির রঙে মেশানো সন্ধ্যা দেখা যায় না—কিন্তু আসলে ওটা বিমলবাবুর বার্ধক্য-দিন এবং শ্রান্ত মনের প্রতীক। বাড়ীর নাম, শ্যামলের মতে, 'উদয়ন' হলেই হয়তো ভালো হত, কারণ উত্তরের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই এই বাড়ীতে সূর্যের প্রথম আলো পড়ে।

একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় বাড়িটি। পার্কিন্‌স্‌ অনেক খরচ করে অনেকটা জায়গা সমতল করে নিয়েছিলেন, গড়েছিলেন ফুলের বাগান, পাইনের সারি আর তিন-চারটি বাঁধানো বেদী। তাঁর একমাত্র সন্তান রবার্ট—পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে মারা যায়, সে ছেলেবেলায় একটি বেদীর গায়ে ছুরি দিয়ে নিজের নাম লিখেছিল। সেটা এখনো শ্যাওলার আড়ালেও পড়া যায়: 'বার্টি'।

যুদ্ধ শেষ হলে, ভারতের স্বাধীনতা এলে পার্কিন্‌স্‌ বাড়ী বিক্রী করে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। বিমল দাস খেয়ালের ঝোঁকে সস্তায় বাড়ীটি কিনে নিয়েছিলেন তখন, বছর কয়েক পরে অবসর নিয়ে এখানে এসেই স্থায়ী হয়েছেন। প্রায় নিঃসঙ্গ দিন কাটে, কারণ পাহাড়ী বস্তিটা বাঁয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে আর একটা পাহাড়ের গায়ে। বাড়ীর দক্ষিণ দিয়ে নদী—প্রায় দুশো ফুট তলা দিয়ে তার সরু রূপালী রেখাটা পাথরে পাথরে ফেনা ছড়িয়ে খরবেগে ছুটে চলেছে—রাত্রে তার গর্জন কোনো অজগরের একটানা গজরানির মতো শোনা যায়, দিনে একটু কান পাতলে কারো নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয়। ওই নদীর ওপর একটি ঝুলন্ত সাঁকো—সেটিই বস্তিতে গেলে বাড়িটির সঙ্গে পৃথিবীর যোগ রাখে। পাহাড়ী পথ দিয়ে জীপ বা ল্যাণ্ড রোভার গাড়ী সাঁকোর ওপর পর্যন্ত আসে, বাকী রাস্তাটুকু পুল পেরিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হয়। পঞ্চাশ যাট ফুট লম্বা এই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপর এসে প্রথম দাঁড়ালে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে মনের ভেতরে, নিচের ফেনিল জল যেখানে রূপালী অজগরের মত ছুটেছে, তার দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ ভাবে—এখান থেকে শরীরটাকে একবার শূন্যের ভেতরে ভাসিয়ে দিলে আত্মহত্যা করা

কত সহজ।

নদীর ওপারে আধ মাইল দূরে একটা মাঝারি ধরনের গঞ্জ, একটি বড়ো চা-বাগান। সেখান থেকে দার্জিলিঙের বাস মেলে। বিমলবাবুর নেপালী দারোয়ান এবং মালী রামবাহাদুর সেখান থেকেই বাজার করে আনে। পাঁচশো ফুট নিচের দূরের বস্তি থেকে আসে তরী-তরকারী, দুধ। মুরগীও পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়ীতে লোকজন না এলে মাছ-মুরগীর দরকার হয় না, কারণ বিমলবাবু নিরামিষ খান।

সব মিলে—নিঃসঙ্গতায় আর সৌন্দর্যে বাড়ীটার আলাদা একটা রূপ আছে। ব্রজেন ভৌমিক দুঃখ করেন, তিনি যদি ঔপন্যাসিক হতেন তা হলে এখানে একটি অমর কীর্তি রচনা করে রেখে যেতেন। শ্যামল কিন্তু এখানে বসে কাব্যচর্চা করে না—প্রায়ই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দোলনা পুলটার ওপর, দূরের নীল পাহাড়ের দিকে চোখ মেলে রাখে। পাহাড়টার নাম 'ফালুট'—হিমালয়ের ভালুকদের আবাস এবং ওখানকার একটি ছোট্ট ডাকবাংলা থেকে নাকি মহান মহিমাময় এভারেস্টকে দেখা যায়। হয়তো সেই এভারেস্টকেই কল্পনায় আনতে চায় সে।

এখন শরৎকাল—পাহাড়ে বসন্তের ছোঁয়া। হাইড্রেনজিয়া-ফরগেট মী নট ফুটেছে গুচ্ছে গুচ্ছে—শানাই ফুলের মালা দুলছে দিকে দিকে। এই পাহাড়েও কোথাও কোথাও দু এক গুচ্ছ কাশফুলের প্রসন্নতাও দেখা যায়, বাংলার সমতলে নদীর বালুচর থেকে ওরা কী করে এখানে উঠে এলো কে জানে! পার্কিন্সের সখ করে পোঁতা দুটো চেরী গাছ আর কয়েকটি লেডীজ লেস্ এখন ফুলে ফুলে 'গোধূলি'র বাগানটিকে একেবারে আলো করে দিয়েছে। সোনালি আলোয় সবুজ ডানা মেলে উড়ছে হরিয়াল, বুনো গাছের ডালে মস্ত বড় ঠোঁট নিয়ে ধনেশ পাখী ধ্যানস্থ। বাতাসে হাজার হাজার সাতরঙা কাগজের কুচির মতো প্রজাপতির উল্লাস। চারদিকের ছোটো বড়ো পাহাড়ে—বিশেষ করে ফালুটের কোলে ছোটো ছোটো ঘুমন্ত মেঘ—যেন এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে কয়েকটি ঘর-পালানো ছোট্ট ছেলে এখানে এসে বনের বুকে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া—শরতের নরম রোদের সঙ্গে মিশে সে হাওয়া একটা অপরূপ আমেজ আনে শরীরে। রাত্রে যখন বাতাস দামাল হয়—অনেক দূরের তুষার চূড়োগুলো থেকে সে বরফের কণা লুট করে আনে, তখন 'গোধূলি'র বন্ধ কাচের শার্শীতে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যায় আর পাগলের মতো পাইনের মাথাগুলোতে ঝাঁকানি দিতে থাকে।

আপাতত 'গোধূলি' আর নিঃসঙ্গ-নির্জনতায় ডুবে নেই। মেজর নির্মল দাস এক মাসের ছুটিতে সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছে এখানে, সঙ্গে বন্দুক—সুযোগ পেলে হরিয়াল কিংবা ঘুঘু শিকার করবে। কিছু নিচে নেমে গেলে বনমুরগী পাওয়ার

সম্ভাবনাও আছে। অনীতা বন্দুক আনে নি—এনেছে সুনীতাকে এবং তারও উদ্দেশ্য এক রকমের শিকার। শ্যামল ছুটিতে প্রত্যেকবারই বাবার কাছে আসে, এবারেও এসেছে। এর মধ্যে একটা ল্যাণ্ড্ রোভার নিয়ে হৈ হৈ করে ব্রজেন ভৌমিক এসে গেছেন, জানিয়েছেন: 'রাতদিন চায়ের ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ডিভিডেণ্ডের হিসেব, মীটিং—এ-সবে প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি করছে, বিমলবাবুর কাছে এসে ক'টা দিন সদালাপ করে হাঁপ ছাড়ব।'

এই পর্যন্ত গোড়ার কথা।

বাড়ীর বাগানে পাথরের বেদীতে বেদীতে সবাই ভাগ হয়ে বসেছেন—বিকেলের আলোতে ঝলমল করছে চারদিক, চেরীফুলের পাপড়ি উড়ছে—প্রজাপতিরা মিলেছে তার সঙ্গে। ফরগেট মী নটের গুচ্ছে লোভে লোভে ঘুরছে কয়েকটি পাহাড়ী মৌমাছি। চাকর কৈলাস এসে প্রত্যেকটি বেদীতে চা দিয়ে গেল।

এইবারে কাহিনীকে অনুসরণ করা যেতে পারে।

॥ ১ ॥

তিনটি বেদী একটু ব্যবধান রেখে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো। একটি দক্ষিণমুখো, একটি পূবদক্ষিণ, আর একটিকে প্রায় সম্পূর্ণ পূবমুখী বলতে পারা যায়। দক্ষিণের বেদীতে বিমল এবং ব্রজেন। পূব দক্ষিণে মেজর আর সুনীতা। পূবের বেদীতে শ্যামল আর অনীতা। তিনটি বেদীর মাঝখানেই ফুলের ঝোপ আছে বলে সবকটিই একটুখানি আড়াল দেওয়া—আলাদাভাবে কেবল মাথাগুলিকে দেখা যায়।

ব্রজেন ভৌমিক সম্প্রতি আধ্যাত্মিক চিন্তায় কিছুটা মনোনিবেশ করেছেন। অনেক টাকা আর বয়েস হলে যা হয়। সেই সম্পর্কেই তিনি কিছু আলোক-লাভ করতে চাইছিলেন বিমলবাবুর কাছে।

—আচ্ছা, 'গুরুগীতা' পড়েছেন আপনি?

বিমলবাবু হাসলেন: না।

—দীক্ষা নিয়েছেন তো?

—সময় পেলুম কোথায়?—সেই হাসিটিকে মুখের ওপর টেনে রেখেই বিমলবাবু বললেন: সারাটা জীবন তো অ্যাকাউণ্টসের যোগ-বিয়োগ গুণভাগের মধ্যেই কাটল। ভাববার কি আর সময় পেয়েছি।

কিন্তু ব্রজেনবাবু হাল ছাড়লেন না।

—আপনাদের কুলগুরু ছিলেন তো?

—তা ছিলেন।—বিমলবাবু চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে লাগলেন: ছেলেবেলায় দেশের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন যেতেন দেখেছি। তারপরে আর খবর জানি না। শুনেছি তাঁর ছেলে বিলেতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ট্যাক্সিডার্মিতে ডক্টরেট নিয়ে কলকাতার আশেপাশে কোথায় ট্যানারী খুলেছে।

ব্রজেন ভৌমিক আকাশ থেকে পড়লেন।

—বলেন কি! বামুনের ছেলে হয়ে শেষে ট্যানারী!

—সেই রকমই শুনেছিলুম।

—তায় গুরুবংশ!

—শুধু গুরুবংশ নয়—বিমলবাবু চশমাটা পরে নিলেন: শুনেছি ওঁদের পূর্বপুরুষ সিদ্ধ ছিলেন—মানভূম আর ওড়িষ্যার অনেক রাজদরবারে তাঁর ডাক পড়ত।

এবার খাবি খেলেন ব্রজেন ভৌমিক:—ছি—ছি—এমন বংশের ছেলে হয়ে শেষে—! তা ট্যানারী যখন, তখন গোরুর চামড়াও তো বিস্তর—

বিমলবাবু বললেন, তা তো বটেই। আর সেইটেই তো আসল।

—তা বটে!—ব্যবসায়ী ব্রজেনবাবুর এবারে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স মনে পড়ে গেল। ভারতবর্ষের মতো এমন গো-মড়ক পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই, আর কোনো দেশ থেকেই এত গোরুর চামড়া রপ্তানি হয় না।

—কী কাণ্ড বলুন তো!—ব্রজেনবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন, তাঁর নিজের বাগান থেকে আনা সবচেয়ে দামী একনম্বর অরেঞ্জ পিকো পর্যন্ত বিস্বাদ মনে হল তাঁর।

—আজকাল তো এই চলেছে। দিনকাল বদলে গেছে একেবারে।—বিমলবাবু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

—সেটা মানি—ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লেন ব্রজেনবাবু: সবই এখন অন্য রকম। দুঃখের কথা বলব কি মশাই, পূজো-পার্বণে এখন পুরুত জোটানো পর্যন্ত শক্ত হয়! সিমলায় আমার ছোট শালার বিয়ের সময় সন্ধ্যেবেলা বাঙালী পুরুত এল স্যুট-টাই-হ্যাট্ পরে—স্কুটার থেকে নেমে। ঢুকেই বললে, পাঁচটা পর্যন্ত আফিস করে আসছি—কী খাবার-দাবার আছে আনুন আগে। বিয়ের কথা পরে হবে। আরো অ্যাড্ভাইজ দিয়ে বললেন, রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিলেই পারেন—কোনো ঝামেলা থাকে না। এতটা তো মশাই সহ্য করা যায় না। শাস্ত্রে বলেছে: 'গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ'—

এই উঁচুদরের আলোচনায় ছেদ পড়ল মেজরের হাসির শব্দে। জ্বালিকার সঙ্গে রসিকতা করতে করতে অট্টহাসিতে একেবারে বিদীর্ণ হয়ে পড়লেন তিনি।

ঝাড়গ্রাম রাজার জঙ্গলে বাঘ-শিকারের গল্প বলছিলেন নির্মল। কেমন করে প্রকাণ্ড

ম্যান-ইটারটা এক লাফে তাঁর মাচান প্রায় ধরে ফেলেছিল আর তিনি কিভাবে প্রায় তার কপালে নল ঠেকিয়ে এক গুলিতে তাকে শেষ করে দিয়েছিলেন, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে সুনীতা বলে ফেলল : আমাকে একবার বাঘ-শিকার দেখাতে নিয়ে যাবেন ?

তারপরেই নির্মলের এই অট্টহাসি। সুনীতার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, অপমানও বোধ করল একটু।

—কেন, ভয় পাব ?

—তা পাবে। তুমি অবলা বলেই নয়, অনেক বড়ো বড়ো মহারথীও মাচানে বসে বাঘের ডাক শুনে জ্ঞান হারিয়েছে আর হাতের রাইফেল খসে পড়েছে মাটিতে। তাদের চাইতে তুমি খারাপ করবে না হয়তো।

কিন্তু এটা স্তব নয়, ব্যাজস্তুতি। সুনীতার মুখের লাল রংটা আরো একটু ঘন হল।

—বাঙালীর মেয়ে রাইফেল ছুঁড়ে সারা দেশজোড়া নাম করেছে—তা জানেন ?

—জানি। কিন্তু টার্গেট প্র্যাক্‌টিস আর বাঘমারা এক জিনিস নয়।

—গায়ের জোরে বলছেন। একবার সুযোগ দিয়ে দেখলে বুঝবেন।

—দরকার কি সুযোগের !—নির্মল সামনে থেকে একগুচ্ছ ফরগেট মী নট্ ছিঁড়ে নিলেন : তোমরা যা করছ, বাঘের সাধ্য কি তা পারে। তোমাদের চোখের একটি অগ্নিবাণে কত বাঘমারা বীরপুরুষ—

—থামুন-থামুন।—সুনীতা বাধা দিয়ে বললে, যত প্রাগৈতিহাসিক রসিকতা।

নির্মল বললেন, সেজন্যে আমার দোষ নেই—কারণ ব্যাপারটাও সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ঘটে আসছে কিনা ! যাই হোক, খুব চটেছ বলে মনে হচ্ছে। আপাতত এই ফুলগুলো নিয়ে খুশি হও এবং নিজগুণে ক্ষমা করতে চেষ্টা করো।

—আপনার ফুলে আমার দরকার নেই।

—বুঝেছি।—নির্মল হাসলেন : ফুল দেবার জন্যে অন্য কেউ আসরে এসে গেছে, এখন আমার ফুল ভালো লাগবে না। তবু একেবারে উপেক্ষা কোরো না—এই ফুলটার নামটা মনে রেখে এক-আধটু স্মরণ অন্তত কোরো। তাতে তোমার ক্ষতি নেই, কিন্তু এই অভাগার ব্যথিত হৃদয়ে একটু প্রলেপ পড়বে।

সুনীতা ফুলটা নিল, কিন্তু আর বসল না।

—যান, ভারী ইয়ার্কি করছেন আজকে।

উঠে বেরিয়ে গেল সুনীতা। লন পার হল, চেরী গাছের তলা দিয়ে হাইড্রেনজিয়ার ঝোপ ছাড়িয়ে মিলিয়ে গেল সামনের দিকে। মেজর নির্মল কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ চোখ মেলে

চেয়ে দেখলেন তাকে। বেশ মেয়েটি—হতভাগা শ্যামল ওকে বিয়ে করলে সুখীই হবে। কিন্তু আধুনিক কবিদের মন-মেজাজ তাদের কবিতার মতোই দুর্বোধ্য। শ্যামলের কবিতা একসঙ্গে দু লাইন বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—ভাইটিকেও তিনি এখনো চিনতে পারেন না।

তিন নম্বর বেদীতে সেই রহস্যটাই বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন অনীতা।

—সন্ন্যাসী হতে চাও নাকি ঠাকুরপো?

—সন্ন্যাসের লক্ষণটা কী দেখলে? মুরগী ধ্বংসের ব্যাপারে কোনো অরুচি কি চোখে পড়েছে তোমার?

অনীতা বললেন, মুরগী খাওয়ার সঙ্গে সন্ন্যাসের সম্পর্ক কী? বরং যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের সর্বভূতে সমদৃষ্টি থাকা দরকার। তাঁরা অত বাছবিচার করেন না।

শ্যামল মাথা নাড়ল: ঠিক। কিন্তু বৌদি, এই উইটি জবাবটা তোমার ওরিজিন্যাল নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ আগেই একটি ছড়ায় লিখে গেছেন:

"গব্বু রাজার পাতে ছাগলের কোরমাতে
যবে দেখা গেল তেলাপোকাটা,
রাজা গেল মহা চটে, চিৎকার করে ওঠে:
খানসামা কোথাকার বোকাটা!
মন্ত্রী জুড়িয়া পাণি কহে, সবই এক প্রাণী—
রাজার ঘুচিয়া গেল ধোঁকাটা,
জীবের শিবের প্রেমে—"

অনীতা হেসে বললেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারবার জো নেই, উনি সকলের ভালো কথাগুলো আগেই লুট করে নিয়েছেন। কিন্তু কবিতা শুনিয়ে আসল কথাটা চাপা দিতে পারবে না। মতলব কি তোমার?

—খারাপ কিছু নেই। কলেজের প্রিটেস্টের কতগুলো খাতা আছে সঙ্গে, কয়েকটি অবোধ-বালিকাকে পাশ করাতে চেষ্টা করব। তারা 'আই ইজ গোয়িং' লিখে থাকে—'আই ইজ থটিং' পর্যন্ত না নামলেই তরিয়ে দেব। এই মহৎ কাজটাকে যদি কু-মতলব ঠাউরে থাকো—

—দায় পড়েছে আমার!—অনীতা ভ্রূকুটি করলেন: আমি তো আর তোমার কলেজের প্রিন্সিপাল নই! চালাকি কোরো না ঠাকুরপো, সত্যি কথা বলো।

—আর কী সত্যি কথা বলব? আমি এখনো মোহ-মুদ্গর পড়তে আরম্ভ করিনি, শেষ রাতে ধ্যানে বসার কোনো ব্যাকুলতা আমায় পেয়ে বসেনি। অদূর ভবিষ্যতে বুদ্ধ-চৈতন্যের মতো গৃহ-ত্যাগ করব, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এমন কি

খ্রীষ্টের মতো ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ারও কোনো আকুলতা টের পাচ্ছি না। অতএব—

অনীতা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ—জ্বালালে। সত্যি বলো, কবে বিয়ে করবে?

—সময় হলে।—অনীতার বিরক্তিতে শ্যামল আরো উৎসাহ বোধ করল: 'যেদিন ফুটবে কমল।'

—সে দিনটি কবে?

—'যে শুভখনে মম আসিবে প্রিয়তম।' সরি, প্রিয়তমা। তবে শুভখনটির খবর এখনো জানি না।

অনীতা এবার চটে উঠলেন: আমি জানি।

—ইম্‌পসিবল। তুমি দৈবজ্ঞ নও।

—আচ্ছা দৈবজ্ঞ কিনা সেটা পরে দেখা যাবে। এখন বলো, বিয়ে করতে রাজী?

—ছ'মাস সময় দাও, প্রস্তাবটা গভীরভাবে অনুধাবন করব।

—ছ'মাস নয়।—অনীতা শক্ত হয়ে বললেন, এই পূজোর পরেই। অঘ্রাণে।

—কেন পান্থ এ চঞ্চলতা? আচ্ছা বৌদি—দাদার মাথাটি তো মুড়িয়েছ—বেলও পড়ছে তার ওপর। আমি সুস্থ শরীরে স্বাধীনভাবে দুটো দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাও তোমার সইছে না? ঘটকালি বন্ধ করে বরং একবার রান্নাঘরে ঘুরে এসো—কী একটা ভালো খাবার তৈরী করবে—কথা দিয়েছিলে।

অনীতা কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে রইলেন শ্যামলের দিকে। কপালে মেঘ ঘনিয়ে এল একটুখানি।

—আচ্ছা ঠাকুরপো!

—বলো, শুনছি।

—একটা সত্যি সত্যি জবাব দেবে?

শরতের বিকেলে, লাল রোদে রাঙানো আকাশে এক জোড়া হরিয়াল উড়ছিল। সেইদিকে চোখ রেখে শ্যামল বললে,' মিথ্যা কথা বলার অভ্যেস নেই আমার।

—তা হলে বলো, কলকাতার কোনো মেয়ের—

—প্রেমে পড়েছি—এই বলতে চাও তো?—শ্যামল হেসে উঠল: না, সে রকম কোনো মানসীকে আপাতত দূর দিগন্তেও দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চিন্ত থাকো।

—থাকতে পারছি কই। শোনো, আর ফাজলামো করে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এবার তোমার বিয়ে আমরা দেবই!

—আঃ—বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে! বিয়ের মানে কী—জানো? **"I will turn from a man with future to a man with past."**

বিদুষী অনীতা বললেন, জানি, বার্ণার্ড শ-র ও নাটকটা আমি পড়েছি। কিন্তু

বুক ফুলিয়ে কথাটা যে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তার ?

—লাইফ ফোর্স বলছ ?—শ্যামল বললে, কিন্তু সেটা এখনো আমার ঘাড়ে ভর করে নি। কিন্তু বৌদি—আর নয়। বিয়ের আলোচনা কালও চলতে পারবে, আপাতত আমি পালাচ্ছি। একটা সিগারেটও খাওয়া দরকার।

শ্যামল হেসে উঠে গেল। অনীতা ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলেন আসল কথাটাই জানা হল না শ্যামলের কাছ থেকে। সুনীতাকে কী চোখ দিয়ে দেখছে ? কী ভাবে তার সম্পর্কে ?

মেজর নিজের জায়গা ছেড়ে স্ত্রীর কাছে উঠে এলেন। অনীতার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল ? এনি লাক ?

—এখনো বুঝতে পারছি না।

—হবে—হবে। শনৈঃ পন্থা।

অনীতা বললেন, এদের হালচাল এই ক'বছরেই কেমন বদলে গেছে, কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় না।

মেজর বললেন, হুঁ—আমাদের কাল থেকে এরা অনেক এগিয়ে এসেছে। ও টাইম—ও ম্যানার্স ! কিন্তু তোমায় কিছু ভাবতে হবে না অনীতা। সুনুর মতো এমন মেয়েকে ভালো লাগবে না—আমার কবি ভাইটিকে এতখানি বেরসিক বলে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। যতই আধুনিক কবিতা লিখুক, থেকে থেকেই পুরোনো রবীন্দ্রনাথ আওড়ায়—দেখতে পাও না ?

ওদিক থেকে ব্রজেন ভৌমিকের গলা ভেসে এল। ধর্মের আলোচনায় ক্রমশ উৎসাহিত হয়ে উঠছেন তিনি।

—আচ্ছা, শাস্ত্রে তো বলে সদ্‌গুরু শিষ্যের সব পাপ গ্রহণ করেন ?

বিমলবাবু কী বললেন, শোনা গেল না।

ব্রজেনবাবু বলে চললেন, আসল কথা হল বিশ্বাস থাকা চাই। আমার গুরুদেব বলেন, সংশয়ের জন্যেই আমাদের কোনো গতি হয় না। যদি মনের সব সন্দেহকে—

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মেজর হাসলেন।

—টাকা যতই বাড়ে, মানুষ ততই ধার্মিক হতে থাকে।

—তা বটে। কিন্তু উপদ্রবটা বাবার ওপরে কেন ?

—ওঁর জন্যে ভেবো না—মেজর হাসিমুখে বললেন, ওসব ওঁকে স্পর্শও করবে না। হিমালয়ের পাহাড়ে বাস করতে করতে বাবা হিমালয়ের মতোই সহিষ্ণু হয়ে গেছেন।

অনীতা বললেন, চুলোয় যাক—ওই বোধ হয় রায়বাহাদুর বাজার নিয়ে এল। আমি একবার রান্নাঘরটা দেখে আসি।

মেজর বললেন, অল রাইট। চলো—আমি তোমাকে সাহায্য করব।

বাড়ির কম্পাউণ্ড পেরিয়ে শ্যামল দোল্না পুলটার দিকে এগিয়ে চলল। বৌদি কী বলতে চায় সেটা সে জানে। সুনীতাকে তার ভালো লাগে, এই মেয়েটিকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার কল্পনাতে মনের ভেতরটা যে একেবারে গুন গুন করে ওঠে না, তা-ও নয়। তবু শ্যামল এখনো তৈরী হতে পারে নি। সুনীতাকে তার জানা হয় নি—তার দিদির দিক থেকে উৎসাহটা যত চড়া পর্দাতেই উঠুক, তার মনের চেহারাটা এখনো দুটো শান্ত চোখের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে। সুনীতা সেই ধরনের মেয়ে—যারা একটু একটু করে পাপড়ি মেলে দেয়—একেবারে সবখানি ফুটে ওঠে না।

তা ছাড়া নিজেকেও এখনো বুঝতে পারেনি সে। ভালো লাগা আর ভালোবাসা এক নয়। আধুনিক কবি শ্যামল দাস ভালোবাসার ইমোশনকে বিশ্বাস করে না—সে জানে ওটা কাঁচা রঙ, রুচি আর চিন্তায় মিল না থাকলে, পরস্পরকে অনেকখানি পর্যন্ত সহ্য না করতে পারলে একালে বিয়ে ব্যাপারটাই অর্থহীন। তখন একসঙ্গে বাস করেও দুটো সমান্তরাল সরল রেখা পাশাপাশি চলতে থাকে—সেটা একদিকে প্রহসন, আর এক দিকে ট্র্যাজিডী।

সেই রুচি আর চিন্তার মিলটা বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

শ্যামলের পা থামল। দোল্না পুলের ওপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতা।

দূরের কালো পাহাড়ের ওপর এখন বেলাশেষের রং। ছোট ছোট মেঘের টুকরোগুলোতে রক্তের ছোপ পড়েছে। নিচের নদীটা কখনো পাহাড়ের ছায়ায় ধূসর—কোথাও সোনালী আলোয় রাঙানো—নানা রঙের সাপের মতো মনে হচ্ছে তাকে। বাতাসে সুনীতার চুল উড়ছে, তার হলদে রঙের শাড়িটি সোনালী রোদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

সুনীতা এখনো তাকে দেখতে পায় নি। নিজের ভেতরে তলিয়ে আছে এক ভাবে। কী ভাবছে? রবীন্দ্রনাথের গান মনে এল : 'আন্‌মনা—আন্‌মনা, তোমার দ্বারে আমার বাণীর'—

কিন্তু লগ্নটা যেন কখন এসেছিল? 'নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে।' চারদিকে এখন সেই ম্লান আলোর মায়া ছড়িয়েছে; এখন নিশীথ রাত্রের শালবনের ঝিঁঝির মতো একটানা সুরে মনের কথা গুঞ্জন করা চলে। শ্যামল হাসল। এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কিছু মতভেদ আছে। শালের বনে ঝিঁঝির ডাক নিশ্চয়ই শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ—কবির সম্মানে তারা হয়তো কিছুটা নরম গলাতেই গান গেয়ে

থাকবে। কিন্তু এক বন-বাংলোয় গতবছর কোনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শ্যামলের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। শালবনের ভেতর ঝিঁঝির ডাক যে কী অসহ্য তীব্র হয়ে ওঠে, সেই করাত-চেরার মতো একটানা কুশ্রী আওয়াজ শুনতে শুনতে কানে যে তালা ধরে যায় এবং চোখের ঘুম যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় ভাগ্যবান রবীন্দ্রনাথ তা টেরও পান নি। মহাকবিরা অন্যরকম সৌভাগ্য নিয়ে আসেন, সাধারণ মানুষের তা জোটে না।

মাথার উপর দিয়ে সাদা-কালো একঝাঁক পাখি কলধ্বনি তুলে উড়ে গেল, মনে হলো সোয়ালো। আর সুনীতা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। দেখা হয়ে গেল শ্যামলের সঙ্গে। সুনীতা চোখ নামিয়ে ফেলল, মুখের রং নিবিড় হল একটুখানি, হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচলটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিলে গায়ে।

এর পরে আর ফিরে যাওয়া চলে না। শ্যামল সুনীতার কাছে এগিয়ে এল।

—একটা গরম চাদর আনেন নি? ঠাণ্ডা লাগবে।

সুনীতা নরম গলায় বললে, আমার শীত করছে না।

—কিন্তু এই বিকেলের হাওয়াটা বিশ্বাসঘাতক।

—কিছু হবে না আমার।

শ্যামল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুনীতার পাশে। মাথার ওপর দিয়ে আবার সেই সোয়ালোদের ঝাঁকটা চঞ্চল হয়ে উড়ে গেল—নিচে থেকে নদীর গর্জন আসতে লাগল একটানা।

একটু পরে সুনীতাই প্রথম কথা বললে।

—বেশ এই জায়গাটা—না?

—অদ্ভুত সুন্দর।

—বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছি, এইটেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বিলিতী ছবিতে যে সব ল্যাণ্ডস্কেপ দেখতে পাই—অবিকল তার সঙ্গে মিলে যায়। হঠাৎ মনে হয় যেন সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে চলে গেছি কোথাও—কিংবা দাঁড়িয়ে আছি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ানের ওপর।

শ্যামল একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা আলতোভাবে ছেড়ে দিলে নদীর দিকে। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কাঠিটা পড়তে লাগল, শেষে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের ছায়ায়। জলে পড়ল কিনা এত ওপর থেকে সেটা দেখবার উপায় ছিল না।

সুনীতা বললে, আচ্ছা, এখান থেকে কেউ যদি নিচে লাফিয়ে পড়ে?

শ্যামল বললে, প্যারাশুট নিয়ে লাফালে কী হবে জানি না। নইলে বুঝতেই পারছেন।

—জাপানের সুইসাইড্ রক কি এই রকম ?

—জানি না—শ্যামলের অস্বস্তি বোধ হল। এই দোল্না পুল আর নিচের ওই গর্জিত নদীটার একটা অদ্ভুত মোহ আছে, একথা তারও মনে জেগেছে বার বার। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ধীরে ধীরে কেমন একটা নেশা যেন ঘনিয়ে আসতে থাকে, অকারণেই আত্মহত্যার কথা মনে হয়।

সুনীতা নিজেই বলে চলল, আমার মনে হয়, জাপানের সেই পাহাড়টা এই রকম সুন্দর। তাই সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে মানুষের এত ভালো লাগে—হয়তো ভাবে একটা বিশ্রী জীবন থেকে বেরিয়ে সুন্দরের ভেতর হারিয়ে যেতে পারবে সে।

রোম্যান্টিক—শ্যামলের মনে হল। সেই সঙ্গে আরো মনে হল, হিমালয়ের চূড়োয় অভিযান করতে গিয়ে যে সব অভিযাত্রীর পা পিছলে মৃত্যু ঘটে, তাদের সবগুলোই হয়তো অপঘাত নয়। হয়তো ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দেয় কেউ কেউ—হয়তো ভয়ঙ্কর সুন্দরের আকর্ষণটাকে কিছুতে রোধ করতে পারে না—কে জানে!

সুনীতা আবার জিজ্ঞাসা করল: অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, আপনি এসেছেন কখনো এখানে ?

—না।

—আমার একদিন আসতে ইচ্ছে করে।

—ভালো লাগবে না। ভয় করবে।

—কেন ?

—প্রকৃতির এই নিয়ম। থেকে থেকে সে রূপ বদলায়। এই মুহূর্তে যাকে সুন্দরী দেখছেন পরক্ষণেই সে রাক্ষসী হয়ে ওঠে।

সুনীতা বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে রইল। শ্যামল বলে চলল: আমরা বাঙাল, জানেন তো ? পদ্মার ধারেই আমাদের গ্রাম ছিল, বাবা ছুটি পেলেই একবার করে দেশের বাড়িতে চলে আসতেন। খুব ছেলেবেলার কথা। দিল্লীতে জন্মেছি, সেখানেই বসবাস—নদী বলতে গেলে দেখিই নি। গ্রামে এসে পদ্মাকে দেখে যেন পাগল হয়ে গেলাম। আর পরের দিনই গ্রামের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে একটা ডিঙিতে উঠে পড়লাম। পদ্মার মাঝখানে চর—তরমুজ ফলেছে, তারই কয়েকটা সংগ্রহ করে আনা উদ্দেশ্য।

সুনীতা হাসল: চুরি ?

—ছেলেবেলার ওই অপরাধটুকুকে যদি চুরি বলেন, তবে তাই। তরমুজ নিয়ে তো নৌকোয় ওঠা গেল নির্বিঘ্নেই। কিন্তু খানিকদূর এগিয়ে আসতেই পদ্মায় হাওয়া উঠল। ঝড় নয়, মেঘ নয়, শুধুই হাওয়া। দেখতে দেখতে নদীর চেহারাটাই গেল

বদলে, ডিঙি পাগলের মতো দুলতে লাগল, থেকে থেকে ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল নৌকোতে। সঙ্গের ছেলেরা বললে, ডুবুক না নৌকো—সাঁতরে পেরিয়ে যাব এটুকু। এটুকু মানে প্রায় মাইলখানেক! আমার অবস্থা ভাবুন—হাত পা ছুঁড়তে পর্যন্ত জানি না—জলে পড়লে ইটের টুকরোর মতো ডুবে যাব। একটা করে ঢেউ আসছে, ভয়ে চোখ বুজছি আর ভাবছি—এইবার গেলাম! সে যে কি নিদারুণ অভিজ্ঞতা সে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।

—নৌকো ডুবল?

—ডুবলে কি আজ আমাকে এখানে দেখতে পেতেন?—শ্যামল সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে হু হু হাওয়ায়: পদ্মার কয়েকটা ধমক খেয়েই আমরা ডাঙায় ফিরে এলাম। নদী যেন আমাদের জানিয়ে দিলে পরের তরমুজে লোভ করাটা ভালো কাজ নয়। কিন্তু সেই থেকেই আমার মোহ কেটে গেছে। পদ্মার ওপর জ্যোৎস্না দেখেছি, আশ্চর্য সূর্যোদয় দেখেছি কতদিন ভোরবেলায়—কিন্তু ওকে আর বিশ্বাস করি নি। করা যায় না।

সুনীতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পাহাড়ের ওপারে মেঘের মাথায় সূর্য ডুবেছে, কয়েক টুকরো মেঘে তখনো তার শেষ আভা। এদিকে ছায়া ঘন হয়ে এসেছে—দূরের পাহাড়ী বস্তিটা কালো হয়ে গেছে এর মধ্যেই। জোনাকি ফোটাবার মতো করে এক-আধটা আলোও জ্বলে উঠল এদিকে ওদিকে। দোল্‌না পুলটার ওপরেও তরল রাত নামছে, নিচে নদীর রুপালি জলটার রং আবছা হয়ে আসছে।

সুনীতা বললে, নদীর চাইতে পাহাড় ভালো। বিশ্বাসঘাতক নয়।

—কে বলতে পারে?—শ্যামলের গলা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল: জানেন আমাদের এই বাড়ীতে এক-একদিন রাত্রে যখন আমার ঘুম ভেঙে যায়, কাচের জানালা থেকে পর্দা সরিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে তাকাই, তখন সব কিছু যেন অদ্ভুত রকমের সিনিস্টার বলে মনে হয় আমার। শার্সির গায়ে একটা ভাঙা চাঁদ যেন রক্তমাখা মুখের মতো লেপটে থাকে, অন্ধকার ঘুমন্ত পাহাড়গুলোকে মিশরের পিরামিডের মতো মনে হয়—হাওয়ার শব্দ বাজে, পাইন গাছগুলো মড় মড় করে—ঠিক বোধ হতে থাকে বাইরে যেন কতগুলো অশরীরী আততায়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ভাবি এর চাইতে কলকাতা ভালো—যেখানে অনেক মানুষ পরস্পরের আশ্রয়ের মতো চারদিকে ভিড় করে আছে।

শ্যামলের কথার ভেতর এমন কিছু একটা ছিল যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল সুনীতার। সেই সময় কোথায় কর্কশ স্বরে একটা পাখি ডাকল। কেউ যেন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল, এমনি খানিকটা তীক্ষ্ণ শব্দ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

নিদারুণভাবে চমকে উঠল স্নুনীতা।

—আমার শীত করছে।

শ্যামল থমকে গেল।

—ঠিক কথা। আমারই খেয়াল ছিল না। যদি কিছু মনে না করেন, আমার এই চাদরটা—

—তার দরকার নেই, চলুন ফেরা যাক।

স্নুনীতা চলল আগে আগে। পুল পেরুতেই দেখা গেল, 'গোধূলি'র ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল স্নুনীতার। ওখানে উত্তাপ, ওখানে আশ্রয়। কী যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল শ্যামল।

জোর করে স্নুনীতা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর শ্যামল পুলের শেষপ্রান্তে এসেও থমকে দাঁড়ালো আব একবার। দূরের ফালুটে পাহাড়ের মাথায় একটা আলোর ক্ষীণমত বিন্দু দেখা যায়, ওটাই কি ওখানকার ডাকবাংলো? কিন্তু ডাক-বাংলোর চাইতেও বেশি করে মনে হল, ফালুট পাহাড়ের ঘন বনের ভেতরে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে ভালুকেরা, শ্যাওলায় পিছল পাথরে পাথরে তাদের নখের আওয়াজ উঠেছে, অন্ধকারে দপ-দপ করে জ্বলছে জোড়ায় জোড়ায় হিংস্র চোখ। গাছের ডালে ডালে ঘুমের আর ভয়ের ঘোরে চোখ বুজেছে বানরেরা, তাদেরই একটা ছানাকে গ্রাস করবার আনন্দে চোরের মতো গাছ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠে আসছে একটা প্রকাণ্ড ময়াল!

হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ী বনে, বড়ো বড়ো গাছের জটিল সাম্রাজ্যে, খাড়া ঝাঁপিয়ে-পড়া ঝর্ণার আশপাশের ঝোপে-ঝাড়ে এখন এক আদিম আত্মার জাগরণ। আর সেই ঘুমভাঙা আদিমতা, কুটিল ক্ষুধা আর জিঘাংসা নিয়ে তার কোলে কোলে অনধিকারীর মতো ছোট ছোট জনপদগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে—যেন স্নুযোগ পেলেই সেগুলোর ওপর এসে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

স্নুনীতা নয়, তাদের বাড়ীর বাগানের চেরী ফুল আর ফরগেট্ মী নটের গুচ্ছ নয়—রাশি রাশি প্রজাপতি নয়। রাত্রির হিমালয় তার আলোর মুখোশটা খুলে ফেলেছে এখন। এই বিরাট বিভীষিকার কাছে পদ্মা কতটুকু। কতখানি তার শক্তি।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শ্যামল ফিরে চলল বাড়ীর দিকে। আজ রাত্রে একটা কবিতা লেখা যায়? না, যায় না। কবিতার জায়গা কলকাতা। যেখানে অনেক মানুষ, অনেক কোলাহল, অনেক আলো।

আর আজকের ভয়টা যেখানে স্মৃতি হয়ে যায়—সেখানে—সেই কলকাতায় ফিরেই হিমালয়কে নিয়ে কবিতা লেখা চলে। হিমালয়ের কালো ডানার নীচে বসে কবিতা লিখতে তার সাহসে কুলোয় না।

॥ ২ ॥

একতলার লাউঞ্জে একটা মস্ত ডেক চেয়ারে পা পর্যন্ত শাল জড়িয়ে শুয়েছিলেন বিমলবাবু। সামনের গোল টেবিলের ওপর শেড দেওয়া বড়ো আলো জলছে একটা, সেই আলোটার পাশে কনুই রেখে, একটা চেয়ারে পিঠ খাড়া করে বসে ব্রজেনবাবু তখনো বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

—যাই বলুন, সাহেবেরা চলে যাওয়ার পর চায়ের ইণ্ডাষ্ট্রিটাই যেন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। দেশ থেকে ওরা টাকা লুটে নিত বটে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে নয়। ভেবে দেখুন, যেখানে খাড়া পাহাড় বেয়ে গিরগিটি পর্যন্ত উঠতে পারে না, সেখানে গিয়ে ওরা বাগান করেছে। যেখানে বাঘ-ভালুকের রাজত্ব ছিল, সেখানে গিয়ে গ্রাম-গঞ্জ গড়ে দিয়েছে। ওরা না থাকলে—

সুনীতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ব্রজেনবাবু থেমে গেলেন আর প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন বিমলবাবু।

—বেড়িয়ে ফিরলে মা? কতদূর গিয়েছিলে?

সুনীতা বললে, বেশিদূর নয়, পুলের উপরে দাঁড়িয়েছিলুম।

—একটা গরম কিছু নিয়ে যাওনি যে? ঠাণ্ডা লাগেনি তো?

—না, তার আগেই চলে এসেছি।

ব্রজেনবাবুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—আচ্ছা মা, তুমি তো ইকনমিক্স নিয়ে এম-এ পড়ছ, তাই না?

সুনীতা মাথা নাড়ল।

—ইণ্ডিয়ান টী-ইনডাষ্ট্রি সম্বন্ধে পড়তে হয় তো? মানে তার প্রস্‌পেক্ট—তার ইণ্টার-ন্যাশনাল মার্কেট—

সুনীতা অল্প একটু হাসল: ওগুলো কমার্সেই পড়ানো হয়। আমাদের—মানে—

ব্রজেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, দিস ইজ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন। ইকনমিক্সের ছাত্রী, অথচ ভারতবর্ষের এত বড়ো একটা শিল্প সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পর্যন্ত নেই।

সুনীতার মুখ লাল হল। বিমলবাবু রক্ষা করলেন তাকে।

—যাও মা, ভেতরে যাও। বৌমা বোধ হয় খুঁজছেন তোমাকে।

সুনীতা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। কাচ ঢাকা লম্বা বারান্দার কার্পেটের ওপর মেজর তন্ময় হয়ে বন্দুক পরিষ্কার করছেন। সুনীতাকে দেখে

আড়চোখে তাকালেন একবার।

—এই যে শ্রীমতী!

একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়ল সুনীতা।

—হঠাৎ বন্দুক সাফ করার ঘটা যে? বাঘ মারতে যাবেন?

—দেবী, এটা ডাক'গান। আরো নিরীহ শিকারের জন্যে।

—হাঁস কোথায় পাবেন এখানে?

—বন-মুরগী মিলবে। কাল ব্রজেনকাকার জীপটা নিয়ে সকালে একটু বেরুব ভাবছি।

—সে জীপ তো দেড় মাইল দূরের বাজারে।

—পুলের ওপারে এসে যাবে কাল। রামবাহাদুর খবর দিয়ে এসেছে।

—কখন বেরুবেন?

—চা পান শেষ করেই। অর্থাৎ সাড়ে ছ'টায়।

—আমাকে নেবেন সঙ্গে?

—সুন্দরী, জীবহিংসায় তোমার এত অনুরাগ কেন? এ সব হত্যাকাণ্ড কি তোমার ভালো লাগবে? তোমরা শিল্পী—তোমাদের জগৎ আলাদা—নির্মল হাসলেন: নদীর ধারে চখাচখীর মেলা দেখলে তোমাদের গলায় গান গুনগুন করে আর আমাদের রসনা ওঠে রসিয়ে। এ তোমার সইবে না। আমার ছোটো ভাইটিকেই ছাখো একবার। এমন কবিতা লিখবে যে পড়ে মনে হবে—ভাষা, ভাব, অর্থ—সব কিছুকে নিপাত করবার জন্যে ছুরি শানিয়ে বসেছে। শিকারের কথা শুনলেই বলবে, পিওর অ্যানিম্যাল্ ইনস্‌টিংকৃট—জান্তব ব্যাপার!

—আমি তা মানি। শিকারের গল্প আমি পড়তে পারি না। ভারী স্যাডিস্টিক মনে হয়।

—হুঁ!—নির্মল নলটাকে দূরবীনের মতো করে তুলে ধরে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভেতরে অপরিচ্ছন্নতার একটি কণাও লেগে আছে কিনা। বললেন, জানি—দুজনে তোমরা এখন ক্রমাগত একমত হতে থাকবে। তাই যদি, তবে সঙ্গে যেতে চাইছ কেন?

সুনীতা হাসল: স্যাবোটাজ করবার জন্যে।

নির্মল ভুরু কোঁচকালেন: তার মানে?

—মানে, আপনি যখন শিকারের জন্যে বন্দুক তাক্ করবেন, তখন আমি চেঁচিয়ে পাখি উড়িয়ে দেব।

—বটে! ফিফ্‌থ কলাম!—বন্দুকটাকে জুড়তে জুড়তে নির্মল বললেন, বাঘ-

শিকারেও কি সেই জন্যই যেতে চাইছিলে? মানে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দেবে? কিন্তু বাঘ যে সেটাকে ফলারের নিমন্ত্রণ বলে ভাবতে পারে, সে কথাটাও ভুলে যেয়ো না।

—কাকে ফলার করবে?

—তোমাকেই। অবশ্য তার আগে যদি দুচোখের বজ্রবাণ ছাড়তে পারো—

কথাটা শেষ হল না, সিঁড়িতে দুমদাম করে পায়ের আওয়াজ উঠল।

নির্মল বললেন, শুনছ? তোমার দিদি আসছেন। যে-রকম মেদবৃদ্ধি হয়েছে, তাতে পদভারে পুরোনো সিঁড়িটা টিঁকলে হয়। একেই বোধ হয় বলে, গজেন্দ্রগামিনী?

—কী যে অসভ্য আপনি!

অনীতা এসে হাজির হলেন।

—মাংস চাপিয়ে দিলুম, নতুন পাঞ্জাবী প্রিপারেশন একটা। পুণার সেই বিগ্রেডিয়ারের বৌ এত ভালো রান্না করে যে কী বলব!—নিজের উচ্ছ্বাসে অনীতা বলে চললেন, আজ প্রথম হাতে-কলমে তৈরী করছি, যদি উৎরোয়—

—তা হলে একটা গয়না কিংবা সার্টিফিকেট চাই—এই তো?—মেজর কথার মাঝখানে বাধা দিলেন: শেষেরটাই চেয়ো তা হলে। গয়না অতি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু দামটা একটু বেশি। কিন্তু সার্টিফিকেটটা লেস কস্টলি, অথচ ফ্রেম করে সারা জীবনের মতো বাঁধিয়ে রাখা যায়।

—কী যে বকতে পারো?—অনীতা ধমক দিলেন: বাজে কথা বলবার জন্য যেন মুখ চুলবুল করছে। তোমার গয়না চাই না, সার্টিফিকেটেও আমার দরকার নেই। এই স্বনী, ঠাকুরপো কই রে?

স্বনীতা চোখ নামালো: আমি জানি না।

নির্মল বন্দুকটাকে কেসে পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করলেন: জানো না মানে?—চোখে কৌতুক চমকে উঠল: ইহা কি সত্য যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই তোমরা দুজনে অত্যন্ত কাছাকাছি দোল্‌না পুলটার ওপরে দাঁড়িয়েছিলে?

—যা-তা বলবেন না।

—অয়ি কুপিতা, এটা পরের মুখে সংগৃহীত সংবাদ নয়। দোতলার এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের এই দোল্‌না-ব্রীজটা পরিষ্কার দেখা যায় এ তথ্যটি বোধ হয় তোমার অবিদিত।

—স্পাইয়িং করছিলেন?

—করা দরকার। আমার ঘরেই সিঁধ পড়ছে, নজর রাখব না?

অনীতা বললেন, হয়েছে। তোমাকে আর রসিকতা করতে হবে না। আয় স্বনী:

আমার ঘরে, তোর সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

নির্মল জিজ্ঞেস করলেন, এখানে সেটা হতে পারে না ?

—না।

—ফর লেডাজ অন্‌লি ?

—ফর লেডীজ অন্‌লি।

অনীতা সুনীতাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে এলেন। একটা সোফায় টেনে বসালেন নিজের পাশে।

—কী বললে ঠাকুরপো ?

অনীতার কথার ভঙ্গিতে সুনীতা হেসে ফেলল।

—পাহাড় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

—তারপর ?

—তারপর বললেন, যা বাইরে থেকে সুন্দর, তার ভেতরে কত নিষ্ঠুর হিংসা লুকিয়ে থাকে। নিজের ছেলেবেলার কথাও বলছিলেন। কী করে একবার নৌকো নিয়ে পদ্মায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, শেষে পদ্মায় এমন তুফান উঠল যে ডোবে আর কি। অনেক কষ্টে—

অনীতার আর সহ্য হল না। একটা কিল দুম করে বসিয়ে দিলেন সুনীতার পিঠে।

—মারছিস কেন ?

—তিনজনে মিলে আমাকে বাঁদর নাচাচ্ছ, তাই না ?

—খামোকা তুই নাচতে আরম্ভ করলে কে কী করতে পারে দিদি ?

অনীতা এবার সুনীতার বিনুনী আক্রমণ করলেন।

—উহু-হু, মরে গেলুম যে !

—মেরেই ফেলব। চালাকি নয়, ঠাকুরপো কী বললে তাই বল্।

—যা বললেন সে তো বলেইছি। যদি বিস্তৃতভাবে শুনতে চাস···

অনীতা হতাশ হয়ে বললেন : তোকে দিয়ে কিছু হবে না। যা করবার আমিই করব।

—বাঁচালি !

জানলা দিয়ে একটা বিদ্যুতের চমক ঘরে এল—কানে এল মেঘের ডাক। খানিকটা হাওয়ার খ্যাপাটে উচ্ছ্বাস এসে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারকে মুখর করে তুলল।

—বাপরে, কী ঠাণ্ডা হাওয়া—সুনীতা শিউরে উঠল।

অনীতা উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিলেন। কাচের জানালার ওপর মুক্তোর

ঝানার মতো কয়েকটা বৃষ্টির কণা এসে পড়ল।

—বৃষ্টি এল দেখছি!

স্থনীতা বললে, লাভ্‌লি! এখন রাত ভরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি চলতে থাকুক—বাইরের পাইন গাছগুলো পাগলামো করুক, ঝর্ণারা খুশি হোক—পাহাড়ী নদীটা ফেনায় ফেনায় পাগল হয়ে ছুটে চলুক। এই সময় বাইরে গিয়ে ভিজতে পারলে দারুণ ভালো লাগত দিদি।

—হুঁ, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়াও হতে পারত সঙ্গে সঙ্গেই।

স্থনীতা সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। ঘরের একপাশে একটা বিরাট অর্গ্যান—মিসেস্ পার্‌কিন্‌সের সম্পত্তি। যাওয়ার সময় সবসুদ্ধই বিক্রী করে গিয়েছিলেন পারকিন্‌স, ওটা পড়েই থাকে। অনীতা এলে কখনো কখনো বাজান। শ্যামল মধ্যে মধ্যে নিজের খেয়াল-খুশিতে এলোমেলোভাবে যা খুশি বাজায়। অনীতাকে বলে, এ স্থরটা হল বীঠোভেন—কীর্তন-গজল-হাওয়াইয়ান মিউজিক আর ভাটিয়ালীর কম্বিনেশন—এসব তুমি বুঝবে না বৌদি!

স্থনীতা সোজা গিয়ে অর্গ্যানে বসে পড়ল। নিপুণ হাতে একবার স্থরটাকে একটুখানি সাজিয়ে নিলে, একটুখানি গুন্ গুন্ করল, তারপর শুরু করল: 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা—'

—ইস—একটুর জন্যে ভিজে যাইনি—ঘরে ঢুকল শ্যামল। আর ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনীতা খুশি হয়ে ডাকলেন: এসো ঠাকুরপো।

—নাঃ, আমার ঘরেই যাচ্ছি। তোমাদের এই গানের আসরে আর রসভঙ্গ করতে চাই না।

—খুব হয়েছে, বোসো এসে।

শ্যামল বসল। একবার শুধু চেয়ে দেখল স্থনীতা, কিন্তু গানে মনের ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—ভালো করে যেন লক্ষ্যও করল না। গান চলল: 'অন্ধ বিভাবরী, সঙ্গপরশহারা—'

তীক্ষ্ণ-মধুর শিক্ষিত গলা—বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল লহরে লহরে। নিচের লাউঞ্জে ব্রজেন ভৌমিক তখন শুরু করেছিলেন, 'সাউথ আফ্রিকাতে ওরা যে প্ল্যান্‌টেশন শুরু করেছে—' কিন্তু থেমে যেতে হল তাঁকে। বললেন, কে গাইছে?

—বৌমার বোন। স্থনীতা।

—দিব্যি গলাটি তো।

বিমলবাবু স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন : হাঁ, বেশ গায়। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। বৌমা ওর সঙ্গে শ্যামলের বিয়ের কথা বলছিলেন—কেমন হয় ?

—চমৎকার হবে। আপনার ছেলেটিও খাসা—খুব মানাবে।

বন্দুকের পরিচর্যা শেষ করে মেজর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা চুরুট টানছিলেন। কবি মেজাজের মানুষ তিনি নন, কিন্তু কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের বৃষ্টিতে তাঁরও মনটা মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ খেলছে—এক একবার ঝলকে উঠছে বাইরের পাইন গাছগুলো, হাওয়ায় হাওয়ায় বাগানে মাতামাতি চলেছে, দোল্‌না পুলটা থেকে থেকে রূপোর খেলনার মতো চিক্‌চিক্‌ করছে।

ভেতর থেকে সুনীতার গানের সুর আসছে। নির্মলের মনে পড়ল এমনি বর্ষা নামলে এমনি করেই কতদিন গান গেয়েছেন অনীতা। সুনীতার মতো না হলেও, গানের গলা তাঁরও মন্দ ছিল না। কিন্তু এই আট বছরে একটু একটু করে বদলে গেছেন তিনি। এখন সংসার দেখে, অন্যান্য অফিসার-গিন্নীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর কারণে অকারণে উল বুনে তাঁর দিন কাটে। শখ করে মধ্যে মধ্যে এটা-ওটা রান্না তিনি করেন, কিন্তু মেজর বুঝতে পারেন মনের দিক থেকে যেন খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন অনীতা।

অনীতার বেদনা যে কোথায় তাও তাঁর অজানা নেই। অনীতা নিঃসন্তানা। মেজর নিজে ডাক্তার, পরীক্ষা করে দেখেছেন মা হওয়ার আশা তাঁর কোনোদিনই নেই। অনীতা অবশ্য কখনো এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, কিন্তু—

মেজরের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

চুরুটটা কখন নিবে গেছে, মোটা একটা ছাইয়ের টুকরো খসে পড়ল কার্পেটের উপর। পা দিয়ে সেটাকে পিষে ফেলে ঘরের দিকে রওনা হলেন তিনি।

তখন নতুন গান ধরেছে সুনীতা :

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার—'

মেজর এসে দাঁড়ালেন দরজায়। একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল।

—আমাকে ডাকা হচ্ছে নাকি ? এই ঝড়ের সন্ধ্যায় ?

অনীতা বললেন, না। খুব আত্মবিশ্বাস দেখছি যে !

—এখনো লেডীজ্‌ অন্‌লি ?—হেসে শ্যামলের দিকে তাকালেন নির্মল : তুই আবার কবে মেয়েদের দলে ভর্তি হলি হতভাগা ? তোর যে এর মধ্যে এতটা উন্নতি হয়েছে সে তো জানতুম না।

শ্যামল অবাক হয়ে বললে, তার মানে ?

—তোর বৌদিকেই জিজ্ঞেস কর।

অনীতা হেসে বললেন, আর ইয়ার্কী করতে হবে না। তুমিও এসে বসতে পারো এখন।

—অসীম অনুগ্রহ! মেজর এসে আসন নিলেন। সুনীতা থেমে গিয়েছিল, তার দিকে চেয়ে দু'চোখে কৌতুক বৃষ্টি করে বললেন,—আমাকে দেখেই গানটা থামল নাকি? রসভঙ্গ করলুম?

—না, স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ হয়েছে।

—তা হলে স্বাভাবিক নিয়মেই আরো চলতে থাকুক।

—আমার গলায় ব্যথা করছে—আর পারব না।

—সাহস তো কম নয়!—নির্মল ভুরু কোঁচকালেন: সামনে জলজ্যান্ত ডাক্তার বসে রয়েছে—তায় মিলিটারী ডাক্তার—আমার সঙ্গে চালাকি!—তারপর মোটা গলায় হুঙ্কার করে বললেন, শিব্‌ লাও!

অনীতা চমকে উঠে বললেন, ও আবার কী!

—ভয় নেই, গলা কাটতে চাইছি না। সুনীকে গলাটা এগিয়ে আনতে বলেছি। পরীক্ষা করে দেখব যে সত্যি সত্যিই গলায় ব্যথা হয়েছে কিনা। দরকার হলে অপারেশনও করতে পারি।

সুনীতা হাসল: অত কষ্ট করতে হবে না, গানই গাইছি।

—এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে!—নির্মল আবার চুরুটটা ধরালেন: ছাখো বিদুষী, চালাকি-টালাকি যা করবার সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে করতে পারো, কিন্তু ডাক্তারের কাছে নৈব নৈব চ!

এইবার প্রতিবাদ করল শ্যামল।

—আবার সাহিত্যের অধ্যাপককে নিয়ে পড়লে কেন দাদা?

অনীতা বললেন, তোমরা দু-ভাই ঝগড়া করবে, না গানটাই চলবে?

নির্মলকে মনে হল সন্ধির পক্ষপাতী। বললেন, গানই চলুক। আমাদের ঝগড়াটা এমন কিছু মধুর নয় যে সেটা সুশ্রাব্য হবে।

গানই চলতে লাগল।

ওদিকে নিচের লাউঞ্জে বসে ব্রজেন ভৌমিক একবার বাইরের দিকে চাইলেন।

বৃষ্টি নেমেছে চারধারে। আকাশে মেঘের পর মেঘ উঠে আসছে। সামনের বাগানটা দিয়ে বন্যার মতো জল ছুটেছে। 'গোধূলি'র ওপাশে সেই পাহাড়ী নদীটার গর্জন যেন বেড়ে উঠেছে একশো গুণ।

ব্রজেন বললেন, এই তো সন্ধ্যের আগেও কেমন পরিষ্কার ছিল আকাশ। মনে

হচ্ছিল এক মাসের মধ্যেও বৃষ্টি হবে না, এখন বোধ হচ্ছে, এক মাসের ভেতরেও থামবে না।

বিমলবাবু বললেন, পাহাড়ের খেয়াল! আট দশ দিন ধরে টানা রোদ চলছিল—তাই বোধ হয় বৃষ্টিটা এল।

—পাহাড়ে বেশি বৃষ্টি ভালো নয় মশাই! ভয় করে এখুনি বুঝি ধ্বস্ নামল!—ব্রজেন আর একবার বিরস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন।

ওপর থেকে তখন গান আসছিল স্থনীতার: 'তিমির অবগুণ্ঠনে, তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি···'

॥ ৩ ॥

বৃষ্টি চলল—সমস্ত রাত ধরেই চলল। পাইনের বন দাপাদাপি করল, চেরী ফুল আর লেডীজ্ লেস্ ঝরে ঝরে ভেসে চলল স্রোতের সঙ্গে, আকাশে মেঘ ধমকালো, বিদ্যুৎ চমকে চলল। আর পাহাড়ের বুকের সমস্ত জল নিয়ে ছোট নদীটা কেঁপে, ফুলে, ফেনা ছড়িয়ে পাথর ভেঙে অবিশ্রান্ত চিৎকার করতে লাগল।

ব্রজেন ভৌমিক অনীতার নতুন পাঞ্জাবী রান্না প্রচুর পরিমাণে খেয়ে মোটা মোটা কম্বলের তলায় ডুব দিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। অনেক রাত পর্যন্ত, লাউঞ্জের সেই ডেকচেয়ারটায় শালে পা ঢেকে চুপ করে বসে রইলেন বিমল দাস—এমনিভাবে বসে থাকাই তাঁর অভ্যাস। শ্যামল কবিতা লিখতে চেষ্টা করল, পারল না—স্থনীতার গান যেন কানে আর মনে সমানে গুঞ্জন করে চলল। বৃষ্টি পড়ার শব্দ প্রথম প্রেমের কাকলীর মতো স্থনীতাকে একটানা কী যেন বলে চলল—নেশার মতো ঘুম নামল তার দু'চোখে। অনীতা ব্রজেনেরই মতোই স্বপ্নহীন ঘুমে তলিয়ে রইলেন—আর নির্মল স্বপ্ন দেখলেন: ঝর্ ঝর্ করে ঝরছে ঝর্ণা, একটা ভালুক বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জল খেতে যাচ্ছে—বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে রাইফেল হাতে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছেন তিনি, ভালুকটা আর একটু এগিয়ে এলেই ট্রিগার টানবেন।

সকাল হল, 'গোধূলি' জাগল। বৃষ্টির বিরাম নেই তখনো। হাওয়া দিচ্ছে সমানে। পাহাড়গুলো বৃষ্টিতে ঝাপসা, কিন্তু যে-সব ঝর্ণা খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বল কতকগুলো রেখার মতো দেখা যাচ্ছে তাদের। দোল্না পুলের নিচের ছোট নদীটার হুঙ্কার শুনে মনে হচ্ছে যেন 'গোধূলি'র একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে সেটা।

এরই মধ্যে ভিজতে ভিজতে রামবাহাদুর টুকটাক জিনিসপত্র কিনে আনল। চা চলল, গল্প-গুজব চলতে লাগল, দুটো আড্ডা আবার বসল একতলায় দোতলায়।

ব্রজেন ভৌমিক উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন, এ কী বিশ্রী বৃষ্টি নামল অসময়ে! রাস্তা-ফাস্তা আবার ধ্বসে না যায়! আমাকে তো কাল ফিরতেই হবে।

—ভাববেন না, থেমে যাবে।

—আপনি তো বলছেন, আমি ভরসা পাচ্ছি কই! আকাশে তো দেখছি মেঘের পর মেঘ জমছে! না মশাই, ভোগাবে বলে বোধ হচ্ছে।

বিমলবাবু বললেন, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, জলে তো পড়েননি। রাস্তায় যদি ধ্বস নামেই, না হয় দুটো চারটে দিন কাটিয়ে যাবেন গরীবের বাড়িতেই।

—সর্বনাশ—বলেন কি! পরশু ডিরেক্টার্স মিটিং—দল বেঁধে সব আসবে শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি থেকে। আমি আটকে গেলে কি আর রক্ষা থাকবে নাকি?

—না হয় ছেড়ে দেবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টারী!—বিমলবাবু হাসলেন: কী করবেন মশাই অত টাকা দিয়ে? একটি মাত্র মেয়ে—তার তো বিয়ে দিয়েছেন। আপনারা দুটি মানুষ—ব্যাঙ্কে লাখ কয়েক টাকা—কেন আর এ সব ঝামেলা ঘাড়ে করে পড়ে রয়েছেন?

—তা যা বলেছেন।—ব্রজেন ভৌমিক ঘাড় নাড়লেন: কয়েক লাখ টাকা নেই বটে, তবে যা আছে তাতে মোটামুটি একরকম বাকী জীবনটা চলেও যায়। আমিও ভাবি, এসব ভূতের ব্যাগার ছেড়েই দেব এক ফাঁকে। কিন্তু কী হয় জানেন—ছাড়তে চায় না। সবাই বলে ব্রজেনদা—আপনি সরে দাঁড়ালে আমরা অনাথ হয়ে পড়ব।—তারপর যেন কোনো তৃতীয় পক্ষ কাছাকাছি রয়েছে, এমনিভাবে গলা নামিয়ে বলে চললেন, আর জানেন তো, ওদিকে বোস গ্রুপ একেবারে মুখিয়ে রয়েছে। আমি চলে গেলেই কোম্পানিকে গ্রাস করে বসবে। এই সব নানা হাঙ্গামাতে পড়েই—

বিমর্ষভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন: এদিকে বয়েস হয়ে যাচ্ছে, ভালোও লাগে না এ-সব ঝক্কি পোয়াতে। মাস তিনেক আগে গুরুদেবের ওখানে গিয়েছিলুম—চমৎকার হয়েছে নতুন আশ্রমটি। হাজার দশেক টাকা আমিও দিয়েছিলুম মন্দিরের জন্যে। গুরুদেব চিঠি লিখলেন, 'বাবা ব্রজেন, অবশ্য আসবে। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।' ডাক অমান্য করতে পারি না, গেলুম। গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ব্রহ্মপুত্রের ঠিক ওপরে একটা পাহাড়ী টিলার মাথায় আশ্রম, পেছনে আমলকি আর ভূর্জপত্রের বন। আপনার এই গোধূলির চাইতেও নির্জন। গুরুদেবকে বলেছিলুম, আর ফিরব না, এখানেই থেকে যাই। তাতে গুরুদেব বললেন,

যতদিন কর্মভোগ আছে, ততদিন তা সইতেই হবে। তোমার সময় হলে আমিই ডাক পাঠাব।

বিমলবাবু বললেন, তা বটে।

ব্রজেনবাবু বলে চললেন, বড়ো বড়ো শিষ্যও রয়েছেন অনেক। কিন্তু কৃপা আমাকে একটু বেশিই করেন। আপনিও এইবার চলুন না বিমলবাবু। বেড়িয়ে আসবেন, আশ্রমটাও দেখে আসা হবে।

—ভেবে দেখব।

—ভেবে দেখবার আর কী আছে আপনার? দুটি কৃতী ছেলে, নিশ্চিন্ত সংসার। রিটায়ার করে দিব্যি বসে আছেন। বেরিয়ে পড়লেই তো আপনার ছুটি।

—সেই ছুটির জন্যেই তো অপেক্ষা করছি ব্রজেনবাবু। তাই তো ডেরা বেঁধেছি হিমালয়ে, মহাপ্রস্থানের পথের ধারে। এখন সময় এলেই হয়।

ব্রজেনবাবু মাথা নাড়লেন: আহা, সে ছুটি তো আছেই। যেতে তো সবাইকে হবে। তার আগে পাথেয়টি তো চাই। আমার গুরুদেব বলেন—

গুরুদেবের বাণীটা বলবার আগেই কৈলাস চা আনল।

—আঃ, বাঁচালে! এতক্ষণ যেন এক পেয়ালা চায়ের জন্যেই মনটা ছটফট করছিল। —চায়ে চুমুক দিয়ে ব্রজেনবাবু আবার বাইরের দিকে তাকালেন: আঃ, বৃষ্টিটা কি আর থামবে না?

দোতলায় অনীতার ঘরে বসে সেই কথাই বলছিলেন মেজর।

—কী জঘন্য বৃষ্টিটাই নামল! সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল আমার।

সুনীতা হাততালি দিলে: বেশ হয়েছে। জীবহিংসা করতে চাইছিলেন—ভগবান ঠেকিয়ে দিলেন।

—ভগবান মানো নাকি?

—কখনো ভেবে দেখিনি। তবে মধ্যে মধ্যে ভদ্রলোককে মনে পড়ে।

—সৌভাগ্য ভদ্রলোকের!—নির্মল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন: কিন্তু এ বৃষ্টি তো পাগল করে তুলল! পাহাড়ে একঘেয়ে বর্ষার মতো বিরক্তিকর জিনিস সংসারে আর নেই। বেরুনো যায় না, ঘরে বসে থাকা আরো অসহ্য লাগে। হোপ্‌লেস!

সুনীতা বললে, তাহলে ভূতের গল্প বলুন। বৃষ্টির সঙ্গে চমৎকার জমবে।

—আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।

—তাইতেই তো সুবিধে। যারা ভূত মানে, তারা ভূতের গল্প বড্ড ভূতুড়ে করে বলে। তাতে আর্ট থাকে না। সেইজন্যেই অবিশ্বাসীর মুখ থেকে শুনতে হয়।

—তা হলে আমার ভাইটিকে ডাকো। ওসব আর্ট-ফার্টের মধ্যে আমি নেই।

সুনীতা বললে, ওরে বাবা—তাঁকে এখন ডাকবে কে? একটা মস্ত ইংরেজী বই নিয়ে পড়েছেন, চেহারা দেখলে ভয় করে।

—শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ইংরেজির এ-বি-সি-ডি-ও চেনো না।

—প্রায় তাই। ইকনমিক্স পড়ি—সাহিত্যের বই দেখলে আতঙ্ক হয়। ওঁর ধ্যান-ভঙ্গ করা আমার সাহসে কুলোবে না।

—সত্যি নাকি? নির্মলের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল: কিন্তু সখি, যতদূর জানি, ওই অপদার্থ গ্রন্থকীটের তপোভঙ্গ করতেই এই যাত্রা তোমার আবির্ভাব।

সুনীতার মুখ রাঙা হয়ে উঠল: থামুন।

—আমি না হয় থামলুম, কিন্তু তোমার দিদিকে থামাতে পারবে? তুমি এক্ষুণি যদি রণে ভঙ্গ দাও, তাহলে তাঁর কাছে তোমার কী অবস্থাটা হবে একবার ভেবে দেখেছ?

—আপনি ভাবুন, আমার দরকার নেই।

সুনীতা পালাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে মেজর তার পথ আটকালেন।

—যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

—যেখানে খুশি।

—খুশি মতো বেরুবার পথ বন্ধ—তোমার সেই ভগবান নামে ভদ্রলোকটি সব মাটি করে রেখেছেন। তার চাইতে একটা কাজ করো। ওই অর্গ্যানে বোসো, গান শোনাও।

—গান গাইলেই হল?—সুনীতা ভ্রূকুটি করল: তার একটা সময়-অসময় নেই?

—গান তাহলে সময়ে গাওয়া যায়—অসময়ে গাইতেও বাধা নেই? আচ্ছা বেশ, এখন যদি সময় না হয়ে থাকে, তবে অসময়ের গানই শোনাও।

—মুড্ নেই।

—এনে ফেলো।—চুরুটটাকে অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মেজর বললেন, কাল যা গাইছিলে, তার উল্‌টোটা চলুক।

—মানে?

—খুব তো মল্লার শুনিয়ে বর্ষাকে ডাকলে। তোমার মধুমাখা গলার গান শুনে সে থাকতে পারল না···সেই যে এসে জাঁকিয়ে বসল, যাবার নামটিও আর করছে না। এবার একখানা দীপক-টীপক ধরো, মেঘ উড়ে পালাক, চারদিক আলো করে রোদ উঠুক আর আমি বন্দুকটাকে ঘাড়ে তুলে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি।

—মেঘ তাড়াতে হলে মিঞা তানসেনকে ডাকুন—আমার কাজ নয়।

—তাঁকে আর পাচ্ছি কোথায়? এক 'প্লাঁসেৎ'-এ হয়তো সম্ভব হতে পারে।

—সেই চেষ্টাই করুন তবে। আমি যাচ্ছি।

সুনীতা বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু যাওয়ার জায়গা সত্যিই কোথাও নেই। বাইরে থই-থই জল, তীব্র শীতের বাতাস। পাইন গাছে যে কাকেরা বাসা বেঁধেছিল, তারা নিরুপায়ভাবে ভিজছে। ধোঁয়াটে রঙের পাহাড়গুলোর মাথায় মেঘের পরে মেঘ। সমস্ত হিমালয় যেন একটা বিরাট শোকের মধ্যে তলিয়ে আছে—তার খোলা রুক্ষ চুলগুলোর মতো হাওয়ায় উড়ছে গাছপালা—তার যন্ত্রণার গোঙানি আসছে দোল্না পুলের তলায় সেই নদীটা থেকে—অঝোর বৃষ্টিতে তার কান্নার আর বিরাম নেই।

সেই বিষণ্ণতা, সেই শোকের দিকে তাকিয়ে সুনীতা দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার শার্সিতে মাথা রেখে। মনে পড়ল শ্যামলের কথা। আশ্চর্য লোক। সকাল থেকে বই নিয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীর মতো—যেন কালই একটা জরুরী পরীক্ষা দিতে হবে তাকে।—কয়েকবারই তো তার ঘরের সামনে দিকে যাওয়া-আসা করল সুনীতা, একবার তাকিয়েও দেখল না!

সত্যিই কি শ্যামল তার কথা ভাবে কখনো? বাইরের ধূসর ছায়ার মতো সুনীতার মনেও মেঘ নামতে লাগল: নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কি সে কোনোদিন দেখতে পায়? কার একটা লেখায় যেন পড়েছিল, শিল্পী-সাহিত্যিকরা পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বার্থপর জীব—তারা অনেক দূরের সন্ধানে থাকে বলেই কাছের জিনিসগুলোকে দেখতে পায় না। এমন যে তলস্তয়—সারা পৃথিবী যাঁকে ঋষি বলে জানে—লেডী তলস্তয়ের অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তিনি যে খুব সহৃদয় ব্যবহার করতেন সে কথাও তো বলা যায় না।

দিদির ওপর ভারী অভিমান হল সুনীতার। দিদি যেন তাকে ক্লাউনের ভূমিকায় নামিয়েছে—যেমন করে হোক, গান গেয়ে, হেসে গল্প করে—শ্যামলকে তার বশ করতেই হবে। একটু আগে জামাইবাবু যে তপোভঙ্গের কথা বলছিলেন, তার মধ্যেও যেন সেই বিশ্রী ইঙ্গিতটা ছিল!

ছি-ছি, এত খেলো হয়ে গেছে সে? সেই কথাটা কি শ্যামলও ভাবছে? মনে মনে ঠাট্টার হাসি হাসছে আর দেখছে তাকে বশ করবার জন্যে সুনীতার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! ছি-ছি!

সুনীতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। না—এ অপমান সহ্য করা যায় না। বৃষ্টিটা থামুক, কালই সে ফিরে যাবে কলকাতায়। যাবার আগে দিদিকে বলে যাবে, সে রঙিন খেলনা নয়, তাকে দিয়ে খদ্দের ভোলানোর চেষ্টা চলবে জানলে সে কিছুতেই আসত না এখানে।

কিন্তু শ্যামল কি এই কথাটাই ভাবে তার সম্পর্কে?

স্নীতা দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়, ওদিকে মেজর বিরক্ত হয়ে একটা পুরোনো বিলিতী পত্রিকার পাতায় মনোনিবেশ করলেন। আর অনীতা এতক্ষণ রান্নাঘরের তত্ত্বাবধান সেরে শ্যামলের ঘরে এসে দেখা দিলেন।

—ঠাকুরপো!

—হুঁ!

—কখন চা দিয়েছে, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে!

—খাচ্ছি—বইয়ের দিকে চোখ রেখে শ্যামল জবাব দিলে।

বিরক্ত হয়ে অনীতা ছোঁ মেরে বইটা তুলে নিলেন সামনে থেকে।

—কী করছ বৌদি? দাও বইটা।

—উঃ, দিনরাত বই আর বই। কী হয় অত পড়ে?

—কিছুই যে বিশেষ হয় তা নয়—শ্যামল হাসল: পড়ি আর ভুলি। আর ভুলি বলেই আবার পড়তে হয়। মানে একটা ভিশাস্ সার্কল। কিন্তু হঠাৎ আমার ওপর এই আক্রমণ কেন? কিছু মতলব আছে নাকি?

—মতলব আবার কী থাকবে?—অনীতা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন: খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। রামবাহাদুরকে পাঠিয়েছিলুম বাজারে—দু' মাইল রাস্তা ভিজে এল, কিছুই পায়নি বলতে গেলে। কী যে খাওয়াব তোমাদের তাই ভাবছি।

—তা সে পরামর্শ আমার কাছে কেন? দাদার কাছে অ্যাডভাইস নাও।

—ওঁকে বলে কী হবে?—অনীতা ভ্রূভঙ্গি করলেন: হয়তো বলে বসবেন: 'চিকেন বিরিয়ানী' আর 'মুঘল-এ আজম' কারী তৈরী করো। বৃষ্টির জল দিয়ে তো আর সেগুলো রান্না হয় না।

—তা হলে চালে-ডালে। স্রেফ বাঙালী খিচুড়ি।

—সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে। অনীতা একবার বাইরের দিকে তাকালেন: আঃ, মুখপোড়া বৃষ্টি থামেও না।

—আমি থামাতে পারব না, কিছু মনে কোরো না—শ্যামল আবার বইখানার দিকে হাত বাড়ালো।

এবার অনীতা বইটাকে একটা শেল্‌ফে চালান করলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে কি দুটো কথাও বলা যাবে না?

শ্যামল হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা, বলো তা হলে।

অনীতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, নাড়াচাড়া করতে লাগলেন টেবিলের কাগজপত্র। তারপর:

—আচ্ছা ঠাকুরপো?

—হুঁ।

—তুমি তো কলকাতায় মেসে থাকো ?

—নির্ঘাত।

—মেস্ ভালো !

—আমার মতো মেযেদের পক্ষে আইডিয়াল। যাকে বলে ভেড়ার গোয়াল।

—কী খেতে-টেতে দেয় ?

—মনে রাখবার মতো কিছু নয়। তবে এক-আধটা স্মরণীয় দিন আসে—যখন ফীস্ট হয়।

—মেসে থেকে শরীর টেঁকে মানুষের ?

—হাজার হাজার মানুষ টিঁকে আছে, আমিও নেহাৎ মন্দ নেই। তোমার যদি মেস সম্বন্ধে কৌতূহল থাকে, চলে এসো একদিন। নমুনা দেখিয়ে দেব। ফীস্টও খাইয়ে দিতে পারি।

—দরকার নেই। একদিন শক্ত অসুখে পড়বে—এই বলে দিচ্ছি।

—আজ প্রায় এগারো বছর হস্টেল আর মেসেই তো কাটছে।—শ্যামল হাসল : দু'একবার সামান্য সর্দিজ্বর ছাড়া আর কোন অসুখবিসুখ হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। আর তেমন যদি কিছু ঘটেই, মেডিক্যাল কলেজ খুব দূরে নয় !

—কী যে বাজে বকো তার ঠিক নেই।—অনীতা সোজা চোখ তুলে তাকালেন শ্যামলের দিকে : কোন্ দুঃখে হাসপাতালে যাবে ? তার চাইতে বিয়ে করে সংসার পাতলে—

শ্যামল একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল : যাক, বাঁচা গেল।

—বাঁচা গেল মানে ?

—মানে, এতক্ষণে ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরুল।

অনীতা চটে বললেন, হ্যাঁ, বেরুল। বিয়ে করবে কিনা খোলাখুলি বলো।

—এক্ষুণি বিয়ে করতে হবে ?

—ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো। সুনীকে তোমার পছন্দ হয় কিনা, স্পষ্ট বলে দাও আমাকে।

শ্যামল টেবিলের ওপর মাথা নামালো।

—এমন পয়েণ্ট্ ব্ল্যাঙ্ক—

—হ্যাঁ, পয়েণ্ট্ ব্ল্যাঙ্ক ! আমার নিজের বোন বলে নয়, এমন মেয়ে লাখে একটি তুমি পাবে না, এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি।

—আরও একটি মেয়ে আছে বৌদি।

অনীতা দারুণ চমকে উঠলেন, মুখের ওপর ভয়ের ছায়া পড়ল।

—কার কথা বলছ ? কে সে ?

—তুমি।

অনীতা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললেন : না, তুমি সিম্প্‌লি ইনকরিজিব্‌ল। আমার জন্যে দয়া করে আর তোমায় সার্টিফিকেট দিতে হবে না, দশ বছর আগেই সে সব দরকার মিটে গেছে। কিন্তু আমার কথাটার জবাব দিলে না। সুনীকে কি তোমার পছন্দ হয় না ? যদি না হয়, তা-ও খোলাখুলি বলো—আমি রাগ করব না।

শ্যামল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আবার। ঘরের ভেতরে কয়েকটা অনিশ্চিত মুহূর্ত স্থির স্তব্ধ হয়ে রইল, সামনে বৃষ্টি পড়তে লাগল বাইরে। একটা গানের আওয়াজ ভেসে এল, দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। সুনীতা গাইছে ? না—সুনীতা নয়। কে যেন রেডিয়োটা খুলে দিয়েছে, শোনা যাচ্ছে : 'কোন্ খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়'—কলকাতা স্টেশন। কিন্তু কলকাতাতেও কি এমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে আজ ? নইলে শরতের সোনালি আলোর ভেতরে হঠাৎ এ গান কেন ?

উৎকণ্ঠ গলায় অনীতা বললেন, সত্যি বলো ঠাকুরপো, সুনীকে কি তোমার পছন্দ হয় না ?

শ্যামল আস্তে আস্তে বললে, শুধু আমার কথাই জিজ্ঞেস করছ কেন ? ও পক্ষেরও তো একটা মতামত থাকতে পারে।

খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন অনীতা।

—তা হলে তোমার আপত্তি নেই ?

—বললুম তো, ও পক্ষের মতটাও জানা দরকার।

—জানা দরকার ? আচ্ছা—

তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অনীতা।

—কোথায় যাচ্ছ বৌদি ?

—আসছি।

ব্যাপারটা বোঝবার মিথ্যে চেষ্টা না করে আবার বইটাকে শেল্‌ফ থেকে টেনে আনল শ্যামল। কিন্তু দরকারী পাতাটা খুঁজে বের করবার আগেই সুনীতাকে সঙ্গে করে অনীতার নাটকীয় পুনঃপ্রবেশ।

অনীতা বললেন, এইবার মোকাবেলা হয়ে যাক।

সুনীতা আশ্চর্য হয়ে বললে, কিসের মোকাবেলা ?

অনীতা কোনো ভূমিকা করলেন না—তিনি যেন একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যেই মরীয়া হয়ে উঠেছেন। বললেন, ঠাকুরপোর তোকে পছন্দ হয়েছে, বলছে একবার তোর

মতটা জানা দরকার। বল, ওকে তুই বিয়ে করবি কিনা?

সিঁদুরের চাইতেও রাঙা হয়ে উঠল স্নীতার মুখ। একছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

—ছি-ছি, কী কাণ্ডটা করলে বৌদি!

অনীতা হাসছিলেন।

—প্রমাণ করে দিলুম যে আপত্তি নেই।

—কিছুই প্রমাণ হয়নি। মাঝখান থেকে ভদ্রমহিলাকে—

—থামো—ভদ্রমহিলা! সেদিনের স্নুনী—এখনো ভালো করে শাড়ীই পরতে শিখল না—ও আবার ভদ্রমহিলা! ওর মত না থাকলেও জোর করে বিয়ে দিতুম।

—তুমি তো দেখছি এইটিন্‌থ সেঞ্চুরির বাপ-মাকেও ছাড়িয়ে গেলে! কিন্তু ওঁর মত যে আছে তাও তো জানা গেল না।

—কী করে জানাবে? মালা গেঁথে তো সঙ্গে আনেনি, নইলে এখুনি গলায় পরিয়ে দিত।

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে! এবার যাও এ ঘর থেকে।

অনীতা স্নেহভরা দুটি চোখ মেলে কিছুক্ষণ পড়ুয়া দেবরের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে কী করব? পাঠিয়ে দেব স্নুনীকে?

—বৌদি!

অনীতা হেসে বেরিয়ে গেলেন আর তাঁর খুশিভরা পায়ের আওয়াজে বিলিতী পত্রিকা থেকে মুখ তুললেন মেজর।

—কী ব্যাপার—বাড়ি কাঁপিয়ে চলেছ যে! ভেঙে ফেলবে নাকি সমস্ত।

অনীতা তাকিয়ে দেখলেন চারদিক। শ্যামল নিজের ঘরে—স্নুনীতা কোথায় উধাও হয়েছে। ব্রজেনবাবু আর বিমলবাবু নীচের লাউঞ্জে বসে গম্ভীর-গম্ভীর আলোচনা চালিয়ে চলেছেন, কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

স্বামীর গলা দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন অনীতা।

মেজর হাসলেন: এত ভাগ্য যে আমার?

—বিয়ে ঠিক করে ফেললুম। খুশী?

মেজর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুশী আর হতে পারলুম কই? আমার সাধের শ্যালিকাটিকে বেহাত করে দিচ্ছ—এটা কি একটা সুখবর?

—ঠাট্টা নয়, বখ্‌শিশ দাও।

—বখ্‌শিশ?—মেজর দুটি গভীর চোখ মেলে ধরলেন স্ত্রীর দিকে: যেটা আপাতত দিতে পারি—

সেটা অবশ্য তৎক্ষণাৎ দেওয়া গেল না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—রামবাহাদুর আসছিল। স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেলেন অনীতা।

সারাটা দিন সেই বৃষ্টি চলল। বাইরের জগৎ লুপ্ত—ঘরেও তার ছন্দ বাজতে লাগল। ব্রজেনবাবু ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে বাক্স থেকে একখানা 'কথামৃত' বের করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের বাণীকে ছাপিয়ে বার বার মনের ভেতর জেগে উঠতে লাগল : এই জঘন্য বৃষ্টিটা যদি না-ও থামে, তবু তাঁকে কাল বেরিয়ে পড়তে হবে—পরশু ডিরেকটার্স মীটিং। অনীতা এক ফাঁকে বিমলবাবুকে শুভ সংবাদটা পৌছে দিয়েছিলেন। আজকে স্ত্রীর কথাই তাঁর মনে পড়তে লাগল বার বার—বেঁচে থাকলে কত যে খুশী হতেন। শ্যামল ভাবতে লাগল, বার্ণার্ড শ-র লাইফ্ ফোর্সই বটে, তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই কিন্তু সম্ভাবনাটা এখন আর তত বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না—বরং ! আর লজ্জার সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভয় মিশে কোনো কথা ভাবতে পারল না সুনীতা—বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল সারা দুপুর।

বৃষ্টিঝরা রাত এল, বৃষ্টিঝরা রাত বাড়ল। তারপর যখন কোথাও কোনোখানে একটি মানুষও আর জেগে রইল না, তখন বর্ষার শব্দকে ছাপিয়ে, পাহাড়ী নদীর পাগল কলরোলকে ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ আদিম জন্তুর মতো একটা আদিম গর্জন করল হিমালয়।

একশো বজ্রের ডাকের মতো শব্দ উঠল, থর্-থর্ করে কেঁপে কেঁপে মাটি,—দুড়দাড় করে পাহাড় ভেঙে পড়বার আওয়াজ এল—ঢেউয়ের মুখে জাহাজের মতো দুলে উঠল 'গোধূলি'। দোতলার বারান্দায় যে বড়ো আলোটা জ্বলছিল এক আছাড়ে মেঝেয় পড়ে সেটা চুরমার হয়ে গেল।

আর দূর-দূরান্ত থেকে যেন ভেসে আসতে লাগল মানুষের অন্তিম আর্তনাদ !

দারুণ বিভীষিকার মধ্যে 'গোধূলি' জেগে উঠল।

বাড়িটা তখনো টলছে অল্প-অল্প, তখনো কানে আসছে পাহাড় ভেঙে পড়বার শব্দ—তখনো মনে হচ্ছে, এখনই—আজকে রাত্রেই—পৃথিবীটা লুপ্ত হয়ে যাবে !

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে অন্ধকারে হোঁচট খেল সুনীতা—মুখ থুবড়ে পড়তে গেল। আর তখন দুটি শক্ত হাতে তাকে ধরে ফেলল শ্যামল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে 'গোধূলি' ভীত-উৎকণ্ঠিত মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। বাইরে বৃষ্টি তখন মন্দা হয়ে এসেছে কিন্তু পাইন গাছে তখনো শন শন করে বাজছে ক্রুদ্ধ বাতাসের চাবুক।

আতঙ্কের আর বিভ্রান্তের জেরটা চলল কিছুক্ষণ। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সবাই।

বিমলবাবুর গলাই একতলা থেকে জেগে উঠল সকলের আগে।

—নির্মল, শ্যামল, অনীতা, সুনীতা—

চারদিক থেকে সাড়া এল : আমরা এখানে—আমরা এখানে।

—কারো কোনো চোট লাগেনি ?

—না—না।

শ্যামল সুনীতাকে ছেড়ে দিয়েছিল। একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তখন দাঁড়িয়ে গেছে সুনীতা। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে সে।

ব্রজেনবাবুর মোটা গলার হাঁক শোনা গেল : আর্থকোয়েক—ল্যাণ্ডস্লাইড! সবাই নেমে এসো নিচে।

দু'তিনটে টর্চ জ্বলে উঠল একতলা-দোতলায়। একটা জোরালো আলো শ্যামলের গায়ের ওপর দিয়ে সুনীতার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। মেজর ডাকলেন : সুনী, ঠিক আছো ?

শ্যামল হাসতে চেষ্টা করল : একটা প্রকাণ্ড আছাড় খেতে যাচ্ছিলেন, কোনমতে সামলে নিয়েছেন।

মেজরের টর্চের আলো অনুসরণ করে আকুল হয়ে ছুটে এলেন অনীতা।

—ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—

—কোনো ভয় নেই বৌদি, টিঁকে আছি।

অনীতা বোনটিকে টেনে নিলেন বুকের ভেতর।

—সুনী!

সুনীতার ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল।

—ভালোই আছি দিদি, কিছু হয়নি আমার।

বাইরে বৃষ্টিটা মন্দা হয়ে এসেছে—শুধু হাওয়ারই বিরাম নেই এখনো। দূরে-কাছে মেঘের মতো গুরুগুরু করে এখনো ধ্বস নামার আওয়াজ আসছে। 'গোধূলি'র চৌহদ্দির মধ্যেই কোথাও বিরাট একখানা পাথর ধ্বসল, আর একবার থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সারা বাড়িখানা আর অনীতার বুকের ভেতরে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করল সুনীতা।

অনীতা বললেন, মাগো! সবসুদ্ধ ভেঙে পড়বে নাকি মাথার ওপর ?

—ভয় নেই—এ বাড়ির কিছু হবে না—মেজর সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু গলার জোর ফুটল না, নিজেও যে খুব ভরসা পাচ্ছেন, তাও মনে হল না। তবু সাহস দেবার জন্যেই কথাটা বলতে হল তাঁকে।

নিচে থেকে আবার ব্রজেনবাবুর ডাক এল: সবাই চলে এসো একতলায়, সবাই।

মেজরের টর্চের আলোয় সবাই নিচে নামল। সিঁড়ির মাথায় যে দুটো প্রকাণ্ড ইতালীয়ান ভাস ছিল, তারা আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রেডিয়োটাও আছাড় খেয়েছে। ডাইনিং হলের দু'তিনখানা ছবি আর প্রকাণ্ড ঝাড়বাতিটা পড়ে গেছে—ঘরটা কাচের টুকরোয় একাকার।

—সকলেই তো খালি পা দেখছি!—চটি পায়ে মেজর হাঁকলেন: সাবধান, খুব সাবধান! কাচ বাঁচিয়ে এসো সব। এইদিকে—এইদিকে—

তখন ব্রজেন ভৌমিক আর বিমলবাবুর টর্চের আলোও এসে পড়েছে। দলটা এসে জড়ো হল লাউঞ্জে।

বিমলবাবু আকুল হয়ে বললেন, কারো কোথাও লাগেনি তো?

—না, লাগেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন সবাই। একটা আকস্মিক ভাঙচুরের খেলা শেষ করে আপাতত শান্ত হয়েছে হিমালয়। বৃষ্টিটা একেবারে থেমে গেছে মনে হল—যেন হিমালয়ের এই হিংস্রতা দেখে আতঙ্কে মেঘগুলো পর্যন্ত দূরে দূরে ছিটকে সরে গেছে। শুধু পাইন গাছগুলোর হাহাকারের বিরাম নেই—শুধু পাহাড়ী নদীটার সাতটা খ্যাপা সমুদ্রের গর্জন বাজছে।

প্রথমে কথা বললেন অনীতা।

—এ কি সর্বনেশে ব্যাপার!

বিমলবাবু বললেন, ল্যাণ্ডস্লাইড।

—শুধু ল্যাণ্ডস্লাইডে এত কাণ্ড ঘটে? আর্থকোয়েকও হয়েছে নিশ্চয়—ব্রজেনবাবু জানালেন।

—পাহাড় ধ্বসেই মাটি কেঁপেছে।

ব্রজেনবাবু বললেন, শুধু ল্যাণ্ডস্লাইড? অসম্ভব! এই দার্জিলিং ডিসট্রিক্টে আমার চল্লিশ বছর কেটেছে। অনেক বর্ষা দেখেছি, অনেক ধ্বসের অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না।

দূরে আবার গড়গড় করে পাথর পড়বার আওয়াজ হল। ভয়ের চমকটাকে চাপবার জন্তে শাড়ীর আঁচল মুখে গুঁজল সুনীতা। শ্যামলের মনে হল এখন একটা

সিগারেট ধরাতে পারলে ভালো হত, কিন্তু দোতলায় গিয়ে সিগারেট খুঁজে আনা আপাতত সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সকলেই চুপ করে রইলেন, বাইরের অন্ধকার পৃথিবীতে কী ঘটছে কী ঘটতে চলেছে অনুমানও করতে না পেরে একটা দুর্বোধ আর নিরুপায় আতঙ্কের মধ্যে ডুবে রইলেন সবাই। সুনীতার মনে পড়ল, কাল বিকেলেই শ্যামল বলছিল, প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই—যে কোনো সময় সে নিজের মুখোশটা খুলে ফেলতে পারে, তখন তার রাক্ষস রূপের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস হয় না। শ্যামলের মনে হতে লাগল, কনর্যাড কিংবা জ্যাক লণ্ডনের গল্পে পড়া একটা জাহাজের কথা—উত্তাল অন্ধকার সমুদ্রে ফেনিল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে প্রতি মুহূর্তে অতল জলে ডুবে যাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ব্রজেন ভৌমিক ভাবতে লাগলেন—যে-রকম ব্যাপার ঘটছে চারদিকে—যদি রাস্তা ধ্বসে গিয়ে থাকে ডিরেকটারস্ মীটিঙে যেতে পারবেন না তিনি, সবাই তাঁর মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে চাইবে। হঠাৎ খেয়ালের মাথায় এখানে বেড়াতে এসে কী বোকামিই করেছেন—এমন পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় কোনো সেফ্‌টি আছে মানুষের! অনীতা অপরিসীম ভয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন, মেজর আবহাওয়াটাকে সহজ করবার জন্যে কথা খুঁজতে লাগলেন আর বিমলবাবু নিজের ডেক-চেয়ারটায় ধ্যানস্থের মতো বসে রইলেন।

শুধু একটি জিজ্ঞাসা—একটি আতঙ্ক সকলের বুকের ভেতরে কারো একটা শক্ত থাবার মতো আঁকড়ে রইল। এরপর? কী হবে এর পরে? বাইরের চন্দ্র-তারকাহীন অন্ধকার—থেকে থেকে এখনো পাথর পড়বার আওয়াজ আর খ্যাপা নদীটার গর্জন—এই রাত কি কখনো সকাল হবে?

দুটো টর্চ সামনের টেবিলের ওপর জ্বলছে। বিমলবাবু বললেন, শুধু ব্যাটারী পুড়িয়ে কী হবে? একটা ল্যাম্প জেলে নেওয়া যাক।

ব্রজেনবাবু বললেন, আমারটা আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে।

অনীতা বললেন, আমারটাও।

—আমার ঘরেরটা ঠিক আছে বোধ হয়—দেখি—বিমলবাবু টর্চ হাতে নিজের ঘরে উঠে গেলেন, ফিরে এলেন ল্যাম্প নিয়ে।

—একটা দেশলাই চাই।

অনীতা বললেন, কিচেন থেকে নিয়ে আসছি আমি।

মেজর তটস্থ হয়ে বললেন, টর্চ নিয়ে যাও—আর খুব সাবধানে পা ফেলবে, ভাঙা কাচে ভর্তি সব।

অনীতা দেশলাই নিয়ে ফিরে এলেন। এসে ভারী গলায় জানালেন: অর্ধেক

বাসনপত্র ভেঙে একাকার—একটা টেবিল উল্টে পড়েছে।

মেজর বললেন, তা যাক। সকলের প্রাণ যে বেঁচেছে এই যথেষ্ট।

টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দেওয়ার পর যেন একটু স্বাভাবিক হল অবস্থাটা। ওই আলোটার দিকে তাকিয়ে সবাই যেন আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেল—যেন এতক্ষণ প্রকৃতির হাতে একটা নিরুপায় শিকার হয়ে ছিল সবাই, এইবার মানুষের জগতে ফিরে এল। শ্যামল ভাবল এই জন্যেই প্রমিথিয়ুস্ মানুষের জন্যে আলো চুরি করেছিলেন অ্যাপোলোর রথচক্র থেকে, এই জন্যেই পৃথিবীর দিকে দিকে কবিরা এমন করে আলোর বন্দনা গেয়েছেন : **Hail, holy light !**

ঘরের আলোটা জলে ওঠায় বাইরে থেকে একদল পতঙ্গ উড়ে এসে বাইরের কাচে মাথা খুঁড়তে লাগল। এই দুঃস্বপ্নের রাতে তারাও যেন মানুষের কাছে এসে আশ্রয় চাইছে।

ব্রজেনবাবু বললেন, আমি তো তখনি বলেছিলাম বিমলবাবু। বৃষ্টিটার ধরন আমার ভালো ঠেকছে না।

বিমল দাস হাসলেন : কী আর করা যায় বলুন। মানুষের তো হাত ছিল না ওর ওপর।

—তা ছিল না—ব্রজেন ভ্রূকুটি করলেন : কিন্তু ডিরেক্টারদের হাতগুলো তো ঠুঁটো হয়ে যায়নি। মীটিঙের সময় আমাকে না পেলে তারা আর আস্তো রাখবে না।

মেজর লঘুভাবে বললেন, না পেলেই তো আপনি নিরাপদ কাকাবাবু, ছোঁবে কী করে আপনাকে ?

ঘরের আতঙ্কিত গুমোট ভাবটা তরল হল আর একটু। এমন কি সুনীতার মুখেও একটুকরো হাসি ফুটল।

ব্রজেন বললেন, তোমরা হাসছ, কিন্তু চেনো না তো লোকগুলোকে, আদত ঘুঘু এক-একজন।

শ্যামল বললে, কিন্তু একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি—

—রেখে দাও ন্যাচারাল ক্যালামিটি ! যাদের সবই আন্‌ন্যাচারাল, তারা ওসব বোঝে না।

মেজর কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এর আগেই বিমলবাবুর চোখ পড়ল।

—আরে সব ঠাণ্ডায় কাঁপছে যে ! যাও—যাও—গরম কাপড় নিয়ে এসো—

তা বটে। এতক্ষণের প্রবল আতঙ্ক আর স্নায়বিক উত্তেজনায় যেন ভালো করে কারো খেয়ালই হয়নি। শুধু ব্রজেনবাবু নিজের কম্বলটাকে গায়ে চড়িয়ে বসেছেন, বিমলবাবু জড়িয়েছেন তাঁর সাদা শালটি।

মেজর বললেন, যে নাইট-মেয়ার শুরু হয়েছিল—তাতে আর শীতের কথা মনে থাকে! তবে এখন একটু একটু টের পাচ্ছি বটে।

গৃহিণী অনীতাই আবার উঠে গেলেন, প্রত্যেকের ঘরে থেকে গরম কাপড়-জামা নিয়ে এলেন। বাইরে নদীটার গর্জন ছাড়া পৃথিবী এখন শান্ত—পাহাড় ভেঙে পড়ার শব্দও আর আসছে না। আকাশের চলন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদও দেখা যেতে লাগল। হাওয়ার পাগলামিও শান্ত হয়ে আসছে। যেন কার একটানা কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের ফোঁসফোঁসানিকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে হিমালয় আবার নিশ্চিন্ত জড়তার ভেতরে এলিয়ে পড়েছে।

শ্যামল বললে, কিন্তু এভাবে বসে থেকে কী আর হবে! এবার গিয়ে নিজের নিজের ঘরে শুয়ে পড়লেই তো হয়।

মেজর সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ব্রজেনবাবুই প্রবল প্রতিবাদ করলেন।

—না—না, কিছুই বিশ্বাস নেই। আবার যদি আর্থকোয়েক হয়! সবাই নিচে থাকাই ভালো, দরকার হলে বেরিয়ে যেতে পারব বাইরে।

শ্যামল হাই তুলে বললে, কিছু হবে না।

ব্রজেন বললেন, আরে থামো বাবু। তুমি তো মাস্টারি করো আর কবিতা নিয়ে থাকো, জানো না পাহাড় কী জিনিস!

বিমলবাবু বললেন, বেশ তো, বসাই যাক্ না এখানে। রাতও তো বেশি নেই বোধ হয়। উনি যখন বলছেন, তখন কোনোরকম রিস্ক না নেওয়াই ভালো।

ব্রজেনবাবু উঠে গিয়ে ঘর থেকে রিস্ট্ওয়াচ নিয়ে এলেন। বললেন, সাড়ে তিনটে।

বলতে বলতেই ডাইনিং হলের ঘড়িটা গম্ভীর গলায় সাড়া দিলে একটা।

অনীতা বললেন, যাক, ঘড়িটা ঠিক আছে দেখছি। হলঘরময় ছড়ানো কাচ দেখে মনে হয়েছিল, ওটাও গেছে। কিন্তু রেডিয়োটার জন্যে ভারী মন খারাপ করছে আমার, আর ফ্লাওয়ার ভাসগুলো।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। টেবিল-ল্যাম্পটাকে শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আলোর আহ্বানে তেমনি করে পতঙ্গের দল এসে মাথা খুঁড়তে লাগল কাঁচের গায়ে। বাগানের ঝিঁঝিঁগুলোর যেন চমক ভাঙল এতক্ষণে, তীব্র রী-রী শব্দে সমস্বরে তান ধরল তারা।

ব্রজেনবাবু বললেন, কাল কী করে যাব, তাই ভাবছি কেবল। ভাবনায় মাথা ঘুরছে আমার।

শ্যামল আশ্বাস দিয়ে বললে, হয়তো পথ ঠিক আছে!

—হয়তো। লেট'স্ হোপ ফর দ্য বেস্ট। সেইজন্যেই গুরুদেবকে ডাকছি তখন থেকে।

মেজর বললেন, এতদূর থেকে ডাক শুনতে পাবেন তিনি?

শুধু বিমলবাবু অন্যমনস্ক হয়ে আলোটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, নির্মলের মন্তব্য তাঁর কানে গেল না। তা ছাড়া বাকী সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল আবার।

ব্রজেন চটে বললেন, ঠাট্টা নয় নির্মল, তাঁকে তুমি দ্যাখোনি। সিদ্ধপুরুষ তিনি—

—তা হবে। কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ের ডাক কি আসাম পর্যন্ত পৌছুতে পারে?

ব্রজেনবাবু টেবিলে মারবার জন্যে প্রকাণ্ড কিল তুলেছিলেন একটা, ল্যাম্পটার কথা ভেবে সামলে নিলেন সেটাকে। বললেন, টেলিপ্যাথি কাকে বলে জানো?

—শুনেছি।

—শুনেছ, কিন্তু প্রমাণ পাওনি। তোমার-আমার কাছে ওসব আষাঢ়ে গল্প, কিন্তু সত্যিকারের সাধুপুরুষের সংস্রবে এলে বুঝতে পারতে, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ!

—ওঃ!

—ওঃ নয়। একটা রিয়্যাল ঘটনা বলছি শোনো। আমার এক গুরুভাই আছেন কলকাতায়—নতুন বাড়ী করেছেন নিউ আলিপুরে। যেদিন গৃহ-প্রবেশ, সেদিন তাঁর মনে হল, এমন শুভদিনে যদি গুরুদেব থাকতেন, তা হলে অনুষ্ঠান সার্থক হত। বলতে না বলতেই বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি এসে থামল। গুরুদেব নেমে বললেন, তোর ডাকে থাকতে পারলুম না—চলে এলুম।

নির্মল বললেন, গল্পটা ভালোই, তবে একটা 'কিন্তু' রয়ে গেল।

ব্রজেন আবার টেবিলে কিল বসাতে গিয়ে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। বললেন, একে তুমি গল্প বলছ? আর কিন্তুটাই বা এলো কোত্থেকে?

—মানে, মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি অতদূর থেকে আসা যায়? আসাম লিংকের কল্যাণে তো দুদিনের আগে পৌছুনো যায় না। গুরুদেব তো ট্রেনেই এসেছিলেন? তা হলে দুদিন পরে শিষ্য কী ভাববে, সেটা আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন বলুন!

—দ্যাখো নির্মল, অবিশ্বাসীর মন নিয়ে বোঝা যায় না এসব। ট্রেনে এসেছিলেন কিংবা যোগবলেই চলে এসেছিলেন, কে বলতে পারে সে-সব কথা?

এবার শ্যামল জুড়ে দিল: তবে ট্যাক্সি থেকে নামবার কী দরকারটা ওঁর ছিল? একেবারে সোজাসুজি ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেই তো পারতেন।

সুনীতা ফিক করে হেসে মুখ নামালো, আর বিব্রত ব্রজেনবাবুর দিকে তাকিয়ে এবার করুণাময়ী অনীতাই তাঁর পক্ষ নিলেন।

—আপনি ওদের কথায় কান দেবেন না কাকাবাবু। আমি বিশ্বাস করি।

—করো নাকি ?

—করি বইকি। কিসে যে কী হয় কেউ বলতে পারে !—অনীতা গম্ভীর হলেন : তা ছাড়া আমাদের দেশে কত সাধু-সন্নিসী এসেছেন, কত অলৌকিক কাণ্ড করেছেন, সে-সব তো আর গাল-গল্প নয় ! আমাকে আপনি একবার নিয়ে যাবেন আপনার গুরুদেবের আশ্রমে।

অনীতার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে ব্রজেন বললেন, সত্যি যেতে চাও ?

—সত্যিই যেতে চাই।

—বেশ, নিয়ে যাব গুরু-পূর্ণিমার সময়।—ব্রজেনবাবু প্রসন্ন হয়ে উঠলেন : মস্ত মেলা হয় তখন, হাজার হাজার লোক আসে—প্রসাদ বিতরণ করা হয় তাদের। সে একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু তোমার এই মিলিটারী ডাক্তারকে নিতে পারবে ?

—উনি না যান, আমি একাই যাব।

—তা মন্দ নয়—বিমলবাবুর সঙ্গে ছেলেদের একটা সহজ সম্পর্ক, তাই বাপের সামনেই স্বচ্ছন্দে রসিকতা করলেন মেজর, হেসে বললেন, তাতে আমারও কিছুটা ইনডাইরেক্ট লাভ আছে। ওঁর পুণ্যের অর্ধেকটা ভাগ আমিও পাব।

বিমলবাবুর অন্যমনস্কতার ঘোর ভাঙল।

—কৈলাসের সাড়া পাচ্ছি না তো ? এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ—

অনীতা বললেন, ও নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে নিজের ঘরে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে তো কানের কাছে কামান দেগেও ওকে জাগানো যাবে না।

—কিন্তু এ তো কামানের চাইতেও ঢের বেশি। এতেও ঘুম ভাঙল না ?

মেজর উঠে পড়লেন : আচ্ছা, আমিই জাগিয়ে আনছি ওকে। একটু চা যদি করে খাওয়ায়, সে-ও মন্দ হয় না।—টর্চটা হাতে করে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

আগের কথার জের টেনে ব্রজেনবাবু আবার আশ্রমের বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। ব্রহ্মপুত্রের ধারে, পাহাড়ের কোলে ছবির মতো আশ্রম। পেছনে আমলকির বন—হাজার হাজার ফল যেন গোছা গোছা পান্নার মতো ফলে রয়েছে। চারদিকে যেমন শান্তি—তেমনি নির্জনতা—এই 'গোধূলি'র চাইতেও নির্জন। বর্ষার সময় নদী একেবারে ফুলে ফুলে আশ্রমের নিচ পর্যন্ত উঠে আসে। গুরুদেব বলেন—

ব্রজেনের গুরুবাক্য এবারেও শেষ হল না। রবারের চটির আওয়াজ তুলে নির্মল এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। আর ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল তাঁর বিবর্ণ রক্তহীন মুখ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখের দৃষ্টি—মিলিটারী ডাক্তারও যেন এই মুহূর্তে কী এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখে ফিরে এসেছেন।

অনীতারই চোখ পড়ল তাঁর দিকে।

দ্রুত দাঁড়িয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন : কী হল তোমার ? কৈলাসদা উঠল না ? কী হয়েছে তার ?

—সে আর উঠবে না।—অবরুদ্ধ স্বরে উত্তর দিলেন মেজর।

ঘরসুদ্ধ মানুষগুলো তীব্র ভয়ের চমকে সমস্বরে বললেন, উঠবে না ?

—না। কৈলাসদার ঘর, মুরগীর খোঁয়াড়, ওপাশের আপেল গাছটা—সব অন্তত দুশো ফুট নিচে তলিয়ে গেছে। আমার টর্চের আলো ততদূর পর্যন্ত পৌঁছোল না।

আর্তনাদ করে সোফার ওপর এলিয়ে পড়ল সুনীতা—জ্ঞান হারিয়েছে সে।

॥ ৫ ॥

তবু সকাল হল। সূর্যের আলো পড়ল 'গোধূলি'র ওপর।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কোথাও কিছুই ঘটে নি। ঠিক তেমনি করেই সূর্য উঠেছে সাত রঙের মায়া ছড়িয়ে। যেমন করে টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর তার আলোর ইন্দ্রজাল চোখে পড়ে, প্রতিদিনের মতো তাতেও কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। ওদিকে ফালুট্-সন্দকৃপুর ওপারে সূর্যস্নান করছে এভারেস্ট্—বনে বনে সাড়া দিয়েছে পাখিরা—টুকরো-টুকরো শরতের মেঘেরা আবার উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় ঘর-পালানো ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুধু বিপর্যয় ঘটেছে নিচের দিকে। লনের সামনে 'গোধূলি'র সব ক'টি বাসিন্দা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

'গোধূলি'র পশ্চিম দিকের অংশটা নিশ্চিহ্ন। মেজর ঠিকই খবর দিয়েছিলেন। খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে মাটি-পাথর-গাছপালা। অনেক নিচে কয়েক টুকরো টালি আর গোটাকয়েক কাঠের খুঁটি জানাচ্ছে একটা ঘরের অস্তিত্ব ছিল কোনোখানে। কিন্তু তার মাঝখানে কোথায় শেষ ঘুম ঘুমিয়েছে কৈলাস—মাটি আর পাথরের কোন্ অতলে সে তলিয়ে আছে, কেউ তার খবর জানে না!

বিমলবাবুর চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল।

—পঁচিশ বছর ছিল আমার সঙ্গে। বলেছিল, দাদা-বৌদিরা চলে গেলে মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে দেশে যাবে একবার।

ভরা গলায় ব্রজেন বললেন, চিরকালের মতোই ছুটি পেয়ে গেছে।

নির্মল বললেন, কৈলাসদাই আমাকে ঘুড়িতে মাঞ্জা দিতে শিখিয়ে ছিল প্রথম। আর সাইকেল চড়তে।

অনীতাও কাঁদছিলেন। বললেন, এমন তো হতে পারে, এখনো বেঁচে আছে সে। ভূমিকম্পের সময় ইঁট-পাথরের তলায় পড়েও তো মানুষ বেঁচে থাকে।

কেউ জবাব দিলেন না।

অনীতা বললেন, যদি তোমরা কেউ একটু খুঁজে দেখতে—

—খোঁজাটা কিভাবে সম্ভব অনী?—নির্মল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ? একেবারে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে! তার ওপর ধ্বসের ফলে প্রত্যেকটা পাথরই হয়তো আলগা হয়ে রয়েছে। ওখানে যে নামতে যাবে, তাকে আর ফিরে আসতে হবে না।

অনীতা ধ্বসের দিকে চেয়ে দেখলেন। আতঙ্কে শিউরে উঠল শরীর।

ব্রজেন ভৌমিক বললেন, দেখবার আরো অনেক আছে। ওইখানেই সেই পাহাড়ী বস্তিটা ছিল না?

তাঁর আঙুল লক্ষ্য করে সকলের দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। ছিল বৈকি পাহাড়ী বস্তি। ওইখানেই কোথাও থাকত রামবাহাদুর—মাইলখানেক পথ ভেঙে রোজ যাওয়া আসা করত 'গোধূলি'তে। বিমলবাবু অনেকবার তাকে থাকতে বলেছেন এখানে, কিন্তু রামবাহাদুর রাজী হয় নি। ঘরে তার দু'তিনটি মা-মরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—এক পিসি তাদের সারাটা দিন দেখাশোনা করে—কিন্তু রাত্রে বাপকে তাদের চাই-ই।

এখানে থাকলে কৈলাসের ঘরেই শুতে হতো তাকে—বরং বেঁচেই গেছে লোকটা। কিন্তু সত্যিই বেঁচেছে কি? যেখানে পাহাড়ী বস্তিটা ছিল, সেখান থেকে মধ্যে মধ্যে মুরগী (বিমলবাবুর মুরগীর খোঁয়াড়ে অবশ্য মুরগী থাকত না—পার্কিন্‌স্‌ চলে যাওয়ার পরেই নিরামিষাশী বিমলবাবু সে পাট মিটিয়ে দিয়েছিলেন) কিংবা টাট্‌কা সব্জী নিয়ে আসত রামবাহাদুর—সেই ছোট ছোট ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট ঘরগুলিকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না আর। সেখানে—তার আশেপাশে নানা জায়গায় শুধু সাদা সাদা বিশাল ক্ষতচিহ্ন—ধ্বসের দাগ; শুধু এদিক-ওদিক দু-একটা টিনের চাল সকালের রোদে কাচের টুকরোর মতো জ্বলে উঠছে—যেন শ্মশানের বুকে কয়েকটা উজ্জ্বল করোটি ব্যঙ্গের হাসির মতো জেগে রয়েছে।

বিমলবাবু বললেন, তা হলে বস্তিটাও প্রায় গেছে।

—অনেক কিছুই গেছে।—ব্রজেনবাবু অস্বাভাবিক গলায় বললেন, আমরাও যেতে পারতুম। শুধু কৈলাসের ঘরটা না গিয়ে সারা বাড়িটাই অতলে নেমে যেতে পারত। শুধু গুরুর কৃপায় বেঁচে গেছি আমরা।

এবার আর তাঁর গুরুকে ঠাট্টা করলেন না কেউ। বিমলবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুনীতা আগেই চলে গিয়েছিল বাড়ির ভেতরে, অনীতাও চোখে আঁচল দিয়ে অনুসরণ

করলেন তাকে। আর মেজর একটা নিরুপায় যন্ত্রণায় কেবল নীচের ঠোঁটটাকে কঠিন ভাবে কামড়ে ধরলেন।

ব্রজেন বললেন, যিনি রাখবার, তিনিই রাখেন। মানুষ যে কত অসহায়, কাল রাতেই তো সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি হাতে-নাতে দেখিয়ে দিলেন যে—

চাপা রুক্ষ স্বরে নির্মল বললেন, আপনার তত্ত্বকথা এখন থাক কাকাবাবু। ভালো লাগছে না।

শ্যামল ধীরে ধীরে সামনের গেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তেমনি ধীরে ধীরেই ফিরে এল সে। এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চারজনেই প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সারা গায়ে নিবিড় ঘন অরণ্য বয়ে তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি, কিন্তু কাল রাতে যে তাদের গায়ে অনেক অনেক কিছু ভাঙচুর হয়ে গেছে—সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ঘন সবুজের বুকে অনেকখানি জুড়ে জুড়ে ধবলের মতো দাগ পড়েছে—ধ্বস নেমেছে ও-সব জায়গায়। এত দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে উল্টে পড়েছে বড়ো বড়ো গাছ—এক একটা কাঠির মতো ঝুলছে এখানে-ওখানে আর চারদিকের পাহাড়েই রূপালি রেখা ঝলমল করছে—পঞ্চাশ বছর আগেও যে সব ঝর্ণা শুকিয়ে গিয়েছিল, তাদের ভেতর দিয়েও প্রচণ্ড বেগে পাহাড়-ঝরা জল সমতলের টানে নেমে পড়েছে।

নির্মলের ধমকে চুপ করে গিয়েছিলেন ব্রজেনবাবু, আবার মুখ খুললেন এবার।

—যাই হোক, আমাকে আজ যেতেই হবে। ব্রীজের ওপারে যদি মাইল কয়েক ভালো রাস্তাও পাই, তা হলে—

শ্যামল কথা বললে এবার।

—কিন্তু ব্রীজের ওপারে কেমন করে যাবেন কাকাবাবু?

—তার মানে?—ব্রজেন চমকে উঠলেন ভয়ানক ভাবে।

—মানে, ব্রীজটা আর নেই। তার ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

বিমলবাবু শুধু একবার শ্যামলের মুখের দিকে তাকালেন—একটা কথাও বললেন না তিনি। মনে হল তিনি যেন সব জানতেন, পৃথিবীর সমস্ত দুঃসংবাদের জন্যেই যেন নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করে ছিলেন তিনি। কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ব্রজেন, মেজর নির্মলও বড় বড় পায়ে সঙ্গ নিলেন তাঁর।

একটি কথাও বাড়িয়ে বলে নি শ্যামল।

ব্রীজের এপারে পাহাড় ধ্বসেছে, ফলে এই দিকের অংশটা খসে গেছে ডাঙা থেকে। ওদিকের তারের সঙ্গে এখন সমস্তটা ঝুলে আছে ওপারের পাহাড়ের গায়ে—নীচের

কালো ঝাড়া পাহাড়ের কোলে একটা হাস্তকর ছোট সাদা মইয়ের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে। নদীটা চারগুণ ফুলে উঠে তীরবেগে ছুটছে—জল আর দেখা যাচ্ছে না, শুধুই ফেনা, সেই ফেনার ওপর স্থর্যের আলো পড়ে রামধনু খেলছে—সাত হাজার খ্যাপা মোষের মিলিত গর্জন তুলেছে ওইটুকু নদী—তার স্রোতের ঘায়ে ছু'পাশ থেকে পাথর ভেঙে পড়ছে।

যেমন স্থন্দর—তেমনি ভয়ঙ্কর !

নির্মল বললেন, এত এগোবেন না কাকাবাবু, সরে আস্থন। খুব নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই আপনি।

ব্রজেন সরে এলেন, তারপর ধপ করে বসে পড়লেন।

—হয়ে গেল আমার ডিরেক্টারস্ মীটিং।

—শুধু সেইটুকুই ভাবছেন ?—একটা তিক্ত হাসিতে ভরে উঠল নির্মলের মুখ : তার চাইতেও আরো একটি ভয়ঙ্কর সত্য আছে কাকাবাবু।

ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে ব্রজেন বললেন, কী বলছ ?

—বলছি, এই ব্রীজটা ছিঁড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি !

ব্রজেন পাথর হয়ে বসে রইলেন। শ্যামল চেয়ে রইল দূরের ফালুট পাহাড়ের দিকে —যেখানে হিমালয়ের ভালুকেরা নিবিড় বনের মধ্যে তাদের বাস্ত বেঁধেছে—যার ওপারে এখন হয়তো নির্মেঘ আকাশের নিচে একরাশ হীরের মতো ঝলঝল করছে মহতোমহীয়ান এভারেস্টের চূড়ো।

তিনজনে আবার ফিরে এলেন বাড়ীর দিকে। নির্মল ঠিকই বলেছেন। হিমালয়ের এই নির্জন অঞ্চলে 'গোধূলি' এখন সমস্ত পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। যে লোকালয়টা এখান থেকে চোখে পড়ত, যেখান থেকে আসত রামবাহাদুর, ছুটি-চারটি মানুষ—বিরাট একটি ধ্বংসের চিহ্ন যেন নিঃশব্দ অট্টহাসির মতো থমকে আছে, ওখানে একজনও কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। দু মাইল দূরের গঞ্জটার কী অবস্থা কেউ জানে না। চারদিকের এই বিপর্যয়ের ভেতর পাহাড়ের কোলে এই 'শান্তিনীড়টি'র কথা কারো মনেও পড়বে না। আর যতদিন মনে না পড়ে—ততদিন—

কিন্তু সে কথা আপাতত কেউ ভাবতেই পারলেন না।

শ্যামল এসে একটা বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে পড়ল। বাকী ছুজন মাথা নীচু করে চলে গেলেন লাউঞ্জের দিকে। ডিরেক্টারস্ মীটিংয়ের সমস্যা নিয়ে ব্রজেন ভৌমিক আর অস্বস্তি বোধ করছেন না এখন। আরো নিষ্ঠুর—আরো ভয়ঙ্কর সমস্যা অপেক্ষা

করে আছে সামনে।

শ্যামল দাস আধুনিক যুগের মানুষ, আধুনিক সাহিত্যের পাঠক—নতুন কালের কবি। রোমান্টিক কবিতার ওপর সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে কলেজে পড়বার সময়। এখন ছাত্রদের কবিতা পড়াতে গিয়ে আবেগসর্বস্ব প্রকৃতি-বিলাসী কবিদের সে তীব্র ধিক্কারে জর্জরিত করে দেয়। যদিও টি. এস. এলিয়ট এখন পুরানো হয়ে গেছেন, তবু ভদ্রলোকের দুটি লাইন বারবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছে: 'প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়—ওটি মাত্র বনভোজনের জন্যেই প্রশস্ত।' শ্যামল তার সঙ্গে আরো কিছু জুড়ে দিতে চায়। সেই বনভোজনে যাওয়ার জন্যে দরকার একটি মোটরগাড়ি, একটা রেডিয়ো সেট্ আর কোনো গাছের ছায়ায় শুয়ে নিশ্চিন্তে পড়বার জন্যে খানকয়েক ধারালো উপন্যাস।

কিন্তু কবিতা লিখে কিম্বা বক্তৃতায় যা বলা যায়—সব সময় মনের কাছেই কি তার সাড়া মেলে? তবু কলকাতার বাইরে ট্রেনটা বেরিয়ে এলেই নীল-সবুজের দোলায় মন দোলে, বড় বড় জলার ভেতরে যেখানে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ মাছ ধরছে, তাদের সঙ্গে মিশে মাতামাতি করতে ইচ্ছে হয়, রেল-লাইনের পাশে যে সব শ্বেত আর রক্ত পদ্ম শরতের আকাশের দিকে ফুটে রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গান মনে আসে:

'এই শরৎ-আলোর কমল বনে,
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।'

মস্ত বটগাছের তলায় ছইওলা গোরুর গাড়ি রেখে যে গাড়োয়ান উনুন তৈরী করে রান্না চাপিয়েছে, তার দূর-দূরান্তের চলার পথটা সামনে স্বপ্নের মতো এগিয়ে চলে।

'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ,
আমার মন ভোলায় রে—'

তারো চাইতে ভালো লাগে এই হিমালয়কে। মনে হয়, হাজার হাজার পাতার একটা বিরাট ছবির অ্যালবাম—প্রতি পাতা ওল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে এক নতুন বিস্ময়। পৃথিবীর সবচাইতে নতুন পাহাড়—তাই সবচাইতে উদ্ধত আর খেয়ালী। একদিন তলিয়ে ছিল সমুদ্রের অতলে। সেই হারানো যুগে তার সর্বাঙ্গে আদিম সমুদ্রের ঢেউ খেলত, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলদানবেরা বাস্তু বেঁধেছিল তার গুহায়-গহ্বরে, তার কোলে কোলে শুক্তিরা বুক-ভরা মুক্তোর সঞ্চয় আগলে নিয়ে বসে থাকত—বিচিত্র-বর্ণ প্রবালের মণিহার দুলত, সামুদ্রিক ফুলে আর উদ্ভিদে সর্বাঙ্গ ছেয়ে থাকত তার, কোনোদিন হয়তো মাতাল সাগরের খ্যাপা টাইফুন তার অতিকায় শঙ্খের

কঙ্কালে অতলের হুঙ্কার তুলত। তারপর একদিন সব উলোট-পালট হয়ে গেল, সমুদ্রের অন্ধকার থেকে বিদ্রোহীর মতো জেগে উঠল হিমালয়—অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের উপচার দিয়ে সূর্যের জন্যে তার অর্ঘ্য সাজালো।

তার কতদিন পরে কালিদাসের কাব্য মেঘদূত, কুমারসম্ভবের বিশাল সুন্দর হিমালয় কী অপরূপ সুন্দর! তার আকাশছোঁয়া রূপ দেখে ভক্তেরা তার বুকে দেব-স্থান আবিষ্কার করলেন, দুর্গমের শিখরে শিখরে গড়ে উঠল তীর্থ, প্রাণ হাতে করে, অসংখ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করে এগিয়ে চলল তীর্থযাত্রীর দল। তারও পরে এল ইংরেজ। আরাম আর বিলাসের কেন্দ্র গড়ে তুলল একের পর এক: সিমলা-শিলং-দার্জিলিং-নাইনি-আলমোড়া। রেলের লাইন, মোটরের পথ, চায়ের বাগান, কত দুরারোহ শিখর থেকে চিরন্তন তুষারে সূর্যোদয় দেখবার আকৃতি।

রূপের আর অন্ত নেই। এখানে ঝলমল করে শহর, ওখানে ঘন-নিবিড় বনের মধ্যে কখনো কোনো আলো পৌঁছোয় না—শ্যাওলা-জড়ানো বিশাল গাছপালা শীতল অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে থাকে; কোথাও রাক্ষসের মাথার মতো ন্যাড়া পাথরের স্তূপ—কোথাও পাহাড়-ভাঙা ঝর্ণার উচ্ছ্বাস। কোথাও তুষারের কোলে মৃণালের পাখার রামধনুর রঙ জ্বলে—কোথাও মনে হয় হিমালয়ের সমস্ত ফুলগুলো যেন খুশিতে ডানা মেলেছে—উড়ছে লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি।

তবু আদিম সমুদ্রের সেই হিংস্র দিনগুলোকে ভুলতে পারে না এখনো, মধ্যে মধ্যে সেই প্রাগৈতিহাসিক চেতনা সাড়া দিয়ে ওঠে—আকাশভাঙা জলকে তার মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ, তখন—

তখন যে কী হতে পারে, কাল রাত্রেই হিমালয় তা জানিয়ে দিয়েছে।

আসলে প্রকৃতির সমস্ত নেপথ্য-জগৎটাই প্রাগৈতিহাসিক। যে কথা সুনীতাকে সেদিন পুলটার ওপরে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, সেইটেই ভাবনার মধ্যে জেগে উঠল তার। মনকে ভরে দেয়, চোখকে জুড়িয়ে দেয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তারপরেই একসময় তার ছদ্মবেশটা খুলে পড়ে, বেরিয়ে আসে দাঁত-নখ: তখন তাকে চেনা যায়। বোঝা যায়, তার চাইতে বড় শত্রু আর মানুষের কেউ নেই। যে বিষধর সাপ মানুষকে প্রতিদিন ছোবল মারে অথচ যার বিষ ছিনিয়ে মানুষ তার নিজের কাজে লাগায়—প্রকৃতির সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্কটাও ঠিক তাই।

—ঠাকুরপো!

শ্যামলের বিষণ্ণ দার্শনিক চিন্তায় ছেদ পড়ল।

অমীতা এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কী বলছিলে বৌদি ?

—পাঁচ-ছটা ডাক দিয়েছি এর আগে। শুনতে পাওনি ?

—অন্যমনস্ক ছিলুম।

কাল হলে অনীতা ঠাট্টা করতেন, জানতে চাইতেন, এমন তন্ময় হয়ে শ্যামল সুনীতার কথাই ভাবছে কিনা। কিন্তু আজকে সব অন্যরকম। শুকনো গলায় বললেন, চা দিয়েছি, খাবে চলো।

এতক্ষণে মনে পড়ল, ভোর ছ'টায় ঘরে ঘরে বেড-টী আসত, সকলকে জাগিয়ে চা দিয়ে যেত কৈলাস। সাড়ে সাতটায় জমে উঠত ব্রেকফাস্টের টেবিল। আর আজকে এখন প্রায় নটা বাজল, তবু কারো এক পেয়ালা চা-ও জোটেনি।

জিভের ডগায় এগিয়ে এসেছিল কৈলাসদা কী করছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে বাস্তব সত্যটা এসে কঠিন একটা হাতুড়ির ঘা মারল। 'গোধূলি'র চাকরি কৈলাসের চিরদিনের মতোই শেষ হয়ে গেছে, আর কোনোদিন সে এই সুখী পরিবারটির জন্যে বেড-টী নিয়ে আসবে না, ব্রেকফাস্ট টেবিলের সামনে পুরোনো স্লিপ-ওভার পরে প্রসন্ন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকবে না। পাথর মাটি আর ইট-কাঠের নিচে চিরদিনের মতোই ঘুমিয়েছে সে।

অনীতা আবার ক্লান্তস্বরে বললেন, এসো ঠাকুরপো—ঠাণ্ডা হয়ে গেল চা।

—চলো।

॥ ৬ ॥

ব্রেকফাস্ট টেবিলে আবার পারিবারিক সম্মেলন। ব্রজেনবাবু গুম হয়ে বসে আছেন, বিমলবাবু চেয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে—যেখানে খসে পড়া ছবিগুলোর শূন্য আর সাদা জায়গাগুলো হা-হা করছে। মেজর টেবিলে টক টক করে আঙুল বাজাচ্ছেন—যেন একটা জরুরী সমস্যার সমাধান প্রায় করে এনেছেন বলে মনে হয়।

অনীতা টী-পট থেকে চা ঢেলে দিলেন প্রত্যেকের পেয়ালায়। এগিয়ে দিলেন রুটি। এ কাজটা কাল পর্যন্তও কৈলাস করত।

অনীতা বললেন, ডিম নেই। রামবাহাদুর সকালে নিয়ে আসবে কথা ছিল।

ব্রজেনবাবু চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিলেন। একটা চুমুক দিয়ে পরম তৃপ্তিতে বললেন, তা হোক—তা হোক। এই যে জুটেছে তাই যথেষ্ট মা।

ঘরে ঢুকেই যে কথাটা মনে হয়েছিল, সেইটেই জিজ্ঞেস করলেন বিমলবাবু।

—সুনীতা কোথায় বৌমা।

—শুইয়ে রেখে এসেছি। এখন আর ওঠাবো না—পরে চা খাবে।

ব্রজেনবাবু উৎকন্ঠিত হয়ে বললেন : শুইয়ে কেন ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

নিজের জন্য চা ঢালতে ঢালতে অনীতা বললেন, না—অসুখ-বিসুখ নয়। শুধু পা-টা কেটে গেছে অনেকখানি।

বিমলবাবু চমকে উঠলেন : সে কি ! পা কাটল কেমন করে ?

—ভাঙা কাচের জন্যে তো কোথাও দাঁড়াবার জায়গা ছিল না, দুজনে মিলে সেগুলো পরিষ্কার করছিলুম। কার্পেটের ভাঁজের ভেতরে একটুকরো কাচ সোজা হয়ে ছিল, সেইটে হঠাৎ বিঁধে গিয়ে—

ব্রজেনবাবু বললেন, কী সর্বনাশ ! আমাদের ডাকলে না কেন বৌমা ?

—কী হবে ডেকে—অনীতা প্রায় ঠাণ্ডা চা-টা দুই চুমুকেই শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন : কারোরই তো মন ভালো নেই, মিছিমিছি সবাইকে ব্যস্ত করে লাভ কী ? তুলো আর বেঞ্জিন দিয়ে আমিই ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। অনেকটা রক্ত পড়েছে, আমিই নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলুম। ঘুমুচ্ছে।

—তা ঘুমোক। কাল রাত থেকে তো আর ঘুমুতে পারে নি।—বিমলবাবু রুটির একটা টুকরো হাতে তুলেই নামিয়ে রাখলেন : ছি-ছি, মেয়েটা দু-দিনের জন্য এখানে আনন্দ করতে এসে—

এতক্ষণে মেজর সজাগ হয়ে উঠলেন। ঠক করে চায়ের পেয়ালাটা নামালেন সসারের ওপর।

—তোমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি তো বার বার বলেছি বাড়ি কাচে একাকার, খালি পায়ে কেউ চলাফেরা করবে না—তোমাদের একটা কথাও কানে যায় না।

অনীতা তিক্ত গলায় বললেন, দিনরাত জুতো পায়ে পরে মেয়েরা সংসারের কাজ করতে পারে না।

—কিন্তু স্লিপার—

অনীতা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, তুমি চুপ করো। যা বোঝো না, মিথ্যে বকবক করতে যেও না তা নিয়ে।

কথাটা এমন বেসুরো শোনালো যে বিমলবাবু পর্যন্ত চমকে উঠলেন একেবারে। আজ দশ বছরের ভেতর—অন্তত শ্বশুর-দেবর এবং বাইরের একজন অতিথির সামনে তাঁর এমন তিক্ত-তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কোনোদিন শোনা যায় নি। চিরদিনই অনীতা প্রিয়ভাষিণী এবং চারুহাসিনী—এমন কি বাড়ির চাকরবাকরকে পর্যন্ত তিনি অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন বলেই মেজর বরাবর অভিযোগ করে এসেছেন।

বিমলবাবু কাশলেন একবার। বললেন, ঠিক আছে—ঠিক আছে। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মিথ্যে কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু পা-টা ভালো করে দেখে দিয়েছ তো বৌমা? ভেতরে আর কাচ-টাচ নেই তো?

অনীতা মাথা নাড়লেন, জানালেন, নেই।

ক্ষুধিত ব্রজেনবাবুই একা খেয়ে চললেন, একটুকরো রুটি চিবিয়ে শ্যামলের মনে হল এমন বিস্বাদ জিনিস জীবনে সে কখনো দাঁতে কাটে নি। আর মেজর নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন টেবিলের দিকে—চোখ দিয়ে তাঁর বিরক্তি আর ক্রোধের আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। বিমলবাবু সামনে বসে না থাকলে একটা অবধারিত কদর্য পারিবারিক কলহ ঘটে যেত এখন।

'গোধূলি'তে সকলে জড়ো হওয়ার পর থেকে এই চায়ের টেবিলটা ছিল এক অপূর্ব আকর্ষণ। হাসিতে গল্পে ঠাট্টায় মুখর হয়ে উঠত। ব্রজেনবাবু মধ্যে চা-বাগানের গল্প ফেঁদে বসতেন, টুকরো হালকা মন্তব্য করে কখনো শ্যামল তাঁকে উসকে দিত, কখনো চটিয়ে দিতেন নির্মল। মুখে রুমাল চেপে হাসি সামলাতে চেষ্টা করত সুনীতা, গাল দুটি তার রাঙা হয়ে উঠত। আর অনীতা তার আত্মতৃপ্ত গোলগাল চেহারাটি নিয়ে সন্ধি স্থাপনের ভূমিকা নিতেন: ওঁদের সঙ্গে কেন তর্ক করছেন কাকাবাবু? ওরা দু ভাই কোনো জিনিস কখনো সিরিয়াসলি নেয় না।' আর বিমলবাবু ভাবতেন, এইবার তিনি নিশ্চিন্তে এদের মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে বাগানের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে পারেন, কারণ তিনি এখানে থাকলে এদের আসর ঠিকমত জমে উঠবে না।

তখন উঠে পড়তেন ব্রজেন ভৌমিকও। এই ছেলে-ছোকরাদের কাছে ভালো ভালো কথার অপচয় না করে বরং বিমলবাবুর সঙ্গে কিছু তত্ত্ব-আলোচনা করা যেতে পারে।

তারপর নির্মল বলতেন, 'অয়ি শ্যালিকে!'

'একেবারে যাত্রার ঢঙে আরম্ভ করলেন যে!'

'ওই ভাষাই ভালো। এ-কালের ছাঁটাকাটা কথায় ঠিক আবেগটা আসতে চায় না। এই ছাখো না—সেকালে একটা জোরদার সম্ভাষণ ছিল,—লোকে স্ত্রীকে ডাকত'—মেজর গলা কাঁপিয়ে বলতেন, 'প্রাণেশ্বরি'!

অনীতা হেসে উঠতেন: 'এ-কালে ওই সম্ভাষণটি করলে স্ত্রী ভাববে স্বামী নিশ্চয় মদ খেয়ে এসেছে।'

—'কিংবা শরদিন্দুনিভাননি—

সুনীতা বলত: 'কী সর্বনাশ! শব্দকল্পদ্রুম মুখস্থ করে এসেছেন নাকি?'

'কিংবা মন্দান্দোলিতফুল্লপঙ্কজিনি—'

সুনীতা সভয়ে বলত: 'থামুন—থামুন।'

অনীতা বলতেন, 'একালের স্বামীরা ও সব বলেই দেখুক না দু-একবার। পরের দিনই ডিভোর্সের মামলা। তুমি চুপ করে আছো কেন ঠাকুরপো? তোমার ইংরেজির তূণ থেকেও দুটো-চারটে বাণ বের করো।'

শ্যামল দাদার সামনেই সিগারেট ধরাতো একটা। (মিলিটারী মানুষ নির্মল নিজেই অনুমতি দিয়েছিলেন ওকে, বলেছিলেন 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ-বর্ষে ভ্রাতা ইয়ারবদাচরেৎ। অর্থাৎ কিনা ষোলো বছর পেরিয়ে গেলে ভাইয়ের সঙ্গে ইয়ারবৎ—ইয়ারের মতো আচরণ করতে হবে।')

শ্যামল বলত, 'ইংরেজ কাজের জাত। সারা দুনিয়া জুড়ে রাজত্ব আর ব্যবসা চালিয়েছে এতদিন। এসব অকারণ কাব্য-বিলাসের সময় তাদের নেই।'

এইবার সুনীতা প্রতিবাদ তুলত।

'কিন্তু প্রেমের কবিতা ওরা তো কম লেখেনি।'

'রামোঃ! আমাদের দেশের জয়দেব বৈষ্ণব কবিতার পাশেও দাঁড়াতে পারে! আর ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার কথা বলছেন? ওটা ওদের চরিত্রের একটা বিকার মাত্র, কোনো মতেই তার স্বাভাবিক ধর্ম নয়!'

এইবার সুনীতার শান্ত চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠত। তর্কের জন্যে তৈরী হত সে।

'আপনি কি তাহলে বলতে চান—'

কিন্তু সে আর কালকের ব্যাপার মাত্র নয়। এই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই যেন যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেছে।

শ্যামল চোখ তুলল। বিমলবাবু চুপ করে আছেন, শ্রান্তভাবে জাবর কাটার মতো এখনো রুটির টুকরো চিবুচ্ছেন ব্রজেন, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টেবিলে তাল বাজাচ্ছেন মেজর। অনীতা একটা চেয়ারের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখ শুকনো, রুক্ষ চুল, পরনে আধময়লা শাড়ী। বোঝা যায় রাতের কাপড়টা এখনো বদলানো হয় নি তাঁর।

বৌদির এমন অপরিচ্ছন্ন চেহারা এর আগে কোনোদিন দেখে নি সে। ভোরবেলা ঘর থেকে বেরুবার আগেই তাঁর প্রসাধন শেষ হয়ে যেত। গালে পাউডারের ছোপ পড়ত, রাঙানো থাকত ঠোঁট। মনে হত, এখুনি বেড়াতে বেরুবেন কোথাও—তার জন্যে তৈরী হয়েই রয়েছেন।

শ্যামল ঠাট্টা করে বলত: 'এভাররেডি বৌদি—অল্‌ওয়েজ টিপটপ!'

'কী করা যায় ভাই! বরাবরের অভ্যেস!'

কিন্তু বরাবরের অভ্যাসটা আজ ভুলতে পেরেছেন অনীতা। এক রাত্রের মধ্যেই সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেছে।

অনীতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রাণহীন স্বরে বললেন, কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

অভিমানভরে মেজর মুখ তুললেন। সবাই-ই তুললেন।

অনীতা বললেন, চিনি ফুরিয়ে গেছে। ডিম তো নেই-ই, বিকেলের রুটিও নেই। চায়ের শিশি ভেঙে চুরমার।

মেজর বললেন, তারপর ?

—কালকের সামান্য মাছ আছে, কয়েকটা আলুও আছে দেখছি। চালে দু'বেলা কুলুতে পারে—কিন্তু তরিতরকারি যা আছে তাতে বিকেলে রান্না করার মতো কিছুই থাকবে না।

—হুঁ।

—কলে জল আসছেই না বলতে গেলে। ঝর্ণার মুখে যেখানে পাম্প বসানো আছে, সেখানে বোধ হয় গোলমাল হয়েছে কিছু। তির-তির করে যা জল আসছে, তাতে কোনোমতে ভাত-তরকারি সেদ্ধ হতে পারে, কিন্তু চান করা যাবে না।

—চুলোয় যাক চান!—ব্রজেন ভৌমিক বললেন, এই শীতের জায়গাতে দু-একদিন চান না করলে এমন কোনো মারাত্মক অসুবিধে হবে না। কিন্তু খাবার-দাবারের যা অবস্থা—

—কালকে বৃষ্টির জন্যে রামবাহাদুর গঞ্জে যেতে পারেনি। আজ সকালে যাবার কথা ছিল।

—দেখা যাক—যদি আসে।

মেজর হাসলেন—হাসিটা তার কান্নার মতো দেখালো। বললেন, মিরাকল্? বস্তিটার চিহ্নই তো প্রায় নেই দেখতে পাচ্ছি—সে আদৌ টিঁকে আছে কিনা সন্দেহ। আর যদি থাকেও, এখানে এসে পৌঁছবে কেমন করে? শুধু ব্রীজটাই ভাঙেনি—বস্তির দিকের যে অ্যাপ্রোচ্‌টা ছিল, সেটাও ধ্বসে পড়েছে। বলতে গেলে আমরা এখন শূন্যে ঝুলে আছি—পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগই নেই আমাদের।

ব্রজেন রুদ্ধ গলায় বললেন, ইম্‌পসিবল।

বিমলবাবু মৃদু স্বরে জবাব দিলেন: কিন্তু তা-ই দাঁড়িয়েছে।

—তারপর?

—এখন বন্দীর মতো থাকতে হবে আমাদের।

—কতদিন?

—ভগবান জানেন।

—আর খাবার ফুরিয়ে গেলে?

এবার অনীতা বললেন, উপোস করতে হবে।

বলে আর দাঁড়ালেন না। সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

প্রচণ্ড শব্দে কাছাকাছি বজ্র পড়বার পর কিছুক্ষণ যে আতঙ্কিত স্তব্ধতা ঘনিয়ে থাকে, তা-ই ঘরের মধ্যে জমে রইল কিছুক্ষণ। যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ল না কারো। বাইরের পাইন গাছে একটা কাক কর্কশ হাসির মতো শব্দ করে ডেকে উঠল।

মেজর টী-পট থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা চা ঢেলে নিলেন। এক চুমুকে শেষ করলেন সেটা, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

—এমন হতেই পারে না—একটু আগেই নিজে যে কথা বলছিলেন, তারই প্রতিবাদ করে বললেন, পাহাড়ীরা যে-কোনো জায়গায় উঠে যায়—আমরা এখান থেকে নামতেই পারব না? দেখা যাক।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, শ্যামল অনুসরণ করল তাঁকে।

ব্রীজের দিকটায় পাহাড় বেয়ে নদীর কাছ পর্যন্ত হয়তো কোনোরকমে নেমে যেতে পারে। কিন্তু তারপর? ওই চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট জল পেরিয়ে যাওয়ার কল্পনা পৃথিবীর সবচাইতে দুঃসাহসীর কাছেও অসম্ভব। কিম্বা জল নয়—পাথর গুঁড়িয়ে যাওয়া একটা অবিশ্বাস্য ফেনার স্রোত—একশো মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে মনে হয়। ডুব-জল হয়তো নয়, কিন্তু পা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য শীতে শরীরের রক্ত জমে যাবে এবং নামতে নামতেই এক আছাড়ে পাথরের গায়ে ফেলে একেবারে গুঁড়ো করে দেবে!

ও নদী নয়—বৈতরণী। একেবারে পরলোকের পথ।

মেজর চুরুট ধরালেন, কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন নদীর দিকে।

বললেন, আচ্ছা, মাঝে মাঝে বড় বড় বোল্‌ডার তো রয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া যায় না?

শ্যামল বললে, ও তো অনেক দূরে দূরে। তা ছাড়া অসম্ভব পিছল। এক সেকেণ্ডও দাঁড়ানো যাবে না।

—হুঁ, তা বটে।

—গঞ্জের দিকের রাস্তাতেও যে ধ্বস পড়েছে দেখছি। নদী পেরুলেই বা যাবে কী করে?

—সে একরকম হয়ে যেত। কিন্তু নদীটাই পেরুনো যাবে না।

দুজনে আবার দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। মেজর চুরুট টানতে লাগলেন। শ্যামল দেখল কালুট পাহাড়ের চূড়োয় একটা রূপোর বিন্দু চকচক করছে—বাংলোটা ঠিক

আছে ওখানে।

মেজর বললেন, একটা মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অন্যদিন ওদিকটাতে গোরু-বাছুর চরে দেখেছি, আজ তাদেরও কারো চিহ্ন নেই। সব চাপা পড়ল নাকি ধ্বসের তলায়?

—অসম্ভব নয়।

ভ্রূকুটি করে চুরুটে আবার কয়েকটা টান দিলেন মেজর।

—তা হলে বস্তির দিকটা দেখা যাক। যদি ওখান দিয়ে নামতে পারা যায়।

—কী হবে দাদা? বস্তিরই তো চিহ্ন নেই মনে হচ্ছে। কী হবে ওখানে গিয়ে?

মেজর বিরক্ত হয়ে বললেন, এক রাতের ধ্বসেই গোটা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টই একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে গেছে নাকি? কী যে বলিস পাগলের মতো, তার ঠিক নেই। পাহাড়ের কোলে কোলে গ্রাম আছে, এক জায়গায় না পাই, আর এক জায়গায় মিলবেই। সঙ্গে টাকা আছে—টাকা দিলে জিনিস পাওয়া যাবে না?

—কিন্তু ওদিকটায় তো শুনেছি ফরেস্ট্ এরিয়া।

—ফরেস্ট্ এরিয়াতেও লোক থাকে। বকিস্ নি, চল্—

'গোধূলি'র পাশে উত্তর দিকটায় এসে দাঁড়ালেন দুজনে। এইখানেই কৈলাসের ঘর, মুরগীর শূন্য খোঁয়াড়, বাগানের কিছু অংশ আর আপেল গাছটাকে নিয়ে মাটির সঙ্গে গড়িয়ে গেছে! সেই বীভৎস সমাধিটার দিকে নতুন করে তাকিয়ে কারো চোখের আর পলক পড়তে চাইল না।

মেজর একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

—বড় ভালো লোক ছিল কৈলাসদা। এইভাবে যে মারা যাবে, ভাবতেই পারা যায়নি।

শ্যামল জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছুই নেই।

কিন্তু যেটা আসল সত্য, কৈলাসের ঘরের পাশ দিয়েই ছিল সেই পায়ে-চলা পথটা—যেটা এঁকেবেঁকে দু-তিনশো ফুট নেমে খানিকটা উপত্যকার মতো জায়গা পার হয়ে বস্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পথটা 'গোধূলি'র বাসিন্দাদের পক্ষে যে খুব সহজ ছিল তা নয়—কৈলাস পর্যন্ত ওখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারত না। বলত, ও রাস্তায় যাওয়া-আসা করা পাহাড়ীদেরই পোষায় বাবু—আমাদের কাজ নয় ওসব!

তবু সেই পথও অদৃশ্য। সে-ও চলে গেছে ধ্বসের নিচে। শুধু অনেক দূরে, সবুজ গাছপালার ভেতর একটা সরু সিঁথির মতো কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে তার।

মেজর চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ও-পাশটায় পাথর ধরে ধরে হয়তো নামা যায়, শ্যামল।

—আমার সন্দেহ আছে দাদা !

—সন্দেহ থাকলে তো চলবে না। এখন এতগুলো মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন ॥ একটা উপায় তো ভাবতেই হবে।

—ওটা বোধ হয় সে উপায়ের মধ্যে পড়ে না। ওখান দিয়ে কাঠবেড়ালীও ওঠা-নামা করতে পারে বলে মনে হয় না আমার। পা দিলেই একেবারে সোজা সর্‌সর্‌ করে—

—তুই চুপ কর ইডিয়ট কোথাকার।—মেজর ভাইয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ফেললেন : শুধু কবিতা লিখলেই চলে না—লাইফকে ফেস্‌ করতে হয়। লেট্‌ মী ট্রাই—

শ্যামল বললে, দাদা—

—শাট্‌ আপ্‌। হোল্‌ড্‌ মাই কোট—জামাটা শ্যামলের দিকে ছুঁড়ে মেজর এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন জায়গাটা। কয়েকটা পাথর আছে পর পর, ঠিকমতো পা দিয়ে নামতে পারলে একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়। কিন্তু শ্যামলের কথাও একেবারে মিথ্যে নয়, একবার পা হড়কে গেলে পাথরে আছড়াতে আছড়াতে কোন্‌ অতলে গিয়ে পৌছুবেন কেউ জানে না।

গ্যামব্লিং। বাট্‌ ওয়ার্থ।

মেজর আবার বললেন, লেট্‌ মী ট্রাই।

কিন্তু প্রথম পা পড়বার পর দ্বিতীয় পা রাখবারও তর সইল না। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরুল মেজরের গলা দিয়ে : মাই গড্‌। তাঁর পায়ের তলা থেকে তৎক্ষণাৎ উপড়ে গেল পাথরটা, আর—

সর্‌ সর্‌ করে নীচে গড়িয়ে চললেন নির্মল দাস। যেন তলা থেকে সোজা তাঁকে টেনে নিয়ে চলল কৈলাসের প্রেতাত্মা।

—দাদা দাদা—বুকফাটা চিৎকার করল শ্যামল : ওই গাছের শেকড়টা—ধরো ধরো, ওইটে—

মেজরকে বলবার দরকার ছিল না। হাত-পাঁচেক গড়িয়ে একটা শেকড়কে আঁকড়ে ধরে ঝুলছেন তিনি। পাশ দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটছে মৃত্যু—মাটি আর পাথরের টুকরো নিচে ঝরঝর করে ঝরছে বৃষ্টির ধারায়।

—আর একটু ধরে থাকো দাদা, আর একটু—

মেজরের হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, যেন রক্ত ফুটে বেরুবে তা দিয়ে। পা রাখবার চেষ্টা করছেন পাথরে, কিন্তু পণ্ডশ্রম—প্রত্যেকটা পাথর যেন পায়ের ছোঁয়া লাগতে-না-লাগতে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—আমার র‍্যাপারটা ধরো দাদা—শক্ত করে ধরো—হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি—এসো—উঠে এসো—

মনে হচ্ছে নীচের টানে শ্যামলসুদ্ধ নেমে চলে যাবে। কিন্তু মাটিতে বসে পড়ে—শরীরটাকে প্রাণপণে পেছনে ঝুঁকিয়ে সে র‍্যাপারটাকে ধরে রাখল। বুকের পাঁজরা পর্যন্ত ফেটে যাচ্ছে যেন। কয়েকটা অবিশ্বাস্য মুহূর্ত কাটবার পর শেষ পর্যন্ত সত্যিই উঠে এলেন নির্মল। তখনো পাথর গড়িয়ে চলেছে একটার পর একটা আর অনেকক্ষণ ধরে তাদের পড়বার শব্দ ভেসে আসছে।

দু ভাই মাটিতে বসে হাপরের মতো হাঁপাতে লাগল কিছুক্ষণ। কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে মেজরের—হাঁটুতে চোট লেগেছে প্রচণ্ড—উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছেন না।

—দাদা, রক্ত পড়ছে যে তোমার কপাল দিয়ে।

—পড়ুক—পড়ুক। মাই ব্রাদার, ইট্ ইজ্ নাথিং। বাট্—

—কী বলছ দাদা?

—ডু ইয়ু নো—হোয়াট ডাজ্ ইট্ মীন্?

—জানি দাদা—প্রায় নিঃশব্দ গলায় জবাব দিল শ্যামল।

—ইট্ মীন্স্ ডেথ। ডেথ বাই স্টার্‌ভেশন।

দু-হাতে মুখ ঢেকে মেজর হু-হু করে কেঁদে ফেললেন।

শ্যামল বললে, কেন ছেলেমানুষি করছ দাদা? হয়তো আজই রিলিফ্ এসে যাবে।

—রিলিফ?

—সব ডিজাস্টারের পরেই তো রিলিফ আসে।

—আসবে না—আসবে না—আবার দু-হাতে মুখ ঢেকে মেজর বললেন, কৈলাসের মৃত্যুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে, হোয়াট্ ইজ ইন্ স্টোর ফর আস্।

॥ ৭ ॥

হ্যাঁ, রিলিফ আসবে বৈকি। এ-সব ডিজাস্টার হয়ে গেলে সরকারের পক্ষ থেকে সব রকম আয়োজন করা হয়। অবিলম্বেই করা হয়ে থাকে। হয়ত আজই এসে পড়বে—নইলে কাল তো নিশ্চয়ই। পাশের গঞ্জের মানুষগুলো তো অন্তত জানে, এখানে পার্কিন্‌স্ সাহেবের বাংলো আছে। আজ না হয় 'গোধূলি' তার শান্ত নির্জনতায় তলিয়ে আছে, কিন্তু পার্কিন্‌সের আমলে চা-বাগানের বহু হোমরা-চোমরা আসতেন এখানে—এমন কি দার্জিলিং-কার্শিয়াং থেকে সাদা চামড়ার অফিসারেরা পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। গান-বাজনা হত, খানাপিনা চলত।

কিন্তু পার্কিন্‌স্‌ নেই বলেই কি 'গোধূলি'র স্মৃতি মুছে গেছে সকলের মন থেকে ? অসম্ভব।

নির্মলের ব্যাপারটা নিয়ে খুব খানিক আলোড়ন চলল। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচেছে। দরকার নেই ও-সব গোঁয়ার্তুমি করে—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা যাক না। গতি একটা হবেই—নিশ্চয় হবে।

নির্মল খানিক অপ্রতিভ। কপাল ফেটেছে, হাঁটু ফুলে উঠেছে—দু'পা-র বেশি চলতে পারে না। যখন সবচাইতে বেশি দরকার—তখনই সবচেয়ে বেশি অকেজো হয়ে গেলেন।

তাঁর দিকে চোখ মেলে সবাই ম্লান হয়ে রইল, অনীতার কান্না আর থামে না। মেজর হাসতে চেষ্টা করলেন।

—ভেবো না—ভেবো না। একা যখন মরতে পারলুম না, তখন সহমরণেই যেয়ো আমার সঙ্গে।

—তুমি থামো।—অনীতা গর্জন করলেন।

দুপুরের খাওয়া হল যৎসামান্য—কারণ অনীতা হিসেব করে ওরই থেকে কিছু বাঁচিয়েছেন, কালকের ভাবনাটাও তো ভাবতে হবে। বিকেলের চায়ে চিনি পড়ল না, কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্ক থেকেই যেটুকু মিষ্টি হল চা। চায়ের সঙ্গে কোনো নতুন খাবার পরিবেষণ করবার সুযোগ পেলেন না অনীতা—খানকতক ন্যাতানো বিস্কুট দিয়েই তাঁকে টেবিল সাজাতে হল।

কিন্তু খাওয়ায় কারো রুচি ছিল না। সারাটা দিন কেবল উৎসুক চোখ মেলে সবাই লনে পায়চারি করতে লাগলেন—যদি দূরে-কাছে কাউকে দেখা যায়। কিন্তু একটি মানুষও চোখে পড়ল না—আশেপাশে যারা ছিল, তারা যেন সবাই ধ্বসের নীচে চিরকালের মতো তলিয়ে গেছে।

শুধু ব্রজেনবাবু যেন অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে কাকে দেখছিলেন। চিৎকার করে সমানে হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন নেপালীতে :

—এত্তা আই জা—এত্তা আই জা—

শ্যামল বললে, কাকে ডাকছেন কাকাবাবু ?

—ওই যে ওখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে—গায়ে হলদে শার্ট, দেখতে পাচ্ছ না ?

—না, দেখতে পাচ্ছি না তো।

—ওই যে, ওই পাইন গাছগুলোর কাছে ? চলে বেড়াচ্ছে, দেখছ না ? এই কান্ছা—এত্তা আই জা—

পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাঁর চিৎকার হা-হা করে ফিরে আসতে লাগল।

মেজর নির্মল দাস খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন তখন। ডেকে বললেন, কী পাগলামো করছেন কাকাবাবু? ওখানে কোন লোক নেই—ওটা একটা পাথর।

—লোক নয়—পাথর?—শিশুর মতো পুনরুক্তি করলেন ব্রজেন: পাথর?

—হ্যাঁ কাকা, পাথর!

ব্রজেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বিড় বিড় করে বললেন, কিন্তু আমি যে স্পষ্ট একটা লোককে চলতে দেখলুম ওখানে। হয়তো আমারই চোখের ভুল, হয়তো চশমাটার পাওয়ার বাড়াতে হবে!

সুনীতা তখন নিজের ঘরে বিছানায় উঠে বসেছে। তারও ভগিনীপতির দশা, কাচফোটা পায়ে অসম্ভব ব্যথা হয়েছে, নেমে দাঁড়ানো যাচ্ছে না পর্যন্ত। ম্লান হেসে বললে, এ বেশ হল দিদি, আমি আর নির্মলদা দুজনেই খোঁড়া হয়ে রইলুম। দরকারের সময় কোথায় সাহায্য করব, তার বদলে বোঝা হয়ে চাপলুম তোমাদের ওপর।

—তোর ভয় করছে সুনী?

—না দিদি।

—আজকালের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়।

—নিশ্চয়।

তবু অনীতা ভরসা পেলেন না, সারা মুখে মেঘ ঘনিয়ে রইল।

—আমারই ভুল হয়েছে। তুই তো পড়াশুনো ফেলে আসতেই চাস্‌নি, আমিই জোর করে নিয়ে এলুম তোকে।

—একেবারে জোর করে কি আর আনতে পারতে?—শীর্ণ মুখে হাসল সুনীতা: আমারও তো আসবার লোভ ছিল। আর এখানে না এলে কি জানতে পারতুম হিমালয় কত সুন্দর, আর কত ভয়ঙ্কর?

—না, কাজটা ভালো হয় নি।—অনীতা শাড়ীর আঁচল তুলে নিয়ে নিজের হাতে জড়াতে লাগলেন: আমরা সবাই যদি এখানে মরি—দুঃখ থাকবে না। কিন্তু তুই—

এতক্ষণ ধৈর্যটাকে ধরে রেখেছিলেন, এবার চোখে জল নামল। সুনীতাই হাত বুলিয়ে দিতে লাগল দিদির গায়ে। কোমল গলায় বললে, মরব কেন দিদি? এতগুলো মানুষ আছে যখন, কোনো-না-কোনো উপায় হবেই একটা। আর দু'চার দিন উপোস দিলেই বা ক্ষতি কী! রাজবন্দীরা তো দিনের পর দিন অনশন করছেন জেলে—বেঁচেও থেকেছেন প্রায় সবাই।

অনীতা বললেন, ভাবনা নেই, কাল থেকে আমাদেরও অনশন চলবে।

—বেশ তো, দেখাই যাক না। তুই মুখ কালো করে থাকিস্‌নি দিদি। এখন তোরই ওপর সব ভার। তুই যদি মাথা ঠাণ্ডা করে থাকিস, সবাই ঠিক থাকবে।

—এর মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা থাকে কারুর? সত্যি বলছি সুনী, অন্তত তোকে যদি এখান থেকে কোনোমতে উদ্ধার করতে পারতুম, তা হলে আর—

—তাই যদি হত, তা হলেও কি আমি একা চলে যেতুম দিদি? যদি মরতেই হয়, সবাই না হয় একসঙ্গেই মরব। সেও একটা মন্দ অভিজ্ঞতা হবে না। একসঙ্গে সবাই মিলে একটা পুষ্পক রথে চড়ে স্বর্গের দিকে চলেছি, সে অভিজ্ঞতাটাও তো কম থ্রীলিং নয়।

সুনীতা হাসল।

—এই কি তোর রসিকতার সময় সুনী?

—দিদি, হাসতে হাসতে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ানোই ভালো। কেঁদে যার মন ভোলানো যায় না—তার কাছে মিথ্যে ছোট হয়ে কী লাভ? বরং আত্মসম্মানটাকে জাগিয়ে রাখাই তো উচিত।

অনীতা বিরক্ত হয়ে বললেন, তত্ত্বকথা রাখ। আমি এদিকে মরছি নিজের জ্বালায়—কাল থেকে যে কী খেতে দেব সবাইকে জানি না। চা আছে, চিনি নেই, রুটি নেই, ডিম নেই। খানিকটা মাখন আছে, সামান্য দু'মুঠো চাল পড়ে রয়েছে, ক'টা শুকনো বরবটি আর গোটাচারেক টোম্যাটো রয়েছে কেবল। এ দিয়ে—

—এ তো রাজভোগের বন্দোবস্ত!

—রাজভোগই বটে! তাও কাল বিকেল থেকে আর থাকবে না।

—বেশ, এরপর থেকে প্রায়োপবেশনের রিহার্স্যাল চলবে।

দরজার পাশ দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। শ্যামল এসেছিল এদিকে—সুনীতার কথার কয়েকটা টুকরো কানে গিয়েছিল তার। ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না—নিঃশব্দে চলে এল নিজের ঘরে।

ড্রয়ারটা খুলল। আছে। একটা আনকোরা সিগারেটের টিন আছে এখনো। যেন মরুদ্যানের মতো মনে হল। সিগারেট ধরিয়ে অগোছালো বিছানাটার ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

তা হলে একজন স্বাভাবিক মানুষ আছে এখনো—সে সুনীতা। কাল সন্ধ্যাবেলাতেই যাকে জীবনে গ্রহণ করবার জন্যে বৌদিকে কথা দিয়েছে সে—ধ্বস্‌ নামবার আগে পর্যন্ত বৃষ্টির আওয়াজ যার গানের সুর হয়ে দু-কান ভরে বেজে উঠছিল তার।

জীবনের পাশে পাশে এমনি একটি মেয়েরই থাকা দরকার—শ্যামল ভাবল।

দুঃখের সময় সে মুষড়ে পড়বে না—দুর্দিনে যার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করা যাবে, বিপদের মধ্যে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনিয়ে যে বলবে :

"পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি"—

কিন্তু—

কিন্তু আর একটা ভাবনা মনে এল শ্যামলের। শুনেছিল, বনের বাঘ যে কখনো দেখেনি, সে-ই বাঘকে ভয় পায় না। হয়তো বিপদের চেহারাটা এখনো সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি বলেই এমন তরল, এত সজীব হয়ে আছে। হয়তো ভাবছে কাল অন্ধকারে আছড়ে পড়বার সময় পুরুষের যে শক্ত হাতটা তাকে রক্ষা করেছিল, সে-ই তাকে বাঁচাবে।

শ্যামল উঠে বসল।

বাঁচাবে? কেমন করে বাঁচাবে?

পাহাড়ী নদীটা পার হতে চেষ্টা করবে একবার? দেখবে, পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে ওটা পেরুনো যায় কিনা? কোনোমতে দু মাইল দূরের গঞ্জটায় একবার যদি পৌছুতে পারা যায়, তা হলে খাবার-দাবারের উপায় অন্তত একটা করা যাবেই। ওখানকার সব মানুষই কিছু আর মরে-হেজে শেষ হয়ে যায় নি।

সিগারেটটা শেষ করে বেরিয়ে এল শ্যামল।

বাবা লাউঞ্জের ডেকচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মেজর নির্মল বারান্দার এককোণে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, একটা অধৈর্য যন্ত্রণা জ্বলছে তাঁর দৃষ্টিতে। আর বাগানের একটা বেঞ্চির উপর জবু-থবু হয়ে বসে আছেন ব্রজেন ভৌমিক; একবার ঘোলা চোখে শ্যামলের দিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েছেন বলেই মনে হল না।

শ্যামল বেরিয়ে এল নিঃশব্দে।

দোলনা পুলটা ওপরের তারের সঙ্গে তেমনি হাস্যকর ভাবে একটা মইয়ের মতো ঝুলে রয়েছে। মনে পড়ল, পরশুও ওর ওপর দাঁড়িয়ে সুনীতার সঙ্গে গল্প করছিল সে, অন্যমনস্ক সুনীতার মুখের ওপর পড়ন্ত বিকেলের আলো দেখে তার মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের লাইন—

'ঝিল্লী যেমন শালের বনে
নিদ্রা-নীরব রাতে—'

আর মনে মনে ভেবেছিল, রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যিই কখনো নিশীথ রাতের শাল-বনে ঝিঁঝিঁর বিকট চীৎকার শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

শুধু পরশুই নয়। এখানে যতবার এসেছে, ওই দোলনা পুলটাই ছিল তার সব চাইতে প্রিয় জায়গা। পায়ের নীচে লাগাম-ছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মতো নদীটাকে দেখতে দেখতে, দূরের ফালুট পাহাড়ের দিকে চেয়ে কত সূর্য-ওঠা সকাল তার কেটেছে, কত বিকেলে আকাশের রঙ বদলেছে, তার মনে ছবি এঁকে এঁকে—কত সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় স্নান করা হিমালয় কবিতার লাইন গুনগুনিয়ে তুলেছে। তখন আর এলিয়টের ঠাট্টাটা তাকে বিচলিত করতে পারে নি : 'প্রকৃতিকে নিয়ে কাব্য লেখা যায় না—প্রকৃতির রাজত্বে শুধু পিকনিকই করা চলে'। বরং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হিমালয়ের বুকে দেখেছে আলপসের ছবি—মনে পড়েছে পাহাড়ের কোলে কোলে কোথাও ডেইজি ফুল তারার কণা হয়ে ঘাসের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও হাওয়া লেগে দুলছে অসংখ্য ব্লু বেল। নীচের নদীটা তাকে ডেকে নিয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ানে—বাংলাদেশের এক পাহাড়ী অঞ্চলে দাঁড়িয়ে কলোর্যাডোর কলগর্জন শুনছে সে।

কিন্তু এ-সব ভাবনা এখন নয়। 'গোধূলি'র মানুষগুলির এখন মরণ-বাঁচন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সত্যি-সত্যিই নদীটা পার হওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা, তাই দেখতে হবে।

দু'দিনের একটানা বৃষ্টিতে পাথর পিছল হয়ে থাকলেও 'গোধূলি'র উত্তর দিকটার মতো পাহাড় এখানে খাড়া নয়, অনেকটা ঢাল হয়ে নেমে গেছে, পাথরে পাথরে তৈরী হয়েছে সিঁড়ির মতো ধাপ। শ্যামল প্রত্যেকটা পাথরকে পরীক্ষা করে নামতে লাগল। নিচ থেকে নদীর শব্দ যেন কান বধির করে আনতে চাইছে। তবু এ-বেলা জল কমে গেছে অনেকখানি—পাহাড়ের সেই মাতাল বন্যা এর মধ্যে সমতলে নেমে গিয়ে তিস্তা-মহানন্দায় উচ্ছ্বাস জাগিয়েছে হয়তো বা।

প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টা করে আধাআধি নেমে এল শ্যামল। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, জিরিয়ে নিতে চাইল একটুখানি। চেয়ে দেখল নদীর দিকে। নুড়ি-ছড়ানো দুটি সংকীর্ণ কূলের ভেতর দিয়ে জলটা যে-ভাবে ছুটেছে, তা দেখলেও হৃৎকম্প জাগে। পার হওয়া যাবে ? যাওয়া যাবে লাফিয়ে লাফিয়ে, পাথরে পাথরে পা দিয়ে ? বলা শক্ত। তবু চেষ্টা করা যাক।

শ্যামল আর একটু নামল। তারপর থমকে গেল। এতক্ষণে একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার।

ওপর থেকে চোখে পড়ে নি, এইবার দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে আটকে আছে সে। সমস্ত শরীরটা তার থরথর করে কাঁপছে—নদী যেন পা-দুটোকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চাইছে দেহ থেকে। মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো

শ্যাওলার মতো জলে ভাসছে—গায়ে খাকি মতো রঙের কী একটা জামা লেপটে রয়েছে। পাথরে মাথাটাকে আটকে রেখে যেন নদীর টান থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে সে। চিৎ হয়ে জলের মধ্যে পড়ে আছে—পর্দা-পড়া দুটো ঘোলাটে আর বিস্ফারিত চোখ যেন চেয়ে আছে শ্যামলের দিকেই—মাথাটা কাঁপছে—যেন চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে কাছে আসবার জন্যে শয়তানের সংকেত দিচ্ছে শ্যামলকে।

যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল শ্যামল। জমে রইল পাথরের সঙ্গে। ওই চোখ দুটো যেন কয়েক মিনিট তাকে সম্মোহিত করে রাখল। মনে হল, সঙ্গী হওয়ার জন্যেই লোকটা ওখান থেকে তাকে ডাকছে।

একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরুল গলা দিয়ে। তারপরই মড়াটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শ্যামল প্রাণপণে ওপরে উঠতে লাগল। 'গোধূলি'র দুটি বেরুবার পথেই মৃত্যু পাহারা দিচ্ছে। একদিকে কৈলাস, আর একদিকে পলকহীন ওই নিষ্ঠুর চোখ দুটো।

বেরুতে দেবে না—বাঁচতে দেবে না।

'গোধূলি'র উপর সন্ধ্যা নামল।

সারাটা দিন একভাবে কেটেছে—আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, অর্থহীন জল্পনা-কল্পনার ভেতরে। সূর্যের আলো যেন ভরসার মতো জেগে থেকেছে। দূরে দূরে পাহাড়গুলোকে দেখা গেছে, এই 'গোধূলি'র বাইরেও যে আর একটা বড়ো পৃথিবী আছে তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ততক্ষণ মনে হয়েছে—সেই পৃথিবী থেকে সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কেউ আসবে—এতগুলি বিপন্ন মানুষের পরিত্রাণের একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু—

সূর্য ডুবল, কালো ছায়া পড়ল, চেরী আর লেডীজ লেসগুলি মলিন হয়ে এল, দূরের পাহাড়গুলো কালির রং ধরলো, পাইনের সারি ক্রমশ ভূতুড়ে রূপ নিতে লাগল। তারও পরে অন্ধকার এল।

আজ আর 'গোধূলি' আলোতে ঝলমল করল না। অধিকাংশ বাতিগুলোই ভেঙে চুরমার। শুধু বিমলবাবুর ঘরের আলোটি লাউঞ্জে এনে জেলে দেওয়া হয়েছে, দোতলায় একটা জলছে মেজরের ঘরে আর একটি কেরোসিনের ডিবি নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছেন অনীতা। ওই ক'টি আলো যেন আরো বেশি করে রাত্রির কালোটাকে ফুটিয়ে তুলছে। অন্যদিন দূরে দূরে পাহাড়ে গ্রামের আলো জলত—আজ সেখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাড়িটা যেন সৃষ্টির আদিম যুগে ফিরে গেছে—দিক-হারানো সমুদ্রের ভেতরে একটা দ্বীপের মধ্যে কেউ নির্বাসন দিয়েছে তাদের। কৈলাসের

মৃত্যুটা বাড়িটাকে ঘিরে ঘিরে বিষাদ আর আতঙ্কের একটা আবরণ ঘন করে তুলছে।

অনীতা ছাড়া সবাই জড়ো হয়েছেন নীচের লাউঞ্জে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা নিয়ে সুনীতাও এসে বসেছে। মেজরের হাঁটুর ফোলা আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে।

শ্যামল সেই চোখ দুটোর কথাই ভুলতে পারছিল না। সামনে তারা-জ্বলা বিরাট আকাশটাকে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল অসংখ্য মড়ার চোখ তাকিয়ে আছে তাদের মধ্যে। মাথার ওপরে আকাশটা পর্যন্ত যেন বলতে শুরু করেছে, মুক্তি নেই—কিছুতেই তাদের বাঁচতে দেওয়া যাবে না।

ঘরের ভেতরের ভার আর বাইরের অনিশ্চিত রাত্রির ভয়টাকে কাটাবার জন্যেই যেন ব্রজেনবাবু সহজ হতে চাইলেন।

—একদিক থেকে এ বরং ভালই হল বিমলবাবু।

—ভালো ? বাকী চারজোড়া চোখের অবাক বিস্ময় প্রসারিত হল ব্রজেনবাবুর দিকে।

অপ্রতিভের মতো ব্রজেন ভৌমিক গলাখাঁকারি দিলেন একবার।

—মানে, ডিরেক্টার্স মীটিং থেকে বেঁচে গেলুম। সেই গার্ডেন পলিটিক্স, লেবার-ট্রাব্‌ল, সেই দলাদলি—সেই খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে এ ওর পেছনে লাগা। বেশ আছি, কী বলেন ?

ব্রজেনবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু এবার মেজর নির্মল ভুরু কোঁচকালেন, সুনীতা মেজের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, শ্যামল নিষ্ঠুর কঠিন তারাগুলোর মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইল। শুধু বিমলবাবু বললেন, তা বটে—ছুটি পেলেন ক'দিনের জন্যে।

—ক'দিন ?—ব্রজেনবাবুর আত্মবঞ্চনা মিলিয়ে গেল মুহূর্তের ভেতর। একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে : আপনি বলতে চান, কালকেও রিলিফ আসবে না ?

—হয়তো আসবে। কিন্তু আপনার ডিরেক্টার্স মীটিং তো পেছিয়ে গেল।

শেষ কথাটা ব্রজেনবাবু শুনতে পেলেন না। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। অস্বাভাবিক গলায় বললেন, হয়তো বলছেন কেন ? কাল রিলিফ আসবে—নিশ্চয় আসবে। এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর গবর্ণমেণ্ট ক্যালাস হয়ে থাকবে ? কী করছে সব সেবা-সমিতি—কিসের জন্যে আছে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ? কেন তাহলে চাঁদা আদায় করে আমাদের কাছ থেকে, কিসের জন্যে আমরা ওদের ভোট দিই ?

বাঁকা একটা হিংস্র হাসি ঝলকে উঠল নির্মলের ঠোঁটের কোণায়।

—এই সময় আপনার গুরুদেব তো এসে পড়তে পারেন। সিদ্ধপুরুষ তিনি, যোগ-বলে পৌঁছে যেতে পারেন, ঝুড়িভর্তি খাবার-দাবার আনতে পারেন, পুলটাকে ঠিক করে দিতে পারেন! তাঁকেই একবার গলা চড়িয়ে ডাকুন না কাকাবাবু।

গলা দিয়ে বিন্দু বিন্দু বিষ যেন ঝরে পড়ল মেজরের।

বিমলবাবু ধমকে উঠলেন: কী হচ্ছে নির্মল?

—ভণ্ডামি সহ্য হয় না বাবা—দাঁতে দাঁত চাপলেন নির্মল।

—নির্মল, এই শিক্ষাই কি আমি তোমাদের দিয়েছিলুম?—অনেকদিন পরে বিমল-বাবুর ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বর ধমক দিয়ে উঠল: এই কি তোমাদের কাল্‌চারের চেহারা? ভুলে যাচ্ছো কি, উনি আমাদের গেস্ট—আমার বন্ধু?

নির্মল মাথা নামালেন।

—আমাকে মাপ করবেন কাকা। আমার অন্যায় হয়েছে।

কিন্তু ব্রজেন ভৌমিক আর বসলেন না—উঠে চলে গেলেন। অন্ধকারে খাটের আওয়াজ উঠল। খুব সম্ভব কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন আর গুরুর পাদপদ্ম জপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

বিমলবাবু হয়তো আরো কিছু বলতে চাইলেন মেজরকে, কিন্তু বলতে পারলেন না। সব অস্বাভাবিক, সব বেসুরো হয়ে গেছে। কান পেতে নীরবে বাইরের ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে লাগলেন চারজনে।

স্তব্ধতা বিমলবাবুই ভাঙলেন। কোমল স্বরে বললেন, মা সুনীতা?

প্রায় নিঃশব্দে সুনীতা জবাব দিলে, বলুন।

—একটা কথা বলব তোমাকে? যদি তোমার কষ্ট না হয়—শরীর অসুস্থ—ভালো করে খাওয়াও তো হয়নি—

—আমি বেশ আছি। বলুন।

—সবাই কিরকম মনমরা হয়ে রয়েছে মা, একটা গান যদি তুমি—

শ্যামল বললে, কিন্তু অর্গ্যানটা তো ওপরে রয়েছে।

সুনীতা বললে, অর্গ্যানের দরকার নেই, খালি গলাতেই গাইছি।

সামান্য গুন গুন করল সুনীতা, তারপর আরম্ভ করল:

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে—

একসঙ্গে নড়ে বসলেন সবাই। যেন সকলের মনের কথা একটা আকুল প্রার্থনার মতো এই গানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল। বিমলবাবু চোখ বুজলেন, নাস্তিক মেজর নিস্পন্দ হয়ে গেলেন, আকাশের তারাগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে শ্যামল

দেখল, মুগ্ধ তন্ময়তায় ভরে গেছে সুনীতার মুখ :

"লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
না জানি কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল পাথারে—"

গানের সুরে মগ্ন হয়ে গেল ঘর—যেন কাছের ব্যবধান পেরিয়ে বাইরের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে গেল, অন্ধকার পাইনের গাছগুলো দুলে উঠল, যেন বাইরে ঝিঁঝিঁরা গান শোনবার জন্যে কান পাতল :

"প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে—"

কিন্তু গানটা শেষ হল না। তার আগেই একটা চিৎকার ভেসে এল রান্নাঘর থেকে। ফোলা হাঁটু নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে পড়তে পড়তে ছুটলেন মেজর, ছুটল শ্যামল, বিমলবাবু ছুটে গেলেন। আর খোঁড়া পায়ে দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে গেল সুনীতা। শুধু ব্রজেনবাবুই নির্বিকার হয়ে পড়ে রইলেন তাঁর বিছানায়—হয়তো গুরুর ধ্যানেই মগ্ন হয়ে আছেন।

রান্নাঘরের মেজেয় পড়ে আছেন অনীতা। জলে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

—কী হল অনী, কী হল ?—স্ত্রীর পাশে অতি কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মেজর, দু'হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন, অনী, কী হয়েছে ?

অনীতা দুটো আরক্তিম চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বললেন, কৈলাস এসেছে।

কৈলাস ! চারজনে শিউরে উঠলেন।

অনীতা চোখ বুজলেন। বিড়বিড় করে বললেন, ওই তো জানলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলছে, বড় খিদে পেয়েছে বৌদি—কিছু খেতে দাও !

জানলার বাইরে শুধু থরে থরে অন্ধকার। কোনো কিছুর চিহ্ন নেই সেখানে।

তারপরে সমস্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিলেন অনীতা। খিঁচুনি ধরল, মুঠো হয়ে এল হাত দুটো, বাঁকা আর শক্ত হয়ে এল পায়ের আঙুল।

মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

শুকনো গলায় বললেন : নার্ভ ! ফিট হয়ে গেছে।

আরো একটা দিন কাটল যেন বিকারের মধ্য দিয়ে।

নদীর ওপরে গঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা খানিক দূরে এগিয়ে পাথর-বালির স্তূপের তলায় অদৃশ্য হয়েছে, এদিকে মানুষ এল না সেজন্য। বস্তির দিকটায় দু'একজনের চলাফেরা ছিল কিনা কে জানে, এত দূর থেকে কিছু বুঝতে পারা গেল না।

আর সারাদিন পাগলের মতো চিৎকার করে কাকে যেন ডেকেই চললেন ব্রজেন ভৌমিক।

'ওহে, শোনো—শোনো।'

'আ-জা—এত্তি আ-জা'—

'লুক হিয়ার স্যার—হেলপ্ আস্! উই আর স্টার্ভিং হিয়ার—উই আর ডায়িং—'

প্রথম প্রথম দু-একবার বাধা দিয়েছিলেন বিমলবাবু, তারপর থেমে গেলেন। ব্রজেনবাবু বিকট চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোণ্ট্ ডিস্টার্ব্ মী—লোক আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি!

চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে গেল, একটা বিকৃত আওয়াজ বেরুতে লাগল তারপরে।

বিনা চিনি, বিনা দুধে খানিকটা চা তৈরী করলেন অনীতা—কন্‌ডেন্‌সড্ মিল্‌কটাও ফুরিয়ে গেছে। তাই খেতে হল সকলকে। শুধু ব্রজেন একবার বলেছিলেন, আমি যে চিকেন-স্যাণ্ডউইচের গন্ধ পাচ্ছিলুম—সেগুলো কোথায় গেল?

চিকেন স্যাণ্ডউইচ্! সব ক'জোড়া চোখ একসঙ্গে জলজ্বল করে উঠল। কাল পর্যন্ত ভয় আর বিমূঢ়তায় ক্ষিদে-তেষ্টার চেতনা কারো ভালো করে ছিল না—আজ তীব্রভাবে সাড়া দিয়েছে তারা। খালি পেটের মধ্যে বিস্বাদ গরম চায়ের স্পর্শ যখন তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমক দিচ্ছে, তখন ব্রজেনবাবুর কথাটা মুহূর্তে হিংস্র ক্ষুধা হয়ে ছোবল মারল সকলকে!

ব্রজেন বললেন, মার্মালেড্ একটু চাই। তা ছাড়া ডবল ডিমের ওম্‌লেট।

মেজর চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন ব্রজেনবাবুর কাঁধটা।

—অ্যানাদার ওয়ার্ড অ্যাণ্ড্ দেন—

বিমলবাবু বললেন, নির্মল!

নির্মল উঠলেন, টলতে টলতে—মাতালের মতোই বাইরের দিকে এসে মাটিতে বসে পড়ে, আক্রোশ মেটাবার জন্যেই ছেলেমানুষের মতো নুড়ি ছুঁড়তে লাগলেন একটার পর একটা।

সুনীতা নিজের ঘরে চুপ করে পড়ে রইল, অনীতা উঠে গেলেন কয়েকমুঠো চাল আর গোটা দুই আলু সেদ্ধ করবার জন্যে। শ্যামল দোতলার বারান্দায় এসে একটা সিগারেট শেষ করে তার আগুন থেকে আর একটা ধরিয়ে নিলে। দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে এসেছে—হিসেব করে খরচ করতে হবে।

কিন্তু হিসেব! হিসেবের কি দরকার আছে? কোনো রিলিফ যদি আজ না আসে—যদি কালও না আসে—তারপর—

তারপর পাহাড় বেয়েই নামতে চেষ্টা করতে হবে, যেমন করে হোক নদীটা পেরিয়ে যাবার জন্যে পাথরে পাথরে লাফিয়ে যেতে হবে। তারও পরে দেশলাইয়ের আর কোনো দরকার থাকবে বলে মনে হয় না।

এই বারান্দা থেকে কী সুন্দর দেখায় চারদিকের পৃথিবী! ধ্বসের দাগ ধরা পাহাড়গুলোতে কী অপরূপ সবুজ—তাদের ভেতর দিয়ে রুপোর ফিতের মতো ঝর্ণা। হাওয়ায় বনের গন্ধ—তুষারের কণা। নীল আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘের চিহ্ন নেই—এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশের রঙ দেখে বোঝা যায় বাংলাদেশে এখন শিউলি ফোটার কাল, এখন পদ্মের বনে মৌমাছিদের মাতাল হওয়ার সময়, এখন বিলে-জলায় বুনো হাঁসের কলধ্বনি।

এই আকাশ এই মুহূর্তে কলকাতাকে ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে সেই সবুজ সমতলকে—যেখানে নতুন ধানের উৎসব এল বলে। সেখানে মানুষের পথ চারদিকে খোলা—কোথাও পাহাড়ী নদী পথ আটকায় না—কোথাও খাড়া পাহাড়ের গায়ে আলগা পাথর মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী করে রাখে না। সেখানে পয়সা থাকলে খাবার পাওয়া যায়—সেখানে মানুষের মুখ ঘুরে বেড়ায় চারদিকে—বিপদের সময় চিৎকার করে ডাকলে বন্ধুর দল হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। নগ্ন-নির্জন প্রকৃতি নয়—তার নিষ্ঠুরতার শেষ নেই; এর চাইতে ঢের ভালো মানুষের সংসার, তার প্রীতি—মমতা, তার লোভ, তার হীনতা, তার পুণ্য, তার পাপ!

দোল্‌না পুলটা যেখানে ছিল, এখন কেবল কালো একটা রেখা। সেখানে সেই রেখার ওপারেই পীচের রাস্তাটা—খানিক দূর এগিয়ে ধ্বসের নিচে চাপা পড়েছে। কিন্তু সেই মাটি পাথরের স্তূপ পেরিয়ে যাওয়াটা এমন কিছু অসাধ্য নয়। শুধু ওই রেখাটা—যাকে এখান থেকে দু ফুট আড়াই ফুটের বেশি বলে মনে হয় না—সে যে কী ভয়ঙ্কর শূন্যতায় হাঁ করে আছে এখান থেকে তা কল্পনাই করা যায় না।

নিচ থেকে ব্রজেনবাবুর ভাঙা গলার চীৎকার কানে এল: এই—কে যায়—কে যায়? শোনো—শোনো—

শ্যামল দেখতে পাচ্ছে ব্রজেনবাবুকে; দেখতে পাচ্ছে কোন্ দিকে তাকিয়ে আছেন

তিনি। 'গোধূলি'র যে দিকটাতে আরো বেশি খাড়াই—যেখানে শুধু কয়েকটা বড় বড় ন্যাড়া পাথর সোজাসুজি একশো-দেড়শো ফুট শূন্যতার ওপর ঝুলে রয়েছে, আর এই বিপজ্জনক দিকটাকে লোহার ফেনসিং দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন পার্কিন্‌স্—সেইখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে মুখ করে ডেকে চলেছেন ব্রজেনবাবু।

এবার ইংরেজিতে বললেন : ফর গড্‌স সেক—কাম হিয়ার ! ইউ সী, উই আর স্ট্র্যাণ্ডেড্। নো ওয়ে আউট। ইন দ্য নেম অফ গড্—কেউ নেই শ্যামল জানে। কিন্তু ইংরেজি-মতে গড্‌কে ডাকাডাকি করছেন কেন ? গুরুদেবের নাম করলেই তো হয়।

তৃতীয় সিগারেটটা ধরিয়েই ফেলে দিলে শ্যামল। গলা জালা করছে তার।

আশ্চর্য—এমন একটা অবস্থাও হতে পারে মানুষের—এই বিজ্ঞানের যুগে ? এই উজ্জল শরতের আকাশের নিচে—একটা বড়ো গঞ্জ থেকে মাত্র মাইল দুই দূরে ছ'জন মানুষ একটা পাহাড়ের ওপর বন্দী থেকে অনাহারে মরে যাবে ! তিনদিক দিয়ে নামবার পথ নেই—পশ্চিমে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে, কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে না—হয়তো ওইটেই মহাপ্রস্থানে যাবার রাস্তা।

অদ্ভুত ! প্রহসনের মতো মনে হয় !

ইয়োরোপ হলে কী হত ? হেলিকপ্টার আসত—দেখতে দেখতে পৌঁছে যেত সাহায্য। কিন্তু ইয়োরোপের কথা থাক ! চারজন সমর্থ শক্ত পুরুষমানুষ রয়েছে এখানে—কিন্তু কী নিরুপায় ক্লীবের মতো হাত কামড়াতে হচ্ছে তাদের ! গ্লানিতে যেন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

অসম্ভব ! এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। আবার চেষ্টা করতে হবে। এমন ভাবে হার মানা যাবে না কোনোমতেই। নদী পেরুব—যে করে হোক। না পারি উঠব ওই পাহাড়টাতেই। দেখি কোথায় কত দূর গেছে। সব পথের শেষ আছে—আর পাহাড়টারই নেই ? দাদার হাঁটুটায় চোট লেগেই সব গোলমাল হয়ে গেল, নইলে দু-ভাই মিলে—চেষ্টা করতে পারলে—

অনীতা এসে ডাকলেন, ঠাকুরপো ?

শ্যামল ফিরে তাকালো। অনীতাকে যেন চেনা যায় না। এই দু'দিনেই গোলগাল সুখী মানুষটার চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, চোখের কোণে ঘন কালি। পরনের শাড়ীটা ময়লা, আঁচলের কাছে কয়েকটা পোড়া দাগ। চোখের দৃষ্টি ফাঁকা হয়ে গেছে। অনীতা বললেন, ঠাকুরপো, খাবে চলো।

—কী খেতে দেবে বৌদি ?

—ভাত আর আলুসেদ্ধ। মাখনের টিনটা উনুনে দিয়েছি—গলে যদি কিছু বেরোয় !

শ্যামল চুপ করে রইল। বৌদির হাতের সেই নানারকম শৌখিন রান্নার কথা মনে পড়ল তার

অনীতা বললেন, এই বেলাতেই শেষ। রাত্রে শুধু চাল রইল কয়েক মুঠো। তাই সেদ্ধ করে দিতে হবে।

—ভেবো না বৌদি। কালকের মধ্যে কিছু উপায় হবেই।

অনীতা হাসলেন। সে হাসিতে একবিন্দু আশা কিংবা আনন্দের চিহ্নও দেখা গেল না।

—হয়তো হবে।

—তুমি বিশ্বাস করো বৌদি—

—বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমার কিছু নেই ঠাকুরপো। এখন খাবে এসো। ওই পিণ্ডি একবার শক্ত হয়ে গেলে গলা দিয়ে কিছুতেই আর নামবে না।

—এখন সব নামবে বৌদি। পাথরও নামবে।

—কাল থেকে তাই নামাতে হবে। এসো এখন।

খাওয়ার টেবিলে গিয়ে দেখা গেল শুধু ভাত আর আলুসেদ্ধই নয়, আলু আর টোমাটো দিয়ে কী একটা তরকারির মতোও রান্না করেছেন তিনি। তাই-ই সকলের মুখে অমৃতের মতো লাগল।

অতৃপ্তি নিয়ে বসে রইলেন সবাই। এখনি টেবিল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

শেষে ব্রজেনবাবুই গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, বৌমা—আর দুটি ভাত—

এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে দু-চামচে ভাত তাঁর পাতে তুলে দিলেন অনীতা।

মেজর লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেদিকে। বললেন, যদি আমাকেও—

সেই নির্বেদ শূন্যতার হাসি হেসে অনীতা চুপ করে রইলেন।

মেজর বললেন, আর নেই ?

অনীতা উবুড় করে ধরলেন হাঁড়িটা। আট-দশটা মাত্র ভাত পড়ল মেঝেতে।

বিমলবাবু বললেন, সে কি ! একমুঠোও রাখো নি তোমার জন্যে ?

—আমার দরকার হবে না, বাবা—অনীতা আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

আর গোগ্রাসে যে ভাতের পিণ্ডিগুলো গিলছিলেন ব্রজেনবাবু, তার একটা যেন তাঁর গলায় আটকে গেল। বিকৃতি একটা জান্তব শব্দ করলেন তিনি, চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

সেই বিকৃতি-বিকট গলায় ব্রজেনবাবু বললেন, আমার বাড়ীতে দু'বেলা একশো লোকের পাত পড়ে আর বৌমার মুখের দু'মুঠো ভাত আমি কেড়ে খেলুম !

ভাতের পিণ্ডি মুখে বীভৎস দেখাচ্ছিল ব্রজেনবাবুকে, আরো অসহ্য-উৎকট লাগছিল তাঁর কান্না। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে মেজরই রুক্ষ স্বরে ধমকে উঠলেন : থামুন—মিথ্যে মায়া-কান্না কাঁদবেন না। চাইবার সময় খেয়াল ছিল না?—অনীতার উপবাসের চাইতেও নিজের মনোভঙ্গেই যেন ধৈর্য হারিয়েছেন নির্মল : খালি রাক্ষসের মতো নিজে গেলবার কথাই ভাবেন—পরের জন্যে কোনো চিন্তা আছে আপনার?

ব্রজেন ভাতের গ্রাসটা নিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলেন, মুখের রং একবার লাল হয়ে তারপরেই কালো হয়ে গেল।

বিমলবাবু বললেন, নির্মল—নির্মল—

নির্মল নিজের চেয়ারটাকে আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলটাকে আঁকড়ে ধরে উঠতে গিয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। বললেন, আপনি আর ওঁকে ডিফেণ্ড করতে চেষ্টা করবেন না বাবা!—

প্রত্যেকটি কথার ভেতর অসহ্য বিদ্বেষ ঠিকরে আসতে লাগল : গেস্ট্! কে বলেছিল ওঁকে এখানে আসতে? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? এই লোকটা না থাকলে তো চার বেলায় চারজনের খাবার বাঁচতো বাবা—একটা দিন আমরা সবাই লড়বার স্থযোগ পেতুম!

নির্ভুল হিসেব, সন্দেহ মাত্র নেই। ঘরের একটি লোকের মুখে একটা কথাও যোগাল না। শুধু ব্রজেনবাবুর মুখ থেকে অর্ধচর্বিত ভাতের রাশ বমির মতো প্লেটের ওপর ঝরে পড়ল।

মেজর দেওয়াল ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন, দু'বার যন্ত্রণায় বসেও পড়লেন, কিন্তু পেছনে আর ফিরেও দেখলেন না একবার। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন বিমল দাস।

আর শ্যামলের মনে হল, কাটা পা-টা অনেকখানি ফুলে গেছে বলে আজ আর টেবিলে খেতে আসেনি স্থনীতা। হয়তো দিদির মতো সে-ও উপোস করবে। উপোস করুক, কিন্তু এই কদর্য স্বার্থপরতার রূপ যে তাকে দেখতে হয়নি—সেইটুকুই অন্তত সান্ত্বনা। কিন্তু অতগুলো ভাত ফেলে উঠে পড়লেন ব্রজেনবাবু? শ্যামলের মনের ভেতরটা জলতে লাগল। তার চাইতে যদি তাকে—

ছিঃ ছিঃ!

দুপুর গড়িয়ে চলল। একটু পরেই রোদ ডুববে—আবার আসবে কৃষ্ণপক্ষের রাত। আবার বাড়ীটাকে ঘিরে ঘিরে কৈলাসের মৃত্যু দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক ছড়াবে। 'গোধূলি'তে একটি ল্যাম্পও জলবে কিনা সন্দেহ, কারণ কেরোসিন ফুরিয়ে এসেছে। আর শ্মশানের মতো এই শূন্য পরিবেশ, ঘরে যখন অন্ধকার এসে জমা হবে—তখন তার সঙ্গে দু'জন মানুষের মস্তিষ্কেও এক আদিম অন্ধকার ছড়িয়ে যাবে।

দু'জনের ? শ্যামল ঠিক জানে না। সুনীতাও কি এই দলে ?

অসহ্য বোধ হল। বাইরে বেরিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল উঁচু পাহাড়টাকে। দুপুরটা বাজে ভাবনায় কাটিয়ে আর রিলিফের অসম্ভব আশায় বসে না থেকে চেষ্টা করে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এখন কি সুবিধে হবে, বেলা তো গড়িয়ে এল। বাড়ীর ভেতর থেকে ওদিকে বিশ্রী চীৎকার। কী হল আবার ? জোর পায়ে শ্যামল ফিরল।

একটা কুশ্রী কলহের আওয়াজ উঠেছে অনীতার ঘরে। অনীতা তীক্ষ্ণ স্বরে : কী হচ্ছে—কী হচ্ছে এসব ?

—ভালোই হচ্ছে। আমাকে বাধা দেবে না বলে দিচ্ছি।

—বাধা আমি দেবই। এ-সব পাগলামি চলবে না।

—পাগলামি কিনা আমিও বুঝব। দাও বাক্সের চাবি।

—দেব না।

—দেবে না ? অল্ রাইট—দড়াম করে একটা টিনের ট্রাঙ্ক আছড়ে পড়ল, কেঁপে উঠল দোতলাটা—যেন ল্যাণ্ডস্লাইড শুরু হয়েছে আবার। শ্যামল ছুটে এল।

অর্গ্যানটায় ঠেসান দিয়ে বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন অনীতা, আর মেজর একটার পর একটা ট্রাঙ্ক স্যুটকেস আছড়ে ফেলছেন। সারা ঘরে তাণ্ডব শুরু হয়েছে যেন।

—দাদা, এ কি !

—লুক্ শ্যামল, লুক্ অ্যাট দিস সেলফিশ ওয়োম্যান। কয়েকটা শাড়ী চাইছি—দেবে না ! মরবার সময় ওই শাড়ীগুলো আঁকড়ে নিয়ে স্বর্গের দিকে রওনা হবে। সেখানেও তো নতুন ফ্যাশান দেখানো দরকার !

এত দুঃখের মধ্যেও শ্যামল আশ্চর্য হয়ে গেল।

—শাড়ী ? শাড়ী কি হবে দাদা ?

রক্তচক্ষে মেজর বললেন, ইডিয়ট ! এই সোজা কথাটাও বোঝাতে হবে তোকে ? রোপ—উই ওয়ান্ট্ এ রোপ। সেই দড়ি ধরে নিচে নামতে হবে। উই কা'ন্ট্ ডাই লাইক হগ্স্ !

—তুমিই দেখো তো ঠাকুরপো। এইসব পাতলা সিল্ক আর সিফনের শাড়ী—

—শাট আপ !—মেজর গর্জন করলেন। তারপর প্রবলভাবে ট্রাঙ্কের তালাটাকে মুচড়ে ভাঙবার চেষ্টা করলেন তিনি। মট-মট করে শব্দ উঠল একটা।

শ্যামল বললে, কী হচ্ছে দাদা ? ক'খানা শাড়ী তুমি পাবে, আর কত বড় রোপ তৈরী হবে তা দিয়ে ? তা ছাড়া হাঁটু নিয়ে দু-পাও চলতে পারো না, কি করবে তুমি ? ছাড়ো—ছাড়ো—মিথ্যে কেন বাক্সটাকে ভাঙছ ?

বাধা দিতে এগিয়ে যেতেই মেজর বসা অবস্থাতেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গেলেন, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন শ্যামলের মুখের ওপর।

—রাস্কেল, তুই-ও ওদের দলে।

অনীতা আবার চীৎকার করে উঠলেন, শ্যামল ঠিকরে গিয়ে পড়ল দেওয়ালের গায়ে।

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইলেন মেজর।

—তোকে আমি মারলুম শ্যামল—হাত তুললুম তোর গায়ে!

পৈশাচিক স্বরে অনীতা জবাব দিলেন: তুমি সব পারো—তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

মেজর মুমূর্ষু রোগীর মতো কায়ক্লেশে উঠলেন—টলতে টলতে পড়তে পড়তে বেরিয়ে গেলেন। দোতলার বারান্দায় একটা জানলার গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথর হয়ে। নিচের ঘরে বিমল দাস কান ঢেকেই বসে ছিলেন এতক্ষণ—এইবার মৃদু পায়ে লনে নেমে গেলেন।

একটা বেঞ্চিতে বসে আছেন ব্রজেন ভৌমিক। বসে আছেন বটে, কিন্তু এখন কাল্পনিক কাউকে উদ্দেশ করে সাহায্য চাইছেন না আর।

—ও কি হচ্ছে ব্রজেনবাবু?

—গুরুগীতা। টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। সব মিথ্যে—গুরু, ভগবান—ধর্ম—সমস্ত বোগাস্। জানেন কাল সারারাত প্রার্থনা করেছি, ভগবানকে ডেকেছি, গুরুকে ডেকেছি। কেউ এল না। সব স্থইন্‌ড্‌লার—প্যাক্ অফ্ থীভ্‌স্!

বিমলবাবু একটিও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলেন না।

ওদিকে দোতলার ঘরে অনীতার মুখ খুলল।

—তোমাকে মেরেছে ঠাকুরপো? মারবেই—ও এখন আর মানুষ নেই—এখন ওর—

—চুপ করো বৌদি, কিছু লাগেনি আমার।

—চুপ করব? কেন চুপ করব? সারাদিনের অনাহার, ভয়, বিতৃষ্ণা—সব ফেটে পড়ল একসঙ্গে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো দুপাশে খুলে পড়েছে, অনীতা যেন ডাকিনীর মূর্তি ধরলেন: আমিই কিছু বলি না ঠাকুরপো—মুখ বুজে সয়ে যাই সব। আজকাল ক্লাবে প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত থাকে, বেশি ড্রিংক করে—সিঁড়িতে ক্রল করে করে ফেরে এক-এক দিন।

—বৌদি—

—বলতে দাও ঠাকুরপো, থামিয়ো না আমাকে। কিসের স্বামী? কী পেয়েছি

আমি স্বামীর কাছ থেকে? একটি সন্তান নেই, জীবনে একটা অবলম্বন নেই। আমি বুঝতে পারি ঠাকুরপো, আমাতে আর ওঁর মন নেই। কেন কর্নেল দেশপাণ্ডের মেয়েটা ঘন ঘন আমাদের কোয়ার্টারে আসে—আমি বুঝতে পারি না? তাকে বাংলা শেখাবার নাম করে—

—বৌদি, দিস্ ইজ টু মাচ!—শ্যামলের হাত পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল। যে কথাগুলো অনীতার অবচেতন মনে এতদিন হয়তো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেত—সন্তানহীনতার যে বেদনা স্বামীর ওপর অসীম মমতার মধ্যে তিনি তলিয়ে দিয়েছিলেন, আজকের এই অস্বাভাবিকতার ভেতরে, নিরুপায় অন্তর্জ্বালায় তা ফণাধরা সাপের মতো বেরিয়ে এসেছে।

—কিসের টু মাচ? একটাও মিথ্যে বলেছি আমি? ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই পারো। আমি জানি না, দেশপাণ্ডের মেয়ে মঞ্জরীর হাসিটা ওর এত মিষ্টি লাগে কেন? বুঝতে পারি না—কেন মঞ্জরীর সঙ্গে টেনিস খেলায় উনি পার্টনার হন?

(মঞ্জরীকে নিয়ে এতদিন শুধু কৌতুক চলত স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে। কতদিন অনীতা হেসে বলেছেন: 'এবার কি আমার পালা ফুরালো? তা হলে একদিন শুভ লগ্নে বরণ করে আনো—সংসারের ভার বুঝিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নিই।'

উত্তরে স্বামী হেসে বলতেন, 'আমার মতলব অন্য রকম। ইচ্ছে করে তোমার সতীন জুটিয়ে ঘরে চুলোচুলি দেখি—পরীক্ষা করি মেয়েলী গালাগাল মারাঠী না বাংলায় জমে ভালো।' তারপর নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন: 'কিন্তু সে স্বপ্ন কি আর সফল হবে? এই পাষণ্ড সরকার হিন্দু ম্যারেজের নতুন আইন পাস করে আমাদের সনাতন ধর্মের এমন মনোরম প্রথাটি একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে।'

দেবচরিত্র স্বামীকে স্ত্রী জানতেন। দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'তা হলে আমাকে ডিভোর্স করো, তোমার পথের কাঁটা পরিষ্কার হয়ে যায়।'

স্ত্রীকে আদর করে স্বামী বলতেন, 'হায়—হায়! ডিভোর্স করবার জন্যে তোমার কতগুলো খুঁত তা হলে আমায় খুঁজে বের করতে হয় যে! আমি যে তার একটাও দেখতে পাই না!'

যেন একটা মর্মাঘাতী আঘাত করতে চান স্বামীকে—যেন প্রবল প্রচণ্ড একটা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চান, এইভাবে প্রেতিনীর স্বরে অনীতা বলে চললেন, ভদ্রলোক, কালচার্ড, মিলিটারীর মেজর! বাইরে থেকেই ফিটফাট দেখতে পাও ঠাকুরপো, কিন্তু জানো না তো—আসলে কত বড় একটা ডাস্টবিন নিয়ে আমি ঘর করছি।

সোফার ওপর আছড়ে পড়লেন অনীতা, তলিয়ে গেলেন কান্নার অসীম সমুদ্রে। আর বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রত্যেকটা কথা শুনতে পেলেন মেজর, কিন্তু একটারও প্রতিবাদ করলেন না।

রিলিফ এল না।

কিন্তু আবার সেই রাত এল, তারায় ঝলমল করল আকাশ, বৃশ্চিক রাশি তার বিষাক্ত হিংস্র পুচ্ছ ছড়িয়ে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল 'গোধূলি'র দিকে। শুধু একতলা দোতলায় দুটি মাত্র আলো জ্বলল। আজ আর লাউঞ্জে গল্প জমল না—যে যার ঘরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

তবু একমাত্র নড়ে-চড়ে বেড়ালেন অনীতাই। আশ্চর্য কঠোর মুখ নিয়ে, অসাধারণ ভাবে স্থির হয়ে তিনি চাল সেদ্ধ করলেন খানিকটা। ওরই মধ্য থেকে একমুঠো বাঁচাতে হল—কাল অন্তত যদি এক গ্রাস করেও সকলকে দেওয়া যায়!

ক্ষিদেয়-তেষ্টায় নাড়ীগুলো জ্বলছে। কিন্তু ভাতের দিকে তাকিয়ে তবু তাঁর স্বামী-দেবর-শ্বশুর-বোনের কথা মনে পড়ল। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ল সুনীতাকে। কী কুক্ষণেই ওকে তিনি টেনে এনেছেন এখানে। শ্যামলের সঙ্গে বিয়ে দিতে? কী এমন সুপাত্র যে মেয়েটাকে ওর গলায় ঝুলিয়ে না দিলেই চলছিল না? অধ্যাপক? বাংলা দেশে অধ্যাপকের অভাব নেই। ভালো ছেলে? কাউকে বিশ্বাস নেই—ও তো মেজর নির্মল দাসেরই আপন ভাই! দু'দিন পরেই সুনীতাকে আর মনে করবে না, তখন কোনো মঞ্জরীর পেছনেই ছুটতে আরম্ভ করবে।

যদি কোনো মতে সুনীতা বাঁচতে পারে—তা হলে শ্যামলের হাত থেকেও অন্তত রক্ষা পাবে সে। মরুক—মরুক—এ বাড়ীর সবাই মরুক। কারো জন্যে তাঁর কোনো মায়া নেই! বুড়ো শ্বশুরকে তিনি এতদিন শ্রদ্ধা করে এসেছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন সব সমান—সবাই এক দলের।

হাঁড়ির গরম ভাতের গন্ধে সারা শরীর তাঁর জ্বালা করছিল। তবু অনীতা উঠলেন, দাঁতে দাঁত চেপে টেবিল সাজালেন। তারপর একটা প্লেটে খানিকটা ভাত আর নুন নিয়ে আগে গেলেন সুনীতার ঘরে।

—সুনী—বলতে গিয়ে অনীতার গলা ধরে এল: আজ আর কিছু নেই, শুধু নুন দিয়ে ভাত ক'টা—

জানলায় মাথা রেখে বসে ছিল সুনীতা। বাইরের তারার আলোয় একটা

ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

—আজ আর আলো নেই সুনী, অন্ধকারেই খেয়ে নে।

—আমার খিদে নেই দিদি।

—সেটা কাল থেকে বলিস।—অনীতার ঠোঁটে বাঁকা কঠোর হাসি দেখা দিল: তখন খিদে থাকলেও কোনো খাবার জুটবে না। আজ যা পাস, খেয়ে নে।

আর কথা বাড়ালেন না। অন্ধকারে সিঁড়ি ধরে ধরে নেমে গেলেন নিচে। যাওয়ার আগে একবার শ্যামলের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে গেলেন: ঠাকুরপো, খাবে এসো।

আবার খাবার টেবিলে জড়ো হলেন চারজন। নির্লজ্জভাবে ব্রজেন ভৌমিকও এসে টেবিলে বসলেন। তাঁর দিকে একটা উগ্র ক্ষিপ্ত দৃষ্টি ফেললেন মেজর। কেউ তা লক্ষ্য করল না, ব্রজেনবাবু তো ননই।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে ব্রজেনবাবু বললেন, কারীর গন্ধ পাচ্ছিলুম—বিরিয়ানীও তো রান্না হচ্ছিল। কোথায় সে-সব?

—খান ভৌমিক মশাই—আবছা গলায় বিমলবাবু বললেন, ওসব পরে হবে।

—পরে হবে কেন?—উদ্‌ভ্রান্ত চোখে ব্রজেনবাবু বললেন, এখুনি দরকার যে। ভারী খিদে পেয়েছে আমার। তা ছাড়া পুডিংটাই বা কোথায় গেল?

চিৎকার করে উঠলেন মেজর: মশাই, খাবেন তো খান—নইলে উঠে যান এখান থেকে। পাগলামিরও একটা মাত্রা আছে মনে রাখবেন—সব সময় সেটা ভালো লাগে না।

—ও বাবা, একেবারে মিলিটারী মেজাজ যে।—শিশুর মতো একটি সরল অকৃত্রিম হাসিতে ব্রজেনবাবুর মুখ ভরে উঠল: কিন্তু শুধু ভাত কি খাওয়া যায়? ও বৌমা, অমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কারীটা অন্তত আনো।

—গেট্ আউট—মেজর গর্জন করলেন আবার।

—নির্মল—তুমি—

কিন্তু বিমলবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না। বাপের দিকে দুটো রক্তচক্ষু মেলে তেমনি চিৎকার করে বললেন, শাট্ আপ ইউ ওল্ড্ ফুল! বুড়ো হয়েছেন—রিটায়ার করেছেন—রিমেন কোয়ায়েট! সব ব্যাপারে কথা কইতে যাবেন না!

বিমলবাবুর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল। দুই ছেলেকে নিয়ে এতদিন গর্ব করতেন তিনি। বলতেন, 'অনেক তপস্যা ক'রে মানুষ এমন সন্তান লাভ করে।'

শ্যামল বললে, দাদা!

—শাট্ আপ—শাট্ আপ! ইউ ক্র্যাশ্ ইডিয়ট্!

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সেই ব্রজেনবাবু নিশ্চিন্তে খেয়ে উঠলেন। সকলের প্লেটের দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ধীরে ধীরে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় গুন গুন করে গাইতে গাইতে চললেন, 'আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে নিয়ে এই হাসি রূপ গান।'

তবুও প্লেটে ভাত পড়ে রইল না কারো। অনীতা দেখলেন একটি দানাও ফেলে গেলেন না কেউ।

শ্যামল নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল, দেশলাইয়ে আর কাঠি নেই। সিগারেট যে ক'টা আছে, হিসেব করে দু-একটা করে খেলে কাল-পরশু পর্যন্ত কুলিয়ে যাবে। কিন্তু আপাতত একটু আগুন দরকার।

রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে ধীরে ধীরে এল রান্নাঘরের দিকে। পুরু কার্পেটের ওপর জুতোর শব্দ হল না বলেই দেখতে পেলো শ্যামল। আর দেখেই দাঁড়িয়ে গেল দোরগোড়ায়।

রান্নাঘরের মেঝেতে উবুড় হয়ে শুয়ে আছেন অনীতা। কিন্তু আজ তাঁর ফিট হয় নি—অন্ধকারে বাইরে কৈলাসের ছায়ামূর্তি দেখতে পাননি। শ্যামল দেখল, রান্নাঘরের দু-তিনটি ছোট ছোট গর্তে ভাতের যে ময়লা ফ্যান জমে আছে, অনীতা তাই চেটে চেটে খেয়ে চলেছেন। একটা বাটি পড়ে আছে পাশে, প্রথমে তাতে তুলে তুলে খেয়েছেন, যা ওঠেনি সেটা খাওয়ার জন্যে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন।

সিগারেট আর ধরানো হল না, ক্ষুধার এই কল্পনাতীত চেহারা দেখে শ্যামল পাথর হয়ে গেল। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল—তেমনি নিঃশব্দ পায়েই ফিরে গেল সে।

আর নয়—আর সহ্য করা যায় না। কাল সকালেই নদীটা পার হবার চেষ্টা করবে সে। যদি সেই মড়াটা তেমনি বীভৎসভাবে তাকিয়ে থাকে, যদি পার হতে গিয়ে নদীর স্রোতে তাকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে যায়, সেও ঢের ভালো এর চাইতে।

মনুষ্যত্বের এমন অপমান কোনোমতে মেনে নেওয়া যাবে না। না—না।

ঠিক সেই সময় নিচ থেকে প্রবলভাবে গানের আওয়াজ উঠল—নিদারুণ চমক লাগল শ্যামলের। না, সুনীতা গান গাইছে না, তার মধুঝরা কণ্ঠ এ নয়।

ভাঙা গলাটাকে যথাসম্ভব চড়িয়ে অপূর্ব জান্তব আর বিকৃত স্বর তুলেছেন স্বয়ং ব্রজেন ভৌমিক :

'ফিরে চলো আপন ঘরে,
চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মিছে
আনন্দ আজ আনন্দ রে—'

আর বিমলবাবু বলছেন : কী হচ্ছে ভৌমিক মশায়, কী কাণ্ড এসব ? উত্তরে ব্রজেনবাবু

গাইছেন :

'আকাশভরা জ্যোৎস্নাধারা,
বাতাস বহে, বাঁধন হারা—'

দ্রুত নিচে নামল শ্যামল। বেরুবার জন্যে পুরো সাজপোশাক করেছেন, একটা কম্বল ভাঁজ করে কাঁধে ফেলেছেন, সুটকেস নিয়েছেন হাতে। গলায় গান চলেছে : 'ফিরে এস আপন ঘরে—'

বিমলবাবু তাঁর বাঁ হাত চেপে ধরলেন : কোথায় যাচ্ছেন ?

—বাড়ী যাব মশাই। এখানে খাওয়ার যা কষ্ট! পোলাও কালিয়া রান্না করে শুধু একমুঠো ভাত দেন আমাকে, পেটের একটা কোণ পর্যন্ত ভরে না। এর মধ্যে থাকা যায় কখনো ? আমি চললুম।

—যাবেন কী করে ?

—কেন, লাইন ক্লীয়ার! এইমাত্র গুরুদেব এসে বললেন, ব্রজেন—ব্রীজ সারিয়ে দিয়েছি, রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছি, ওপারে তোর ল্যাণ্ডরোভার রেডি হয়েই আছে —বেরিয়ে পড়, বেড়িয়ে পড়।

—পাগলামি করবেন না ব্রজেনবাবু, ঘরে যান।

—পাগলামি কী মশাই ?—আবার গান শুরু হল : আকাশভরা জ্যোৎস্নাধারা—

—শুনুন—

—শোনবার কিছু নেই, আমাকে যেতেই হবে। গুরুদেবের হুকুম—এক মিনিটও আর দেরি করা চলবে না।

বলতে বলতে বিমলবাবুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেলেন গেটের দিকে, যেন ট্রেন ফেল করতে যাচ্ছেন এমনি একটা তাড়া। ভাঙা গলার গানের সুর শাঁকচুন্নির আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে : আপন ঘরে—আপন ঘরে—

—শ্যামল, ধর্ শিগগীর—পাগল হয়ে গেছে লোকটা—এখুনি নদীতে পড়ে মরবে—

দোতলার বারান্দা থেকে গলা বাড়ালেন মেজর, চিৎকার করে জানালেন : মরুক মরুক, লেট্ হিম ডাই।

কিন্তু শ্যামল তাঁকে ধরে ফেলল। হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিলে, দু'হাতে জাপটে রাখল। তবু রাখা যায় না—ভদ্রলোক ক্যাপা হাতির মতো লড়তে লাগলেন, রুদ্ধশ্বাসে বলে চললেন, ছাড়ো—ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে!

তিনদিনের দাড়ি-না-কামানো মুখ, কষ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে—বিস্ফারিত চোখে পলক পড়ছে না, সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। যখন শ্যামলের হাত ছাড়িয়ে কিছুতেই যেতে পারলেন না, তখন ধপাস্ করে বসে পড়লেন মাটির ওপর।

মিনিট কয়েক একভাবে বসে রইলেন। তারপরই উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন বিমলবাবুর দিকে।

—আপনি বলেছিলেন না, আসবে? ইউ লায়ার—ড্যাম লায়ার!

এবং তৎক্ষণাৎ একটা ক্ষুধিত চিতা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিমলবাবুর উপরে: ইউ লায়ার—মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর! কোথায় রিলিফ্?—বিমলবাবুর শার্টের কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন: কোথায় রিলিফ্? বলো—নইলে আমি তোমাকে—

শ্যামল তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল কিন্তু এর মধ্যেই টলতে টলতে নেমে এসেছেন মেজর। এককালে বক্সিং শিখেছিলেন, একটা শক্ত 'আপার কাট' লোহার পিণ্ডের মতো এসে পড়লো চোয়ালে। নিঃশব্দে ব্রজেনবাবু বসে পড়লেন—তারপর শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে।

—নির্মল!

—কিছু হয়নি বাবা, হি ইজ অল্ রাইট্। নক আউটের ব্যাপার—এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবেন!—মেজর নির্মল দাসের কুশ্রী একটা পরিতৃপ্ত হাসির শব্দে শ্যামলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল।

আর বলেই নির্মল বসে পড়লেন—এবং চিৎকার উঠল মুখে। চোট খাওয়া হাঁটু-টায় কোথায় যেন ঘা লেগেছে।

ব্রজেনবাবুকে ধরাধরি করে ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল বিছানায়। আবার যাতে বেরিয়ে যেতে না পারেন সেজন্যে বাইরে থেকে দরজায় তালাবন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু জানলা তো আছে। তাই দিয়েও তো লাফিয়ে পড়তে পারেন বাইরে।

মেজর হলঘরের সিঁড়িতে বসেছিলেন কঠিন মুখে। একটা উগ্র জ্বালা জ্বলছে চোখে—অক্ষম পা নিয়ে নিরুপায় যন্ত্রণায় তাঁর মন জ্বলছে।

উঃ, পা যদি তাঁর অচল না হত—যদি একটু ভালো করে হাঁটতে পারতেন!

নির্মল বললেন, আমি পাহারা দিচ্ছি। অন্ গার্ড, কাউকে কিছু ভাবতে হবে না—যান, শুয়ে পড়ুন আপনারা।

সারা বাড়ীটা আবার সেই যন্ত্রণাভরা স্তব্ধতার মধ্যে ডুব মারল।

ঘুমোবার মতো অবস্থা কারো নয়—খিদে, আতঙ্ক আর বিতৃষ্ণার মধ্যে তবুও শ্যামলের খানিকটা ঝিমুনি এসেছিল। তার মধ্যেও স্বপ্ন দেখছিল, এ বাড়ীর প্রত্যেকটা মানুষ যেন ব্রজেনবাবুর মতো পাগল হয়ে গেছে, এ ওকে আক্রমণ করছে—খিদের জ্বালায় পরস্পরের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সে নিজে আক্রমণ করেছে

সুনীতাকে—একটা ফুলের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে থরথর ক'রে কাঁপছে সুনীতা, আর একটা ধারালো ছুরি বাগিয়ে বলছে : পালাবে কোথায়—আমার হাত থেকে আজ কিছুতে তোমার নিস্তার নেই !

এই শীতের মধ্যে ঘামে স্নান করে জেগে উঠল শ্যামল।

ক্যানিবালিজ্‌ম ! আদিম মানুষের সেই আদিম ইচ্ছা ! মরে যায়নি। অন্ধকারে শ্যামলের মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠতে চাইল। কিছুই হারায় নি—সব আছে। সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। এক-একটা আগ্নেয়গিরি যেমন হাজার হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকে—তার শান্ত ক্রেটারের চারদিক ঘিরে ঘিরে মাটির শ্যামলতা দেখা দেয়, ফুল ফোটে, তার পায়ের কাছে নির্ভয়ে বাসা বাঁধে মানুষ ; তারপর একদিন ধুমিয়ে ওঠে—আগুনের জিভ মেলে দেয় আকাশের দিকে—হাজার বজ্রের গর্জনে ফেটে পড়ে বইয়ে দেয় মৃত্যুর স্রোত, মানুষের ভেতরটাও ওই রকম। সমস্ত আবরণ সরিয়ে—সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞানকে ছেঁড়া জামার মতো টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে একদিন রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে দেখা দেয় সে।

টুক টুক করে একটা আওয়াজ উঠল। উৎকর্ণ হল শ্যামল। কিসের শব্দ ?

তারই দরজায়। কে যেন সাবধানে টোকা দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, এরই মধ্যে কি ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়েছে কেউ ? একটা প্রবল চিৎকারকে সামলে নিয়ে অবরুদ্ধ গলায় শ্যামল বললে, কে—কে ওখানে ?

চাপা ভীরু গলায় আওয়াজ এল : আমি সুনীতা।

সুনীতা ? এত রাতে ? টেবিলের উপর রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা জ্বলছে। রাত আড়াইটে।

—দরজা খোলা আছে, আসুন—

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সুনীতা ঘরে ঢুকল। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

—কী হয়েছে ? ভয় পেয়েছেন ?

কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটা এতক্ষণ বোধ হয় মেঘের আড়ালে চাপা ছিল—আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। সেটা শ্যামলের কাচের জানলাটাকে লালচে আভায় রাঙিয়ে দিয়ে তার আলোটা সুনীতার মুখে গিয়ে পড়ল। ব্রোঞ্জের তৈরী প্রতিমার মতো দেখালো তাকে।

—না, ভয় পাইনি। তেমনি ক্লান্ত বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সুনীতা একটা প্লেট রাখল টেবিলের ওপর।

—এইটে খেয়ে নিন।

—খেয়ে নেব ? বিস্ময়ের অবধি রইল না : কী এ ?

—ভাত।

ভাতই বটে। কাচের জানলা-রাঙানো লাল আলোয় একমুঠো সোনার মতো জলছে।

—কোথায় পেলেন?

সুনীতা একপাশে মুখ ফিরিয়ে নিলে, কানের একটি ছোট সোনার রিং, গলার একগাছা সরু হার চিক্ চিক্ করতে লাগল, শাড়ীর জরিপাড়টা জলতে লাগল। সব মিলে একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ অবাস্তব স্বপ্নের মতো মনে হল তাকে।

—দিদি দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় নিঃশব্দ স্বরে সুনীতা বললে, কিন্তু আমার একেবারে খিদে ছিল না, শরীরটাও ভালো নেই। অথচ সকাল থেকে আপনাদের কারোই তো বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয়নি—দেখলুম এটা নষ্ট হচ্ছে—তাই—

সুনীতা চুপ করে গেল আর শ্যামল একভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এক মুহূর্তে মনে হল একটু আগেই যা সে ভাবছিল, তার সবটাই তো সত্য নয়। সমস্ত মৃত্যুভয় সব আতঙ্ক সব হতাশার ভেতরেও যা হার মানে না সে প্রেম! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বড়ো আত্মত্যাগ করবার শক্তি তারই আছে—সেই প্রেমই মনে করিয়ে দেয়: মানুষ শুধু স্বার্থ-লোভ-বাসনা-বিকৃতির একটা মাংসপিণ্ডই নয়। অনেক বেশি, অনেক বড়ো তার চাইতে!

লাল আলোয় ব্রোঞ্জের প্রতিমাটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। যে প্রতিমা চিরকালের কবির স্বপ্ন অথচ স্বপ্নের চেয়ে যা অনেক বড়ো।

শ্যামল উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে সুনীতাকে টেনে নিলে বুকের ভেতর। ছায়ার মতো লঘু, অপরূপ কোমল একটা শরীর তার বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপতে লাগল। রুক্ষ চুল থেকে একটা মৃদু সৌরভ শ্যামলের সমস্ত অনুভবের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল নেশার মতো।

—তুমি আমাকে ভালোবাসো সুনী?

ছায়াশরীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো জবাব এল: জানি না।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয় প্লেটের সেই একমুঠো ভাত সোনা হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় নিচের ঘরে বিমল দাস তাঁর টেবিল-ল্যাম্পটি জেলে চিঠি লিখছিলেন একখানা।

'আমি জানি, আমাদের এই দুর্গতি চিরকাল থাকবে না। কাল হোক, পরশু হোক—সত্যিই রিলিফ্ আসবে। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না। সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলুম—জীবনে কোন অভিযোগ ছিল না—কোথাও কোনো অতৃপ্তি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দেখতে পাচ্ছি, সব অন্য রকম হয়ে

গেছে। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব—কোনো কিছুর মূল্য নেই কোথাও। একটা বীভৎস বিকৃতি ফুঁসে উঠছে, প্রত্যেক মুহূর্তে! কাল কী হবে' জানি না। হয়তো এই বিকার আরো ফেনিয়ে উঠবে, হয়তো কদর্যতার সীমা থাকবে না—হয়তো ব্রজেনবাবুর মতো নির্মলও পাগল হয়ে যাবে—হয়তো শ্যামল কিংবা বৌমা পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে। আমি আর তা দেখতে চাই না। তার আগেই—'

বিমলবাবু একবার দেওয়ালের দিকে তাকালেন। স্ত্রীর ছবি সেখানে। কুড়ি বছর আগে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। তারপর ছবির দিকে চোখ রেখেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন ঘুমের ওষুধের শিশিটা। ডাক্তার বলেছিলেন, একটা-দুটোর বেশি কখনো খাবেন না—মাত্রা বেশি হলে নার্ভগুলো চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়বে।

বিমলবাবু স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

—হ্যাঁ, ঘুমোবার সময় এসে গেছে আমার। তোমার কাছে একটু পরেই আমি পৌঁছুব। তার আগে চিঠিটা শেষ করতে দাও।—

কলমটা তুলে নিলেন আবার।

ওপরের ঘরে সুনীতার রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে শ্যামল বললে, সুনী!

—বলো।

—ভাতটা বরং দিয়ে আসি বৌদিকে।

—তুমি খাবে না?

—আমার তো কিছু জুটেছে, কিন্তু বৌদির খাওয়াই হয়নি। একবেলাও না।

শঙ্কিত চোখ তুলে সুনীতা তাকালো: সত্যি? দিদি খায়নি?

—না।—শ্যামলের চোখে জল এল: নিজে যা দেখেছি তাও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। বৌদি রান্নাঘরের মেজেয় শুয়ে গর্তের ভেতর থেকে চেটে চেটে ফ্যান খাচ্ছিল!

একটা আর্তনাদ করল সুনীতা, উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল, তারপরে চোখের জলে বুক ভিজে গেল শ্যামলের।

—কেঁদে কোনো লাভ নেই সুনী। এখন—

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই চিৎকার উঠল মেজরের।

শ্যামল আর সুনীতা সভয়ে কান পাতল।

—হু ইজ দেয়ার? আন্‌সার অর্‌ আই শুট্‌!

পরক্ষণেই বাড়ী কাঁপিয়ে বন্দুকের আওয়াজ উঠল পর পর দু-বার। কী একটা ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আর অনীতা ডুকরে উঠলেন তারস্বরে।

সুনীতা পড়ে যাচ্ছিল, দু-হাতে তাকে ধ'রে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে শ্যামল। বললে, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি দেখছি।

সেই সময় ঘুমের ওষুধের শিশিটা খুলেছিলেন বিমলবাবু। হাত থেকে খসে পড়ল সেটা। পিলগুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

দোতলার সিঁড়িতে একেবারে নীচের ধাপে বসে আছেন মেজর। বিমলবাবু ল্যাম্পটা হাতে করে বেরিয়ে এসেছিলেন, তার আলোয় দেখা গেল মেজর অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে, সেখানে গুলি লেগে ঘড়ির কাচটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, দুটো কালো কালো ফুটো জ্বলজ্বল করছে তার ডায়ালে। সারাটা ঘরে বারুদের গন্ধ—খানিকটা নীল ধোঁয়া তখনো ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অনীতা—এমনভাবে স্থির হয়ে রয়েছেন যে মনে হচ্ছে পাথরে পরিণত হয়েছেন তিনি।

—এ কি কাণ্ড, নির্মল !

নির্মল জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ দুটো ঘড়িটার দিকে। যেন এখনো কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে।

—কী হয়েছে বৌমা ? বৌমা কথা বলছ না কেন ?

—আমরা সবাই পাগল হয়ে গেছি বাবা—আমরা কেউ আর মানুষ নেই ! অনীতা ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে বলে আমি ওঁকে শোবার জন্যে ডাকতে এসেছিলুম। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন উনি—তারপর দুমদুম করে গুলি ছুঁড়ে বসলেন।

এতক্ষণে কথা বললেন মেজর, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার মতো অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বরে বললেন, দে কেম্—আই স দেম্ !

—কে এসেছিল দাদা ? ব্যাকুল হয়ে শ্যামল প্রশ্ন করল : কাকে দেখলে তুমি ?

—ওয়েল, দ্যাট্ রাস্কেল কৈলাস ! মরেও নিষ্কৃতি দেবে না। পায়ের শব্দে ঘুমটা ভেঙে যেতে দেখি একটা ছায়া—ইয়েস্ আই নো দি শ্যাডো ফর দি লাস্ট টুয়েন্টি ইয়ার্স —কৈলাস ! তারপরেই দেখি রামবাহাদুর ! তখন আমায় স্ট্রাইক করল। মনে পড়ল রান্নাঘরে এখনো হয়তো কিছু চাল আছে—মে বী—দু'একটা আলু আছে। হোয়েন উই আর গোয়িং টু ডাই ইন্ স্টারভেশন, দোজ স্কাউণ্ড্রেল্‌স্ হ্যাভ কাম টু স্টীল আওয়ার লাস্ট্ মরশেল্‌স্ ! দেন আই শট।

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন বিমলবাবু, এইবারে ভেঙে পড়লেন।

—এই দেখবার জন্যেই কি এতদিন বেঁচে ছিলুম আমি ? শেষ জীবনে এই কি আমার পুরস্কার ?

বাইরে পাইন গাছে শেষরাতের বাতাস মর্মর তুলল। যেন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল একটা চাপা কুটিল হাসির তরঙ্গ। খানিক আগেই শ্যামলের ঘরে কৃষ্ণপক্ষের যে চাঁদ সুনীতাকে সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছিল, এখন কাচের ভেতর দিয়ে তার একঝলক আলো যেন রক্তের স্রোত ঢেলে দিলে বাড়ীর ভেতরে। বন্ধ-দরজা জানালার ওপর থেকে আসতে লাগল ঝিঁঝিঁর ডাক, শোনা যেতে লাগল নদীটার গর্জন। সব মিলে মনে হতে লাগল, 'গোধূলি'-র প্রতিটি মানুষকে হত্যা করবার জন্যেই বাইরে কারা যেন কতকগুলো ধারালো ছোরায় শান দিয়ে চলেছে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন মেজর। মাথাটা ঝুলে পড়ল সামনের দিকে।

—আই নো আই নো—দিজ্ আর অল্ ইলিউশ্যন্‌স্। কিন্তু এখন সব ইলিউশ্যন আমার কাছে বাস্তব হয়ে উঠছে। বন্দুকটা সরিয়ে নে শ্যামল, টেক অ্যাওয়ে দি আকসড্ গান। নিজেকে আর আমার বিশ্বাস নেই—হয়তো সুইসাইড্ করব, হয়তো খুন করে ফেলব কাউকে। নিয়ে যা ওটা—সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যা আমার—

কাউকেই সরিয়ে নিতে হল না। নিজেই দু হাতে তুলে ছুঁড়ে দিলেন। কতগুলো ভাঙা কাচের ওপর দিয়ে বিকট শব্দে সেটা আছড়ে পড়ল।

আর বন্দুকের আওয়াজেই, যাঁর এতক্ষণ সাড়া মেলেনি, এইবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ব্রজেনবাবু।

—আমাকে মেরে ফেলছে ওরা সবাই মিলে, খুন করছে আমাকে। ও লর্ড, সেভ্ মী! সেভ্ মী!

"জীবন যখন শুকায়ে যায়,
করুণাধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়—"

কেউ গাইতে বলেনি, একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে সুনীতা। ঘুমের ওষুধটা আর খাওয়া হয়নি—লাউঞ্জের ডেক-চেয়ারটায় চোখ বুজে শুয়ে আছেন বিমল বাবু—দু গাল বেয়ে জল পড়ছে তাঁর। অনীতার রুক্ষ দু'চোখে আগুন জ্বলছে—চেয়ে আছেন বাইরের দিকে—যেন ভেতরের সমস্ত জ্বালা চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মেজর বসছেন, উঠছেন, চলতে চেষ্টা করছেন, আবার বসছেন। তাঁর সর্বাঙ্গে চিড়িয়া-খানার খাঁচায় ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের অস্থিরতা। আর শ্যামলের মনে হচ্ছে, ভোর হোক—শুধু আলো ফুটুক একবার। যে শক্তি সুনীতা তাকে দিয়েছে, তার জোরে আর সে ভয় করবে না। ওই নদীটা সে পেরিয়ে যাবে। খাবার আনবে—এতগুলি মানুষকে

বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে।

কোথাও দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা—তাকে উদ্ধার করবার জন্যে—রাজপুত্র কত দেশ-দেশান্তর—দূর-দূরান্তে পাড়ি দিয়ে চলে গেছে—রক্তের সমুদ্র তাকে ঠেকাতে পারেনি—পায়ের তলায় জাদুর পাহাড় গুঁড়িয়ে গেছে, হাতের তলোয়ারে উড়ে গেছে রাক্ষসের মাথা—কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনি।

রূপকথা? রোমান্স? কিন্তু সবটাই তো গল্প নয়! মানুষ এর ভেতর দিয়ে বার বার বলেছে, যেখানে প্রেম, সেখানে পরাজয় নেই; যেখানেই প্রেম—সেখানে অফুরন্ত শক্তির চিরকালের উৎস।

"বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়—"

সুনীতা গাইছে। গলা চড়িয়ে নয়—একটা ক্লান্ত মৃদু গুঞ্জনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তার সুর—যেন মা সস্নেহে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন ক'টি চঞ্চল ছেলেমানুষকে শান্ত করবার জন্যে! কিন্তু শ্যামল সেই শিশুদের দলে নয়।

আবার সে ঘরের সব ক'টি মানুষের দিকে চেয়ে দেখল। এক সুনীতা ছাড়া—কিন্তু সুনীতার মুখেও কি ছায়া পড়েনি? সব যেন এক নিরুপায় বন্দী-শিবিরের শিকার। আশা আনন্দ বিশ্বাস সব লুপ্ত হয়ে গেছে—লোহার গরাদের মধ্য দিয়ে চেয়ে আছে এক সুদূর বর্ণহীন ধূসর দিগন্তের দিকে, কোনো ভবিষ্যৎ অবশিষ্ট নেই আর:

**"The prisoners
Turned massive with their vaults and
dark with dark!"**

আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের ভেতরে স্টিফেন্ স্পেণ্ডারের লাইনগুলো একদল উজ্জ্বল পতঙ্গের মতো উড়ে এল:

**"Their time is almost Death.
The silted flow of years on years
Is marked by dawns
As faint as cracks on mudflats of despair—"**

হ্যাঁ, আবার সকাল আসছে। সাদা হয়ে আসছে বাইরের আকাশ। কিন্তু কী সেই অসহ্য দিন—কী তার দুঃসহ যন্ত্রণা—কী ভয়ঙ্কর তার স্নায়ু বিদীর্ণ করা প্রত্যেকটি মুহূর্ত।

**"Then when I raise my hands to strike.
It is too late.**

There are no chains that fall

No visionary liquid door

Melted with anger—"

"It is too late" ?—না ! অধ্যাপক যখন দিনের পর দিন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে তখন বুঝেছেন এই কবিতা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এক পরম দুর্ভাগ্যময় বন্দীত্বের কাহিনী। চিরকাল ধরে তারা জীবনের অন্ধ কারাগারের বাসিন্দা, তাদের মুক্তি কোথাও নেই, যুগ-যুগান্তর ধরে বন্দীশালার বিষাক্ত জঠরে তারা জীর্ণ হয়ে গেছে—এমন কি বন্দীত্বের যন্ত্রণা উপলব্ধি করবার মতো শক্তি পর্যন্ত তাদের নেই। **"But pity for the grief they, cannot feel—"**

কিন্তু এ তো তা নয়। 'গোধূলি'র প্রতিটি মানুষ এই বন্দীত্বের যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে —সব ভেঙে হিংস্রভাবে বেরিয়ে আসতে চাইছে, পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে আদিম জিঘাংসায়। **"It is too late"** ?

উপোস করে মানুষ কি থাকতে পারে না ? পারে। একদিন—দুদিন—পাঁচদিন —সাতদিন—হয়তো আরো বেশি।

কিন্তু ক্ষুধার চাইতে বড়ো হয়ে উঠছে আতঙ্ক—সব চাইতে বিকৃত হয়ে উঠছে মানুষে মানুষে এতদিনের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মূল্য—যে আদিমতার কাছ থেকে সমাজ-দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞানের শক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে বেরিয়ে এসেছিল, সেই আদিমতাই তার সব ক'টি নখদন্ত মেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই যে দানবিক স্বপ্নটা সে দেখছিল, সে তো আর কিছু নয়—তার আত্মার অন্ধকার থেকে উঠে আসা সেই প্রাগৈতিহাসিক সত্তারই ক্ষুধা !

শুধু সুনীতাই আশা ছাড়েনি এখনো। বয়েস তার অল্প—ভালোবাসা তার বুকে আলো হয়ে জ্বলছে। তাই এখনো সে গেয়ে চলেছে :

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়—"

এক ফাঁকে অনীতা কখন উঠে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একরাশ শাড়ী নিয়ে। সেগুলো ছুঁড়ে দিলেন মেজরের গায়ের ওপর। সুনীতার গান বন্ধ হল, বিমলবাবু চকিত হয়ে উঠলেন।

—এসব কাপড়-চোপড় আনলে কেন বৌমা ? কী হবে এ দিয়ে ?

দাঁতে দাঁত ঘষে অনীতা বললেন, উনি দড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

—ড্যাম ইট্—

কাপড়গুলোকে লাথি মারলেন মেজর। সারা ঘরময় ছড়িয়ে গেল তারা। বললেন,

দড়ি করে করে গলায় পরো তুমি !

বাইরের আকাশে সকালের রঙ পড়ল। পাইন গাছের মাথায় কাকের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে—তাদের কোনো ভাবনা নেই। নদীর ওপর ব্রীজ না থাকলেও তারা পার হয়ে যেতে পারে—তাদের খাবারের কোনোদিন অভাব হয় না।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মেজর : মাই গান !

—বন্দুক দিয়ে কী হবে দাদা ?

—কয়েকটা কাক মারব। আগুনে পুড়িয়ে ওদের মাংস তো খাওয়া যায়।

—দাদা—শান্ত হও। লেট আস্ সী—

মেজর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—অল্ রাইট, সী ! বাট্ ইউ উইল সী নাথিং। সব ফাঁকা—এভ্রিথিং ইজ ব্ল্যাঙ্ক ! হিয়ার ইজ এ লেম ম্যান—ডায়িং লাইক্ অ্যান্ ইডিয়ট—হা-হা-হা !

এতক্ষণ লাউঞ্জের টেবিলে বিমলবাবুর ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তেল পুড়ে যে অপচয় হচ্ছে সে-কথা খেয়ালই ছিল না কারো। এইবার সকালের আলোয় সাদা হতে হতে তার শিখাটা দপদপ করে নিবে গেল। পোড়া কেরোসিনের গন্ধে আবিল হয়ে উঠল ঘরের বদ্ধ বাতাস।

লনে আলো পড়েছে। আড়মোড়া ভেঙে দরজা খুলে বাইরে বেবিয়ে এল শ্যামল।

আর একটা দিন সামনে। আর একটা ভয়ঙ্কর দিন।

না, হার মানা যায় না।

ক'দিন তারা এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে ? এক দিন—দু দিন—তিন দিন ? এর চেয়ে অনেক বেশি দিন মানুষ না খেয়ে বাঁচতে পারে। একটা বাস্তব কাহিনী মনে এল শ্যামলের। যুদ্ধ-সীমান্তের এক গ্রাম। পুড়ে গেছে—ধ্বংস হয়ে গেছে—তার ওপর প্রচণ্ড শীত আর প্রবল তুষার—যে ক'টি মানুষ বেঁচে ছিল, এক দানা খাদ্য জোটেনি তাদের। তবু প্রায় দু'মাস পরে যখন মুক্তিফৌজ সেখানে পৌঁছুল, তখনো কয়েকটি নরকঙ্কালে প্রাণের স্পন্দন—তখনো পোড়া ঘরের ধ্বংসস্তূপে শিশুর কান্না !

মানুষ বাঁচতে জানে।

মৃত্যু অনাহারে নয়—মৃত্যু ভয়ে। সেই ভয় গোধূলির প্রত্যেককে পেয়ে বসেছে—হয়তো কাল থেকে সুনীতাও তার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তখন সেই স্বপ্নটাই সত্য হয়ে উঠবে। তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাংস ছিঁড়ে খেতে চাইবে—প্রত্যেকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে সেই আদিম—চিরকাল ধরে যাকে শাসন করাই সবচেয়ে বড়ো সাধনা।

হার মানব না !

না—না।

কালকের রাত আমাকে শক্তি দিয়েছে, সুনীতার সেই একমুঠো ভাত আমাকে নতুন করে লড়বার জোর দিয়েছে। মানুষ মেরু পার হয়—সমুদ্র ছাড়িয়ে যায়, জয় করে সাহারা, পাড়ি দেয় আফ্রিকার ভয়ালতম অরণ্যে। একটা পাহাড়ী নদী আমি পার হতে পারবো না?

দুই মৃত্যু দু দিকে প্রতিহারী। আমি জয় করব, আমি অতিক্রম করব। আমাকে যেতেই হবে। ওই নদীটি পার হয়ে চলে যাব গঞ্জে—গ্রামে—যেখানে খাবার পাওয়া যাবে—সাহায্য পাওয়া যাবে—যেখানে মানুষ আছে সেখানে। আমি হারব না, আমি ফিরব না।

যদি মরতে হয়?

তিলে তিলে আত্মার মৃত্যুর চাইতে তা ঢের ভালো।

সকালের রোদ উঠেছে পাহাড়ে। প্রসন্ন শরৎ দিকে দিকে। ফালুটের নীলাঞ্জন। তেমনি করে শানাই ফুলের সারি, তেমনিভাবে কাশ দুলছে, যেন কোথাও কিছু হয়নি। শুধু একটা ধ্বংসের দাগ তাকিয়ে আছে এখানে ওখানে। কিন্তু দু-দিন পরেই পাহাড়ের কাছে আজকের দুঃখস্বপ্ন স্মৃতি হয়ে যাবে, ক্ষতচিহ্নগুলোর উপর শ্যাওলা জমবে, মাথা তুলবে নতুন গাছপালা। গোধূলির মানুষগুলোর কাছেও আজকের বীভৎস দুর্দিন এমনি করেই হারিয়ে যাবে অতলে।

কিন্তু যাবে কি করে?

তবু চেষ্টা করতে হবে শ্যামলকে। শরৎ জয়যাত্রার ঋতু। যেতেই হবে।

সাঁকোটা তেমনি ঝুলছে ত্রিশূন্যে। নদীর ক্ষ্যাপামি এখন অনেক শান্ত—তবু ফেনায় ফেনায় কী তার পাগলামো—পাথরে পাথরে কী তার গর্জন। সেই মড়াটাকে আর চোখে পড়ল না—স্রোতে তাকে কখন যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সে নেই, কিন্তু—পার হওয়া যাবে? যাওয়া যাবে একটা থেকে আর এক পাথরে? ভাববার সময় নেই, হোক শেষ চেষ্টা, তাকে করতেই হবে।

শ্যামল পা বাড়ালো।

হু আর ইউ? ওয়াণ্ট টু ডাই?

দৈববাণী নয়—ব্রজেন ভৌমিকের মতো মনোবিকার নয়—মানুষের গলা। গোধূলির বাইরেও যে মানুষ আছে তাদের গলা! শ্যামল পাথর হয়ে গেল।

—হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?

নদীর ওপারে সাত-আটটি মানুষ দেখা দিয়েছে। দুজনের অফিসারের ইউনিফর্ম, বাকী দুজনের সঙ্গে নানারকম বাক্স আর জিনিসপত্র।

শ্যামল জবাব দিতে পারল না।

ওপার থেকে আবার প্রশ্ন এল : দিস্ ইজ গবর্ণমেণ্ট রিলিফ। হু আর ইউ? হোয়াট আর ইউ ডুয়িং স্যার?

—ট্রায়িং টু ক্রস্ দি স্ট্রীম। উই আর স্ট্র্যাণ্ডেড ওভার দেয়ার। নো ফুড—নো ফুয়েল্।

—ওয়েট্—ওয়েট্। উই হ্যাভ কাম! অ্যানাদার ফিফটিন মিনিট্, প্লীজ। মেকিং এ ব্রিজ উইথ প্ল্যাঙ্কস্—ওয়েট্—ওয়েট্—শ্যামল বসে পড়ল পাথরের ওপর।

পনেরো মিনিট নয়, প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল দড়ি আর কাঠ বেঁধে সাঁকো তৈরী করতে। অভ্যস্ত কৌশলে পাথরের সঙ্গে কাঠ আটকে গড়ে ফেলল তারা। তারপর—তারপর সেই রিলিফ এসে পৌছুল গোধূলিতে।

শুধু ব্রজেনবাবু তাঁর বন্ধ ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, তা ছাড়া 'গোধূলি'র সবাই বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। অনীতা টলতে টলতে বসে পড়লেন, মেজর সোজা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, নিঃশব্দ মন্ত্র উচ্চারণের মতো থর থর করে কাঁপতে লাগল বিমলবাবুর ঠোঁট।

আর শ্যামল দেখল, প্রথম সূর্যের সবটুকু আলো যেন সুনীতার ক্লান্ত সুন্দর মুখখানার উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে এসে।

প্রেম॥

ঘূর্ণি

ঘূর্ণি

১ ॥

অনেক দূরের গ্রাম থেকে বিয়ে করে এনেছিল কালাচাঁদ। বউ যমুনা তখনও কিছু জানত না।

বাবরী চুল ষণ্ডা মানুষটাকে দেখে তার ভালোই লেগেছিল। মস্ত ছাতি—মোষের মতো চওড়া কাঁধ। গায়ের কুচকুচে কালো রঙ রোদ পড়লে যেন উজ্‌লে উজ্‌লে ওঠে। আর কী অসম্ভব শক্তি তার শরীরে! একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তিনমণী ধানের বস্তাটাকে কতদূরে ছিটকে দিলে!

এমন জোয়ান, অথচ মুখখানা ঠিক বারো বছরের ছেলের মতো। শান্ত আর কোমল। হাসলে ভারী লাজুক মনে হয়। যমুনা খুশি হয়েছিল। সরল মানুষটি প্রাণভরে তাকে ভালোবাসবে—আপদ-বিপদের দিন এলে লোহার মতো চওড়া বুকের ভেতরে ছোট্ট একটা পাখির মতো লুকিয়ে রাখবে—বলবে, আমি আছি—ভাবনা কী।

আসবার দিন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল বুড়ো বাপ।

—তোর মা নেই যমুনা, এইটুকু বয়েস থেকে তোকে বড় করে তুলেছিলুম। আজ তুই দূর দেশে চলে যাচ্ছিস, বছরে একবারও তোকে দেখতে পাব না। কী নিয়ে আমি বাঁচব বল দিকি?

যমুনা কিছু বলতে পারেনি। চোখের জলে গলার স্বর থমকে গিয়েছিল।

কালাচাঁদ বলেছিল, তুমি ভেবো না মোড়ল। দু-চার মাস বাদ একবার করে তোমার মেয়েকে আমি দেখিয়ে নিয়ে যাব।

—কথা দাও।

—কথা দিচ্ছি।

বুড়ো মোড়ল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সময় পেলো না। নোঙর আগেই তুলে ফেলেছিল কালাচাঁদ, এবার একটা খোঁচ দিলে লগিতে। পদ্মার স্রোতে ছোট্ট একটা দুলুনি খেয়ে নৌকো ছুটল তীরের মতো। পড়ে রইল ভাঙনের মুখে হেলে-পড়া মন্দিরটা, দেখতে দেখতে মিলিয়ে এল গ্রামের চিহ্ন—কখন ছাড়িয়ে গেল শ্মশানটা। নৌকো চলল।

কালাচাঁদ বৈঠা ধরে বসেছিল। যমুনার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলে, ভয় করছে তোমার?

লাল শাড়ীর ঘোমটাটা আস্তে আস্তে মুখ থেকে সরিয়ে দিলে যমুনা। ভিজে-ভিজে পাতার তলা থেকে দুটো ডাগর ডাগর চোখ মেলে ধরল স্বামীর দিকে। বললে, না।

—বাপের জন্যে মন খারাপ করছে ?

যমুনা জবাব দিলে না। আবার দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এল চোখ থেকে।

কালাচাঁদ একবারের জন্যে বৈঠাটা তুলে ধরল। তারপর বললে, মন খারাপ করবারই কথা। তুমি ভেবো না। যখনই তোমার ইচ্ছে হবে নিয়ে আসব বাপের বাড়ীতে। কেমন ?

কৃতজ্ঞতায় যমুনা ঘাড় নাড়ল : আচ্ছা।

পদ্মার ভরা স্রোতে নৌকা চলল। যমুনা তাকিয়ে রইল জলের দিকে। গহীন অথৈ পদ্মা। এপারের গাছপালাগুলো দেখা যায়—ওপারটা একেবারে ঝাপসা। মাঝখানে জল আর জল। উঃ—কত জল আছে এই নদীতে !

হঠাৎ যমুনা জিজ্ঞেস করল : তুমি বুঝি পদ্মায় খুব নৌকো বাও ?

কালাচাঁদ হা-হা করে হেসে উঠল। হাসিটা যেন কেমন বেয়াড়া আর নতুন রকমের শোনালো যমুনার কানে। চমকে চোখ তুলল যমুনা।

—পদ্মার জলেই তো বাস করি বলতে গেলে। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধারে পাড়ি জমাই। ঝড়-তুফান পেরিয়ে চলে আসি।

যমুনা শিউরে উঠল মনে মনে।

—ভয় লাগে না তোমার ?

কালাচাঁদ শব্দ করে হাসল না বটে, কিন্তু হাসি এবার ঝরে পড়ল গলা দিয়ে।

—পদ্মার ধারে যে ঘর বাঁধে, পদ্মাকে ভয় করলে তার চলে ?

—কিন্তু এ যে রাক্ষুসী নদী।

কালাচাঁদ বললে, উঁহু—মা ! মা কালী। ঝড় উঠলে, রাত কালির মতো কালো হয়ে গেলে খাঁড়া নিয়ে নাচতে শুরু করে। সে নাচ দেখলে আর ভয় হয় না বউ—সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠতে ইচ্ছে করে। তোমাকেও সে নাচ দেখাব বউ—কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

—আমার দেখে দরকার নেই—যমুনা কেঁপে উঠল।

কালাচাঁদ একটু চুপ করে রইল, বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে স্নেহভরা চোখ মেলে চেয়ে রইল যমুনার দিকে। ছেলেমানুষ এখনো কিছু জানে না। কিন্তু আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে ওর। রাত্রের পদ্মাকে চিনবে—রাত্রের পদ্মায় যা ঘটে, তা-ও ওর কাছে তখন আর ভয়ঙ্কর ঠেকবে না। ঠিক কথা—মা-র সেই কালীমূর্তি একবার যে দেখেছে, তার চোখ সে রূপে একেবারে ডুবে গেছে। যমুনারও তাই হবে।

কিন্তু এখনই নয়। এই দিনের আলোয় পদ্মা আর এক রকম। এ মা-র আর এক চেহারা। কোলে তুলে নেয়, আদর করে—ঠাণ্ডা হাওয়ার আঙুল বুলিয়ে দেয়

গায়ে। এই পদ্মার মাঝিরা সারি গায়, ধানের নৌকা গঞ্জে এসে ভেড়ে, বাচ্চারা মোচার খোলা ভাসায়, দামাল ছেলে ঝাঁপাই ঝোড়ে, বৌ-ঝিরা কলসী ভরে নিয়ে যায়, জেলের জালে রুপোলি ইলিশ ঝিলমিল করে। এই পদ্মা ফসল দেয়, বাঁকে বাঁকে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। তুফানের রাতের কথা এখন থাক।

কালাচাঁদের চোখ আর মন পদ্মার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল। সাদা ঘোলা জল তা নেয়—যেন মায়ের দুধ! মাটি সেই দুধ টেনে নিচ্ছে শিশুর মতো, পুষ্ট হয়ে উঠছে ধানের চারা—আম-জাম-নারকেল-সুপুরি রসে শ্বাসে ভরে উঠেছে। যমুনার ভীরু মুখের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে একটু চেয়ে রইল কালাচাঁদ, গুনগুন করল বার কয়েক, তারপর গান ধরল গলা ছেড়ে :

পদ্মা মোদের মা জননী রে,
পদ্মা মোদের প্রাণ,
তার সোনার জলে মোদের ক্ষেতে
ভরে সোনার ধান রে—
ভরে সোনার ধান—

মুগ্ধ আনন্দে চোখের তারা দুটো বড় হয়ে উঠল যমুনার। এমন ষণ্ডা জোয়ান মানুষটা, এতবড় বুকের ছাতি এমন লোহার মতো হাতের গুল—তার গলায় এই গান! আর এত মিষ্টি তার গলা! পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে দরাজ গলার এই গান যেন দূর-দূরান্তে ভেসে যেতে লাগল।

যমুনার মুখের দিকে আড়চোখের দৃষ্টি রেখে কালাচাঁদ গেয়ে চলল :

রঙ্গিলা নাও স্রোতে বাইয়া
বন্ধু আসে ভিনদেশিয়া
আর আপন ভুলে রূপবতী
ভাসায় কলসখান—

যমুনার চোখে আর পলক পড়ে না। এই রূপবতী কে? সে-ই? আর এই কি সেই ভিনদেশিয়া বন্ধু, যে এমন করে তাকে রঙিলা নায়ে তুলে নিয়ে ভেসে চলেছে?

যমুনা স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু স্বপ্নটা ভেঙে গেল আচমকা!

নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ওটা কী চলেছে? শ্যাওলা-ধরা কাঠের গুঁড়ি? না—তা তো নয়। পিঠের ওপরে কাঁটার মতো উঁচু উঁচু হয়ে আছে—চারটে ছোট ছোট কদাকার পা জল টানছে, সরু সুচলো মুখ, আর জলের একটু ওপরে দুটো হিংস্র পলকহীন চোখ যেন একভাবে চেয়ে আছে তার দিকে!

—কুমির! কুমির! ভীত বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল যমুনা।

সঙ্গে সঙ্গে জলের দিকে চোখ গেল কালাচাঁদের, আচমকা থেমে গেল গানটা। হিংস্র কর্কশ গলায় বললে, শা—লা! তারপর বৈঠাটা বাগিয়ে ঢপাস করে একটা প্রচণ্ড ঘা বসালো, কুমিরটার পিঠের ওপর।

ল্যাজের একটা বিরাট ঝাপটা দিয়ে, একরাশ জল ছলকে দিয়ে কুমির ডুবে গেল।

যমুনা তখনো কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে আছে। কালাচাঁদ হেসে বললে, ভয় নেই—ভয় নেই! আমরা আছি নৌকার ওপর—ও শালা আমাদের কী করবে! আর জলের তলায় হলেই বা কী করত! কালাচাঁদ ডুলেকে চেনে না—গলা টিপে মেরে ফেলতুম ওকে!

কুমিরের চাইতে আরো নিষ্ঠুর—আরো বীভৎস দেখালো কালাচাঁদের চোখ। যমুনা ভরসা পেলো না—আরো শক্ত হয়ে ঠায় বসে রইল, বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে গেছে। কিছুই জানত না যমুনা, তবু এই মুহূর্তে কেমন করে যেন টের পেলো: কালাচাঁদকে সে যা ভেবেছিল, কালাচাঁদ ঠিক তা নয়!

॥ ২ ॥

চাষীর ছেলে, অথচ চাষবাস করে না। জমিজমা বলতেও কিছু নেই। অল্পস্বল্প ঘরামির কাজ—জনমজুর খাটা। তবু টিনের নতুন দো-চালা ঘর, গোয়ালে তিন-তিনটে গোরু। ত্রি-সংসারে কোথাও কেউ নেই।

এ-ই হল কালাচাঁদের সংসার।

তখনো কিছু টের পায়নি যমুনা। পেলো সেদিন—যেদিন অনেক রাতে কোত্থেকে একপেট মদ খেয়ে ফিরল কালাচাঁদ। ভাত আর মাছের ঝোল রান্না করে যমুনা ঝিমুচ্ছিল দাওয়ায় বসে বসে। পেয়ারা গাছের ও-পাশে হলদে রঙের একটুকরো চাঁদ ঝুলে পড়ছিল, থেকে থেকে ডাহুক ডাকছিল ঝোপের ভেতর। যমুনা ঝিমুচ্ছিল আর আলগা আলগা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে টুকরো টুকরো মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছিল ছাড়া ছাড়া কতগুলো ছবি। মা-কে উঠোনে নামানো হয়েছে—একমাথা রুখো চুল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ছোট্ট যমুনা কাঁদছে লুটোপুটি খেয়ে—পাশের বাড়ীর মানিকের মা কী যেন বোঝাতে চাইছে তাকে—বাবা একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপরে বৃষ্টি পড়ছে, অনেক—অনেক বৃষ্টি। উঠানে ব্যাং ডাকছে—একটা দুটো তিনটে চারটে। বাবা হাট থেকে আসছে, বেলা ডুবে যাচ্ছে, যমুনা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। বাবা এসে যমুনাকে দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে

নিলে, বললে, কী সুন্দর শাড়ী কিনে এনেছি তোর জন্যে—বিক্রমপুরের তাঁতের শাড়ী ময়ূরকণ্ঠী রঙ—

কড়—কড়াং! যেন বাজ পড়ল কোথাও। চমকে উঠে বসল যমুনা। সদর দরজাটা আছড়ে ফেলে বাড়ীতে ঢুকল কালাচাঁদ—টলতে টলতে এগিয়ে এল।

—মদ খাও নাকি তুমি?—যমুনা চেঁচিয়ে উঠল।

—কারো বাপের পয়সায় খাই নাকি?—রূঢ় কর্কশ জবাব এল একটা।

—ছিঃ—ছিঃ—

—চুপ কর হারামজাদী—গলাটাকে সপ্তমে চড়িয়ে কালাচাঁদ জানোয়ারের মতো গর্জন করে উঠল: চেঁচাবি তো গলা টিপে মেরে ফেলব!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না যমুনা—নিজের কানকেও নয়। লণ্ঠনের একমুঠো আলো গিয়ে পড়েছে কালাচাঁদের মুখে। সেই কালাচাঁদ—কিন্তু এক মাস ধরে যমুনা যার ঘর করেছে এ সে নয়। সমস্ত চেহারার আদলটাই বদলে গেছে তার। এখনি একটা লোহার মতো থাবা বাড়িয়ে সে যমুনার গলা টিপে ধরতে পারে।

যমুনা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে স্বামীকে চিনল যমুনা। কালাচাঁদের আসলে পেশা ডাকাতি। রাতের অন্ধকারে পদ্মার বুকে সে ডাকাতি করে বেড়ায়।

প্রথম জানবার পর তিন রাত সে ঘুমুতে পারেনি। চোখের জলে ঘরের দাওয়া ভিজিয়ে ফেলেছে—ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছে বাপের কাছে। কিন্তু কালাচাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে সে সাহসও পায়নি। কোথায় যাবে—কোনখানে পালাবে? কালাচাঁদের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই কোথাও।

কেঁদেছে—নিজের মাথা খুঁড়েছে মাটিতে, তারপর ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। দেখেছে, সন্ধ্যের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো একদল মানুষ এসে জড়ো হয় তাদের বাড়ীর দাওয়ায়, ফিসফিস করে কথা বলে, মদ খায়, গাঁজা খায়—তারপর একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে চলে যায়। অসম্ভব ভয়ে সারা রাত জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে যমুনা। ভোর হওয়ার আগে ফেরে কালাচাঁদ—টাকা এনে ঢালে মেজের ওপর, আনে রক্তমাখা গয়না। দাঁতে দাঁত চেপে যমুনাকে বলে, একটা টুঁ শব্দ যদি করবি কারু কাছে, তা হলে গলা কেটে পদ্মায় ফেলে দেব—মনে থাকে যেন।

যমুনা বালিশ কামড়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে—নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে তার। তারপর একটা ছোট শাবল দিয়ে ঘরের কোণায় গর্ত করে টাকা-গয়নাগুলো পুঁতে রাখে কালাচাঁদ। বিড়ি ধরিয়ে যমুনার পাশটিতে এসে শোয়—আতঙ্কে শরীর সিঁটিয়ে ওঠে যমুনার—স্বামীর গা থেকে যেন মানুষের রক্তের আঁশটে গন্ধ পায় সে!

কালাচাঁদের মনটা নরম হয় এতক্ষণে—হাত বাড়িয়ে যমুনাকে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে। যমুনার মনে হয়—একটা বাঘ যেন মেরে ফেলবার আগে খেলা করছে শিকারটাকে নিয়ে। চোখের পাতা চেপে ধরে সে শক্ত হয়ে থাকে।

—চোখ মেলে চা বউ, চোখ মেলে চা। তোর জন্যই তো এসব করি। একছড়া সুন্দর হার পেয়েছি, পরিয়ে দেব তোকে।

প্রায়-নিঃশব্দ গলায় যমুনা বলে, হার আমি চাই না তোমার পায়ে পড়ি, এই মানুষ মারার কাজ তুমি ছেড়ে দাও।—তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বিরক্ত হয়ে কালাচাঁদ বিড়বিড় করে : দুত্তোর—মেয়েমানুষের নিকুচি করেছে।

যমুনাকে ছেড়ে দিয়ে কাত হয়ে শোয়। ভাবে, বিয়ে না করেই বেশ ছিল। দলের সাকরেদ রাখালের সেই বিধবা বোনটাই ছিল তার সত্যিকারের যোগ্য। যমুনার মতো একটা ভিজে কাঁথা নয়—তেতে থাকত আগুনের মতো। তেমনি ছিল সোনা আর পয়সার খাঁই। কালাচাঁদের শড়কিতে নিজের হাতে শান দিয়ে বলত : একসঙ্গে তিনটেকে ফুঁড়তে পারবে এমনি করে ধার দিয়ে দিলুম।

তিনদিনের জ্বরে মরে গেল। নইলে কি আর যমুনাকে বিয়ে করে আনত সে? রাখালের বোনটার কথা ভাবতে ভাবতে কালাচাঁদের ক্লান্ত শরীর ঘুমে জড়িয়ে আসে, নাক ডাকতে শুরু করে। আর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে যায় যমুনা—আকাশে সকালের আলো ফুটেছে।

তবু চেষ্টা করেছে যমুনা। দিনের আলোয়, কালাচাঁদের মনটা ভালো থাকলে, তার মুখখানাকে বারো বছরের ছেলের মতো শান্ত আর কোমল দেখালে—সেই সময়।

—আচ্ছা, তোমার পরকালের ভয় নেই?

—দুত্তোর পরকাল! ও-সব বুঝি না!

—খুন করো কেন?

—সহজে করি না তো? চিনে না ফেললে কিংবা বাধা না দিলে হাত ছোঁয়াই না কারুর গায়ে।

—মানুষ মারতে কষ্ট হয় না?

—কইমাছ কুটতে কষ্ট হয় তোর? হাঁস কাটতে?

—এক হল?

কালাচাঁদ হাসে : তফাত কিছু নেই। লাল রক্ত বেরোয়—ছটফট করে, তারপর সব ঠাণ্ডা।

যমুনা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। আবার বলে : পরকালের ভয় না-ই করলে, পুলিসকে ভয় হয় না? ধরতে পারলে যে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে!

এই ভয়টা কালাচাঁদেরও নেই তা নয়। পুলিসের নজর তার ওপর আছেই। যমুনাকে বিয়ে করে আনবার আগে দু-তিনবার দারোগা এসে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে গেছে তাকে। কিন্তু এত সাবধান তার দলটা, এমন হিসেব করে কাজ করে যে আজ পর্যন্ত কাঁটার আঁচড়টি লাগেনি তার গায়ে। তবু মধ্যে মধ্যে বুক ধুকপুক করে। জল-পুলিসের লঞ্চ ইদানীং একটু বেশি যাওয়া-আসা করছে এই তল্লাট দিয়ে। ভয় করে বইকি কালাচাঁদের।

আর ভয় করে বলেই সেটাকে আরো বেশি করে উড়িয়ে দিতে চায়। হা-হা করে হাসে এবারে।

—ওঃ, পুলিস! পুলিস ঢের দেখেছি।

—বেশ, পুলিসও নয় কিছু করতে পারবে না। কিন্তু টাকা তো কম জমল না। কেন আর এ-সব করে বেড়াও তুমি? যা আছে তাই দিয়ে জমি-জমা কেনো, বলদ আনো, চাষবাস করো।

—বলিস কি! শড়কি ফেলে লাঙল নেব! জোয়ানের কাজ ছেড়ে চাষা হয়ে যাব!

—কোনো লজ্জা নেই। চাষেই তো লক্ষ্মী। দোহাই তোমার—অনেক তো করলে, এবার ছেড়ে দাও এ-সব।

—দাঁড়া দাঁড়া। আর দু-চারটে ভাল ক্ষেপ মেরে নিই, তারপর—

—না-না, এখুনি। আজ থেকেই ছেড়ে দাও—যমুনা পা জড়িয়ে ধরে: ছেড়ে দাও এ-সব।

আবার রাখালের বোনটাকে মনে পড়ে—বুকের ভেতরটা যেন জ্বালা করতে থাকে কালাচাঁদের। উঠে দাঁড়িয়ে বলে: দেখব, দেখব ভেবে।

ভাবে কালাচাঁদ। পুলিসের ভয়—ফাঁসির দড়ি। ছেড়ে-ছুড়ে দিলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তার বদলে চাষা? লাঙল চেপে ধরে দুপুরের রোদে হাল দেওয়া, জলকাদার ভেতর ধান রোয়া, সকাল থেকে নুয়ে নুয়ে পিঠ কুঁজো করে ফসল কাটা? পারবে কালাচাঁদ? তার মেজাজে কুলোবে?

তা ছাড়া রাত। ডাকিনীর মতো কালো হয়ে আসে। পদ্মা তার ঝোড়ো চুল মেলে দিয়ে ডাক দেয়: অথই গহীন জলের ওপর খাঁড়া নাচতে থাকে। সঙ্গীরা আসে, ফিসফিস করে খবর দিয়ে যায়—পাট বিক্রি করে ফিরছে নামকরা মহাজন, নৌকোটা ধরতে পারলে—

বুকে ঢেউ দোলে—খাঁড়া নাচিয়ে পদ্মা ডাক দেয়। মাথার ভেতর মদের নেশা আগুনের চাকা হয়ে ঘুরতে থাকে। কালাচাঁদ আর থাকতে পারে না। খিদেয়

ছটফটিয়ে ওঠা বাঘ হরিণের গন্ধ পায়।

তারপর নদী।

ছিপের দাঁড় তালে তালে পড়তে থাকে—জল কেটে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চলে, বারো-চোদ্দ জোড়া চোখ অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলে, একটা মিটমিটে আলো দুলতে থাকে—পাট-বেচা মহাজনের নৌকোটা আসছে। মাঝপদ্মা, নিথর রাত—পদ্মার জলে খড়্গ ঝলকায়। তখন কোথায় যমুনা—কোথায় কে?

দাওয়ার খুঁটি ধরে বসে আছে যমুনা। জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে।

সকালে দৃশ্যটা দেখেই বিরক্ত হয় কালাচাঁদ।

—এই সাতসকালেই কাঁদতে বসলি কেন? যমুনা চুপ করে রইল।

—তবে তুই কাঁদ বসে বসে—আমি চললুম।—কালাচাঁদ পা বাড়াবার উদ্যোগ করল।

—একটু দাঁড়াও—যমুনা চোখের জল মুছল: কথা শুনবে একটা?

—আবার ওই সব বলবি তো? কালাচাঁদের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল: তুই যা শুরু করেছিস, এরপর বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে আমাকে। নইলে গিয়ে ধরা দিতে হবে পুলিসের হাতে।

যমুনা চোখ দুটো মেলে ধরল কালাচাঁদের দিকে। কাঁপা গলায় বললে, আমার কথা না হয় না-ই ভাবলে। আমার পেটে যে আসছে তার কথা একবার ভাবো। তোমার যদি একটা কিছু হয় তা হলে—

যমুনাকে শেষ করতে দিলে না কালাচাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল বৌয়ের পাশে, দু-হাতে জড়িয়ে ধরল কোমরটা।

—তোর ছেলে হবে বউ? সত্যি—ছেলে হবে তোর?

আনন্দে আদরে যমুনাকে ভরে দিলে এক মুহূর্তে। বদলে গেছে কালাচাঁদ—আবার সেই মানুষটা, বিয়ের আগে যার মস্ত জোয়ান শরীরটার ওপর ছেলেমানুষের মতো একখানা মুখ দেখে ভারী ভালো লেগেছিল যমুনার।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে—এই কি তুমি চাও?

কালাচাঁদ চুপ করে রইল একটু। তারপর ধীরে ধীরে বললে, না—এবার থেকে ভালো হয়ে যাব—সব ছেড়ে দেব, দেখে নিস তুই।

ছেলেই হল। গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। কোলে তুলতে কাঁকাল বেঁকে আসে যমুনার। বড় হলে বাপের মতো হয়ে উঠবে—এখুনি ফুটে বেরুচ্ছে তার লক্ষণ।

কিন্তু কেবল জোয়ানই হবে বাপের মতো? ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার নামে।

কথা রাখতে চেষ্টা করেছিল কালাচাঁদ। প্রায় এক বছর সে যেন নতুন হয়ে গিয়েছিল। ঘরে পোঁতা টাকাকড়ি যা আছে আছেই, তবুও আবার মন দিয়ে ঘরামির কাজ শুরু করেছিল এখানে ওখানে। জনমজুরির খোঁজে আসা যাওয়া করেছিল দূর দূর গ্রামে। যমুনাকে নিয়ে গিয়েছিল বাপের বাড়ী, বুড়োকে দেখিয়ে এসেছিল নাতির মুখ।

বুড়ো কেঁদে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

—তবু ভাগ্যিস, এতদিনে মনে পড়ল বাপটাকে।

—কী করব বাবা, অনেক দূরের পথ যে।

—না এলি, না এলি! তোরা সুখে থাকলেই আমার সুখ। হ্যাঁ রে, তোকে তো কালাচাঁদ কোনো কষ্ট দেয় না? ভাত-কাপড়ের দুঃখু পাস্‌নে তো?

একবারের জন্যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল যমুনার। না, ভাত-কাপড়ের কষ্ট নেই। কষ্ট যে তার কোথায়, সে কথা মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারবে না যমুনা, শুধু ভেতরে ভেতরে পুড়ে খাক হয়ে যাবে তুষের আগুনে।

—না বাবা, কোনো কষ্ট নেই।

বলে যমুনা ভেবেছিল, সত্যিই তো। এই সাত-আট মাসের ভেতরে কালাচাঁদ একবারও রাত্রে বেরোয়নি পদ্মার বুকে হানা দিতে, রক্তমাখা পাপের ধন নিয়ে আসতে। ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে বদলে গেছে সে। জমি কেনবার কথা ভাবছে, বলদও মনের মতো খুঁজছে হাটে হাটে। না, যমুনার কোনো দুঃখ নেই।

ফিরে আসবার সময় তেমনি করেই বুড়ো বাপ এসে দাঁড়িয়েছিল ঘাটে। আর পদ্মার স্রোতে তেমনি তীরের মতো ভেসে গিয়েছিল নৌকো। এবার আর কালাচাঁদ কথা বলে নি, গান গায় নি, নিঃশব্দে বৈঠা টানতে টানতে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে।

—কী ভাবছ?—যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল।

—উঁ?

—কী ভাবছ চুপ করে?

ক্লান্তভাবে হেসেছিল কালাচাঁদ। বলেছিল, ভাবছি তোর কথাই সত্যি হল তা হলে! এরপর থেকে একেবারে চাষাই হয়ে যাব। রাতের পদ্মা যখন কালো আঁধারে ডাক পাঠাবে, তখন সে ডাক আমি আর শুনতে পাব না, একপেট পান্তা

ভাত খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুব কেবল।

—আবার ওই কথা? ফের যদি ও-সব বলবে, তা হলে ছেলে বুকে করে আমি সোজা গাঙের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব এই বলে দিচ্ছি তোমাকে।

কালাচাঁদ আর কথা বলেনি। চুপ করে বৈঠা টেনেছে বসে বসে।

হাঁ, চেষ্টা সে করেছিল। মদ ছেড়ে তাড়ি ধরেছিল—তাও হপ্তায় এক-আধদিনের বেশি নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে যারা ছায়ামূর্তির মতো আসা-যাওয়া শুরু করেছিল, টিটকিরি দিত তারা।

—কী হল তোর? বৌয়ের আঁচল ছেড়ে যে নড়তে চাসনে?

—আর ভালো লাগে না এ-সব। আমাকে আর ডাকিসনি। পাপ কাজের ভেতরে আমি আর নেই। ছেলের আখেরটা তো দেখতে হবে!

—আরে ছেলের আখেরের কথাই তো হচ্ছে। একটু বড় হলেই সঙ্গে নিবি। নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি এখন থেকে। তবে না বাপের নাম রাখতে পারবে?

—না। ও-সব করব না আমি।

—পাগলামো করিসনি কালাচাঁদ—একজন ধমকে দেয়: ওই বৌ-ই তোর মাথা খেয়েছে। দে ওটাকে তাড়িয়ে। তুই সঙ্গে না বেরুলে আমরা জোর পাই না—কানা হয়ে যাই। বৌটাকে দে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে।

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, কথাটা তার পছন্দ হয়নি।

একজন টিপ্পনী কেটে বলে, তা হলে একদিন রাতে মুখে কাপড় বেঁধে দিই বউটাকে লোপাট করে। তারপর—

হঠাৎ কালাচাঁদ বেসুরো গলায় গর্জন করে ওঠে। দপ দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ —মুখের চেহারা হয়ে ওঠে হিংস্র জানোয়ারের মতো। কালাচাঁদ বলে, খবর্দার—খুন করে ফেলে দেব এসব বললে! মুখ সামাল্!

—আহা-হা—ঠাট্টাও বুঝতে পারিসনে।

—না, ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

দলের লোকেরা নিরাশ হয়ে চলে যায়। কিন্তু কালাচাঁদ খুশি হতে পারে না। মনের ভেতর সমানে জ্বলে যেতে থাকে। ওদের কথাগুলো বাজতে থাকে কানে।

যমুনা এসে বলে, অনেক রাত হল যে! খাবে না?

—না।

—কী হল?

কালাচাঁদ ধমক দিয়ে বলে, বিরক্ত করিস নি আমাকে। তোর ইচ্ছে হয়, এক পেট গিলে পড়ে থাকগে।

নিজের ওপর রাগ হয় কালাচাঁদের—অকারণ বিদ্বেষে মনটা ভরে ওঠে। ঘরামি—জনমজুর—চাষী। রাত্রের পদ্মা আর তাকে কোনোদিন ডাক পাঠাবে না। সে তার জীবন থেকে সরে গেছে চিরকালের মতো। এখন ভালোমানুষ হবে কালাচাঁদ, পরের ঘর ছেয়ে দেবে, বেড়া বাঁধবে—ফসল কাটবে।

অসহ্য মনে হয়।

সব ওই যমুনার জন্তে। যদি রাখালের বোনটা অমন করে না মরে যেত, যদি সে বিয়ে করে না আসত, যদি ছেলেটা না হত ! কিসের ভয় ছিল কালাচাঁদের, কাকেই বা পরোয়া করত সে ! যেমন চলছিল, তেমনিই চলত। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হলেই বা কী আসত যেত তার। জোয়ান চিরকাল জোয়ানের মতোই মরে।

কিন্তু—

মাথাটা দু'হাতে টিপে ধরে বসে থাকে কালাচাঁদ। কিছু ভালো লাগে না। বিশ্রী, অশ্লীল ভাষায় পৃথিবীসুদ্ধ লোককে তার গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে।

যমুনা আবার এসে জিজ্ঞেস করে : খেয়ে নিলে হত না ?

—দূর হয়ে যা সামনে থেকে—উঠে ছিটকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় কালাচাঁদ।

আরো এক মাস যায়—দু মাস যায়। জমি কিনব-কিনব করেও কেনা হয় না। হাটে হাটে ঘুরেও বলদ পছন্দ হয় না কিছুতেই। আর রাত জেগে জেগে শোনে দূরে পদ্মার ঢেউ ভাঙার শব্দ—ভাবে অন্ধকারে নিশ্চিন্ত টাকার থলে নিয়ে পদ্মায় পাড়ি দিচ্ছে পাটবেচা মহাজন, ভারী ভারী গয়না পরা মেয়েদের নিয়ে নৌকো চলেছে দূরের শহরে। কালাচাঁদের মাথার ভেতর তুফান ছুটতে থাকে।

ছেলেটাকে বুকে নিয়ে যমুনা ঘুমিয়ে পড়লে এক-একদিন এসে দাঁড়ায় পদ্মার ধারে। কালো উজ্জ্বল জল যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাক পাঠায়। মানুষ শিকার করার স্মৃতিগুলো সব ভেসে ওঠে চোখের সামনে। থাকতে পারে না কালাচাঁদ, একটা ডিঙি খুলে নিয়ে ভাসিয়ে দেয় অন্ধকার নদীতে—ঘণ্টাখানেক পাগলের মতো বৈঠা টেনে মনের অসহ্য অস্থিরতাটাকে খানিক শান্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু আর পারল না শেষ পর্যন্ত।

সেই ছায়ামূর্তিরা এল, অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করল ফিসফিস গলায়। তারপর : কালাচাঁদ বললে, বৌ, যাচ্ছি।

কালাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল যমুনা। ভয়ে পিছিয়ে

গেল দু পা।

—কোথায় যাবে?

—শিকারে।

—আবার? তুমি যে আমায় কথা দিয়েছ।

—কথা দিয়েছি।—কদর্যভাবে মুখ ভ্যাংচালো কালাচাঁদ: তুই আমায় ভেড়ুয়া বানিয়েছিস, সকলের কাছে ইজ্জত নষ্ট করেছিস। আমি আর এভাবে থাকতে পারব না—পাগল হয়ে যাব।

যাবার জন্যে পা বাড়াল কালাচাঁদ। যমুনা দু হাতে পা জড়িয়ে ধরল তার।

—আমার কথা না শোনো না-ই শুনলে। কিন্তু ছেলেটা—

কালাচাঁদের সমস্ত চেহারাটাকে বুনো মোষের মতো দেখালো। হিংস্র গলায় বললে, পা ছাড়,—ছেড়ে দে বলছি—

—দোহাই তোমার, ছেলেটার কথাও একটিবার—

—ছেলে নিয়ে পদ্মায় ডুবে মর তুই—তোরও শান্তি, আমিও বেঁচে যাই। পা ছাড় হারামজাদী—

ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে লাথি মারল কালাচাঁদ। যমুনা ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে।

একবারের জন্য অনুতাপ এল মনে। একবার ভাবল—

কিন্তু ভাবলেই জট পাকায়। এতদিন ধরে যত ভেবেছে ততই যমুনার জালে সে জড়িয়ে গেছে, টের পেয়েছে ধীরে ধীরে তার শক্তি শুকিয়ে আসছে, সাহস থমকে দাঁড়াচ্ছে। কালাচাঁদ আর অপেক্ষা করল না—পদ্মা তখন তার নাড়ী ধরে টান দিয়েছে।

নৌকোতে ছিল চক্রবর্তী। মেয়ের বিয়ের জন্যে গয়না কিনে নিয়ে ফিরছিল।

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল—ছাইয়ের মতো তার মুখ।

—দোহাই বাবা, গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও—ব্রহ্মস্ব হরণ কোরো না।

জবাব দিলে রাখাল। চক্রবর্তীর গলার ওপর রামদা বাগিয়ে ধরে বললে, চুপ কর বুড়ো শয়তান কোথাকার। যা আছে বের করে দে এখুনি। নইলে এক কোপে মাথা উড়িয়ে দেব।

তেমনি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল চক্রবর্তী। ভাঙা ঘ্যাসঘেঁসে গলায় বললে, বাবা সকল, দয়া করে—

—চুপ—কী আছে দে এখুনি!

চক্রবর্তী বেঁচে যেত, অনর্থক একটা বুড়ো মানুষকে খুন করে হাত নোংরা করবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নৌকোর লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় কালাচাঁদের মুখের দিকে তার চোখ পড়ল। দুর্গ্রহ।

চক্রবর্তী যেন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কুটো কুড়িয়ে পেলো।

—তুমি বাবা কালাচাঁদ না? রায়নগরে চাটুজ্জেদের রান্নাঘর ছেয়ে দিয়েছিলে না গত বছর?—বলতে বলতে আশায় জ্বলে উঠল চক্রবর্তীর মুখ: আমি সে বাড়ীতে ছিলুম—তারা আমার কুটুম। বসে বসে তামাক খেতুম তার তোমার সঙ্গে কত গল্প—

কথাটা আর শেষ হল না। রাখালের হাতের রামদা নেচে উঠল বিদ্যুতের মতো। চক্রবর্তীর মনে হল ঘাড়ের ওপর খুব জোরে কে একটা ধাক্কা দিয়েছে। তারপরেই মাথাটা ছিটকে পড়ল পাটাতনের ওপর। চোখ দুটো তখনও জ্বলজ্বল করছে—ঠোঁট দুটো বাকী কথাটা শেষ করতে চাইছে তখনো।

কবন্ধটা কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে বসে রইল। আট-দশটা শিরা থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল রক্ত, তারপর উবুড় হয়ে পড়ে গেল শরীরটা।

—শা-লা! চিনে ফেলেছিল!—রাখালের চোখ দুটো অদ্ভুত দেখাচ্ছে—মনে হল এখন সে রক্ত খেতে পারে।

একটা মাঝি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে ধরা গেল না। আর একটা বল্লমের মুখে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল।

এ খুন এই প্রথম নয়, এমন আরো অনেকবারই ঘটেছে কালাচাঁদের। নিজের হাতেই যে কতগুলোকে শেষ করেছে সে কথা আঙুল গুনেও বলতে পারে না। তবু হঠাৎ রক্ত দেখে মাথাটার ভেতর কেমন পাক খেয়ে গেল তার। চোখ বুজে বসে পড়ল পাটাতনের ওপর।

ঝিম ভাঙল কার যেন ঝাঁকুনিতে।

—কী হল তোর? এই কালাচাঁদ—এই—

কিছুই হয় নি—চোখ খুলে উঠে পড়ল কালাচাঁদ। চক্রবর্তীর রক্তে সারা গা তার মাখামাখি।

শেষ রাতে যখন স্নান করে বাড়ি ফিরল, রক্তের গন্ধটা তখনো যেন জড়িয়ে আছে শরীরে—কেমন গুলিয়ে উঠছে শরীর।

চক্রবর্তীকে খুন না করে উপায় ছিল না—চিনে নিয়েছিল। তবু—তবু—

—শালা।

নিজের উদ্দেশেই গালাগাল করলে কালাচাঁদ। এই অধঃপাত হয়েছে যমুনার

জন্যেই। সে-ই তাকে এমনভাবে সব কাজের বার করে দিয়েছে। মানুষের রক্ত দেখে আজ তার মাথা ঘুরে গেল—ছিঃ ছিঃ! এর পরে আর তার মুখ দেখানোর জো রইল না। বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে কালাচাঁদ ভাবল, আজ বৌটা একটা কথাও বলতে এলে একচোট বোঝাপড়া হয়ে যাবে তার সঙ্গে।

কিন্তু কিছুই করবার দরকার হয় না কালাচাঁদের।

ভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায়। সেইখানেই মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে যমুনা।

—এই ওঠ্—ওঠ্—ওঠ্ না হারামজাদী। দরজা খোলা রেখে এইভাবে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস।

যমুনার সাড়া এল না। কালাচাঁদের পায়ের গুঁতোয় সমস্ত শরীরটা একবার নড়ে উঠল কেবল। আর তখনি একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে মুখে, চাঁদের বিবর্ণ আলোয় দেখল খানিকটা তরল জিনিস লেপটে আছে যমুনার সর্বাঙ্গে—সারা বারান্দায়।

ঘরের বারান্দায় মিটমিট করছে লণ্ঠন। পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিল কালাচাঁদ, তারপর সেটা নিয়ে যমুনার মুখের ওপর একবার ঝুঁকে পড়েই দু হাত পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দুটো সাদা পর্দা নেমে এসেছে যমুনার খোলা চোখে—যেন মরা পাখীর চোখ। ঠোঁটের দু-পাশে গলায়, বুকে বমি চিকচিক করছে এখনো।

কলেরা।

কখন বার কয়েক ভেদবমি করে এই বারান্দার ওপরেই মুখ থুবড়ে মরেছে যমুনা। কালাচাঁদকে ছুটি দিয়ে গেছে চিরকালের মতো। আর কাঁদবে না, বাধা দেবে না, বারণ করবে না কোন দিন।

চক্রবর্তীর রক্ত দেখে যেমন হয়েছিল, তেমনি আর একবার মাথাটা ঘুরে গেল কালাচাঁদের। একদিনে দুবার। অন্ধের মতো বসে পড়ল সেই দুর্গন্ধ ময়লাগুলোর ওপর। ঘরের ভেতর কঁকিয়ে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেটা, শুকনো কাতর গলায়। ওর খিদে পেয়েছে—মায়ের দুধ চায় এখন।

॥ ৪ ॥

ক্রমশই দূর আকাশের একেবারে শেষ সীমায় বন্দরের আলোগুলো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে এল। মিঠাইয়ের দোকানে যে বড় পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্পটা জ্বলছিল, সেটা পর্যন্ত একটা তারা হয়ে গেল কেবল। তারপরেই নীরেট অন্ধকার আর অতল গহীন গাঙ। ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে দেখবার মতো কিছুই রইল না।

উজানের মুখে শিরশিরিয়ে খানিক বাতাস দিচ্ছিল, তবু স্রোতের একরোখা টানে নৌকো এগিয়ে চলল সামনের দিকেই। পদ্মার ওপর কোণাকুনি পাড়ি জমালে লক্ষ্মীপুরের বাজার, সেখান থেকে কুমারহাটির খাল বেয়ে আরো ঘণ্টাখানেকের পথ। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বাড়ী পৌঁছে যাব—মথুরানাথ ঘোষাল ভাবল।

বিশাল পদ্মা—মাথার ওপর তারা-জ্বলা বিরাট আকাশ। মাঝখানে অন্ধকারের কালো পর্দা এই দুটোকে যেন একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। ওপরের তারারা স্থির, নিচে পদ্মার জলে লক্ষ লক্ষ তারা নেচে উঠছে একসঙ্গে, ঠিকরে পড়ছে, ছিটকে যাচ্ছে। স্রোতের মুখে ভেসে-যাওয়া পচা কচুরিপানার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে—এক একটা কচুরির ঝাঁক পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পচা মড়ার মতো। দাঁড় টানা আর ফেলার আওয়াজ উঠছে তালে তালে—তর তর করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। অন্ধকারে যাদের চোখ ভাম-বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল হয়ে যায়, সেই মাঝিরাও কপালে হাত রেখে, একাগ্রভাবে তাকিয়ে—এপার-ওপারের একটা গাছপালার আভাস পাচ্ছে না। এ বছর বান ডেকেছে অস্বাভাবিক, ক্ষ্যাপা পদ্মা মাত্রা ছাড়িয়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে।

অনেকটা আন্দাজ, অনেকখানি অভ্যাস আর রক্তের সংস্কারের ওপর ভরসা রেখে মাঝিরা পাড়ি জমিয়েছে। একবার ওপারের ডাঙা ধরতে পারলে লক্ষ্মীপুরের বাজার খুঁজে নিতে আর কষ্ট হবে না। তবু মনের ভেতর অনিশ্চিত অবস্থাটা একটা আছেই। আর সেইটে কাটাবার জন্যে একজন গান ধরেছে :

কোন্ দেশেতে গেলা বন্ধু
পাথার দিয়া পাড়ি,
আমার সাথে দিয়া গেলা
জীবন-ভরা আড়ি রে—

যে দু'জন দাঁড় টানছিল, তাদের একজন মাঝপথে থামিয়ে দিলে গানটাকে।

—একটু সামাল ভাই—খেয়াল থাকে যেন। বড় পাকটা অনেক নৌকো গিলেছে এবার।

হালের মাঝিই গান ধরেছিল। সে বললে, ভয় নেই—ভয় নেই—টেনে যা। সে আরো ঢের দক্ষিণে, অনেক নীচুতে।

—ভয় নেই, ভরসাও নেই।

—আমার হাল ঠিক আছে—হালের মাঝি অভয় দিলে : নিজেদের কাজ করে যা তোরা।

মথুরানাথ ঘোষাল ছইয়ের বাইরে বসে হুঁকো টানছিল। এই রাতে—এমন দুরন্ত পদ্মায় পাড়ি দেবার ইচ্ছে তার বিশেষ ছিল তা নয়। কিন্তু বন্দরে দু-তিন দিন

আটকে পড়তে হল। ওদিকে কাল থেকে ভাগীদারেরা গোলায় ধান তুলতে থাকবে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নজর না রাখলে ঠিক বোকা বুঝিয়ে যাবে বউ-ছেলেকে। তাই আজ রাতে না ফিরলেই তার নয়।

কিন্তু, মাঝখানে ভাবনায় বাধা পড়ল মথুরার।

অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে তার চোখের দৃষ্টি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট আর স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তারাজ্বলা আকাশের ছায়া পদ্মার ঘোলা জলের ওপর পড়ে একটা চঞ্চল আলোর দীপ্তি যেন নেচে উঠছিল, ছুটন্ত স্রোতের ওপর কাঁপছিল। সেই আলোয় একটা কিসের ওপর যেন মথুরার চোখ পড়ল।

একখানা নৌকো আসছে না এদিক পানে ?

পেছন ফিরে যারা দাঁড় টানছিল, তারা দেখতে পায়নি। কিন্তু হালের মাঝির ভাম-বেড়ালের মতো জ্বলন্ত সজাগ চোখ ঠিকই লক্ষ্য করেছিল। মনের ভেতর ছায়া ঘনাচ্ছিল তার।

—ঠিকই বলেছেন কর্তা। বড় একটা জেলেডিঙির মতো এগিয়ে আসছে তর-তরিয়ে। কিন্তু আলো নেই কেন ? এই রাত্তিরে যেভাবে পাড়ি মেরে এগিয়ে আসছে—

মাঝপথেই সে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে গলা বুক শুকিয়ে উঠল মথুরার।

—হ্যাঁরে, এ-তল্লাটে তো কোনো ভয়ডর ছিল না।

—একেবারে যে নেই তাই বা কি করে বলি কর্তা ? দিন বারো আগেই মাইল সাতের উজানে একটা বড় রকম ডাকাতি হয়ে গেছে।

—জলপুলিস কী করে ?

—ঘুরে তো বেড়ায়। কিন্তু এত বড় গাঙ। তারপর কে কোন্ দিক দিয়ে, কোন্ খাল বেয়ে হুট করে সরে পড়ে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে। শয়তানের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বাবু ?

—বলিস কী !—মথুরার জিভটা কে যেন ভেতর থেকে টানতে লাগল। রাত্রির এই ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়াতেও সারা গা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে এল। ভাঙা গলায় বললে, হাঁকডাক করব ?

দাঁড়ের মাঝিরা দাঁড় বন্ধ করে ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। নীরস গলায় একজন বললে, এত রাত্তিরে মাঝগাঙে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ সাড়া দেবে না কর্তা। এ বড় বিষম ঠাঁই। ধারেকাছে দু-একখানা এক-মাল্লাই থাকলেও এখন তারা কিছুতেই কাছে ভিড়বে না।

হালের লোকটি নড়ে-চড়ে বসল। পদ্মার মাঝি, রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সে

বললে, লগি বাগিয়ে ধর মকবুল। যদি ডাকাতই হয় একটা মোকাবেলা করে ছাড়ব।

মকবুল সংক্ষেপে শান্ত গলায় বললে, খেপেছ ইয়াকুব চাচা!

সত্যি কথা। কী স্বার্থ আছে তাদের! সামান্য দু-একটি ময়লা জামাকাপড়, এক-আধটা তেলচিটে বালিশ, হুঁকো আর আগুনের মালসা, রান্নার মাটির হাঁড়ি আর কলাইকরা বাসন, সঙ্গে দু-চার-ছ গণ্ডা পয়সা বা এক-আধটা টাকা—এর লোভে কেউ আর ডাকাতি করতে আসবে না, মজুরিই পোষাবে না তার। অনর্থক পরের জন্যে মারামারি করতে গিয়ে তারা নিজেদের মরণকে ডেকে আনবে কেন!

এর মধ্যেই অন্ধকারে নৌকোটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। বারো-চৌদ্দটি কালো কালো মাথা—বারো-চৌদ্দটি হাতের দাঁড়ে জলের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে বাইচের নৌকার মতো। ছিপ-নৌকো। এত রাত্রে—এই সময় কোন্ বাইচ খেলায় তারা বেরিয়ে পড়েছে, সেটা বুঝতে কারো আর এক মিনিটও সময় লাগল না। মথুরা ঘোষাল গেঞ্জির তলায় কাঁপা আঙুল ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল, কিন্তু সময় বুঝে পৈতের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ছিপ-নৌকো প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ইয়াকুব অনর্থক জেনেও হাঁক ছাড়ল: এই নাও সামলে আপন ডাইন—

আপন ডাইনে নৌকো সামলাবার কোনো গরজ দেখা গেল না তাদের। তার বদলে বেশ মোলায়েম গলায় কে যেন জানতে চাইল: নৌকো কোথায় যাবে হে?

—কুমারহাটি।

—কুমারহাটি? বেশ, বেশ। তা একটু তামাক খাওয়াও না মিঞা ভাই। গলা শুকিয়ে গেছে।

দু চোখ বুজে বসে রইল মথুরা ঘোষাল—কানের মধ্যে তার ঝিঁঝিঁ ডাকছে। সব নিয়মমাফিক চলছে—এমনিভাবেই ওরা এসে আলাপ জমায়।

মকবুল গলা চড়িয়ে বললে, না—তামাক আমাদের নেই।

ও নৌকো থেকে হাসির আওয়াজ এল। মিষ্টি খিলখিল হাসি।

—আছে শেখের পো, আছে। কেন আর মিছে কথা বাড়াচ্ছ বলো দেখি। ভালো মানুষের মতো হুকোটা বাড়িয়ে দাও—এক ছিলিম টেনে নিয়ে চলে যাই।

মকবুল বোধ হয় একটা অসম্ভব আশায় হুঁকোই খুঁজতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খট্‌খটাৎ করে ছিপ এসে নৌকোর গায়ে ভিড়ে গেল। টলমল করে দুলে উঠল নৌকো।

ইয়াকুব চেঁচিয়ে উঠল: গায়ে এসে পড়লে যে, তফাৎ যাও—তফাৎ যাও।

—থামো হে স্মুন্দি, আস্তে। ভালো কথায় কান দেবার পাত্তর তো নও, তাই বাঁকা আঙুলেই ঘি ওঠাতে হবে। আচ্ছা, তামাক তোমাদের আর দিতে হবে না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি।

কথাটা বলেই তারা আর সময় দিলে না। চোখের পলকে তিন-চারজন লোক প্রায় একসঙ্গেই এই নৌকায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একদিকে কাত হয়ে নৌকাটা সোজা হয়ে উঠতে-না-উঠতেই দেখা গেল—একখানা বিরাট রামদার উজ্জ্বল চেহারা—তিন-চারখানা শড়কির ক্ষুধার্ত ফলক। অন্ধকার পদ্মার অতল থেকে একদল প্রেত এসে যেন তাদের সামনে দাঁড়াল।

রামদা যার হাতে ছিল, কালভৈরবের মতো তার চেহারা। মাথার বিরাট বাবরী নাচিয়ে, রামদাখানাকে বারকয়েক শূন্যে ভেঁজে নিয়ে সে মথুরাকে বললে, তাড়াতাড়ি বের করে দাও সব। একটু সোরগোল তুলেছ কি ধড় থেকে মাথা তফাৎ করে দেব।

মথুরা অস্পষ্টভাবে কী একটা হাউমাউ করে বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারল ঠিক তার হৃৎপিণ্ডের ওপরটিতে বুকের চামড়ায় পিনের মতো খোঁচার একটুখানি মৃদু যন্ত্রণা। শড়কির একটা ধারালো ফলা অত্যন্ত পরিষ্কার অর্থ নিয়ে জায়গাটি স্পর্শ করে আছে।

—চুপ। নইলে এখুনি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলব।

মথুরা যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত শব্দ করে ফেলবার মতো সাহস তার নেই।

লুট শুরু হয়ে গেল। বাক্স-বিছানা থেকে শুরু করে জার্মান সিল্‌ভারের পান খাওয়ার ছোট কৌটোটি পর্যন্ত বাদ পড়ল না। স্পর্শ করল না কেবল মাঝিদের ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা, গোটা দুই লোহার কড়াই আর তিন-চারখানা কলাইকরা এনা-মেলের থালা।

সমস্ত চেষ্টা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মাঝিরা গলুইয়ের উপর নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল। যেন নিতান্তই দর্শকের দল, যেন কিছুই তাদের করবার নেই। হঠাৎ যেন মকবুলের জ্ঞান ফিরে এল। চমকে জিজ্ঞেস করল : এমন করে নৌকো ছুটেছে কেন ইয়াকুব চাচা? জলের এমন টান কেন?

টান!

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল সকলের। সত্যিই তো! দুরন্ত একটা স্রোতের টানে দুখানা নৌকাই যেন ঝড়ের পালে ছুটে চলেছে। এ স্বাভাবিক টান নয়—পদ্মার স্রোতের চাইতে অনেক প্রখর—অনেক দুরন্ত এর শক্তি!

মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল সব। শিকার আর শিকারী দু'দলের মধ্যেই একসঙ্গে

হাহাকার উঠল একটা। রামদা হাতে করে যে এতক্ষণ সকলকে শাসাচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ তার হাতখানা ঝুলে পড়ল দুর্বলভাবে। ভয়-জড়ানো গলায় সে বলল, বড় পাকের টান।

বড় পাকের টান! পদ্মার এই অঞ্চলে সে পাকের খ্যাতি কে না জানে। চুম্বক যেমন অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে টেনে আনে, তেমনি এই বড় পাকের টানও বহু দূর থেকে নৌকা বা যা কিছু পায়—সকলের অজ্ঞাতে বুভুক্ষু জলচক্রের ভেতর সেগুলিকে গ্রাস করতে নিয়ে আসে। সাপের চোখের মতো তার আকর্ষণ-প্রভাব। হুঁশিয়ার মাঝিরা দূর থেকে সে প্রভাব অনুভব করে প্রাণ বাঁচায়, যারা পারে না সেই অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে মোহমুগ্ধের মতো ছুটে আসে, বিশাল ঘূর্ণি প্রচণ্ড কয়েকটি আবর্তে বার কয়েক তাদের ঘুরিয়ে শোঁ করে অতলগর্ভে তলিয়ে নেয়—জলের ওপর কোনোখানে এতটুকু চিহ্ন রেখে যায় না। তারপর হয়তো তিন মাইল দূরের বাঁকের মুখে কয়েকটা দেহ বা একখানা উবুড়-করা নৌকা ভেসে ওঠে। এ নিয়তির টান—এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। এই পাকের টানে একবার পড়লে কোনো মাঝির সাধ্য নেই যে নৌকা কিংবা প্রাণ বাঁচিয়ে আসতে পারে।

ডাকাতির উত্তেজনায় হোক কিংবা অসাবধানেই হোক—কোন্ অশুভক্ষণে যে নৌকা পাকের টানের মধ্যে এসে পড়েছে, কেউ তা বুঝতে পারে নি। যখন পারল তখন আর সময় ছিল না। নৌকার গায়ে ঘা দিয়ে দিয়ে পদ্মার জল বাজতে লাগল খানিকটা ক্রূর কুৎসিত হাসির মতো।

লুটের মাল যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল। শড়কি, বল্লম, রামদা ফেলে দিয়ে দু'দলই দাঁড় টানতে লাগল পাগলের মতো। ছিঁড়ে যেতে লাগল হাতের পেশী, ফেটে যেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। কিন্তু প্রকৃতির এই অসম্ভব শক্তির কাছে মানুষের সমস্ত চেষ্টা হার মানল। এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে এল নৌকা। উজানের বাতাসটুকুও পড়ে গেছে—পালের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আশা নেই।

নৌকা আর বাঁচবে না।

এবার ঝুপঝাপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। নৌকার যা হওয়ার হোক—কোনোমতে বাহুবলে যদি আত্মরক্ষা করা যায়, যদি চড়া কিম্বা অন্য কিছুর আকস্মিক আশ্রয় জুটে যায় একটা। নৌকা দুখানা উল্কার গতিতে ছুটে চলে গেল, সেই অনিবার্য মৃত্যুচক্রের দিকেই।

॥ ৫ ॥

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু স্রোতের টানে কে যে কোন্ দিকে বুদ্বুদের মতো নিশ্চিহ্ন হল তার আর সন্ধানই মিলল না। সে আকর্ষণে মথুরা ঘোষালও কুটোর মতো

ঘূর্ণির রাক্ষসগর্ভের দিকে ভেসে চলল। আগেই প্রায় মরে গিয়েছিল সে—এখন আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর তার মনে হতে লাগল পেছন থেকে মরণের দূতেরা লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা হাতে তাকে পাতালের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে চলেছে, একবিন্দু করুণা নেই তাদের। জলের গর্জন ক্রমশ একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর আক্রোশ-ধ্বনির মতো বেড়ে উঠছে—পাকটা আর কত দূরে?

সেই সময় হঠাৎ জলের ভেতরে কিসে পা আটকালো মথুরার। কি যেন একটা জিনিস স্থির হয়ে আছে এই ভয়ঙ্কর স্রোতের ভেতরেও। দু হাতে সেটাকে প্রাণপণে আকড়ে ধরল মথুরা, টের পেলো পাড় ভেঙে পড়া একটা নারকেল গাছের আশ্রয় পেয়েছে সে। পাড় কবে ভেঙেছে, পদ্মাতীরের সীমানা কত দূর সরিয়ে দিয়েছে ঠিক নেই, তবু অল্প গভীর এখানকার জলে—ঘূর্ণির প্রবল টানকে উপেক্ষা করেও মাত্র মাথাটুকু জাগিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আজ নারিকেল গাছটা।

পিঠের ওপর দিয়ে একটানা স্রোত। আশ্রয় পেয়েও অস্বস্তি বোধ করছিল মথুরা। নিশ্চিত মরণের ভেতর বাঁচার এতটুকু আশা মনকে চাঙ্গা করে তুলল অনেকখানি। শরীর ক্রমশঃ অচল হয়ে আসছে, গায়ে যে প্রচুর শক্তি অবশিষ্ট আছে তাও নয়। 'আর একটু দুর্বল হয়ে পড়লে নিঃসন্দেহে আত্মসমর্পণ করতে হবে নদীর করুণার সামনে।

অবশিষ্ট শক্তিটুকু কোনোমতে গুছিয়ে নিয়ে মথুরা বহুকষ্টে নারকেলগাছটার আগায় এসে পৌছুল। জল থেকে মাথাটা হাততিনেক মাত্র ওপরে। কিন্তু মাথা বলতে কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। কালক্রমে শুকিয়ে শুকিয়ে তারা পদ্মার জলে ঝরে পড়েছে; শুধু দু-একটা শুকনো ডাঁটা ন্যাড়া মাথার ওপর কাঁটার মুকুটের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নক্ষত্র-ছাওয়া আকাশে এতক্ষণ কেবল অন্ধকারের উৎসব চলছিল। কিন্তু এতক্ষণে সেটা ফিকে হয়ে এল। ভাঙা ভাঙা হয়ে টুকরো মেঘের ওপার থেকে চাঁদ উঠল এতক্ষণে। খণ্ড চাঁদ—নিষ্প্রভ আলো—তবু সেই ম্লান করুণ আলোয় পদ্মার এই নিশীথ রূপটাকে আরো রহস্যময়—আরো ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল। নারকেলগাছটা থরথর করে উঠছে স্রোতের বেগে, দীর্ঘকাল এই টান সয়ে জলের ভেতর ডুবে থেকে তার দাঁড়াবার শক্তিও কমে আসছে। ক্রমশ তিল তিল করে ক্ষয় হচ্ছে তার তলার মাটি, যে কোন সময়ে উপড়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এত কথা ভাববার সময় মথুরার ছিল না। শেষ অবলম্বনটুকু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে অজ্ঞানের মতো পড়ে রইল—তার চারদিকে মুখের শিকার ছেড়ে যাওয়া কালনাগিনী, আক্রোশে গজরে চলল।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়। হঠাৎ সে টের পেলো নারকেলগাছটায় জোরালো

ঝাঁকুনি লেগেছে একটা। চমকে তাকিয়ে দেখল স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আর একটি মানুষও তারই মতো এই গাছটাকে আঁকড়ে ধরেছে। লোকটার সারা শরীর জলের মধ্যে, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা আর দুখানি হাত মাত্র ভেসে আছে জলের ওপর।

একবারের জন্যে শিউরে উঠে পরক্ষণেই হাসি ফুটে উঠল মথুরার মুখে। একেই বলে বিধাতার ঠাট্টা। রামদা মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই এই লোকটাই না এতক্ষণ শাসাচ্ছিল তাদের ! এতক্ষণ জলে ভিজলেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। তার ঝাঁকরা বাবরী আর বুনো মোষের মতো শরীরটা একবার দেখলে আর ভোলবার নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটার এত পরাক্রম চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মথুরা শব্দ করে হেসে উঠল।

লোকটা চমকালো—দারুণভাবে চমকালো। যেন মাথার ওপর কালো পদ্মার প্রেতাত্মার হাসি শুনেছে সে। আতঙ্কে বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল—চাঁদের আলোয় চিনতেও পারল মথুরাকে।

—ওঃ, তুমি !

সমস্ত ভয় আর ভাবনার একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছেছে মথুরা। এখন আর ঘাবড়াবার মতো কিছু নেই। লোকটার দশা দেখে ভারী কৌতুক বোধ হল তার।

ঠাট্টা করে মথুরা বললে, তোমাদেরই দয়ায় এখানে আসতে হল বাবা। কিন্তু যাত্রাটা দেখছি তোমাদেরও শুভ হয়নি।

—নাঃ !—একটু চুপ করে থেকে লোকটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলল। পদ্মার হাওয়ায় আর কলধ্বনিতে নিঃশ্বাসের আওয়াজটা মথুরা শুনতে পেল না। লোকটা আবার বললে, ছ মাস আগেও জেল খেটে বেরিয়েছি, দু বছর। কিন্তু এমন বিপদে আর কখনো পড়িনি।

মথুরা চুপ করে রইল।

লোকটা বলে চলল, কাল পূর্ণ হয়েছিল আর কি। ধর্মের ঢাক হাওয়ায় বাজে কিনা। বউটা বলত—এত পাপ ধর্মে সইবে না। এমন কাজ কোরোনি। আমি তার কথা শুনিনি। মরণ তাকে টেনে নিলে, দু-তিন বছর ভালো হয়ে থাকলুম, তারপর আবার মানুষ মারার জন্তে পদ্মা ডাক পাঠালো : মায়ের কাছে অনেক বলি দিয়েছি—এবার আমাকেই বলি নেবে।

আশ্চর্য—কান্নায় ভরা লোকটার গলা। একটা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর ডাকাত কোথাও নেই—নিতান্তই সাধারণ মানুষ। মরণের সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর থেকে তার হাহাকার উঠছে !

মথুরা শুনতে লাগল।

—ছেলেটাকে মানুষ করতে চেয়েছিলুম চাষী গেরস্তর মতো, লাঙল ঠেলে—মাটি কুপিয়ে। বৌয়ের শেষ মিনতি। পারলুম না। কিছুদিন পরেই আবার ওরা আমায় টানতে লাগল। বললে, চল্ কালাচাঁদ—চল্! আবার ধরিয়ে দিলে ডাকাতির নেশা। ছেলের কথা ভাবলুম না—বৌয়ের শেষ কথা ভুলে গেলুম। কিন্তু এবার দারোগা দলকে দল ধরে নিয়ে গেল। তিন বছর ফাটক খেটে এলুম।

—তার পরেও আবার বেরিয়েছিলে ডাকাতি করতে?

—ও যে রক্তের টান বাবু—ওখানেও যে সর্বনাশা বড় পাকের টান। নদীর ওপর কালো হয়ে রাত নামলে, পদ্মার জল খাঁড়া তুলিয়ে ডাক পাঠালে—হু-হু করে হাওয়ার তুফান বইলে তখন যে আর কিছুতেই ঘরে থাকা যায় না। অনেক চেষ্টা করেছি, দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছি, তারপর নিজেই দড়ি কেটে পালিয়ে গেছি। এতদিনে সব মিটল। শুধু ছেলেটাকে যদি—

কালাচাঁদ থামল। পদ্মা গর্জন করে চলল একটানা। ঘুমের ঘোরে কোন্ দূরের বাসা থেকে ভুলে বেরিয়ে এসে একটা গাংচিল কেঁদে চলে গেল।

জল থেকে ওপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল কালাচাঁদ—কিন্তু বসবার জায়গা কোথাও নেই। বৃষ্টি-বাদলায় শ্যাওলা পড়ে পড়ে গাছটা পেছল হয়ে আছে—বার বার হাত ফসকে যেতে চায়। আবার ভালো জায়গাটি মথুরা দখল করে বসে আছে, একবার হতাশভাবে কালাচাঁদ সেদিকে তাকিয়ে দেখল। তার পা দুখানা তখনো জলের ভেতর—বড় পাকের টান হিংস্রভাবে সে দুখানাকে যেন শরীর থেকে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। হাতের মুঠো একটু আলগা হলেই সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেবে নিজের ঘুরন্ত রাক্ষসগর্ভের মাঝখানে।

কালাচাঁদ আবার বললে, তোমার বাড়ী তো কুমারহাটি—না?

—হুঁ।

—আমার হল মাদারঘাটা। একই দেশের মানুষ তাহলে।

—সে তো বটেই।—একটু খোঁচা দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। নাহলে আর সর্বনাশ করতে আসবে কেন আমার?

জ্যোৎস্না আর একটু উজ্জ্বল হলে দেখা যেত, কালাচাঁদের কালো মুখ লজ্জায় আরো কালো হয়ে উঠেছে।

—আর লজ্জা দিয়ো না ও-কথা বলে। শাস্তি তো আমার শুরু হয়েছে। নামটা কী?

মথুরা নাম জানালো।

—ঘোষাল? ব্রাহ্মণ?—কালাচাঁদ জিভ কাটল:—ব্রহ্মস্ব লুট করতে গিয়েছিলুম—

হবেই তো—হবেই তো।—নিজে নিজেই একবার মাথা নাড়ল : এমনিই হয়।

—আর কখনো ব্রহ্মস্ব লুট করো নি বোধ হয় ?

—না জেনে ক'বার করেছি বলতে পারি নে। কিন্তু জানিতে একবার—কালাচাঁদ থামল। চক্রবর্তীর কবন্ধ থেকে একরাশ রক্ত যেন ফিনকি দিয়ে চোখেমুখে ছিটকে পড়ল তার। একটু চুপ করে থেকেই বললে—দণ্ড হাতে-হাতেই পেয়েছিলুম। ঘরে ফিরে দেখি বৌটা মরে কাঠ হয়ে আছে। কলেরা।

আবার চুপ। পদ্মার গর্জন—ঘূর্ণির একটা ক্রুদ্ধ আহ্বান। কালো আকাশ আর কালো জল—দুয়ের মাঝখানে খানিকটা কাকজ্যোৎস্না জ্বলছে কুয়াশার একটা পর্দার মতো। পাখার শব্দ বাজিয়ে উড়ে চলেছে গোটাকয়েক বাদুড়, মরা জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া ওদের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। নীচে জলের অবিশ্রান্ত গতি—সময়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কলরোল ছুটেছে দ্বৈত সঙ্গীতে। কাল যেমন করে সব ভেঙে এগিয়ে যায়, ঠিক সেই একই নিয়মে ছুটেছে কীর্তিনাশা পদ্মা—দুই কূলে তার ভাঙনের ডমরু বাজছে !

মানুষের দেহমন দুই-ই আশ্চর্য। সব অবস্থার সঙ্গেই যেমন করে হোক মানিয়ে নিতে পারে। তাই এর মধ্যেও মথুরের চেতনা অসাড় হয়ে আসছিল। চট করে ঘোর ভেঙে গেল। সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছে নাকি সে ! একবার হাত খুলে পড়ে গেলেই আর দেখতে হবে না—একটা টানেই পদ্মা একেবারে পনেরো-ষোল হাত দূরে নিয়ে চলে যাবে। তখন আব ফিরে আসা মানুষ কেন, দৈত্যের পক্ষেও সম্ভব নয়।

চোখ মেলে মথুরা চেয়ে দেখল। তেমনি জলের ভিতর বারো আনা শরীরটাকে ডুবিয়ে প্রাণপণে গাছটাকে আঁকড়ে আছে কালাচাঁদ। চাঁদ আরো খানিকটা উঠে এসেছে—প্রায় মাথার ওপর। সেই আলোয় মথুরা আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেলো তাকে। ক্লান্তি, যন্ত্রণা আর ভয় সমস্ত মুখের ওপর থমকে আছে তার—বেঁচে থেকেও যেন নরকবাস করছে।

—কেমন আছো হে কালাচাঁদ ?

—ভালো নেই ঠাকুরমশাই !—ক্লিষ্ট গলায় জবাব এল : জলে পড়বার আগেই পাঁজরাতে একটা চোট পেয়েছিলাম। ভিজে ভিজে আর জোর পাচ্ছিনে গায়ে। বেশিক্ষণ যে ধরে থাকতে পারব, সে ভরসা আর নেই।

—ওপরে উঠতে পারবে ?

ওপরে দুজনের জায়গা হওয়ার কথা নয় ; কিন্তু এই চরম বিপদে পরম শত্রুকে মথুরা ডাক না দিয়ে থাকতে পারল না। লোকটার জন্যে এখন তার কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু কালাচাঁদের মনও বদলে গেছে এখন।

—না ঠাকুরমশাই, দুজনের জায়গা হবে না ওখানে। তা ছাড়া শরীরেও এমন বল নেই যে এতটুকু উঠে আসতে পারি। হাত-পা আমার অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

—তা হলে ?

—আর উপায় নেই ঠাকুর, মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে। তার আগে—

বার-বার-বারাং—

একটা ভয়ঙ্কর শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে জেগে উঠল, কোথায় যেন তোলপাড় হয়ে উঠল জল। পদ্মা ভাঙছে—ভেঙে চলেছে। মানুষের নীড়, পৃথিবীর মাটি। কোথায় যেন মস্ত একটা ভাঙন নামল কাছাকাছিই।

দুজনেই কান পেতে কিছুক্ষণ ধরে শুনল শব্দটা। আবার পাড়ি ভাঙল। হয়তো কারো ঘর গেল, কারো জমি গেল, কারো সর্বস্ব হারিয়ে গেল ওর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে আবার নিঃশ্বাস ফেলল কালাচাঁদ।

—তুমি আমার দেশের মানুষ ঠাকুরমশাই, মরণের আগে তোমার চরণে নিবেদন আছে একটা।

মথুরার কষ্ট হল।

—মরবে কেন হে ? অনেকক্ষণ তো কাটালে। আর ঘণ্টা-তিনেকের বেশি রাত্তির নেই। এর মধ্যে যদি কোনো জাহাজ এসে পড়ে তো ভালোই, নইলে দিনের বেলা যে করে হোক উপায় একটা হবেই। ভগবান আছেন।

—আমার জন্যে নেই !—কালাচাঁদ হাসতে চেষ্টা করল : তা ছাড়া তিন ঘণ্টা ! আর পারছিনে ঠাকুরমশাই, আমার হয়ে এসেছে। আমার ন-দশ বছরের একটা ছেলে আছে সংসারে, সে পড়ে আছে রতনগঞ্জে তার এক পিসির বাড়ীতে। তুমি সেই পিসিকে এই গেঁজেটা দিয়ো, খানকয়েক মোহর আছে এতে। এ নিয়ে যেন আমার ছেলের নামে জমি কিনে রাখে—বড় হলে যেন আমার ছেলে চাষী হয়ে নিজের রোজগারের ফসল খেতে পারে। তা ছাড়া আরো বোলো, উত্তরের পোঁতায় দু-ঘটি—

হাত নামিয়ে গেঁজেটা তুলে নিলে মথুরা।

—উত্তরের পোঁতায় দু-ঘটি—

কিন্তু আর বলতে পারল না কালাচাঁদ। এক হাতে গেঁজেটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দুর্বল বাঁ হাতখানা কালাচাঁদের পিছলে গেল নারকেলগাছের গা থেকে। তারপরেই ছলাৎ করে শব্দ হল—যেন বড় একটা রুই মাছ উলাস্ দিয়ে উঠল জলের ওপর।

তাকিয়ে রইল মথুরা ঘোষাল। দেখল পদ্মার সেই দুরন্ত ঘূর্ণির টানে কালাচাঁদের ঝাঁকড়া মাথাটা ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল একবার।

—যমুনা ঠিকই বলেছিল ঠাকুরমশাই—মাথাটা ডুবে আবার ভেসে উঠল : মা নয় রাক্ষুসী। রক্ত খায়—

সেই শেষ কথা। জলে বুদ্বুদ মিলিয়ে গেল। আর যাওয়ার আগে সমস্ত বিশ্বাস এমন একজনের হাতে দিয়ে গেল—একটু আগে চোখ বুজে যাকে সে খুন করতে পারত।

সকালের আলো জাগল। জেগে উঠল পদ্মা—যে মা। যে ক্ষিদের ফসল দেয়, পিপাসার জল দেয়, যে পদ্মায় রঙিলা নাও ভাসিয়ে ভিনদেশিয়া বন্ধু দেশে ফিরে আসে। যে পদ্মার জলে কালাচাঁদের ছেলে ডিঙি বেয়ে ধান বেচতে যাবে লক্ষ্মীপুরার বাজারে।

একটা চলতি স্টীমার এসে নারকেলগাছের মাথা থেকে যখন অজ্ঞান অচৈতন্য মথুরা ঘোষালকে উদ্ধার করল, তখন তার হাতের মুঠোয় গেঁজেটা বজ্রশক্তিতে ধরা।

ধানশ্রী

॥ ১ ॥

বন্দরের ঘাট থেকে এক্সপ্রেস স্টীমার ছেড়ে চলে গেল।

সুধাকর মাঝি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল সেদিকে। জাহাজ তো নয়—একটা প্রকাণ্ড দৈত্য যেন। কীর্তনখোলার জল তোলপাড় করে, চারদিক ফেনায় ফেনাময় করে দিয়ে বাঁকের মুখে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুধু বহুক্ষণ ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগল সুধাকরের কেরায়া নৌকো।

কোথায় যায়—কত দূর-দূরান্ত থেকে আসে! এতবড় রাক্ষসী নদীটাকে গ্রাহ্যও করে না। রোদ-বৃষ্টি-তুফান—কোনোটাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। উত্তরের আকাশে মেঘ জমে—নদীর বুকে কাজল-বরণ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে—ঢেউ উলাস্ দেয়—হুঁশিয়ার মাঝিরা সঙ্গে সঙ্গে কূলের দিকে পাড়ি জমায়। কিন্তু ওই জাহাজটা নির্বিকার। ও জানে—পাগলা নদীর মাতাল ঢেউ মিথ্যে আক্রোশেই বার বার ওর গায়ে এসে ভেঙে পড়বে—এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না।

জাহাজটা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কানে আসছে দুটো প্রকাণ্ড চাকার হুস্ হুস্ করে জল ভাঙবার আওয়াজ—শোনা যাচ্ছে বাঁশির গম্ভীর স্বর। সুধাকর অন্যমনস্ক হয়ে রইল। ওই জাহাজটার দিকে তাকালে ভারী ছোট মনে হয় নিজের জীবনকে—মনে হয় ভারী সংকীর্ণ। কখনো কখনো ইচ্ছে করে জাহাজের খালাসী হয়ে চলে যায় সে—যেখানে হোক, যত দূরেই হোক।

সুধাকরের দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

এইবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। অধিকাংশ কেরায়া নৌকোই তেম্নি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। সোয়ারী জোটেনি। পূজোর মরশুম শেষ হয়ে গেছে। এখন আর ঘরমুখো যাত্রীর ভিড় নেই—সব ফিরে চলেছে কলকাতার দিকে। ষ্টীমার থেকে মাত্র সামান্য ক'টি লোক নেমেছিল—অধিকাংশই বন্দরের মানুষ। দূরের কেরায়া নেই বললেই চলে।

অতএব এখন আর হাতে কোনো কাজ নেই। চুপচাপ ঘাটেই অপেক্ষা করা। এর মধ্যে যাত্রী জোটে তো ভালোই, নইলে সন্ধ্যার 'মেল' পর্যন্ত দেখে তবে ঘরে ফেরা।

গোটাকয়েক ইলিশ মাছের নৌকো আসছিল ঘাটের দিকে। সুধাকর ডাকল : আছে ?

—আছে।

—দরদাম কি রকম ?

—বারো আনা—চৌদ্দ আনা—এক টাকা।

বলে কি ! একটা ইলিশ মাছ বারো আনা ! মগের মুল্লুক ছাড়া একে আর কী বলা যায় !

—কিসের মাছ তোমার ? সোনার না রূপোর ?—সুধাকর রসিকতা করতে চেষ্টা করল।

—তুমি আদার ব্যাপারী, সে খোঁজে তোমার কী দরকার ?—চটাং করে উত্তর এলো ইলিশ মাছের নৌকো থেকে।

মুখের মতো জবাব পেয়ে চুপ করে গেল সুধাকর। তারপর বিড় বিড় করে বকতে লাগল : ইস্—বারো আনায় ইলিশ মাছ বেচবেন ! সেদিন আর নেই—কলকাতার বাবুরা সব ফিরে গেছে এখন। ওই ইলিশ মাছ নৌকোতেই পচবে—এ আমি বলে দিচ্ছি।

তা না হয় পচুক, কিন্তু তাতে সুধাকরের কোনো সান্ত্বনা নেই। আপাতত রান্না চাপাতে হবে এবং কিছু মাছ দরকার। কিন্তু নৌকোর দর শুনেই আর গঞ্জের দিকে এগোতে সাহস হচ্ছে না। এক টাকা পাঁচ-সিকের কমে মাছ ছোঁয়াই যাবে না হয়তো। তার চেয়ে—

গলুইয়ের পাটাতন সরালো সুধাকর। ক্যাঁস ক্যাঁস করে একটা আওয়াজ উঠল সেখান থেকে—নড়ে উঠল বেজীর মতো একটা মেটে রঙের প্রাণী। উদ্‌বেড়াল একটা।

—আয় জুয়ান (জোয়ান), আয়—উদ্‌বেড়ালের গলার লম্বা দড়িটা ধরে টান

দিলে সুধাকর। উদ্‌টা উঠে এল পাটাতনের ওপর। পোষা বেড়ালের মতোই সুধাকরের চারদিকে সে ঘুরতে লাগল—মাথা ঘষতে লাগল তার হাঁটুতে। সুধাকর একটা সঙ্কেত করলে, যা—

উদ্ আর অপেক্ষা করলে না। ওস্তাদ সাঁতারুর মতো ঝুপ করে ঘোলাটে নীল জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েকটা চ্যালা মাছ ঝাঁক বেঁধে নৌকোর আশপাশে ঘুরছিল—একরাশ খইয়ের মতো চারদিকে সভয়ে ছিটকে পড়ল তারা। হাতের দড়িটা শক্ত করে ধরে জলের দিকে তাকিয়ে রইল সুধাকর। উদের মেটে রঙের শরীরটা কখনো জলের তলায় নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে—কখনো বা নিশ্বাস নেবার জন্যে এক-একবার ভেসে উঠছে ওপরে। সুধাকর অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকের একটা নৌকো থেকে মকবুল মাঝি ছিপ ফেলেছিল। বিরক্ত হয়ে ছিপ তুলে নিয়ে বললে, আবার উদ্ নামিয়েছ জলে? একটা মাছও ধরা যাবে না আর। সুধাকর জবাব দিল না, তার দৃষ্টি তখনো জলের দিকে। জলের তলায় উদ্ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো টান পড়ছে হাতের দড়িতে—কখনো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে তার আকর্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা হুটোপুটি টের পাওয়া গেল। সুধাকর রইল উৎকর্ণ হয়ে।

একটু পরেই উদ্ ভেসে উঠল জলের ওপর। তার ধারালো দাঁতে আন্দাজ একপো একটা রুপালি মাছ ছট্‌ফট্ করছে প্রাণপণে। হাত বাড়িয়ে জানোয়ারটার ভিজে মসৃণ শরীর সুধাকর তুলে নিলে নৌকোর ওপরে।

—শেষ পর্যন্ত বোয়াল মাছ ধরলি জুয়ান?

জুয়ান একবার মনিবের মুখের দিকে তাকালো। তার পর আবার জলে ঝাঁপ দেবার উদ্যোগ করল।

—থাক থাক, ওতেই হবে। গলার দড়িতে একটা ঝাঁকুনি দিলে সুধাকর।

পাটাতনের ওপর বসে উদ্ এবার নিজের শরীর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাতে লাগল সুধাকরের দিকে। সে দৃষ্টিতে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ।

—বিকেলে একটা ইলিশ ধরতে হবে—বুঝলি? বেশ বড় ইলিশ মাছ। তুই আর আমি ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব রাত্রে। বুঝলি তো?

উত্তরে জুয়ান মনিবের হাঁটুতে ভিজে মাথাটা ঘষে দিলে।

—কী মাছ আনল তোমার জুয়ান?—মকবুল মাঝির জিজ্ঞাসা শোনা গেল।

—বোয়াল। ভাগ নেবে নাকি?

—থাক। আমি একগণ্ডা ট্যাংরা ধরেছি।

উদ্‌কে খানিকটা কাঁচা মাছ কেটে দিয়ে তোলা-উনুন ধরিয়ে নিলে সুধাকর।

বেলা বাড়ছে—জোয়ার আসছে নদীতে। ঘোলা জল ফুলে ফুলে ওদিকের ইটের ভাঁটা পর্যন্ত পৌঁছেছে—কেরায়া নৌকো দুলছে, স্টীমার ঘাটের পণ্টুন দুলছে। গাং-শালিক উড়ছে দল বেঁধে। মন্থর শান্ত গতিতে একটা ডেস্‌প্যাচ্ চলেছে মাঝনদী দিয়ে—এ ঘাটে ওটা ভিড়বে না। স্টীমার ঘাটের সামনে একটা মিঠাইয়ের দোকানের কাছে কুকুরে ঝগড়া করছে তারস্বরে।

শুধু সুধাকরের নয়—সব নৌকোতেই প্রায় রান্না চড়েছে এখন। জলের গন্ধ—কাদার গন্ধ—কাছ দিয়ে ভেসে যাওয়া একঝাঁক নিরাশ্রয় কচুরিপানার গন্ধ। তার সঙ্গে রসুন, মশলা আর ফুটন্ত ভাতের গন্ধ মিশে গেছে। রোদটা সম্পূর্ণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠবারও সুযোগ পাচ্ছে না—নদীর ভিজে হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে বার বার।

সুধাকর খেতে বসেছে, এমন সময় ডাঙা দিয়ে ঘুরে ওর নৌকোয় মকবুল এসে উঠল।

—কী, খাওয়া হয়নি এখনো?

—না, রান্না চাপাতে দেরি হল একটু। রসুনের ঝোল মাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে সুধাকর বললে, একটু বোসো ভাই। তামাক খাও।

মকবুল তামাকের সরঞ্জাম বের করে টিকে ধরাতে বসে গেল।

—এই হয়ে এল আমার—বড় বড় গ্রাস মাখতে লাগল সুধাকর।

—আস্তে আস্তে খাও না, ব্যস্ত হওয়ার কী আছে!—টিকেতে ফুঁ দিতে দিতে মকবুল বললে, বিকেলের আগে তো কোনো সোয়ারী পাওয়ার আশা নেই। খাও নিশ্চিন্ত হয়ে—

—হয়ে গেছে আমার—প্রায় চক্ষের পলকে পেতলের থালাখানা পরিষ্কার হয়ে গেল সুধাকরের। দুটি চারটি ভাতের অবশেষ সে নদীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলে—ভালো করে সেগুলো জলে পড়বার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে চ্যালা মাছ তা যেন লুফে নিতে লাগল।

থালা মেজে, হাঁড়ি-কড়াই গলুইয়ের ভেতরে সাজিয়ে রাখতে আরো সময় গেল খানিকটা। ততক্ষণে হুঁকোয় একটা শাল পাতার নল গুঁজে তামাক টানতে শুরু করেছে মকবুল। মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া।

—কী হল? মেজাজ খারাপ নাকি?

নলটা খুলে নিয়ে সুধাকরের দিকে হুঁকো এগিয়ে দিলে মকবুল: নাও।

কড়া দা-কাটা তামাকে টান দিয়ে চোখ দুটো প্রায় তৃপ্তিতে বুজে এল সুধাকরের। বেশ আমেজ লাগিয়ে দিয়েছে মকবুল—কল্‌কেতে গন্ গন্ করছে টিকের আগুন।

আয়েস জড়ানো গলায় সুধাকর আবার বললে, কী হয়েছে? অমন কেন মুখের চেহারা?

মকবুল ভ্রূকুটি-ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। কপালটা কোঁচকানো—অন্যমনস্কভাবে হাতের শালপাতার নলটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে।

—আর ভালো লাগছে না, এবার চলে যাব শহরে।

—শহরে ?

—সেই কথাই ভাবছি।—মুখ ফিরিয়ে মকবুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: স্টীমার-ঘাটে কুলিগিরি করব, রিক্‌শা টানব তা নইলে।

—কেন, আর বুঝি নৌকো বাইতে মন চায় না ?

—কী হবে ? এও তো কুলির কাজ। যেখানেই যাই, আমার অবস্থা সমান। বরং শহরে দুটো পয়সা বেশি আসবে। রিক্‌শা টানতে পারলে আরো বেশি হবে রোজগার।

সুধাকর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু চাচার কথাটা একবার ভেবে দেখো তোমার।

চাচার কথা! কেমন চমকে উঠল মকবুল। তার চাচা জয়নালও একদিন গ্রাম-দেশ ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করেই পেয়ে গেল রিক্‌শা টানার কাজ। তারপরে মনে হত, জয়নালের মতো সুখী বুঝি বিশ্বসংসারে কেউ নেই। সারাদিনে রোজগার বেশ ভালোই হয়, মালিকের জমার পয়সা মিটিয়ে দিয়েও বেশ উদ্বৃত্ত থাকে হাতে। তাই থেকে প্রায়ই বাড়িতে পাঁচ-দশটা টাকা পাঠায় জয়নাল, ফর্সা লুঙ্গি পরে, সন্ধ্যাবেলায় এক-আধটু ফুরতি করতেও যায় দু'চারদিন। বছর খানেক এই ভাবেই চলল।

কিন্তু হোটেলের কলেছাঁটা ভাত, জলের মত ডাল, দু'এক টুকরো মাছ আর কালেভদ্রে এক আধ খণ্ড মাংস—এতে পেট হয়তো ভরতে পারে, কিন্তু শরীরের তাগিদ মেটে না। যে শক্তি আসে সীমানাহীন নদীর অপর্যাপ্ত জোলো-হাওয়ার উচ্ছ্বাস থেকে, যে প্রাণ আসে চন্দ্র-সূর্য-তারার অবারিত আলোর ঝর্ণায়, মুঠো মুঠো রাঙা মোটা চালের ভাত, টাটকা নদীর মাছ আর শাক-সব্জী শরীরে যে সঞ্জীবনী জাগিয়ে রাখে, রেঙ্গুনচালের ভাতে আর মাপা তরকারিতে তা কোথায় পাবে জয়নাল ? প্রথমে বেরি-বেরি ধরল—হাত-পা ফুলে দিনকয়েক কষ্ট হল খুব। তারপর থেকেই কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল শহরের আলো, রিক্‌শা নিয়ে ছোটবার সময় কেমন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল কানে, হঠাৎ এক এক সময় ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরে। শহরে তখন সাইকেল-রিক্‌শা আসতে শুরু হয়েছে, জয়নাল ভাবল, ওর একটা জমা নিতে পারলে ঢের বেশি রোজগার করা যাবে। কিন্তু সাইকেল-রিক্‌শার ওপরে বাবুদের ঝোঁক বেশি, কাজেই জমা নিতে গেলে আগাম চায় মালিক। অতএব টাকা জমাবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম শুরু করল জয়নাল। তারপর একদিন যখন সদর রোড থেকে

সোয়ারী নিয়ে চলেছে কাশীপুরের দিকে, তখন নথুল্লা বাজার পুলের ওপরে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। সেই যে পড়ল—আর উঠতে পারল না, মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত ঝরতে লাগল খোয়া-ওঠা পথের ওপর। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে দু ঘণ্টার বেশি বাঁচেনি জয়নাল।

একবার—এক পলকের জন্যে সেই স্মৃতিটা চমকে গেল মকবুলের মনের ওপর। শহর! সেখানে টাকা পাওয়া যায়—সাইকেল-রিক্শা টানা চলে, কুলিগিরি করা যায়, একটা পান-বিড়ির দোকান দিয়ে বসলেও নেহাৎ মন্দ হয় না। বায়োস্কোপ দেখা যায়, নানা রকম স্ফূর্তি করাও চলে, কিন্তু—

কিন্তু!

মকবুল ভ্রূকুটি করে জোয়ারের ফুলে-ওঠা জলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখতে লাগল। কতকগুলো কুমিরের ছানার মতো একঝাঁক খরশুলা মাছের পোনা জলের ওপর বড় বড় চোখ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে। উড়ন্ত মাছরাঙার লোলুপ দৃষ্টি আছে ওদের ওপর. কিন্তু সহজে ধরা দেবার পাত্র নয় ওরা। ছোঁ মেরে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই টুপ্ করে ডুবে যাবে জলের মধ্যে। মকবুল একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ওদের দিকে। ছলাৎ করে লঘু শব্দ হল একটু—মাছগুলো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেছে। মকবুল বললে, তা হোক। শহরই আমার ভালো।

—যে-রকম ক্ষেপে গেছ, এরপরে খুন-খারাপী করবে মনে হচ্ছে।—সুধাকর হাসল।

—খুন করতে আর পারছি কই। তা হলে তো বেঁচে যাই। ইচ্ছে করে কাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে ধড়টাকে পুঁতে দিই কচুরিপানার ভেতরে—শেয়ালে-কুকুরে টেনে খাক।

—এত রাগ তা হলে ইদ্রিশ সাহেবের ওপরেই?

—ইদ্রিশ সাহেব!—মুখটা বিকৃত করলে মকবুল: বাঁদীর ব্যাটা—চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে দুটো পয়সা জমিয়েই সাহেব হয়ে বসেছে। এখন আমাকে বলে বান্দা! বলে, আমি ওর জুতোর চাকর!

বান্দা তো বটেই—সুধাকর ভাবল। মকবুলের নৌকো তার নিজের নয়—ইদ্রিশ মিঞাই তার মালিক। প্রতিটি পাইপয়সার হিসেব দিতে হয় তাকে। আর আশ্চর্য খরশান দৃষ্টি ইদ্রিশ মিঞার! তিন টাকার সোয়ারী বয়ে দুটো টাকা বলে পার পাওয়ার জো নেই। কী করে টের পায় সে-ই জানে। মকবুল বলে লোকটার ইব্লিশের চোখ আছে।

মকবুল বলে চলল, আমারও দিন ছিল। আমার বাপ-দাদা যদি দাঙ্গাবাজী আর মামলা করে ফতুর না হত, তা হলে কে পরোয়া করত ওই ইদ্রিশ মিঞাকে? এই আমাকেই তবে পোলাও খাওয়ার নেমন্তন্ন করত, ফরাসে বসিয়ে বলত: আসুন মিঞা

ভাই আসুন—এই নিন ফরশী। কী করব—সবই নসীব!

নসীব বই কি—কী আর নসীব ছাড়া! নইলে গোলাম আলি সর্দারের মেয়ে রোকেয়াকে দেখে এমন করে মন মজবে কেন মকবুলের? যে মকবুলের মাথা গোঁজবার গোলপাতার ছাউনিটুকু পর্যন্ত একটা দমকা হাওয়ার ভর সয় না—তার কেন হবে বিয়ে করে ঘর বাঁধবার শখ? আর গোলাম আলি সর্দারই বা কেন এমন হতে যাবে—যার চোখের চামড়া বলে কোনো জিনিস নেই! তারও তো সম্বলের মধ্যে বিঘে তিনেক জমি—তাও চাষ করতে হয় ইদ্‌রিশ মিঞার কাছ থেকে বলদ ধার করে। যদিও নামেই সর্দার তবু তার ঘর থেকেও তো দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ দেখা যায়। তবু সেই গোলাম আলিই বা জেনেশুনে কেন পাঁচকুড়ি টাকার দেন-মোহর চেয়ে বসবে মকবুলের কাছে?

ঘর নেই—জমি নেই, খোরাকী ছাড়া তিন টাকা মাইনে। লুঙ্গি কিনতে হলে এক মাস বিড়ি না খেয়ে থাকতে হয়। সেই মকবুল কিনা রোকেয়াকে দেখে দিশেহারা হয়ে গেল! তারপর ইদ্‌রিশ মিঞার কাছে গিয়ে দরবার করে বললে, মিঞা সাহেব, যদি পাঁচকুড়ি টাকা কর্জ দেন—

পাঁচকুড়ি টাকা! ইদ্‌রিশ মিঞা হা-হা করে হেসে উঠেছিল: শোধ করবি কী করে? বিবি বাঁধা দিয়ে নাকি?

আশ্চর্য ধৈর্য মকবুলের! এর পরেও তাই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েনি ইদ্‌রিশ মিঞার ঘাড়ের উপর—চড়্ চড়্ করে টেনে ছিঁড়ে দেয়নি তার মেহেদী-রাঙানো দাড়িগুলো। শুধু রক্তচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে এসেছে সামনে থেকে।

সুধাকর জানে—সবই জানে। বুঝতে পারে দিনের পর দিন কী অসহ্য হিংস্রতায় মকবুলের বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে থাকে। কিন্তু সহানুভূতি বোধ করা ছাড়া আর কীই বা উপায় আছে তার! তার নিজের ঘরের মেঝেতে যে মেটে হাঁড়িটা পোঁতা রয়েছে, বড়জোর চারগণ্ডা টাকা মিলতে পারে তার ভেতর। কিন্তু পাঁচকুড়ি তার থেকে অনেক দূরে।

মকবুল বললে, তার চাইতে শহরে যাওয়াই ভালো। স্টীমারঘাটে মুটের কাজ করলেও পাঁচকুড়ি টাকা জমে যাবে এক বছরে।

—তা হয়তো যাবে। কিন্তু ততদিন রোকেয়া বিবি তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে না।

—থাকবে না?—মকবুলের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠলো: না থাকে বয়ে গেল। আরো অনেক রোকেয়া জুটে যাবে দুনিয়ায়।

—এইটে কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ভাই।—এত দুঃখেও হাসি এল সুধাকরের:

মেয়ে হয়তো গণ্ডা গণ্ডা জুটবে, কিন্তু রোকেয়া বিবি দুটি জুটবে না।

মকবুল ছাড়া এত বেশি করে আর কে জানে সেকথা? এমন করে আর কে সেটা অনুভব করে রক্তে রক্তে—নাড়ীতে নাড়ীতে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জোয়ারের জল কল্লোল তুলছে। ইটের পাঁজার ওপরে একটা সবুজ লতা দুলছিল, আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগল ফাটলের ভেতরে। লাউডগা সাপ একটা।

—ও মাঝি, কেরায়া যাবে?

আচমকা ডাক উঠল—যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। গায়ে ছিটের শার্টের ওপরে একখানা গামছা, এক হাতে পুঁটলি, আর এক হাতে জুতো একজোড়া।

মকবুল উঠে পড়ল : ওই নাও—তোমার সোয়ারী এসে গেছে।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ লাফিয়ে নেমে পড়ল নৌকো থেকে। তারপর ডাঙা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

সুধাকর ভ্রূকুটি করল। যদিও সওয়ারীর জন্যেই সকাল থেকে সে অপেক্ষা করে আছে, তবু মনে হল যেন এ সময়ে না এলেই ভালো করত লোকটা। কেমন বিশ্রী ভাবে রসভঙ্গ করে দিলে।

লোকটা আবার অধৈর্যভাবে বললে, যাবে নাকি কেরায়া?

—কেন যাব না? যাবার জন্যেই তো বসে আছি। কোথাকার কেরায়া?

—মুরাদপুর।

—দেড় টাকা দেবেন।

—দেড় টাকা? এই তিন মাইল রাস্তা দেড় টাকা?

—তবে অন্য নৌকো দেখুন।

কিন্তু লোকটা বোকার মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে রাজী নয়। দশ জায়গায় দর করে বেড়ানোর চাইতে এক জায়গায় দামদস্তুর করাই ভালো। রফা হল এক টাকায়।

সওয়ারী তুলে নিয়ে সুধাকর যখন নৌকো ভাসাল, তখন তার চোখে পড়ল মকবুল জলে ছিপ ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে।

জোয়ারের জলে মাছ উঠবে না—তাছাড়া মাছের দরকারও নেই ওর। তবু!

॥ ২ ॥

কিন্তু মকবুলের জন্যে মিথ্যে দুঃখ করে কী হবে সুধাকরের? তার নিজের কথাই কি সে ভাববার সুযোগ পেয়েছে এ পর্যন্ত?

ওপরে আকাশ—নীচে গাঙ, মাঝখানে ডিঙি। সুধাকরের জীবনে এ ছাড়া কোথায় কী আছে আর? ঘর আছে—সে ঘরে থাকে তার বুড়ী পিসি। সে-ই চারদিক আগলে রাখে—যক্ষের মতো পাহারা দেয় কয়েকটা সুপুরি গাছ—রাত্রে কান পেতে থাকে পুকুরের দিকে। মাছেরই দেশ—তবু লোকের স্বভাব যাবে কোথায়? চুরি করতে না পারলে পেটের ভাত যাদের হজম হয় না, রাত-বিরেতে তারা আসে, ঝপাং করে জাল ফেলে পুকুরে—মোচা চিংড়ি, পোনা মাছ, কাঁকড়া—যা পায় তাই নিয়েই পালায়। পুকুর-ভর্তি কলের কাঁটা ফেলেও নিস্তার নেই তাদের হাত থেকে। তাই বুড়ী সারারাতই কান খাড়া করে থাকে, জলে একটা গোসাপ পড়লেও হুড়মুড় করে ছুটে যায় ঠ্যাঙা নিয়ে।

আর সারারাত পড়ে 'কফ্‌ফলের' মন্ত্র :

'কফ্‌ফল, কফ্‌ফল, কফ্‌ফল—
চোরের রাত্তির নিষ্ফল!
সাপা, চোরা, বাঘা না বাড়াইও পাও—
যদ্দ রে যায় কফ্‌ফলের রাও!'

কিন্তু কফ্‌ফলকে পাহারা দেবার দরকার হয় না। বুড়ী একাই যথেষ্ট।

এক-একদিন চটে যায় সুধাকরের ওপর। প্রাণ খুলে গাল দিতে শুরু করে।

—বিয়ে করবে না, সংসার করবে না, রাতদিন নৌকো আর নৌকো! আমারি বা এমন কোন্ দায়টা ঠেকেছে সংসার আগলে থাকার? আমারও শ্বশুরবাড়ী আছে—ঘরদোর আছে। একদিন চলে যাব সেখানেই।

শুনে সুধাকরের হাসি পায়।

—যাও না, সেখানেই যাও।

—যাবই তো। ভয় করি নাকি তোকে?

—আমাকে ভয় করবে কেন খামোখা? কিন্তু আমি বলছিলাম কে আছে তোমার শ্বশুরবাড়িতে? সব তো কবে মরে হেজে শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখো, ভিটের ওপর এখন শেয়াল চরে বেড়াচ্ছে—ডিম পাড়ছে গোখরো সাপে।

—তা হোক—তা হোক। তবু এই অলক্ষীর সংসারের চাইতে সেই জঙ্গলই আমার ঢের ভালো।

সুধাকর জানে, বুড়ী কোনোদিন যাবে না—সে প্রশ্ন ওঠেও না। তবু মধ্যে মধ্যে তারও কি মনে হয় না এ তার অলক্ষ্মীর সংসার? বউ আসবে, ধানের পালা সাজাবে, চিঁড়ে কুটবে ঢেঁকিতে, শাঁখ বাজাবে সন্ধ্যেবেলায়, বাড়ি ফিরলে মুখধোয়ার জলের ঘটি আর গামছা এগিয়ে দেবে, আর যখন রাত হবে—

যখন রাত হবে, তখন এই ভাঙা ঘরকেই মনে হবে যেন শায়েস্তাবাদের নবাববাড়ি। খড়ের ওপরে ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় নেবে আসবে স্বর্গ। একটা রাত শেষ হয়ে যাবে এক পলকে—সুপুরি বনের মাথার ওপর থেকে এক ডুবে চাঁদটা নদীর ওপারে গিয়ে ভেসে উঠবে!

কিন্তু সে আর হয় না। সুর কেটে গেছে।

মকবুলের মতো নয়। তার কারণ অন্য।

চব্বিশ বছরের সুধাকর ছ'বছর পেছনে ফিরে তাকালো। মুরাদপুরের সোয়ারী নামিয়ে, ভাঁটার টানে নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালো সুধাকর।

ছ' বছর আগেকার সুধাকর। আঠারো বছর বয়েস তখন। বুকের মধ্যে টগবগ করে ওঠে, সব সময়ে নিজেকে আশ্চর্য শক্তিমান মনে হয়। মনে হয়—ইচ্ছে করলে এখন সে লড়তে পারে ডোরাদার বাঘের সঙ্গে, তুফানের মুখে সাঁতার দিতে পারে কালাবদরের জলে, মানুষখেকো কুমিরের মুখ দু হাতে ধরে ছিঁড়ে আলাদা করে দিতে পারে। সেই আঠারো বছর বয়েস: যখন মেয়েদের দিকে তাকালে মন একটা নতুন অর্থে গুঞ্জন করে ওঠে, তাদের চলার ছন্দে রক্তের ভেতর কী যেন ঝিন্‌ঝিন্ করে বাজতে থাকে।

সেই সময় বাইচ খেলা হচ্ছিল রায়মহলে।

বিজয়া দশমী—প্রতিমা বিসর্জনের দিন। গাঁয়ের বাইচের নৌকোয় সুধাকরও এসেছিল। নামকরা বাইচের দল তাদের। এর আগে অনেকবার তারা বাইচ জিতেছে—পাঁচ পাঁচ টাকা করে বকশিশ পেয়েছে প্রত্যেক দাঁড়ী, পেয়েছে একখানা করে কাপড়। বড় রায়কর্তা বলেছেন, টাকা তো দেবেনই, তা ছাড়া একটা করে রূপোর মেডেলও দেওয়া হবে সকলকে।

তাই জোর পাল্লা হবে এবার।

হলও।

সে কি উত্তেজনা! দু পাড় থেকে ঢাক বাজছে—নদীতে নৌকোয় নৌকোয় উঠছে ঢাকের আওয়াজ। ধূপ-ধুনোর সঙ্গে যেন ঘন কুয়াসা জমেছে নদীর ওপরে—হুস্ হুস্ করে সাপের মতন আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে উড়ন-তুবড়ি। দাঁড়ের তালে তালে

হালের মাঝি দমাদম পা ঠুকছে গলুইয়ের ওপর।

দুখানা নৌকো পাশাপাশি চলেছে—সমানে সমানে। বাকীগুলো হাল ছেড়ে দিয়েছে—পিছিয়ে পড়েছে তারা। সুধাকরদের নৌকোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে রায়মহল বাজারের নৌকো।

হঠাৎ রায়মহলের নৌকো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকখানি সরে এল এদিকে। ধাক্কা লাগল সুধাকরদের নৌকোর গলুইয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ওদের নৌকো প্রায় তিন হাত পিছিয়ে সরে গেল।

এটা বে-আইনি—মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধে বাইচের নৌকোয় খুনোখুনি হয়ে যায়—এর আগে হয়েও গেছে অনেকবার।

—মার শালাদের—

বিশাল বাবরী দুলিয়ে পা ঠুকল হালের মাঝি। গোঁয়ার ধরন—গায়ে অসুরের মতো শক্তি, তার ওপর মদ খেয়ে এসেছে লোকটা। বলেই ফস্ করে গলুইয়ের তলা থেকে একখানা রাম-দা বের করে ঘোরাতে লাগল মাথার ওপর, পৈশাচিক গলায় চীৎকার করে উঠল : মার শালাদের—

নদীর দুধার থেকে লোকে হৈ-হৈ করে উঠল, কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। মার্-মার্ শব্দে দু নৌকোতেই দাঁড়িয়ে উঠল আটচল্লিশ জন লোক। বেরুল রাম-দা, বেরুল শড়কী, বেরুল টেটা। তারপর—

সুধাকর একটা বল্লম ছুঁড়ে দিলে রায়মহলের নৌকোয়। কারো গায়ে লাগল না—একটা লোকের কানের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল নদীর জলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা টেটা এসে সুধাকরের হাঁটুতে বিঁধল শতমুখী ফলায়। অসহ্য যন্ত্রণায় টলে উঠল সুধাকর। ঝপ্ করে পড়ে গেল নদীতে।

সেই অবস্থাতেই টেটাটাকে পা থেকে খুলে নৌকোয় ওঠবার চেষ্টা করল সুধাকর। কিন্তু তাকে পেছনে ফেলে নৌকো অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখন। আর তার ওপর লক্ষ্যও ছিল ও নৌকোর—মাথা তুলতে ঝপাং করে একটা বল্লম একেবারে সামনে এসে পড়ল।

নদীর ওপর তখন অন্ধকার নামছে—কালো হয়ে গেছে জল, আবছা আবছা দেখাচ্ছে সমস্ত। কয়েকটা ভেসে-যাওয়া কচুরিপানার সঙ্গে আত্মগোপন করে সাঁতরে চলল সুধাকর—পাড়ে উঠতে পারলে হয়। কিন্তু শরীরে আর বইছে না। ডান পা-টা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে—শতমুখী ক্ষতে নোন্তা জল লেগে একটা দুবিষহ যন্ত্রণার চমক বইছে। সুধাকর বুঝতে পারছিল, আর বেশিক্ষণ এভাবে চলবে না। তার আঠারো বছরের লোহায় গড়া শরীরেও এই মুহূর্তে ভাঙন ধরেছে—বড় বেশি রক্ত

দপ্‌ করছে হৃৎপিণ্ড! হয়তো—

হয়তো? মুহূর্তের মধ্যে সুধাকর অনুভব করতে পারল—সে নিঃশেষিত হয়ে আসছে, মৃত্যু এসে ছায়ার মতো নামছে তার মাথায় ওপরে। আর এক মিনিট—কিংবা দু মিনিট—কিংবা হয়তো আরো কম—তার মধ্যেই সে তলিয়ে যাবে জলের মধ্যে। যে জলটা একসময় পাখীর পাখার মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, সেই জলই এখন একমণ ওজনের একটা গুরুভার বোঝার মতো তাকে আকর্ষণ করছে নিচের দিকে!

শুধু তাই নয়! এ অঞ্চলের জলের সঙ্গে পরিচিত সুধাকর স্পষ্ট একটা অভ্যস্ত শব্দ শুনল পেছনে। ছলাৎ করে একটা আওয়াজ—আরো একটা তারপরে। মুখ ফিরিয়ে চকিতের জন্যে সুধাকর দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড রাঘববোয়ালের মতো বিরাট উজ্জ্বল মাছ ক্রমাগত জলের ওপর লাফিয়ে উঠছে।

কামট! রক্তের গন্ধ পেয়েছে!

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল সুধাকরের গলা দিয়ে। কিন্তু কেউ শুনতে পেল না—শোনবার উপায়ও নেই। বাইচের নৌকোয় তখনো মারামারি চলছে—দুধার থেকে সমান কোলাহল উঠছে আকাশ ফাটিয়ে। তার মধ্যে নদীর কালোজলে কোথায় মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সুধাকর—কে তার খবর রাখে?

ছলাৎ করে শব্দটা আরো কাছে। কামটটা এবারে অনেক কাছে এসে পড়েছে। পালাবার উপায় নেই। রক্তের গন্ধ অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে আনছে তাকে।

সুধাকর চোখ বুজল। সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। উড়ন-তুবড়ীর ফুলঝুরিগুলো শেষবারের জন্যে চোখের সামনে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল।

সেই তখন—

একটা কী তাকে আঁকড়ে ধরল, কিন্তু সে কামটের দাঁত নয়, মানুষের হাত। তারপর—সুধাকর যখন চোখ মেলল তখন সে রায়মহলের ছোট কর্তার বজরায়।

নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন ছোট কর্তা। বেপরোয়া মেজাজের লোক। নেশায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি—চরিত্রে গুণের ঘাট নেই। পাড়ার ঝি বউ সন্ত্রস্ত থাকে তাঁর ভয়ে। বিয়ে একটা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী ছ'মাসের বেশি টিঁকতে পারেননি। শোনা যায়, আফিং খেয়েছিলেন। ডাক্তার কবিরাজে তাঁকে বাঁচালো, কিন্তু ছোট কর্তার সংসারে তিনি আর রইলেন না। কিছুদিন পরে বাপেরবাড়ির লোক এসে ছোট গিন্নীকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। আর ফিরে আসেননি তারপরে।

কিন্তু ছোট কর্তা নিরঙ্কুশ সেই থেকে।

রেসের মরশুমে কলকাতা যান—মাসকয়েক থাকেন। তারপরে আবার গ্রাম।

দিনদুপুরেই পড়ে থাকেন মদে চুর হয়ে—নিজের রক্ষিতা নিয়ে বেড়াতে বেরোন খোলা নৌকোয়।

আজো বিজয়ার দিনে বেরিয়েছিলেন রঙ চড়িয়েই।

তাঁরই বজরার মাঝিরা তুলে এনেছে সুধাকরকে।

চোখ মেলতেই সুধাকর দেখল গোলগাল ফর্সা একটি মুখ। পানের রসে রঙানো টুকটুকে ঠোঁট। পরনে নীলাম্বরী শাড়ী—হাতে সোনার চুড়ির ঝলক।

—একটু ভালো আছো এখন?

কথা তো নয়—যেন গানের সুর।

বজরার ভেতরে গ্যাসের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় যেন মায়াপুরীর মতো মনে হল সমস্ত। পায়ের পাতায় টেটার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গেল সুধাকর। তাকিয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

একটা গম্ভীর গম্‌গমে গলা এল এবার।

—লোকটাকে এখন নামিয়ে দাও ডাঙ্গায়। বাড়ি চলে যাক।

সেই ফর্সা সুন্দর মুখখানা ভরে উঠল করুণায়। দুটি কালো চোখ চকচক করে উঠল।

—না-না! দাঙ্গার পরে পুলিসে সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওকে পেলে এখুনি নিয়ে যাবে থানায়।

—তা হলে কী করা যায়! আবার সেই গম্ভীর জড়ানো গলাটা শুনতে পাওয়া গেল: কী করতে চাও একে নিয়ে?

সুধাকর তাকিয়ে দেখল। প্রকাণ্ড মুখ—কালিপড়া কোটরের ভেতরে রাঙা টক্‌টকে চোখ। ছোটবাবু।

সুন্দর মানুষটি বললে, আজ আমাদের ওখানেই নিয়ে চলো।

—কী বলছ তুমি? একটা দাঙ্গার আসামীকে নিয়ে—

—সে আমি বুঝব। তোমায় ভাবতে হবে না।

সেই মিষ্টি মুখের কথা। কিন্তু কথা নয়—আদেশ। ছোট কর্তা বললেন, বেশ, তাই হবে।

তারপর—

তারপরের অভিজ্ঞতা কী করে ভুলবে সুধাকর? সে যেন স্বপ্নের ঘোরে পরীর দেশের আশ্চর্য কাহিনী। বাইচের নৌকো থেকে রূপকথার রঙমহলে।

সুধাকর আবার কখন যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল কে জানে। যখন ঘোর ভাঙল তখন পিঠের নীচে দুধের মতো নরম বিছানা। সামনে ছোট টেবিলে একটা কাচের

গ্লাসভর্তি গরম দুধ। আর—আর সেই স্বপ্নময়ী মেয়েটি। একটা চেয়ারে তারই মুখোমুখি বসে আছে।

আবার সেই গানের সুর শোনা গেল।

—নাও, এই দুধ খাও।

সুধাকর চোখ কচলালো। ব্যাপারটা এখনো বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না তার।

—উঠে বোসো, খেয়ে নাও দুধটা।

আদেশ। সুধাকরকে উঠে বসতে হল। পরনে ভিজে কাপড়টা নেই—একখানা মসৃণ ধুতি কে যেন জড়িয়ে দিয়েছে। পায়ে যেখানে টেঁটার ঘা লেগেছিল, সেখানে একটা পুরু ব্যাণ্ডেজ। যন্ত্রণা আছে, তবু আঠারো বছরের শরীরটা আবার শক্তি আর লঘুতায় ভরে উঠেছে।

—দেখুন, এবার আমি যাই।

—এখনি যাবে কোথায়? আজ রাতে বিশ্রাম করো এখানে। তোমার কোনো ভয় নেই—এ বাড়িতে পুলিস আসবে না।

—দেখুন, আপনারা আমাকে—

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করলে। বিহ্বলতার নেশা লাগল সুধাকরের।

মেয়েটি বললে, আমাকে অত আপনি-আপনি করছ কেন? আমি এ বাড়ির গিন্নী নই।—

—তা হলে আপনি—

—আমি কে, পরে বলছি। তোমার নাম কী?

—আমার নাম সুধাকর।

—সুধাকর! বেশ নাম। মেয়েটি মনে মনে যেন আউড়ে নিলে একবার: কী জাত?

বলতে গিয়ে একটা ঢোঁক গিলল সুধাকর। এই ঘর, দুধের ফেনার মতো নরম বিছানা, সামনে বিচিত্র চেহারার ওই ঝাড়লণ্ঠনের আলো, আর এই আশ্চর্য মোহময় মেয়েটি। এখানে নিজের পরিচয় আরো একটু বুক ফুলিয়ে বলতে পারলে হত। ভালো হত আরো গর্বের সঙ্গে বলতে পারলে। কিন্তু কুঁকড়ে গিয়ে সুধাকর বললে, আমরা জাতে জেলে।

—আমি কপালীর মেয়ে। রাধা আমার নাম।

কপালীর মেয়ে! চকিত বিস্ময় চলকে পড়ল সুধাকরের চোখ থেকে। তা হলে—! তারপরেই লোকশ্রুতিতে শোনা ছোটবাবুর কাহিনী মনে পড়ে গেল সুধাকরের। ছোট কর্তা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র লোক, নিজের স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে—

রক্ষিতা নিয়ে থাকে—

সুধাকর শিউরে উঠল একবার। রক্ষিতা! জেলের ছেলে সুধাকরেরও সর্বাঙ্গে একটা ঘৃণার ঢেউ বয়ে চলে গেল। একবার মনে হল—

কিন্তু পরক্ষণেই রাধার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখল সে। কাকে ঘৃণা করবে সে—কাকে ভাববে রক্ষিতা। বয়েসে তারই সমান হবে মেয়েটি—রূপ আর যৌবন ফেটে পড়ছে পাকা ডালিমের মতো। কপালীর ঘরে এমন মেয়ে কোথা থেকে জন্মায়—কী করেই বা জন্মায়?

রাধা বললে, কাজেই বুঝতে পারছ আমার কাছে তোমার লজ্জার কিছু নেই। আমাকে আপনি-আজ্ঞেও করতে হবে না। এখন এই দুধটা খেয়ে নাও।

এবার আর দুধের গ্লাস তুলে নিতে আপত্তি রইল না কোথাও।…

—আপন ডাইন, আপন ডাইন!

একটা তীব্র চীৎকার। সুধাকরের ঘোর ভেঙে গেল। ক্ষিপ্র হাতে নৌকোকে সামলে নিলে সে। খালের বাঁক ঘুরে আর একখানা নৌকো যে আসছিল, তার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ছইয়ের বাতাগুলো কট কট করে উঠল—ও নৌকো থেকে একটা লগি ঝপাস করে পড়ে গেল জলের ভেতরে।

—এই মাঝির পো—চোখ থাকে কোন্ দিকে? নৌকো বাইতে শেখোনি এখনো?—বিপরীতমুখী নৌকো থেকে ধমক এল।

লজ্জিত সুধাকর জবাব দিল না।

বেলা তিন প্রহর। আরো দুটো বাঁক সামনে। রোদের রঙ হলদে হয়ে আসছে। সুধাকরের মন ফিরে এসেছে বাস্তবের সীমায়। চোখ পড়ল পাশে একটা মস্ত কচুরি-দামের ভেতরে কুচো চিংড়ি লাফাচ্ছে।

সুধাকর ঝুপ করে লগিটা পুঁতে ফেলল। তারপর কচুরির ঝাঁকটাকে টেনে তুলল নৌকোর ওপর। অনুমান নির্ভুল। প্রায় আধপো কুচো চিংড়ি আর গোটা-কয়েক ডারকিনা মাছ ছটাং ছটাং করে লাফাতে লাগল চারদিকে।

—নে জুয়ান, খা। তোর ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়।

জুয়ানকে নিমন্ত্রণ করবার দরকার ছিল না। যেমন করে ছোট ছেলেপুলে এক একটা করে মুড়ি কুড়িয়ে খায়, তেমনি ভাবেই সে মাছগুলোর সদ্‌গতিতে লেগে গেল।

আবার নৌকো ছাড়ল সুধাকর।

মকবুল—রোকেয়া! গোলামের বাদশাজাদী পাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু সে নিজেও তো—

কিছুতেই তো ভোলা যাচ্ছে না রাধাকে। বারে বারে মনে পড়ছে—একটা

দুঃসহ যন্ত্রণায় মনে পড়ে যাচ্ছে ! সুধাকর ঠোঁট কামড়ে ধরল।

সেই রাত। সে তো শেষ রাত নয়। আঠারো বছরের সুধাকরকে রাধা বলেছিল, আবার এসো।

—কিন্তু এখানে ?

—কোনো ভাবনা নেই। সন্ধ্যার পরে বাবুর আর সাড় থাকে না।

তা থাকে না। কিন্তু সেজন্যে ছোট রায়কর্তার কোনো লজ্জা-সংকোচের প্রশ্ন নেই। তিনি নিজেই গর্বভরে অনেকবার বলেছেন, সন্ধ্যের পরে কোনো ভদ্রলোক কী করে যে চোখ মেলে তাকায় আমি তো সেকথা ভেবেই পাইনে।

নিঃসন্দেহ। খাঁটি ভদ্রলোক হতে গেলে সন্ধ্যের পরে কিছুতেই চোখ খুলে রাখা উচিত নয়। কিন্তু সুধাকর তো ভদ্রলোক নয়। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার তার রক্তে একটা কিসের যেন ঘুম ভাঙায় : প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন তার বুকের মধ্যে মৃদঙ্গের আওয়াজের মতো ঘা দিতে থাকে। রাত্রির আড়ালে আড়ালে যারা শিকার খুঁজে বেড়ায়—তাদের মতোই কতগুলো খরধার নখ-দন্তের অস্তিত্ব নিজের মধ্যে অনুভব করতে থাকে সুধাকর। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠো দুটো যেন থাবা হয়ে যায়—বন-বেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে দৃষ্টি।

সুধাকর ভদ্রলোক নয়। তাই রাত্রিই তার সময়।

প্রথম দিন রাধাই দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায়। খিড়কির ধারে।

—আপনি ?

—আবার আপনি ?—রাধা ধমক দিয়ে উঠেছিল : আমি কপালীর মেয়ে। নাম ধরেই ডেকো আমাকে।

একবার তাকিয়ে দেখল সুধাকর। কানে সোনার দুল দুটো ঝকঝক করছে। কপালের উল্‌কিটা যেন রাজটীকা। তবু রাজকন্যা নয়—রাধা।

রাত্রির নেশা তখন একটু একটু করে কাঁপছে রক্তে। আকাশে নক্ষত্ররা বিহ্বল। গাছের ডালে ডালে অতন্দ্র বন-বেড়াল ঘুরছে শিকারের সন্ধানে। সেই বন-বেড়ালের লুব্ধ পিঙ্গল চোখের মতোই জ্বলে উঠল সুধাকরের চোখ।

সেই মুহূর্তের প্রভাবে সুধাকর বলেছিল, বেশ তাই হবে। কিন্তু তুমি আমায় ডেকেছ কেন ?

—সেকথা তো এখানে বলা যাবে না। চলো ভেতরে।

—ভেতরে ? একবারের জন্যে কুঁকড়ে গিয়েছিল সুধাকর। কিছুই বিশ্বাস নেই —কে জানে কোথায় অপেক্ষা করে আছে একটা বিপজ্জনক ফাঁদ। ছোট রায়কর্তা যদি টের পান—

রাধা বলেছিল, কোনো ভয় নেই। আমি বলছি, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

সত্যিই ভয় ছিল না। নেশায় বেঘোর হয়ে একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছেন রায়কর্তা। পড়ে আছেন উবুড় হয়ে মস্ত ফরাসের ওপর। রাধার পায়ের শব্দ শুনে জড়ানো গলায় কী যে বললেন সেটা বোঝাও গেল না।

কী করে সেই রাতকে ভুলবে সুধাকর? কেমন করে ভুলবে সেই আশ্চর্য রূপকথা?

কত সহজে নিজের কথা বলেছিল রাধা! কত অবলীলাক্রমে কপালীর মেয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিল জেলের ছেলের কাছে!

সে-মুখ সুধাকর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখনো। পদ্মফুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে জলের বিন্দু।

—আমি আসতে চাইনি, কক্ষনো আসতে চাইনি এখানে। একমুঠো টাকা নিয়ে আমার কাকা আমাকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল জমিদারের বজরায়।

তারপর—

তারপর চার বছরের ইতিহাস। অন্ধকার আর অন্ধকার। টাকা-গয়না সব পেয়েছে রাধা। কিন্তু আর কিছুই তো পায়নি। রায়কর্তার ঘরে আরো অনেক পুতুলের মতো তাকেও সাজিয়েই রাখা হয়েছে শুধু। আরো বহু মেয়ে এসেছে এর মধ্যে—একটার পর একটা শূন্য মাটির ভাঁড়ের মতো তাদের দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে ছোটকর্তা।

রাধা তার পাটরাণী। তবু—

সেই বৃষ্টি-ধোয়া পদ্মের মতো মুখখানা রাধা তুলে ধরেছিল সুধাকরের দিকে।

—নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে—নিয়ে যাও। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে ছেড়ে দাও। নতুন করে ঘর বাঁধতে না পারি, ভিক্ষে করে খাব।

শিউরে উঠে পালিয়ে এসেছিল সুধাকর।

সেই শেষ নয়। তারপরে আরো। আরো অনেক সন্ধ্যা। অনেক প্যাঁচার ডাক—ঝম্‌ঝম্ ঝিম্‌ঝিম্ রাতের অনেক বুক-দুরু-দুরু প্রহর। সব শেষে রাধা সুধাকরের দু'হাত জড়িয়ে ধরেছিল।

—নিয়ে যাও এখান থেকে, নিয়ে যাও আমাকে। অনেক সোনার গয়না আছে আমার, অনেক টাকা আছে। কোনো কষ্ট হবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুধাকর বুঝেছিল, বড় বেশি এগিয়ে গেছে সে। পা দিয়েছে সাপের গর্তে।

রাধা বলেছিল, চলো শহরে যাই। তুমি বিড়ির দোকান করবে—আমি পান সেজে দেব। কোনো অভাব আমাদের থাকবে না। না—না, এ শহরে নয়—

কলকাতায়। আমি দেখেছি কলকাতা। কত বড়—কত লোক! সেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না—

ঠিক সেই সময় হঠাৎ শোনা গিয়েছিল চটির আওয়াজ। ছোটকর্তা। আজ নেশাটা তাঁর মাঝপথে যেন চটে গিয়েছিল—কে জানে!

পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়েছিল সুধাকর।

সেই থেকে রাধাও মুছে গেল চিরদিনের মতো। আর রাধার কোনো খবর পায়নি সে। ছোটকর্তার যে মাঝিটা চুপি চুপি রাধার খবর নিয়ে আসত তার কাছে সে-ও কোনো হদিস দিতে পারেনি আর।

কী হল রাধার?

কেউ ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল ছোটকর্তা তার গলা টিপে মেরেছে। কেউ বলে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে কোথাও। কেউ বা আন্দাজ করে—রাধা নিজেই পালিয়ে গেছে ছোটকর্তার খপ্পর থেকে—কোনো মনের মানুষকে নিয়ে ভেসে পড়েছে যেদিকে চোখ যায়।

মনের মানুষ?

বুকের ভেতরে জ্বালা করে সুধাকরের। আঠারো থেকে চব্বিশ—এই ছ'বছরের পরেও সে জ্বালা এখনো অনির্বাণ। আজো সে বিশ্বাস করে রাধা যদি কারো খোঁজে বেরিয়ে পড়ে থাকে, তবে সে সুধাকর ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু এখনো সে তাকে খুঁজে পায়নি। এক-একটা বাঁকের মুখে পড়ে যেমন আনাড়ি মাঝির নৌকো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে অথচ বেরিয়ে আসবার পথ পায় না—সে দশা রাধারও। যদি বেঁচে থাকে—তবে আজো সে সুধাকরের জন্যেই বেঁচে আছে।

কয়েকবারই ভেবেছিল, একদিন রাতে ধারালো একটা দা নিয়ে সে ঢোকে রায়-কর্তার বাড়ি। নেশায় অচেতন ওই প্রকাণ্ড লাশটার বুকের ওপর চেপে বসে, তারপর প্রশ্ন করে: বলে দাও, কোথায় আছে রাধা। নইলে এই দা দিয়ে গলা দু'খানা করে ফেলব তোমার!

কিন্তু সে আশাও সুধাকরের মেটেনি। আজ প্রায় চার বছর আগে কলকাতায় ছটফটিয়ে মরে গেছে ছোটকর্তা। যকৃতে জল হয়েছিল তার।

সেজন্যে একবিন্দু দুঃখ নেই। শুধু এই ক্ষোভটাই সে কিছুতে ভুলতে পারছে না যে মরে গিয়ে ছোটকর্তা চিরদিনের মতোই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে রাধাকে। আর তাকে ফিরে পাবার পথ নেই কোথাও।

তবু সুধাকর অপেক্ষা করবে।

ছ'বছর কেটে গেছে। আরো কতদিন যাবে জানা নেই। কিন্তু রাধাকে না

পাওয়া পর্যন্ত তো সুধাকরের বুকের উপবাসী জন্তুটা তৃপ্তি মানবে না কিছুতেই ; আর কাউকে তো সে ঠাঁই দিতে পারবে না মনের মধ্যে। আর কাউকে নিয়ে তো তার ঘর বাঁধবার উপায় নেই। তাতে যদি তার ঘর চিরদিন শূন্য থাকে তবে তাই থাক।

…একটা বাঁক ঘুরে সুধাকরের নৌকো এবারে গাঙে এসে পড়ল। লাল আলো পড়েছে জলে, কেমন অদ্ভুত লাগছে দেখতে। জোয়ারের ঘোলাজলে দিনান্তের শেষ রঙ্‌ দেখে মনে হচ্ছে যেন মোষবলি হয়ে গেছে একটা—রক্তে আর কাদায় চারদিক একাকার।

সামনে গঞ্জ। নৌকোর সারি এখনো তেম্‌নি করে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। দুটি-চারটি সরেছে বটে, কিন্তু জমেছে আরো বেশি। পূজোর পরে কেরায়া নৌকোর মাঝিদের বড় দুঃসময় এখন।

তার মধ্যে মকবুলের নৌকো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। ওর ভাড়াটে জোটেনি। জীবনের সব কিছুই ওর ফাঁকা—নৌকোও যে ফাঁকা পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী।

॥ ৩ ॥

—এলে ?—নৌকো লাগাতেই মকবুলের প্রশ্ন।

—এলাম। পাল্‌টা উত্তর সুধাকরের।

মকবুলের পাশেই খালি জায়গা ছিল একটা। সুধাকর নৌকো ভেড়ালো সেখানে।

—এবেলাও ফাঁকা গেল তা হলে ?—প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল না, তবু সুধাকর সেটা থামাতে পারল না।

জিজ্ঞাসা করেই সে লজ্জা পেল।

—আমার কী ? ভাড়াটে জুটল না ইদ্রিশ মিঞার—আমি কী করব ? আমি চিনির বলদ—বোঝা টেনে চলেছি, টেনেই চলব। এক-আধটা দিন ছুটি পাই তো হাত পা ছড়িয়ে বেঁচে যাই।

—কিন্তু মাইনে কেটে নেবে যে !

—নিকুগে যাক। আমার তো এম্‌নি উপোস—অম্‌নিও উপোস। একমুঠো আমানি ভাত না জোটে মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকব।

সুধাকর কিছুক্ষণ মকবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। মকবুলের মুখ থেকে দুপুরের সেই ছায়াটা এখনো সরে যায়নি। রোকেয়া বিবি ! এখনো ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে বুকের ভেতরে।

সুধাকর ছইয়ে বসল হেলান দিয়ে। একটা পোষা বেড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে

ঘুমুচ্ছে উদ্টো। সস্নেহে সুধাকর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেড়ালের ডাকের মতোই একটা গুরগুরে আওয়াজ বেরুতে লাগল তার গলা দিয়ে।

একটু দূরে দুখানা বড় ভাওয়ালি নৌকো তখন এসে লেগেছে। সুধাকরের চোখ সেদিকে পড়তেই মকবুল জবাব যুগিয়ে দিলে।

—গানের দল এসেছে আজ। ঢপ-কীর্তনের দল। বারোয়ারীতলায় গান হবে।

—আজই?—সুধাকর চকিত হয়ে উঠল।

—তাই তো শুনেছি।

—একবার গেলে হত শুনতে। কখন লাগবে?

—সন্ধ্যের পরেই। তা যেতে চাও যাও না।

—তুমি যাবে?

—আমি?—মকবুল একবার উদাস আর উদার দৃষ্টিতে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকালো: কিন্তু আমি গিয়ে কী করব? আমি মুসলমান, আমাকে তো আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

—আর ভেতরে ঢুকলে আমাকেই বুঝি ফরাসে বসিয়ে তামাক খেতে দেবে? সুধাকর হাসল: সব গরীবেরই এক অবস্থা ভাই, হিন্দু মুসলমান বলে কোনো কথা নেই। বেশ তো, দুজনেই নয় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। গান শোনা নিয়ে কথা।

—তবে চলো।—নিরাসক্ত উত্তরটা প্রায় নদীর বাতাসেই ছেড়ে দিলে মকবুল।

রাত্রে আর রান্নার পাট করবার উৎসাহ নেই। সুধাকরের নয়—মকবুলেরও না। তাড়াতাড়ি চারটি চিঁড়ে চিবিয়ে নিলে দুজনে। সকালের একমুঠো ভাত আছে, আর আছে দুটো কুচো চিংড়ি। ওদের ওতেই কুলিয়ে যাবে।

তারপর রওনা হল গান শুনতে।

বন্দরের অবস্থা জমজমাট ছিল এককালে—এখন ভাঙনদশা। অর্ধেক নদীতে নিয়েছে—সে আমলের বনেদী বাড়িগুলো এখন নিশ্চিহ্ন। তা ছাড়া পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছে ঝালকাঠির বন্দর—এখানকার ঐশ্বর্য গিয়ে সংহত হয়েছে সেখানে। এর অর্ধেক এখন শূন্যপুরী। ধানচালের যে কারবার এখানকার সব জায়গাতেই চলে, তারি কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে এখন। আট-দশ ঘর বড় বড় সাহা আছে আর আছে দুটো ধানের কল। সেগুলো সরে গেলেই সব অন্ধকার।

বারোয়ারীতলা সেই অতীত আমলের। রাধাকৃষ্ণের মস্ত মন্দির আছে—আছে নাটমন্দির। তারাও ভাঙতে শুরু হয়েছে—কেউ বিশেষ হাত লাগায় না আর। যতদিন আছে ততদিনই চলবে, তারপর যেদিন ঝুপঝুপিয়ে ভেঙে পড়বে সেদিন একেবারেই মিটে যাবে সমস্ত।

তবু রামধন সাহার এক-আধটু নজর আছে এদিকে। তারই চেষ্টায় কিছু কিছু জমে আছে বারোয়ারীতলা। এই গানের ব্যবস্থাও তারি উদ্যোগে।

দুজনে যখন পৌছুল, তখন গান শুরু হব-হব করছে। এর মধ্যেই বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। মকবুলের চিন্তার কারণ ছিল না, ভেতরে ঢোকবার পথ এমনিতেই বন্ধ। আরো দশজন মাল্লা-মাঝি-গরীবের সঙ্গে সিংহ-দরজার বাইরেই দাঁড়ালো তারা।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, উঁচু নাটমন্দিরের ওপর দুজন বৈরাগী অল্প অল্প খোলে চাঁটি দিচ্ছে, জন দুই ঝম্‌ঝম্‌ করছে করতাল নিয়ে। রামধন সাহা গলায় সিল্কের চাদর জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন—হাতজোড় করে কী যেন বললেনও সবাইকে। কিন্তু চারদিকের প্রচণ্ড গোলমালে তার একটি বর্ণও শোনা বা বোঝা গেল না।

কিন্তু তার পরেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল সব। জনতার কোলাহলের ওপর দিয়ে তীরের মতো তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় ভেসে এল :

"ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস,
পদতলে লুটই সো পীতবাস!
সখিরে, যাক দরশ বিনু ঝুরই নয়ান—
অব নাহি হেরসি তাকে বয়ান—"

ঢপের প্রধান নায়িকা এসে দাঁড়িয়েছে আসরে। সাদা শাড়ির জরিপাড়টা চকচক করছে—মোটা একছড়া গোড়ের মালা দুলছে তার গলায়। এত দূর থেকে তাকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যতদূর অনুমান করা যাচ্ছে মেয়েটি সুন্দরী—রীতিমতো সুন্দরী।

মকবুল বললে, বেড়ে গাইছে—না?

সুধাকর সংক্ষেপে বললে, হুঁ!

"সুন্দরী তেজহ দারুণ মান—
পদতলে লুটই রসিক কান—"

সভা স্তব্ধ। এতগুলো মানুষ নিঃশব্দ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা দুলছে শুধু, কখনো বা টান পড়ছে হাতের বিড়ি সিগারেটে।

গাইতে গাইতে মেয়েটি মুখ ফেরালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাপের ছোবল খেল সুধাকর। আর্তনাদের মতো চাপা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

—কী হয়েছে?—প্রশ্ন করল মকবুল। চারপাশের মানুষগুলো ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলল সুধাকরের ওপর।

কিন্তু ততক্ষণে শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমেছে সুধাকরের মাথায়। বুকের ভেতরে

পড়েছে হাতুড়ির ঘা। বিশ্বাস করা যায় না—তবুও মিথ্যে নয়! ওই মেয়েটি—

আর কেউ হতেই পারে না। রাধা!

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুধাকর। গানের একটি বর্ণও আর কানে আসছে না। মাথার মধ্যে একরাশ কুয়াশা পাক খাচ্ছে। বুকের ভেতরে যেন এক্সপ্রেস স্টীমারটা চলছে, আর রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মাথার খুলিতে।

সামনের পাঁচ-সাতশো মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর মাঝির ছেলে সুধাকরের সাধ্য কি এখন হাত বাড়ায় রাধার দিকে! আকাশের চাঁদের চাইতেও অনেক দূরে—ধরা ছোঁয়ার সীমার বাইরে সরে গেছে রাধা।

মকবুল আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ফিস্‌ফিস্ করে বললে, খাসা চেহারা, খাসা গান!

সুধাকর বললে, হুঁ।

কিন্তু কতক্ষণ এভাবে থাকা যায় আর? একটা বন-বেড়াল যেন হৃৎপিণ্ডটাকে আঁচড়ে চলেছে সমানে। কপালের ওপরে খর খর বিঁধছে একরাশ তীক্ষ্ণধার কাঁটা। খানিক পরেই সুধাকর বললে, তুমি গান শোনো, আমি নৌকোয় ফিরে যাই।

—সে কি কথা! এই তো সবে জমে উঠেছে!—মকবুলের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

—আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে—আর থাকতে পারছি না।

—কিন্তু বড় ভালো গান হচ্ছে যে।

—তা হোক।

মকবুল আর আপত্তি করল না। তাঁর সারা মন পড়ে রয়েছে গানের দিকে।

সমস্ত মানুষ যখন দু'কান ভরে রাধার গান শুনছে—তখন আসর থেকে একা বেরিয়ে এল সুধাকর। বন্দরের অন্ধকার পথটাকে আরো কালো মনে হচ্ছে এখন। পায়ের নিচে মাটিটা কালাবদরের ঢেউয়ের মতো দুলছে। ছ' বছরের ক্ষুধার্ত জানোয়ারটা এখন আর এক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করতেও রাজী নয়!

রাধা! এতদিন পরে যখন পেয়েছে—তখন আর ছাড়বে না। সেদিন আঠারো বছরের মন নিঃসংশয় হতে পারেনি—ছোটবাবুর প্রেতমূর্তিটা সব সময়ে চোখের সামনে যেন ভেসে বেড়াত। কিন্তু এই ছ'বছরে অনেক গাঙ্ পাড়ি দিয়েছে সুধাকর—অনেক কালবৈশাখীর মুখে পাল তুলেছে মাতাল নদীতে। গত শীতকালে বল্লম দিয়ে চিতাবাঘও মেরেছে একটা। চব্বিশ বছরের সুধাকর এত সহজেই হাল ছাড়বে না।

* * *

মকবুল ঘাটে ফিরল রাত এগারোটার পরে। মুখে গুন্ গুন্ গান। অদ্ভুত পরিতৃপ্ত সমস্ত মন। এমন কি রোকেয়া বিবির ক্ষোভটাও ভুলে গেছে আপাতত।

—কী দোস্ত, ঘুমিয়েছ?

ঘুমোবার সাধ্য কি সুধাকরের! অসহ্য যন্ত্রণা চমকে বেড়াচ্ছে সর্ব শরীরে। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে বেরিয়ে ডাকাতি-খুনোখুনি যা হোক একটা কিছু করে আসে!

—কী মাঝির পো, ঘুমে বেঘোর নাকি?

আবার জিজ্ঞাসা এল মকবুলের। কিন্তু সুধাকর জবাব দিলে না, পড়ে রইল মুখ গুঁজে। কথা বলবার মতো কোনো উদ্যম তার অবশিষ্ট নেই। আর কী-ই বা বলবার আছে? হয়তো মকবুলকে ব্যথার ব্যথী করা চলে, একটা উপদেশ চাওয়াও যায় তার কাছে। কিন্তু সব কথা খুলে বলার মতো মানসিক প্রশান্তি এখন নেই সুধাকরের। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

মকবুল আর ডাকল না। সুধাকর কান পেতে শুনতে লাগল তার সুরের গুঞ্জন—রাধার গানই নিশ্চয়! তারপরে লণ্ঠন জ্বালল, তামাক সাজল, অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেল। কল্‌কেটা নদীর জলে উবুড় করে ফেলার ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ আওয়াজ পর্যন্ত কানে এল সুধাকরের।

মকবুল এবার গলা ছাড়ল:

মুখ তুলে চাও সজনি—
তোমারি নাম বাঁশিতে মোর
বাজে লো দিন-রজনী।

রাধার গান! একটা অদ্ভুত হিংস্রতায় সুধাকরের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। থামো থামো। ও আমার রাধার গান—ওর ওপরে তোমাদের কারো কোনো দাবি নেই। কিন্তু সে-কথা কিছুতেই বলা গেল না, দাঁতে দাঁত চেপে সুধাকর পড়ে রইল।

রাত বাড়তে লাগল—কৃষ্ণপক্ষের রাত। বন্দর নিঝুম হয়ে গেল—। স্টীমার-ঘাটের কাছে যে কেরোসিনের আলোটা জ্বলে সেটা নিবু-নিবু হয়ে এল। পন্টুন থেকে কখন একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল ঘাটবাবু—কাল সকালের আগে আর সে আসবে না। নদীর অনেকটা দূর দিয়ে আবার একটা ডেস্‌প্যাচ চলে গেল—ঢেউ এসে নৌকোগুলোকে দোলাতে লাগল দোলনার মতো—পাড়ের ওপর উঠল আছড়ে-পড়া জলের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ।

আবার সব নিথর। স্টীমার-ঘাটের আলোটা নিভে গেছে এখন। শুধু জলের কলশব্দ। থমথমে রাত নেমে এসেছে চারদিকে—নদীটাকে কেমন আদি-অন্তহীন মনে হচ্ছে এখন। কেমন অদ্ভুত গুমোট রাত—কেমন ছাইরঙের অন্ধকার। হঠাৎ মনে হয় এর পরেই উঠবে একটা প্রচণ্ড 'কাইতান'—কার্তিকের ঝড়!

এই রকম এক-একটা রাত মাঝিদের বুকে ভয় ধরায়। এমনি এক-একটা থম্‌থমে অন্ধকারে নদীর চাপা শব্দটা যেন একটা গোপন-অর্থে ভরে ওঠে—হঠাৎ সন্দেহ হয় জলের মধ্যে কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা কইছে। একটু কান পেতে শুনলেই সে কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে।

কারা কথা কইছে? কারা তারা?

সুধাকর জানে—মকবুল জানে—এ অঞ্চলের সমস্ত মাঝিরাই জানে। নদী—মা! জল দেয়, অন্ন দেয়। জ্যোৎস্নার রঙে—ভোরের আলোয় রূপসী হয়ে মন ভোলায়। কিন্তু! কিন্তু এই সব রাত্রে? তার অতল তলায় যারা আছে তাদের ঘুম ভাঙে। কত মানুষ ডুবে মরেছে এই নদীর জলে, দায়ের আর বল্লমের ঘায়ে কত লোককে খুন করে ডাকাতেরা এই সর্বনাশা জলেই ভাসিয়ে দিয়েছে, গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করেছে কত জন—কত জনকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে! এম্‌নি এক-একটা নিশি-পাওয়া রাত্রেই তাদের ঘুম ভাঙে। তখন কুমিরেরা ভয়ে ডাঙার দিকে পালিয়ে আসে, কামট, পাঙাশ আর ইলিশ মাছের দল আতঙ্কে নদীর তলায় কাদা কামড়ে পড়ে থাকে —একটা শুশুক পর্যন্ত ডিগ্‌বাজী খায় না। আর তখন—

তাদের যারা দেখে তারা শিবনেত্র হয়ে যায়। টকটকে লাল চোখে কোনো দৃষ্টি থাকে না—মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে বোবা গোঙানি। তারপর তিন দিনের দিন জরবিকারে মরে যায়, নয়তো দু'ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ওলাউঠোয়—মরা-মাঝির নৌকো স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চলে যায় যেদিকে খুশি।

সুধাকরের বুকটা গুর গুর করে উঠল।

ভয় নয়—তার রক্তের তলা থেকেও অম্‌নি একটা প্রেত উঠে আসতে চাইছে। কী অন্ধকার—কী বীভৎস অন্ধকার! পাতলা একটা মেঘের আস্তর ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, যেন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে রাতটা।

এই রাত! এই রাত সব সময়ে আসে না। কিন্তু যেদিন আসে—

সুধাকর চোরের মতো উঠে পড়ল। জলের শব্দ—দূরে ব্যাঙের ডাক। দু'একটা বোয়াল মাছ ছলাৎ ছলাৎ করছে ইতস্তত:। সুধাকর নৌকো থেকে নেমে গেল নিঃশব্দে।

বন্দরের অন্ধকার পথ দিয়ে নিঃসাড়ে চলল সুধাকর। একটা গোসাপ পালিয়ে গেল সামনে দিয়ে—দু'তিনটে শেয়াল জলজ্বলে সবুজ চোখে তার দিকে তাকিয়ে পাশের ঝোপগুলোতে গা-ঢাকা দিলে। আচমকা হাওয়া দিল একটা—এদিক-ওদিকের সুপুরিবন থেকে দুটো চারটে পাকা সুপুরি টুপটুপ করে ঝরে পড়ল।

হঠাৎ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধাকর। একটু দূরেই একটা লণ্ঠন আসছে।

—ঘুমের মানুষ—জাগো—হো—

চৌকিদার। দেখতে পেলে এমনি ছাড়বে না—আধঘণ্টা ধরে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—নইলে হয়তো টেনেই নিয়ে যাবে থানায়। কয়েকটা বন্যগাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল সুধাকর।

—ঘুমের মানুষ—জাগো—হো—

ডাকতে ডাকতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল চৌকিদার। হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁক ঘুরে।

আরো খানিক নিঃসাড় হয়ে রইল সুধাকর। তারপরে আবার চোরের মতো এগোতে লাগল বন্দরের পথ ধরে। পায়ের কাছে ঝপাৎ করে কী পড়ল—দুরদুর করে উঠল বুক। নাঃ—ভয়ের কিছু নেই। কটায়-খাওয়া একটা শুকনো নারকেল খসে পড়েছে গাছ থেকে।

কিন্তু এই তো—বারোয়ারীতলা। এখানেই আস্তানা নিয়েছে ঢপের দল।

সদরের বড় দরজাটা বন্ধ। ভেতরেও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলো যেন ভূতুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একবারের জন্যে অনিশ্চিত হয়ে রইল সুধাকর। কিন্তু আর উপায় নেই। এত দূর যখন এসেছে—কোনো মতেই ফিরে যাওয়া চলে না। এই ভূতে পাওয়া সর্বনেশে রাত্রে তাকেও যেন ভূতে পেয়েছে। যা হওয়ার হোক—একটা কিছু সে করে যাবেই। যেমন করে হোক—রাধার কাছে তাকে পৌঁছুতেই হবে।

কিন্তু!

এই ছ'বছর পরে রাধা যদি তাকে চিনতে না পারে? যদি ছ'টা বছর নদীর জলের মতোই একেবারে মুছে গিয়ে থাকে তার মন থেকে? রাধার জীবনে হয়তো সুধাকরের মতো কত মানুষ এসেছে, আরো কত আদরে সোহাগে ভরে দিয়েছে তাকে। সেখানে জেলের ছেলে সুধাকরকে সে মনে রাখতে পারে না। রাখবেই বা কোন্ দুঃখে?

তা ছাড়া ওই মেয়েটিই যে রাধা—তাই বা কে বলতে পারে জোর করে? দূর থেকে যতটুকু দেখেছে তাতে তো ভুলও হতে পারে তার। একরকম চেহারার মানুষ কি দু'জন থাকতে নেই সংসারে!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে লাগল। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না। সন্দেহের শেষ কোথাও নেই। তাকে যতই বাড়িয়ে চলো—ততই সে ফেঁপে উঠতে থাকবে। থামতে সে জানে না।

তার চেয়ে যা হওয়ার তাই হোক। রাধাই হোক আর যেই হোক, এসেছে যখন

আর ফেরা চলে না।

উঁচু পাঁচিলের চুন-সুরকি ঝরে গেছে—ইট বেরিয়ে পড়েছে এখানে ওখানে। তাদের ওপর পা দিয়ে সতর্ক একটা জন্তুর মতো উঠতে লাগলো সুধাকর। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই একেবারে প্রাচীরের মাথায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সে—রাত্রির প্রেতের মতো চোখটা তীক্ষ্ণ করে দেখতে চাইল সবটা।

নাটমন্দিরেই পড়ে আছে সব। একরাশ মড়ার মতো নিস্তব্ধ। সারাদিনের ক্লান্তির পরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দেওয়ালের মাথাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরে যথাসম্ভব নিজের শরীরটাকে নিচে ঝুলিয়ে দিলে সে। তবু আরো দু'হাত তলায় মাটিটা। হাতটা ছেড়ে দিতেই সে নিচে পড়ল, ধুপ্ করে আওয়াজ উঠল একটা।

কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে রইল সুধাকর—দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। কারো কি ঘুম ভেঙে গেছে, টের পেয়ে গেছে কেউ? অসহ্য উৎকণ্ঠায় হাতুড়ি পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। কান পেতে সে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগল।

না—কেউ নড়ে উঠল না। তেমনি নিঃসাড় নিস্পন্দ সব। একদল মড়া মানুষের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। প্রাচীর ঘেঁষে ঘেঁষে ছায়ামূর্তির মতো সরতে লাগল সুধাকর। এর মধ্যে কোথায় সে খুঁজে পাবে রাধাকে?

সতর্ক পায়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করল সুধাকর। নানা অঙ্গ-ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে সব। মাথার কাছে ছোট বড় পুঁটলি—হারমোনিয়াম, খোল—অন্ধকারে চক্‌চকিয়ে ওঠা পেতলের করতাল। কিন্তু মেয়েরা কোথাও নেই।

আর তাই তো—মেয়েরা কী করেই বা থাকবে খোলা নাটমন্দিরে? নিশ্চয় আর কোথাও আছে তারা। কিন্তু কোথায় তা হতে পারে?

ভয়ের আড়াল ভেঙে সুধাকর ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। অন্ধকারে একটা রাত্রির প্রাণীর মতো সে নাটমন্দিরের চারদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তারপর ভোগের ঘরের কাছে আসতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে।

এককালে বারোয়ারীতলা যখন জমজমাট ছিল, তখন এই ঘরে বড় বড় হাঁড়ায় ভোগ রান্না হত। সে দশ বছর আগের কথা। এখন আর ও ঘর কোনো কাজেই লাগে না। কবাটহীন দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাতেই সুধাকরের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম করল।

প্রায় দরজার পাশেই শুয়ে আছে রাধা—নিঃসন্দেহেই রাধা। ওদিকের জানালা

দিয়ে হেলে-পড়া চাঁদের আলো তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ছ'বছর আগেকার সেই মুখ—কপালে সেই উল্কির চিহ্ন। আরো ভারী হয়েছে—আরো ফর্সা হয়েছে যেন! কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের রক্তে করতাল শুনতে লাগল সুধাকর। তারপর লঘুভাবে স্পর্শ করে ডাকল: রাধা!

সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড হল একটা।

বিদ্যুৎবেগে রাধা উঠে বসল। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে সুধাকরের গালে। চোখে যেন শর্ষের একরাশ ফুল দেখতে পেল সুধাকর।

—তুমি আবার এসেছ বাবাজী? তোমার লজ্জা করে না? তোমাকে আমি হাজার বার বলিনি যে তেমন মেয়ে আমাকে তুমি পাওনি?—সাপের গর্জনের মতো চাপা তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল রাধার গলায়।

বিহ্বলতা। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। তার পরেই সুধাকর বললে, বাবাজী নয় রাধা—আমি।

—কে—কে তুমি?—তারস্বরে রাধা চিৎকার করে উঠতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুধাকরের হাত পড়ল তার মুখে। আত্মরক্ষার জৈবিক তাগিদে নিষ্ঠুরভাবে রাধার মুখ চেপে ধরে ফিসফিসে গলায় সুধাকর বললে, রাধা—আমি—আমি। আমাকে চিনতে পারছ না? আমি জেলের ছেলে সুধাকর।

এতক্ষণ দু'হাতে রাধা সুধাকরের হাত সরাতে চাইছিল, বো-বো করে একটা চাপা আওয়াজ উঠছিল তার গলা থেকে—ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তার চোখ। কিন্তু সুধাকরের নামটা কানে আসতেই তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। ঝুলে পড়ল হাত দুটো—উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল চোখের তারা দুটো এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সুধাকর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলে।

—আমাকে এর মধ্যেই কি ভুলে গেলে তুমি?

রাধা আরো কিছুক্ষণ কথা কইতে পারল না। অদ্ভুত বিহ্বল চোখে সমানে তাকিয়ে রইল।

—এই ছ'বছর ধরে আমি দিন গুনেছি। শুধু তোমারি জন্যে। তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না?

রাধা হঠাৎ যেন আত্মস্থ হয়ে উঠল। জড়িয়ে ধরল সুধাকরের দু'হাত।

—কী করে এলে তুমি এখানে?

—যেমন করে আসতে হয়। প্রাচীর টপকে।

—এখনি পালাও। পালিয়ে যাও এখান থেকে।

—তোমাকে না নিয়ে আমি আর যাব না।

—সর্বনাশ, কী করে নেবে আমাকে ?

—যেমন করে নিজে এসেছি। প্রাচীর টপকে।

—মাঝি, তুমি কি পাগল ? এখনো ধরা পড়োনি—সে তোমার বিস্তর পুণ্যের ফল। কিন্তু বেশী দেরি করলে কী যে হবে কিছুই বলা যায় না। এরা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে পৌঁছে দেবে থানায়—দারোগা হাজতে ভরে দেবে চোর বলে। তুমি পালাও—

—রাধা !

—আমাকে তুমি পাবে না মাঝি। আমি ছাড়লে দল ভেঙে যাবে। সর্দার বৈরাগী বাঘের বাচ্চার মতো পাহারা দেয় আমাকে। আমি ইচ্ছেয় চলে যেতে চাইলেও ছাড়ান নেই তার হাত থেকে। আগে ডাকাতি করত, এখন বুড়ো হয়ে গেছে, খুঁতো হয়ে গেছে ডান হাত, তাই বৈরাগী সেজে ঢপের দল খুলে বসেছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই খুন করতে পারে এখনো।

—আমিও খুন করতে পারি !—সুধাকরের চোখ জলজল করতে লাগল।

—তোমার হাত ধরছি মাঝি, আমার কথা রাখো। আজ তুমি পালাও। কাল সন্ধ্যায় যখন গান শেষ হয়ে যাবে, তখন মন্দিরের পেছনে বড় গাব গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়ো। আমার যা বলবার আছে সেই তখন বলব।

—বেশ, তাই হবে।—সুধাকর উঠে দাঁড়ালো। দু'চোখে ক্ষুধার্ত আগুন ছড়িয়ে বললে, সেই কথাই রইল। কিন্তু ছ'বছর তোমার জন্যে দিন গুনেছি আমি—আর আমার সইবে না। কাল যদি একটা হেস্তনেস্ত না হয়—তা হলে দু'জনের একজন খুন হয়ে যাবে।

সুধাকর নাটমন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল। যেন মিলিয়ে গেল চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে। রাধা বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

একটু পরেই বাইরে শব্দ উঠল : ধুপ্—ঝপাস্ !

এতক্ষণে ঘুম ভেঙে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল সর্দার বৈরাগী : কে—কে ওখানে ?

রাধার বুকের ভেতরটা যেন আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কেউ জবাব দিলে, কী আর হবে ! একটা খটাস্ কিংবা একটা ভাম হয়তো।

॥ ৪ ॥

সকালে যখন সুধাকরের ঘুম ভাঙল, সূর্য তখন অনেকখানি উঠে বসেছে আকাশে। রোদে ধার লেগেছে—একটু পরেই এসে পড়বে এক্সপ্রেস স্টীমার। চকিতভাবে উঠে পড়ল সুধাকর। নৌকোর খোলের ভেতর থেকে উদ্‌-বেড়ালের ডাক আর মৃদু মৃদু আঁচড়ানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে ওর।

সুধাকর উদ্‌কে টেনে তুলল নৌকার ওপর। তারপর জল দেখিয়ে বললে, যা—সঙ্গে সঙ্গেই ছপাৎ করে শব্দ। উদ্ জলে পড়ল।

সুধাকর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল জলের ভেতর কী ভাবে ওর ধূসর শরীরটা খেলে বেড়াচ্ছে।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। তারপরেই উদ্ সাঁতরে এল নৌকোর দিকে। বেশ বড় চেহারার একটা সরপুঁটি মাছ তার মুখে।

সুধাকরের পায়ের কাছে মাছটা এনে সে রাখল।

সদয় হাসিতে সুধাকর ইঙ্গিত করলে, খা—

বেশি বলবার দরকার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

সুধাকর তাকিয়ে দেখল চারপাশে। অনেক নতুন নৌকোর আমদানি হয়েছে—চেনা, অচেনা। অনেক নৌকো সোয়ারী নিয়ে চলে গেছে। মকবুলও।

কখন গেল? কী জানি! যাওয়ার আগে হয়তো দু'চারবার ডেকেও ছিল তাকে। কিন্তু সুধাকর একেবারে জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে—একটা শব্দও তার কানে যায়নি।

নিজের মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিলে সুধাকর। কালকের রাতটা কী ভাবে কেটেছে তার? যা কিছু হয়েছে সে কি স্বপ্ন? সব কি ঘটে গেছে ঘুমের ঘোরে? সেই ছ'বছর পরে দেখা রাধাকে—অসহ্য উত্তেজনায় মাঝরাতে সেই নাটমন্দিরে গিয়ে হাজির হওয়া—সেই আশ্চর্য আবিষ্কার—সর্দার বৈরাগীর কথা—রাধা—আরো সুন্দর হয়েছে, ফর্সা হয়েছে আরো—

কিন্তু কী করেই বা বলা যাবে স্বপ্ন? ওই তো পর পর দুখানা ভাউলি নৌকো দাঁড়িয়ে। ঢপের নৌকো! ওই তো কে যেন একটা স্টীমার-ঘাটের কাঠের রেলিঙে বসে চড়া স্বরে গান ধরেছে:

> 'ওলো, মন-মজানো বিনোদিনী রাই লো,—
> তোমার প্রেম সায়রে ডুব দিয়েছি
> তল তবু না পাই লো!'

সুধাকরের মাথার ভেতরে চড়াৎ করে উঠল। আজ সন্ধ্যার পরে গান শেষ হলে মন্দিরের পেছনে নিথর কালো গাব গাছটার ছায়ায়। তারপর—তারপর একটা খুন হয়ে যাবে। হয় সর্দার বৈরাগী, নইলে সে নিজেই। দুজনে একসঙ্গে পেতে পারে না রাধাকে।

—মাঝি, কেরায়া যাবে ?

দুজন ভদ্রলোক যাত্রী। বগলে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা—হাতে চামড়ার সুটকেস্।

—কোথায় যাবেন ? কতদূরে ?

—গৈলা।

—গৈলা ! সে তো অনেক দূর।

—অনেক দূর বৈকি !—ভদ্রলোক যাত্রীরা ভ্রূকুটি করলেন : হেঁটে যেতে পারলে আর তোমার নৌকো ভাড়া করতে আসব কেন ? যাবে কিনা বলো।

—না, অতদূর যেতে পারব না।

—ওরে বাপরে, তোমরা দেখছি দস্তুরমতো বাবু হয়ে গেছ আজকাল। ঘাট হয়েছে বাপু, তোমাকে বিরক্ত করেছি। বসে বসে ঝিমুচ্ছিলে—ঝিমোও।

ঠাট্টা করে গেল বাবুরা! তা যাক। আজ কিছুতেই ঘাট ছেড়ে নড়বে না সুধাকর—কুড়ি টাকার কেরায়া পেলেও না। কাছাকাছির যাত্রী হলে তবু ভেবে দেখা যেত—সন্ধ্যের আগেই যাতে সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু আজ উৎসাহ নেই। আজ সারাদিন সে অপেক্ষা করবে—অপেক্ষা করবে দাঁতে দাঁত চেপে। অসহ্য প্রতীক্ষাটাকে মন্থন করবে নিজের রক্তের ভেতরে।

দূরে গম্ভীর বাঁশির আওয়াজ। স্টীমার-ঘাটে চাঞ্চল্যের স্পন্দন। এক্সপ্রেস্ স্টীমার আসছে। পুরো একটা দিন—চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু এই একটা দিনের মধ্যেই যেন যুগ-যুগান্ত কাল-কালান্ত পার হয়ে গেছে সুধাকর। ছ'বছর ধরে বুকের মধ্যে সব ঝিমিয়ে এসেছিল—এখন খড়ের আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে।

স্টীমার এগিয়ে এল ঘাটের দিকে। সাড়া পড়েছে নৌকোর মাঝিদের মধ্যে, ঘাটের কুলিদের ভেতরে। মাঝনদী থেকে বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে—কাদাভরা তীরের ওপর। ইটের পাজাটার ওপরে গোটা দুই মাছরাঙা বসে ছিল—কর্কশ আওয়াজ করে আকাশে ডানা মেলল তারা।

স্টীমার ঘাটে এসে লাগল। আজকে লোক নামল আরো কম। মাত্র দু'চারটি যাত্রী—ঘাটের কাছাকাছি যে দু'চারটে নৌকো ছিল, যা হয় তারাই ভাড়া পেল।

যাক—নিশ্চিন্ত। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষা।

কিন্তু ও কে ! হঠাৎ খরশান হয়ে উঠল সুধাকরের দৃষ্টি।

দু'তিনজন বৈরাগী এসে ঘাটের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে—স্টীমার দেখতে এসেছে। তাদের মাঝের লোকটাকে দেখবামাত্র একটা অশুভ অনুমান বিদ্যুতের মতো চমকে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

সর্দার বৈরাগী ! নিঃসন্দেহ !

এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে কালো কাদাকার লোকটাকে। মাথার চুল ধূসর—মুখে বসন্তের গোটাকয়েক চিহ্নও আঁকা আছে বলে বোধ হল। বয়েস হয়েছে, একটু কুঁজোও হয়েছে পিঠটা। তবু শরীরটা এখনো অসামান্য শক্তিমান। মুখে একরাশ বিশৃঙ্খল সাদা দাড়ি—হাওয়ায় উড়ছে সেগুলো। চেহারা দেখলেই মনে হয়—রাধার কথা মিথ্যে নয়; লোকটা এককালে ডাকাতি করত।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঘ। শিকারের মতো আগলে বসে আছে। সহজে কেড়ে নেওয়া যাবে না ! এ ছোট রায়কর্তা নয়—এর চোখ নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না। অনেকখানি শক্তির পরীক্ষা দিয়েই এর কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে রাধাকে।

সুধাকর জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ভুল হয়ে গেছে—মস্ত বড় ভুল। সেদিন সে হাত বাড়িয়ে দিলেই রাধাকে কেড়ে নিতে পারত, ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারত যেদিকে যতদূরে খুশি, সেদিনকার সেই সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে। আঠারো বছরের শরীরে উন্মাদনা ছিল, কিন্তু মনে সাহস ছিল না। তখনো অনেক ঝোড়ো নদী তার পাড়ি দেওয়া হয়নি, তখনো বল্লমে ফুঁড়ে চিতাবাঘ মারবার সাহস ছিল না তার। সেদিন সুযোগ হারিয়েছে, তাই আজ তার জন্যে ঢের বেশি দাম দিতে হবে।

চিতা বাঘ নয়—লড়তে হবে জাত-বাঘের সঙ্গে !

তা হোক।

লোকগুলো বন্দরের দিকে ফিরে চলেছে। সুধাকরের ইচ্ছে হল এখনি গিয়ে দাঁড়ায় লোকটার সামনে—এই মুহূর্তেই যা হোক একটা কিছুর চরম নিষ্পত্তি করে ফেলে।

কিন্তু ! কিন্তু এখনো সময় হয়নি। আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে তাকে।

দিন এগিয়ে চলল—বেড়ে চলল বেলা। আবার নদী উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোদের খরধারে, খরশুলা মাছের ঝাঁক নৌকোর আশেপাশে খেলে বেড়াতে লাগল। সুধাকরের মনে পড়ল রান্না চাপানো দরকার। কাল রাতে সে কিছুই খায়নি।

চাল আছে, আলু আছে, পেঁয়াজ আছে দু'চারটে। উদ্ নামালে এক-আধটা মাছও

মিলতে পারে হয়তো। কিন্তু খাওয়ার জন্যে বিশেষ উৎসাহ হচ্ছে না। যা আছে চলে যাবে ওতেই।

ক্লান্তভাবে তোলা উনুনটায় আগুন দিতে বসল সুধাকর।

আচ্ছা, ধরো যদি রাধাকে পাওয়া যায়—

বুকের নাড়ীগুলো তারের বাজনার মতো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল : যদি রাধাকে পাওয়া যায়? কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? ওই ঘরে—ওই গ্রামে? যেখানে পিসির কাছে তাকে জিম্মা করে রেখে আবার পরের সোয়ারী বওয়া? নিজের ঘর ছেড়ে রাতের পর রাত এই খাল-বিল-নদী-নালায় ভূতের মতো ঘুরে বেড়ানো? তার নৌকোয় উঠবে অল্পবয়েসী স্বামী-স্ত্রী, সারারাত তারা গুঞ্জন করবে জলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আর তখন—

তখন দাঁতে দাঁত চেপে হয়তো বা নৌকোর লগি ঠেলে চলবে সুধাকর? ওরা যখন দুজনে ঘন হয়ে জড়িয়ে থাকবে, তখন তার মাথার ওপরে ঝরঝরিয়ে ঝরবে বৃষ্টির জল?

তা হয় না। কিছুতেই না।

আজ যদি কয়েক কাঠা ধানী জমি থাকত! থাকত একটুখানি ক্ষেতখামার! রাধাকে নিয়ে কী নিশ্চিন্ত আনন্দে তা হলে সংসার বাঁধত সে! সামনে ধানের ক্ষেত, ঘরে রাধার সোনা মুখ, জানলা দিয়ে সোনার মতো চাঁদের আলো—

ধান! ক্ষেত! মাটি!

নদীর মতো দুলে ওঠে না—রাক্ষসী ক্ষুধায় থাকে না মুখ বাড়িয়ে। একটু অসতর্ক হও—সঙ্গে সঙ্গে আর কথা নেই! অমনি ডাইনীর মতো হাজারটা হাত বাড়িয়ে একেবারে টেনে নেবে পেটের মধ্যে! মেঘের লক্ষণ দেখে যদি বুঝতে না পারো, তা হলে অথৈ গাঙের ক্রোধ থেকে আর তোমার আত্মরক্ষা করবার কোনো আশাই নেই। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া যদি সেই রকম একটা রাত আসে? যে রাতে জলের অতল থেকে উঠে আসে সেই সব অপঘাতের দল? যারা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়েছে, যাদের নিচে টেনে নিয়েছে মানুষখেকো কুমির—গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করেছে যারা, যদি কখনো তাদের হাতে তোমাকে পড়তে হয়? তারপরে কী হবে সে কথা ভেবে লাভ নেই।

তার চেয়ে ভালো মাটি। ঢের ভালো। সে স্থির—সে ভর সয়। জীবনকে আঁকড়ে রাখে দু হাতে। তার ওপরে ফুল ফোটে—পাখি গান গায়, ফসল ফলে। তার ওপরেই মানুষ ঘর বাঁধে। মাটি—একটুখানিও সে যদি পেত!

তা হলে রাধাকে নিয়ে সোনার সংসার গড়ে তুলত সেখানে।

সুধাকর চমকে উঠল। ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছে উনুনটা। একটু হলেই তার হাতে লাগত আগুনের ঝলক।

দিনটা কী অদ্ভুত বিলম্বিত! যেন নদীর স্রোতটা হঠাৎ থমকে গেছে—যেন সূর্যটা আর চলতে পারছে না। কোনোমতে একমুঠো ভাত গিলে, উদ্কে খাইয়ে—সুধাকর লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

মাটি। ধানের ক্ষেত। নদীর স্রোতের মতো অস্থির অনিশ্চিত জীবন নয়।

যদি একটুখানি জমি থাকত তার—তবে কি এইভাবে ঘুরে বেড়াত সে? সুধাকর জানে—চব্বিশ বছর চিরদিন থাকবে না। তারপরে আসবে চল্লিশ—পঞ্চাশ। সেদিন আর এমন শক্তি থাকবে না শরীরে—সেদিন মাতলা নদী পার হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না সে—রাত্রির পাথুরে অন্ধকারে সে পথ দেখতে পাবে না। সেদিন?

এই মাটি নেই বলেই তো এমন করে নতুন বৌকে ফেলে গাঙে গাঙে ঘুরে বেড়ায় মাঝিরা। মাটি নেই বলেই তো জীবনের মূল নেই কোথাও—স্রোতের কচুরিপানার মতো তাদের ভেসে বেড়াতে হয়। তাই মকবুল রাতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর অভিশাপ দেয় ইদ্রিশ মিঞাকে, তাই রোকেয়া তার কাছে আশমানের চাঁদের চাইতেও সুদূর।

রাধা! রাধাকে নিয়ে থাকবার মতো একটু মাটি যদি সে পেত! পেত এক-ফালি নিশ্চল মাটি!

ঘটাং-ঘট্—

একটা নৌকো এসে ধাক্কা দিলে সুধাকরের নৌকোর গায়ে। ভয়ঙ্কর-ভাবে দুলে উঠল সবটা।

বিরক্ত হয়ে উঠে বসল সুধাকর: গায়ের ওপর এমন করে এসে নাও ভিড়োয় কে? একটুও আক্কেল-পছন্দ নেই নাকি?

যার নৌকো, সে তখন হিংস্রভাবে লগি পুঁতছে নৌকোর। বললে, মকবুল।

—সোয়ারী নামিয়ে ফিরলে?

—না।—তিক্ত জ্বালাভরা গলায় মকবুল বললে, নিজের কবর দেখে এলাম।

—কবর? কী বকছ দোস্ত? পাগল হলে নাকি?

—এইবার হবো। আর বাকী নেই তার।—সশব্দে হাতের লগিটাকে মকবুল ছইয়ের ওপরে ছুঁড়ে দিলে।

—কী হয়েছে খুলে বলো দেখি।

—বলছি।—মকবুল ঝুপ করে প্রায় একহাঁটু জলের মধ্যে নেমে পড়ল—অনেকখানি

ভিজে গেল লুঙ্গিটা। তারপর ক্ষিপ্ত স্বরে বললে, শালার নৌকোর তলা ফুটো করে ডুবিয়ে দেব মাঝগাঙে।

—উঠে এসো, উঠে এসো এখানে।—নিজের কথা ভুলে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল সুধাকর : সব খুলে বলো। নতুন কিছু করেছে নাকি ইদ্‌রিশ মিঞা ?

মকবুল উঠে এল সুধাকরের নৌকোয়। কান থেকে একটা বিড়ি নামালো ধরাবার জন্যে, তারপরেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নদীর জলে ছড়িয়ে দিতে লাগল। ছুটো লাল টকটকে চোখ সুধাকরের মুখে ফেলে দিয়ে বললে, শালা গোলাম সর্দার এতদিন তামাসা করছিল আমাকে নিয়ে।

—সে কি !

মকবুল পৈশাচিক মুখে বলে যেতে লাগল : তলায় তলায় ঠিক ছিল সবই। হয়তো বান্দার খরচায় একটু মজা দেখবার জন্যেই ওকে লেলিয়ে দিয়েছিল শয়তান ইদ্‌রিশ মিঞা।

—কী হয়েছে ? অমন রেখে রেখে বলছ কেন ?—সুধাকর অধৈর্য হয়ে উঠল : খোলসা করো সব।

—খোলসা কী করব আর ? খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম ! গিয়ে দেখলাম ইদ্‌রিশ মিঞার সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়ে গেছে।

সুধাকর অস্ফুট আর্তনাদ্ করল একটা।

—বিশ্বাস হচ্ছে না—না ?—মকবুল অদ্ভুত ধরনের হাসতে চেষ্টা করল : এই-ই ছুনিয়া। তিনটে বিবি আছে ইদ্‌রিশ মিঞার—চারটে বাঁদী। কিন্তু তবু আর একটা বিবি না হলে শরিয়তী কানুনটা পাকা হয় না। তাই তিনশো নগদ টাকা দিয়েছে গোলাম আলী সর্দারকে—টিনের ঘর করে দেবে এরপরে। থুঃ—মকবুল জলের মধ্যে থুথু ফেলল। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুধাকর। তারপর : কিন্তু রোকেয়া বেগম ? তার আশ্‌নাই ?

—মেয়েমানুষের আশ্‌নাই ! ও শুধু কথার কথা ! হাজার হাজার টাকা ইদ্‌রিশ মিঞার—হাজার বিঘে ধানের জমি—গণ্ডা গণ্ডা গোরু ছাগল মুরগী—পাঁচ সাতটা খামার। রোকেয়া হবে লাল বিবি—ইদ্‌রিশ মিঞার চোখের সুর্মা হয়ে থাকবে। কোন্ ছুঃখে ও আসবে ভাঙা গোলপাতার ঘরে—কেন খেতে যাবে ক্ষুদের জাউ আর পেঁয়াজের তরকারি।

—কিন্তু দোস্ত—সুধাকর যেন বারকয়েক খাবি খেল : আমি ভেবেছিলাম রোকেয়া বিবি তোমাকে—

—খুব পেয়ার করে, না ?—আবার সেই অদ্ভুত বিকৃত হাসিটা ভেসে উঠল

মকবুলের মুখে : মেয়েমানুষ শুধু জোরকেই পেয়ার করে। হয় টাকার জোর—নইলে গায়ের জোর। টাকার জোরে ইদ্‌রিশ মিঞা ওকে নিয়ে গেল, কিন্তু তার আগে আমি যদি ওকে গায়ের জোরে কেড়ে আনতাম, তা হলে এমন করে বুক চাপড়াতে হত না আমাকে।

মেয়েমানুষ শুধু জোরটাকেই পেয়ার করে। কথাটা যেন তীরের মতো এসে আঘাত করল সুধাকরকে। তাই বটে! সেই ভুল করেই সে একবার হারিয়েছিল রাধাকে—আর আজ—

মকবুল কর্কশ-গলায় বলে চলল, ইদ্‌রিশ মিঞার বাড়িতে খুব খানাপিনা হচ্ছে। আমাকে বললে, বড় বড় মুর্গী রান্না হচ্ছে—পোলাও হচ্ছে—মিঠাই এসেছে। খেয়ে যা! আমি ভাবছিলাম কোথাও যদি খানিক বিষ পাই তা হলে মিশিয়ে দিই ওই পোলাওয়ের সঙ্গে। ওই ইদ্‌রিশ মিঞা, ওই লাল বিবি, ওই হারামী গোলাম আলী সর্দার—একসঙ্গেই মিটে যায় সমস্ত!

যদি বিষ পাই! কিন্তু একথা কেন বলছে না মকবুল যে ইদ্‌রিশ মিঞাকে সে খুন করবে?

—চলে যাব, শহরেই চলে যাব। আমার পক্ষে শহরও যা—নদীও তাই। মজুরের খেটে খাওয়াই সার—সে নদীতেই হোক আর শহরেই হোক।

হাঁটুতে থুত্‌নি রেখে মকবুল বসে রইল। সুধাকরের মনে হল, অদ্ভুত রকমের ভাঙা-চোরা যেন তার চেহারাটা। যেন প্রকাণ্ড একটা তালগাছের মাথা থেকে আছড়ে পড়ে সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে গেছে সে।

সুধাকর আস্তে আস্তে বললে, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে মকবুল।

—পরামর্শ! কিসের?—মকবুল যেন কেমন চমকে উঠল।

—মেয়েমানুষ সম্বন্ধেই।

—মেয়েমানুষ?—মকবুল গর্জে উঠল : না—ওর মধ্যে আমি আর নেই। কোনো কথা শুনতে চাই না আর।

—কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই।—সুধাকর মকবুলের কাঁধে হাত রাখল : তোমার রোকেয়া তোমায় ঠকিয়েছে—কিন্তু আমার রাধা আমায় ঠকাতে পারবে না। তোমাকে আমার দরকার!

—মেয়েমানুষ। থুঃ!—জলে আবার থুথু ফেলে মকবুল বললে, বলে যাও।

॥ ৫ ॥

বারোয়ারীতলায় ঢপ-কীর্তন আজ শেষ হয়ে গেল।

গানটা আরো ভালো জমেছিল আজ। রাধাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মাটির নয়—আকাশ থেকে নেমে এসেছে। তার গলায় গন্ধর্বলোকের সুর।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর!
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে——
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে—"

'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে!' তেমনি নাটমন্দিরের বাইরে—দরজার সামনে অসংখ্য চাষাভুষোর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান শুনেছে সুধাকর। হিয়ার পরশের জন্যে হিয়া কাঁদে না—কথাটা ভুল। বুকের প্রত্যেকটা হাড়-পাঁজরা পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে।

চারদিকে বার বার হাততালি পড়েছে আজ। সাহাবাবুদের বাড়ির ছেলেরা শহরের কায়দায় বলেছে, এন্‌কোর—এন্‌কোর! আর তারি তালে দুলে উঠেছে রাধার শরীর—যেন জোয়ারের ঢেউ দুলেছে উছল গাঙে। রামধন সাহা নিজে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—একটা সোনার মেডেল্ দেবেন রাধাকে। রাধা তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করেছে। কিন্তু সুধাকর এসব দেখেছে নিছক ছায়াবাজীর মতো। যেন স্বপ্ন দেখেছে! শুধু অপেক্ষা করেছে কখন শেষ হবে গান—কখন সেই অন্ধকার গাব গাছের নিচে—

আসর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কালো ছায়ার তলায় নিশ্চল প্রতীক্ষা সুধাকরের। সময় বয়ে চলেছে। কই—রাধা তো আসছে না এখনো।

তবে কি আসবে না? তবে কি মিথ্যেই স্তোক দিয়েছে কাল? সুধাকরের চোখের সামনে একটা রক্তাক্ত ঘূর্ণি ঘুরছে যেন। যদি না আসে, তা হলে—

শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ একটা। সুধাকরের হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে চাইল। রাধাই বটে! অন্ধকারের মধ্যে একটা শ্বেতপদ্মের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে—চিকচিক করছে গলার সোনার হার। সুধাকর এগিয়ে এল। দুঃসহ উত্তেজনায় বললে, রাধা। দু পা পিছিয়ে গেল রাধা। বললে, না।—আমার সঙ্গে চলো রাধা। নদীতে নয়—খালের ঘাটে নৌকো রেখে এসেছি। দুটো সুপুরি-বন পার হলেই খাল। আঁধারে আঁধারে চলে যাব—কেউ দেখতে পাবে না।

আমি যাব না।—পাথরের মতো শক্ত শোনালো রাধার স্বর।

সুধাকরের গায়ে যেন সাপের ছোবল লাগল।

—রাধা ?

—আমি যাব না। কেন যাব ?—রাধার গলার স্বরে বিদ্রোহ ভেঙে পড়ল : কোন্ দুঃখে মরতে যাব তোমার সঙ্গে ? ছ' বছর আগে তোমায় ভালো লেগেছিল—একটা মাতাল শয়তানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আসতে চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তো আমার কোনো কষ্ট নেই। কত নাম হয়েছে আমার—গয়না হয়েছে, টাকা হয়েছে। সর্দার বৈরাগী আমার হাতের মুঠোয়। কেন যাব আমি ?

সুধাকরের গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।

—রাধা, ছোট রায়কর্তাও তোমাকে অনেক সোনাদানা দিয়েছিল।

—দিয়েছিল বইকি। কিন্তু সেদিন আমার বয়স ছিল অল্প, তাই তার কদর বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার চোখ খুলেছে। আমি জানি টাকাতেই সুখ। সে টাকা আমি দু'হাতে রোজগার করতে পারব। মাঝি, তুমি ফিরে যাও।

—রাধা !

—তুমি ফিরেই যাও মাঝি, সেই-ই ভালো হবে সব চেয়ে। সর্দার বৈরাগী টের পেয়ে যাবে এখনি। সে এলে আর তোমার রক্ষা থাকবে না। এককালে ডাকাতি করত সে—দরকার হলে এখনো খুন করতে পারে।

—তা হলে সেই চেষ্টাই সে করুক।—সুধাকর আর নিজের ধৈর্য রাখতে পারল না। দৃঢ় কঠিন বাহুতে হঠাৎ সে দু'হাতে রাধাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

কাল রাতের মতোই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলতে চাইল রাধা—কাল রাতের মতোই সুধাকর তার মুখ চেপে ধরল। তীব্র গোঙানি—প্রাণপণ ছট্‌ফটানি কিছুক্ষণ। কাঁধের গামছাটা সজোরে সুধাকর রাধার মুখের ভেতরে চালিয়ে দিলে। একটু পরেই নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে পড়ল রাধা।

ঝোপের মধ্য থেকে এগিয়ে এল মকবুল।

—দিব্যি হয়েছে—খাসা। এই হল পাকা হাতের কাজ। পালাও এবার।

অন্ধকার সুপুরি বাগানের মধ্য দিয়ে পথ। মাঝরাতের চাঁদ উঠতে আরো দেরি আছে খানিকটা। রাধাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে কুঁজো হয়ে এগোতে লাগল সুধাকর। কিন্তু পিঠে অত বড় ভারটাকেও যথেষ্ট ভারী বলে মনে হচ্ছে না তার। শুধু রক্তের চাপে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম করছে ! আর পেছনে পেছনে পাহারা দিতে দিতে আসছে মকবুল। ঠিকই বুঝেছিল সে। মেয়েদের পেতে গেলে জোর চাই। সে টাকার জোর হোক—আর গায়ের জোরই হোক !

খালের ধারে যেখানে শ্মশান—আশেপাশে জন-মানুষের চিহ্ন নেই যেখানে, সেই-

খানেই ভাঙা ঘাটলার আড়ালে সুধাকরের নৌকোটা লুকিয়েছিল। রাধাকে নৌকোয় নামিয়ে ছইয়ের ভেতরে তাকে ঠেলে দিলে সুধাকর। মড়ার মতো পড়ে রইল রাধা। তারপরে দু'খানা দাঁড় ধরল দুজনে। তীরের মতো খালের কালো জল কেটে নৌকো এগিয়ে চলল। একটি কথা নেই কারো মুখে।

প্রায় দশ মিনিট পরে নৌকো বড় গাঙে গিয়ে পড়ল। স্টীমারঘাট অনেকখানি বাঁ দিকে পড়ে আছে—মিট্‌মিট্‌ করছে ঘাটের কেরোসিনের আলোটা, জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে নৌকোগুলো। সেই দিকে তাকিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল সুধাকরের।—দোস্ত, তোমার নৌকো যে পড়ে রইল !

—নৌকো আমার নয়—ইদ্রিশ মিঞার।

—কিন্তু—

—কেন মিছিমিছি নিয়ে আসতে যাব ওই বাঁদীর বাচ্চার নৌকো ? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে যাব কোন্ দুঃখে ? আমি তো শহরে চলেছি, খেটেই খাব সেখানে। ওর নৌকো থাক্ পড়ে। গরজ থাকে তো নিজেই নিয়ে যাবে খোঁজ করে।

আর কোনো কথা বলল না কেউ। দুখানা দাঁড়ের টানে নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলল কালো অন্ধকারের স্রোত বেয়ে। তারপর আরো খানিক পরে যখন মাঝ রাতের চাঁদ উঠল আকাশে, দুজনের মুখে পড়ল তার আলো, তখন আবার কথা কইল মকবুল।—মুখের গামছাটা খুলে দাও মেয়েটার। নইলে শেষে হয়তো দম আটকেই মরে যাবে।

* * *

রাত ভোর হয়ে গেছে। রাধা চোখ মেলল। স্তিমিত শান্ত আলোয় ঝিমন্ত চোখে বৈঠা বাইছে সুধাকর। রাধা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। মাথাটা তার পরিষ্কার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রাধা ডাকল, মাঝি ?

সুধাকর চমকে উঠল। রাধা উঠে বসেছে। বসেছে গলুইয়ে হেলান দিয়ে।

আবার ডাকল : মাঝি ?

সুধাকর বিবর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন নিজের অপরাধটা একটা কালো ছায়ার মতো তার সামনে এসে দাঁড়ালো। রাধাকে জোর করে ধরে এনেছে সে। কিন্তু রাধার মন যদি ধরা না দেয় তার কাছে ? চোখ তুলে তাকানোর সাহসও সে খুঁজে পেল না—নত দৃষ্টিতে পাণ্ডুর জলের দিকে চেয়ে রইল।

রাধা বললে, অত শক্ত করে কি মুখ বাঁধে ? একটু হলেই মরে যেতাম যে।

—আমায় মাপ করো রাধা।—একটা আবেগ ঠেলে এল সুধাকরের গলায় :

ঝোঁকের মাথায় তোমাকে ধরে এনেছি। কিন্তু এখন দেখছি তাতে লাভ নেই। আমি তোমায় ফিরিয়েই দিয়ে আসব।

রাধা হাসল। করুণ, ক্লান্ত হাসি। —ফিরেই যদি যাব, তা হলে কাল কেন দেখা করতে আসব তোমার সঙ্গে?

হঠাৎ নৌকোটা দুলে উঠল—যেন একদিকে হেলে গেল একবার।

রাধা বললে, কী করছ—ডুবিয়ে দেবে নাকি নৌকো? জোর করে ধরে এনে শেষে ডুবিয়ে মারবে নদীতে?

বিহ্বল বিস্ময়ে সুধাকর বললে, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

রাধা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চোখ তুলল আকাশের দিকে। পুবের দিগন্ত রাঙা হয়ে আসছে—সাদা মেঘের মাথায় সিঁদুর পড়ছে একটু একটু করে। তারই একটুখানি আভা এসে যেন রাধার সিঁথিতেও পড়ল—অন্তত সেই রকমই মনে হল সুধাকরের।

রাধা গম্ভীর গলায় বললে, কী যে হয়েছে সে কি আমিই বুঝতে পারছি? আমি খাঁচার পাখির মতো। খাঁচা আমার সয়ে গেছে—দাঁড়ে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু কেউ যদি খাঁচার বাইরে এনে আমায় ছেড়ে দেয়, তা হলেই কি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি আমি?

—আর একটু স্পষ্ট করে বলো রাধা!—আকুল গলায় জানতে চাইল সুধাকর।

—কী স্পষ্ট করে বলব এর চেয়ে?—সিঁদুরে আলোটা এবার শুধু রাধার সিঁথিতেই নয়, তার সারা কপালেও ছড়িয়ে পড়ল: ছোট রায়কর্তার ঘর থেকে পালাতে পারতাম অনেকদিন আগেই, তবু এত দেরি হল কেন পালাতে? খাঁচার নেশা আমার সহজে কাটতে চায় না। ভেবেছিলাম বোষ্টুমি হয়ে বৃন্দাবনে চলে যাব—তোমাকেও ভুলে যাব। পারলাম কই? পদ্মার ওপারে শ্রীপাট খেতুরের মেলায় গিয়ে পড়লাম সর্দার বৈরাগীর হাতে। ভিড়লাম ঢপের দলে—সর্দার বৈরাগী আমাকে সেবাদাসী করে নিতে চাইল—লোভ সামলাতে পারলাম না। আবার চলে এলাম খাঁচায়। তার পর কাল রাতে তুমি এলে। মন একবার দুলে উঠল, তারপরেই মনে হল: আর নয়—এই বেশ আছি। কিন্তু থাকতে তো পারলাম না। চলে এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আর তুমিও কী করবে—সেও আমি জানতাম। তোমার চোখ দেখেই আগের রাতে সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—তবে কেন মিথ্যে করে আমায় বাধা দিলে?

—মিথ্যে করে বাধা দিইনি মাঝি—সেও সত্যি। জোর করে না আনলে আমায় তুমি পেতে না—সর্দার বৈরাগীই তার জোরে আমায় ধরে রাখত।—ভোরের আলো

এবার সোনা হয়ে রাধার চোখমুখ আলো করে তুলল।

সুধাকর এবার সোজা হয়ে বসল। আঠারো বছরের চঞ্চলতা ফিরে এসেছে শরীরে—এসেছে চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। হাতের পেশীতে সমস্ত শক্তি এনে জোর করে বৈঠায় টান দিলে সুধাকর। বললে, এবার আমার জোরেই তোমায় ধরে রাখব রাধা।

রাধা হাসল। সূর্যের প্রথম আলোয় মন-ভোলানো অপরূপ হাসি।—পারবে?

—পারব।

—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে? শহরে?

—না, শহরে নয়।—এবার সুধাকরও হাসল: সেখানে অনেক ছোট রায়কর্তা আছে, অনেক সর্দার বৈরাগী আছে। তাদের সকলের সঙ্গে জোরে আমি পেরে উঠব না। আমি তোমায় দক্ষিণে নিয়ে যাব।

—দক্ষিণে?

—হাঁ। নতুন চরে নতুন মাটি উঠেছে সেখানে। বিনা পয়সায় পত্তনি পাওয়া যায় শুনেছি। সোনা কাটিয়ে ফসল ফলাব আগে, তারপরে দেব খাজনা। আর সেইখানে ঘর বাঁধব তোমায় নিয়ে।

রাধা স্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। আর ঠিক সেই সময় কাঠের পাঠাতনের তলা থেকে একলাফে সুধাকরের কোলের কাছে লাফিয়ে উঠল জুয়ান। রাধা চমকে উঠে চাপা আর্তনাদ করল একটা। সুধাকর হা-হা করে হেসে উঠল।

—ভয় নেই, আমার উদ্—জুয়ান ওর নাম। দুজন বন্ধু আমার—একজন জুয়ান, আর একজন মকবুল।

জুয়ান তখন সুধাকরের হাঁটুতে মাথা ঘষছে। এক হাতে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুধাকর। কৌতুকভরা চোখে রাধা দেখতে লাগল। তারপর শুধালো:—মকবুল কে?

—সে না থাকলে কী করে আনতাম তোমাকে? সে-ই তো ভরসা দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখো, পেছনের গলুইয়ে সে ঘুমুচ্ছে।

রাধা ফিরে তাকালো।—কই, পেছনের গলুইয়ে তো কেউ নেই!

—নেই!—সুধাকর চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল: নেই! তাই তো—তবে কোথায় গেল মকবুল?—পাণ্ডুর বিবর্ণমুখে বললে, তবে কি জলে পড়ে গেল? অনেকক্ষণ আগে নৌকোটা একবার দুলে উঠেছিল বটে—ঝুপ্ করে একটা আওয়াজও হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম শুশুকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল বোধ হয়। তবে কি মকবুল ঘুমোতে ঘুমোতে—

কিন্তু মকবুল তো ঘুমুতে ঘুমুতে জলে পড়ে যায়নি। একটা চরের পাশ দিয়ে যখন নৌকো চলেছে, তখন নিজেই সে টুপ করে নেমে পড়েছিল তা থেকে। কারণ রোকেয়াকে সে পায়নি। কিন্তু দেখেছে রাধাকে কী করে পেয়েছে সুধাকর। আরো দেখেছে রাধার রূপ—নিজের বুকের মধ্যে শুনেছে উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি। যদি নিজের মনের পশুটা তার বাগ না মানে? যদি ওইভাবেই সেও সুধাকরের কাছ থেকে রাধাকে কেড়ে নেবার কথা ভাবে? যদি শয়তান তার মাথার ভেতরেই সব কিছু ওলোট্-পালোট্ করে দেয়? তার চেয়ে—

প্রথম সূর্যের আলোয় একটা নির্জন চরের একবুক বেনা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে মকবুল ভাবতে লাগল, তার চেয়ে আর একবার ফিরে যাবে গ্রামে। আর একবার নতুনভাবে চেষ্টা করে দেখবে—রোকেয়াকে সত্যিই ফিরে পাওয়া যায় কিনা!

সীমান্ত

দাওয়ায় বসে চিন্তিত মুখে হুঁকো টানছিল ফজলে রব্বি। না, আর দেরি করা উচিত নয়। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বিয়েশাদীর ব্যবস্থা করে ফেলতে হচ্ছে মেয়েটার।

এদিক থেকে তাদের নিয়মকানুন বরং অনেকটা ভালো। নিতান্ত চাষাভুষোর ঘরেও ন'বছর হতে না হতে পর্দা হয়ে যায় মেয়েদের—অনেকখানি আড়াল থাকে শকুনগুলোর চোখ থেকে। কিন্তু হিঁদুর ঘরের বেটি, নটখট করে সব জায়গায় বেরুনো চাই। গাঁয়ের যে বখা-বাঁদরগুলো আগে তটস্থ হয়ে থাকত ভয়ে, ইদানীং যেন সাপের পাঁচখানা করে পা দেখেছে তারা। কিছুদিন থেকেই এ রাস্তায় তাদের আসা-যাওয়া অকারণে বেড়ে উঠেছে। কবে রাতারাতি কী হয়ে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে—

ছেলে তাহের একখানা গোরুরগাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছিল। ফজলে রব্বি তাকে ডাকল।

—হাঁ রে, কোন্ দিকে চললি?

—সাপাহার হাটে যাব বাজান। ধান আনতে হবে আজ।

—ভালোই হল। যাওয়ার সময় কান্তরামকে ডেকে দিবি একবার।

—কান্তরাম? তাহের একবার চোখ মিটমিট করল: সে তো এখনই হিন্দুস্তানে পালাবার ফিকির খুঁজছে। তাকে কেন?

ফজলে রব্বি চটে উঠল : সব কথার জবাবদিহি করতে হবে নাকি তোকে? যা বললাম তাই করবি।

—আচ্ছা।—মুখ গোঁজ করে তাহের গাড়িতে গিয়ে উঠল। চাপা ক্রোধে একটা নির্দোষ গোরুর ওপরেই সবেগে চালিয়ে দিলে পাঁটাটা। একরাশ ধুলো উড়িয়ে মেহেদী-বেড়ার আড়ালে গাড়িটা অদৃশ্য হল।

বিরক্ত হয়ে হুঁকো নামাল ফজলে রব্বি। সত্যি-সত্যিই মেয়েটা তার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। নিজে বুড়ো হয়ে পড়েছে, তার ওপরে একটা পা তার খোঁড়া। এমনিতেই অশক্ত মানুষ, সব সময়ে আগলে আগলে রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া পট্ করে একদিন যদি মরে যায়, তা হলে যে মেয়েটা অথই জলে পড়বে এ সে দিব্য দৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছে। হাঙর-কুমির চারদিকে মুখিয়ে তো আছেই, তার নিজের ছেলে তাহেরের মতিগতিও খুব সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না। তাই বেঁচে থাকতে থাকতে কোনো বেইমানি ঘটবার আগেই মেয়েটার একটা সুরাহা সে করে দিয়ে যাবে।

বন্ধু!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সুতোয় টান পড়ল একটা; আর সেই টানে পুতুলবাজীর মতো কতকগুলো পেছনের দিন সামনে এসে দাঁড়ালো। পাশাপাশি বাড়িতে থাকত, পাশাপাশি জমিতে চাষ করত দুজন, তার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে তাতে একটা নল বসিয়ে টান লাগাত দয়াল মণ্ডল। বন্ধু বইকি! অমন বন্ধু কারো হয় না—কারো কোনদিন হয়নি।

তারপর ঝড়ের রাত এল। সে ঝড় আকাশ ভেঙে ঝরে পড়ল না, মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। সমস্ত রাত ধরে লাল মাটির মাঠ জুড়ে ডুম ডুম করে মেঘের ডাকের মতো বাজতে লাগল সাঁওতালের নাগারা-টিকারা। বাঘের জিভের মতো সড়কি বল্লম টাঙীর ফলা।

আগস্ট আন্দোলন। নামটা ভোলবার কথা নয়—কলিজার ভেতর গাঁথা হয়ে আছে আগুনের হরফে। সেদিনের লড়াইয়ের ডাকে দয়াল মণ্ডল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, ফজলে রব্বিও পেছনে পড়ে থাকল না। প্রথম দুটো দিন কাটল অবিচ্ছিন্ন জয়ের গৌরবে। শহর দখল হয়ে গেল—থানার বাবুরা, মহকুমা হাকিম কে যে কোন্ দিকে পালিয়ে বাঁচল, তার হদিস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মনে হল, ইংরেজ সরকার ফৌত হয়ে গেছে, কায়েম হয়েছে গরিবের মালিকানা, দেশের মানুষ তার দেশের মাটি ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু তিন দিনের দিন এল ফৌজ। একটা টিলার দুধারে জমায়েত হল দু দল। এপার থেকে যখন সড়কি বল্লম নিয়ে হাজার মানুষ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, ওপার থেকে

তখন তার জবাব দিলে কয়েকশো বন্দুক। সে বন্দুকের সামনে টাঙী বল্লম শুকনো পাতার মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল, সেই সঙ্গে বুক চেপে পড়ে গেল দয়াল মণ্ডল।

হাঁটুতে গুলি খেয়ে তার পাশেই বসে পড়েছিল ফজলে রব্বি। মরবার আগে দয়াল মণ্ডল তার হাত ধরল।

—আমার বেটিটাকে দেখো দোস্ত। ওর আর কেউ নেই। ওর ভার তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম।

সেই থেকেই ফুলমণির দায় ফজলে রব্বির ওপরে এসে পড়েছে। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল কাঞ্চন নদীর ওপর দিয়ে। যে আজাদীর জন্যে অতগুলো মানুষ অমন করে প্রাণ দিলে, যার জন্যে অতগুলো মানুষকে অমন করে চাবুক মারা হল, জ্বালিয়ে দেওয়া হল গ্রামের পর গ্রাম, কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল ধানের গোলা—সেই আজাদী একদিন না চাইতেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো। বাও নেই, বাতাস নেই, অথচ ভাদ্রমাসের পাকা তাল যেমন টুপ করে পড়ে যায়, তেমনি করে আজাদী এসে পৌছুল।

ভারী তাজ্জব লেগেছিল গোড়াতে। পাকিস্তানের কথা শোনা আছে অনেকবার, ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারে ভোটও দিয়েছে লীগের লোককে, কিন্তু পাকিস্তান যে এমন বিনা নোটিশে মুঠোর মধ্যে চলে আসবে, কে ভেবেছিল সে কথা!

এসেছে, ভালোই হয়েছে। মুসলমানের মাটি, মুসলমানের তমদ্দুন! কোথাও কোথাও এ নিয়ে খুব দাঙ্গা ফ্যাসাদও হয়েছে হিন্দু-মুসলমানে—সেকথাও অজানা নেই ফজলে রব্বির। কিন্তু ওসব দাঙ্গার আঁচ কখনো এসব তল্লাটে লাগেনি, কখনো সখনো মৌলবীরা গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়ে গেছে বটে, কিন্তু লোকে ঝিমুতে ঝিমুতে সে-সব কথা শুনেছে, কখনো কান পাতে নি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই পাকিস্তান হয়ে গেল। নদীর ওপার থেকে ঝাঁক বেঁধে আসতে লাগল মুসলমান, এপার থেকে দল বেঁধে পালাতে লাগল হিন্দু। বোঝা গেল রাতারাতি পালটে গেছে দুনিয়ার হালচাল। কিন্তু মনে মনে কিছুতেই একটা জিনিসের ফয়শালা করতে পারল না ফজলে রব্বি। আজাদীর জন্যে যে মাটিতে দয়াল মণ্ডল তার বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে দিলে—সেই মাটিই তার রইল না, সে হল ভিন দেশের বাসিন্দা!

চিরকালের চেনা মানুষগুলো যখন এক এক করে পর হয়ে গেল, বুকের ভেতরে তখন মোচড় দিয়ে উঠেছিল বইকি। তবু মনে হয়েছিল এক দিক দিয়ে এ ভালই হয়েছে। কাগজের পাতায় আর লোকের মুখে উড়ো উড়ো ভাবে যখন কলকাতার খবর আসত, খবর আসত 'কাফের'রা কি ভাবে সাবাড় করে দিচ্ছে মুসলমানের ধন-প্রাণ-ইজ্জৎ, তখন খাঁটি মুসলমান ফজলে রব্বিও কি রক্তের মধ্যে একটা চঞ্চলতা অনুভব

করত না ? আগুন ঝরানো ভাষায় মসজেদে মোক্তবে মৌলবী সাহেবেরা যখন 'ওয়াজ' করে যেতেন, তখন সে আগুনের তাপ কি তাকেও এসে স্পর্শ করত না। তার চাইতে এই-ই ভালো হয়েছে। ওরা থাক হিন্দুস্থান নিয়ে, পাকিস্তান নিয়ে খুশি থাক মুসলমান। কারো গায়ে কেউ এসে পড়বে না, যার যত ইচ্ছে বাজনা বাজাক, আর যত খুশি কোরবানী করুক। কোনো ঝামেলা নেই।

তবু ঝামেলা বেধেছে ফুলমণিকে নিয়ে।

দয়াল মারা যাবার পরে তার জমিজিরেত ফজলে রব্বিই তদারক করত। মেয়েটাকে দেখবার জন্যে তিন গাঁ থেকে এসেছিল তার এক বিধবা মাসী। মোটের ওপর নিশ্চিন্তেই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু আট বছরের ফুলমণি যখন সতেরো বছরে পড়ল, তখন একদিন ওলাবিবির নেকনজরে পড়ে চোখ বুজল মাসী। আর সেই থেকে মুখের প্রতিটি গ্রাস তেতো হয়ে উঠলো ফজলে রব্বির। একা ঘরে থাকে মেয়েটা, একা ঘাটে জল ভরে। তারই সুযোগ নিয়ে শুরু হয়েছে ভূতের উৎপাত। দিনেদুপুরে বাড়ির সামনে কে গান গেয়ে ওঠে, পুকুরপাড়ের ভাঁট ঝোপের আড়াল থেকে চড়া গলায় শিস্ টানে রাতবিরেতে, টর্চের আলো পিছলে পড়ে উঠোনে দাওয়ায়।

এই তো কাল সকালে। ফুলমণি এসে বললে, চাচা, আর তো ঘাটে যেতে ভরসা পাই না।

—কেন, কি হয়েছে ?—নড়েচড়ে বসল ফজলে রব্বি।

—সাহু মোল্লার বড় ছেলে জিকরিয়া আজ দুদিন থেকে ছিপ নিয়ে ঘাটে বসছে। আর যা-তা বলছে আমাকে।

—জিকরিয়া !—অসহ্য ক্রোধে ফজলে রব্বির সারা গা জ্বলে উঠল। এক নম্বরের বদমায়েশ, একটা মেয়েচুরির হাঙ্গামায় কিছুদিন আগেও দু বছর হাজত খেটে এসেছে। এতদিন চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াত, হালে আবার বড্ড ঘাড় বেড়েছে ওর ! নাঃ, একবার দেখতে হচ্ছে।

খোঁড়া পা-খানাকে টেনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ফজলে রব্বি : আয় আমার সঙ্গে।

ঘাটে তখনো ছিপ ফেলে বসে ছিল জিকরিয়া ওরফে জ্যাকেরিয়া। ওদের আসতে দেখে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না, তাকিয়ে রইল ফাত্‌নার দিকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ফজলে রব্বি। ভেবেছিল, তাকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পাবে না জিকরিয়া। কিন্তু আশ্চর্য দুঃসাহস, অবিশ্বাস্য স্পর্ধা ছোকরাটার।

নিজেকে সামলে নিয়ে ফজলে রব্বি বললে, জিকরিয়া।

মাথা না তুলে জিকরিয়া সাড়া দিলে, কী বলছ ?

—ছিপ নিয়ে বসেছিল কেন মণ্ডলের পুকুরে?

—মাছ ধরব।—শান্ত নিস্পৃহ স্বর জিকরিয়ার।

—কিন্তু পরের পুকুরে মাছ ধরতে কে হুকুম দিয়েছে তোকে?

—পাকিস্তানে হিন্দুর কোনো সম্পত্তি নেই। সব মুসলমানের।

ফজলে রব্বি এইবারে ফেটে পড়ল।

—চুপ কর হারামজাদা বদমায়েশ! তোদের মতো শয়তানের জন্তেই পাকিস্তানের এত বদনাম। উঠে যা বলছি এক্ষুনি, উঠে যা—

আকস্মিক বিস্ফোরণে বিভ্রান্ত হয়ে ছিপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল জিকরিয়া। কিন্তু তার দু চোখে আগুন ঝিলমিল করতে লাগল।

—অত চোখ দেখিয়ো না মিঞা—এ তোমায় বলে দিচ্ছি।

—কী করবি, কী করবি তুই? হতভাগা শয়তান! খোঁড়া পা নিয়েই হিংস্র ক্রোধে জিকরিয়ার দিকে এগোতে লাগল ফজলে রব্বি: ফের এদিকে এগোবি তো মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

জিকরিয়া পিছু হটতে লাগল। তার সমস্ত মুখ যেমন কুটিল, তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে: কাফেরের পথ নিয়ে তুমিও বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছ মিঞা। কিন্তু অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আমার মাথা গুঁড়োবার ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু অমন করে চোখ রাঙালে তোমারো ভালো হবে না।

এর পরে একমাত্র হাতের লাঠিটা তুলেই ছুঁড়ে মারতে পারত ফজলে রব্বি। করতে যাচ্ছিলও তাই, কিন্তু তার আগেই বুদ্ধিমানের মতো উধাও হয়েছে জিকরিয়া। অদৃশ্য হয়েছে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে।

—হারামজাদা!—নিরুপায় ক্রোধে ফজলে রব্বি দাঁত কিড়মিড় করল একবার, বিষাক্ত চোখে তাকালো ফুলমণির দিকে: কাল থেকে ঘাটে আসবার সময় আমায় ডাকবি তুই।

কিন্তু এমন করে কতদিন আগলে রাখা যাবে? শয়তানের মওকা পড়েছে চারদিকে। মানুষের আরজ আর খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছোয় না। ভালো লোকের জান-মান কিছুই আর থাকবে না বলে সন্দেহ হয়। রক্তে রক্তে ছড়িয়ে গেছে পাপ—মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধেছে বেইমানি। খোঁড়া পা নিয়ে বুড়ো ফজলে রব্বি কতদিন লড়তে পারবে, লড়তে পারবে ক'জনের সঙ্গে?

নইলে তাহের—তার নিজের ছেলে তাহের! সেই কিনা বলতে পারল কথাটা!

—ফুলমণির শাদী নিয়ে এত ভাবনা কেন আব্বাজান? দিয়ে দাও না আমাদের মকবুলের সঙ্গে। কথাটা শেষ করতে পারেনি, এমনি বিদ্যুৎ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল ফজলে

রব্বি। তাহের আবার শুরু করল: কালই কল্‌মা পড়িয়ে উকিল ডেকে—

কথাটা শেষ হতে পারল না। তার আগেই ফজলে রব্বির ডান পায়ের চটিটা বাজের মতো গিয়ে উড়ে পড়ল তাহেরের গালে। একটা টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে তাহের।

—কমবখ্‌ত—উল্লুক! ফের যদি এসব তোর মুখে শুনতে পাই তাহলে পঁচিশ পয়জার লাগিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দেব।

তাহের চলে গেল। কিন্তু যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেল – সে দৃষ্টি জিকরিয়ার চোখের। ঠিক কথা—তামাম দুনিয়া জুড়ে শয়তানের দেওয়ানি কায়েম হয়েছে। কেউ বাদ নেই, কোথাও বাদ নেই। বাইরের ক্ষ্যাপা কুত্তাগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরের দাওয়াতে যখন গোমা সাপে গর্ত করে বসে আছে, তখন যত তাড়াতাড়ি দায় চুকিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

হ্যাঁ, কান্তরাম। ভালোই হবে। দয়ালেরই স্বজাতি। দেখতে-শুনতেও মন্দ নয় ছোকরা, সুখীই হবে ফুলমণি। হিন্দুস্থানে পালাতে চাইছে কান্তরাম—তা পালাক। একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যাবে মেয়েটা এ কথা ভাবতে গেলেও মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতরে। কিন্তু নিজের চেনা, নিজের জানা মানুষগুলোর মধ্যে গিয়েই নিশ্চিন্ত হোক মেয়েটা, দু'দণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচুক। ফুলমণি তার নিজের মেয়ে হলেও এর চাইতে বেশী কী আর দোয়া সে চাইতে পারত আল্লা রহমানের কাছে?

না, কান্তরামের সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে আজ-কালের মধ্যেই। নইলে চট্‌ করে কোন্‌ দিন হিন্দুস্থানে সরে পড়বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু।

নেবা হুঁকোটায় একটা টান দিয়ে নামিয়ে রাখল ফজলে রব্বি। পোড়া টিকে আর তামাকের ছাই ঝাড়তে লাগল দাওয়ার নিচে।

—ডেকেছেন বুড়ো মিঞা?

কান্তরাম ভয়ার্ত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে দাওয়ার নিচে। একটু এদিক ওদিক দেখলেই হাত কচলাতে শুরু করবে যেন। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর সব হিন্দুর চোখেই ওই রকম একটা উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতা লক্ষ্য করেছে ফজলে রব্বি। যেন কোথা থেকে কেউ মস্ত একটা ডাণ্ডার ঘা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওদের শিরদাঁড়াগুলো, ওদের কলিজার রক্তটুকু শুষে খেয়ে নিয়েছে কেউ। দিনেদুপুরে আচমকা বেরিয়ে-পড়া শেয়াল যেমন পালাবার জন্য ঝোপঝাড় সন্ধান করে বেড়ায়, ওরাও ঠিক সেই রকম সব সময় একটা লুকোবার জায়গা খুঁজে ফিরছে।

বিশ্রী লাগে, কেমন সহজভাবে কথা বলতে পারা যায় না ওদের সঙ্গে। মিষ্টি করে বললে সন্দেহ করে, চোখ রাঙালে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সত্যিই ওদের ঘৃণা করা যেন আর অন্যায় নয় এখন।

ফজলে রব্বি ভ্রূকুটি করল।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে একটা চৌপাই টেনে নিলে কান্তরাম।

—চলে যাচ্ছ বুঝি ঘরবাড়ি ছেড়ে?

কান্তরাম মাথা নিচু করে রইল, জবাব দিলে না।

—তা যাও। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে মরতে যাও যেখানে খুশি।—ফজলে রব্বি আর একবার ভ্রূকুটি করল: কিন্তু এই বুড়োর একটি আর্জি আছে তোমার কাছে।

—আর্জি! হকচকিয়ে উঠল কান্তরাম: আর্জি কি বুড়ো মিঞা? হুকুম করুন।

—থামো! পাকামি করো না—ফজলে রব্বি একটা ধমক দিলে: দয়াল মণ্ডলের মেয়ে ফুলমণিকে দেখেছ তো?

—দেখেছি—সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল কান্তরাম।

—কেমন মেয়ে?

—তা-তা মন্দ কি! কান্তরাম গোটা দুই ঢোঁক গিলল। প্রশ্নটার কোন অর্থ-বোধ করতে না পেরে তাকিয়ে রইল বোকা বোকা শঙ্কিত দৃষ্টিতে।

—ফুলমণিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

—কী বললেন?—কান্তরাম ভয়ানকভাবে চমকে গেল এবারে।

—অমন হাঁ করছ কেন! আমি কি রসগোল্লা গিলতে বলছি নাকি? খাসা মেয়ে ফুলমণি, আমার নিজের বেটির মতোই দেখি ওকে। ঘরে নিলে বর্তে যাবে। তোমাদের যা পাওনা-থোওনা সব আমিই দেব, সেজন্যে কিছু আটকাবে না তোমার।

—আজ্ঞে তা বটে তা বটে।—কান্তরাম মাথা নাড়তে লাগল: কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী? হিন্দু, তোমার সজাতি—কিন্তু কোথায় এল এর ভেতরে?—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ফজলে রব্বি জানতে চাইলে।

—আমি বলছিলাম—কান্তরাম ঢোঁক গিলল: ওদের নিচু ঘর, আমাদের সঙ্গে ঠিক—

—চোপরাও!—জিকরিয়া আর তাহেরের ওপরে সঞ্চিত ফজলে রব্বির যা কিছু ক্রোধ দ্বিগুণ বেগে ফেটে পড়ল কান্তরামের ওপর: নিচু ঘর! জাতের বড়াই হচ্ছে! ওই করেই মরতে বসেছ তোমরা! খেয়াল থাকে যেন এটা পাকিস্তান। এখন যদি

মাটিতে চিৎ করে ফেলে খানিক গোস্ত ঠেলে দিই, জাতের গরমাই কোথায় থাকবে তখন ?

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল কান্তরাম। পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চৌপাইটার ওপরে।

—জাত জাত ! অসহ্য জ্বালায় দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল ফজলে রব্বি : আজ যদি গুণ্ডারা এসে মেয়েটাকে লোপাট করে নিয়ে যায়, জাতের মান বাড়বে তোমার ? যদি জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই, হিঁদুর মুখ উজ্জ্বল হবে ? ভদ্রলোক জানোয়ারের দল। একটা মেয়ের ইজ্জত বাঁচাবার সাহস নেই, জাতের বড়াই ! সাধে কি তোমাদের ঠেঙিয়ে দূর করে দিতে চায় পাকিস্তান থেকে !

নিষ্প্রাণ কান্তরাম নড়ে উঠল এবার। থরথর করে কাঁপতে লাগল বাঁশপাতার মতো। তার হাত দুটোকে জড়ো করে আনল কোনক্রমে। প্রায় নিঃশব্দ আবছা গলায় বললে, মাপ করুন। আপনি যা বললেন, তাই করব।

... ...

পুরো একটা বছর হয়ে গেছে তারপর।

আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে ফজলে রব্বি, খোঁড়া পা-খানাকে টেনে চলতে আরো বেশি কষ্ট হয় আজকাল। তাহেরের হাতে তুলে দিয়েছে ঘরসংসার ক্ষেত-খামারের ভার—শূন্য দাওয়ায় বসে বসে ঝিমোনো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আজকাল। এক-একবার ইচ্ছে করে এই শেষ বয়সে হজটা একবার ঘুরে আসে, কিন্তু উৎসাহ হয় না, ভরসা জাগে না দুর্বল অশক্ত দেহটার ওপরে।

ঝিমঝিমে স্তব্ধ দুপুরে নেশা জড়ানো চোখে চুপ করে বসে থাকে দাওয়াটার ওপরে। কানে আসে শালিকের কচকচি, ঝিরঝিরে হাওয়ায় সামনের নিমগাছ থেকে ঝুরঝুরিয়ে পাতা পড়তে থাকে ; আর ওই ঝরা পাতাগুলোর মতোই বোধ হয় জীবনকে —তার দিনগুলোও যে কবে কখন অমন করে ঝরে গেছে, ভালো করে যেন মনেও পড়ে না সে-সব।

নিম গাছটার পেছনেই দয়ালের ভিটের দাওয়াটা শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। এই এক বছরেই চালের খড় ঝরে ঝরে মাটিতে মিশে গেছে ওর, কঙ্কালের পাঁজরের মতো জেগে জেগে হয়ে নয় পেয়েছে ঘুণে খাওয়া বাঁশের খুঁটিগুলো। দরজা জানালা যা ছিল, যে যা পেরেছে রাতারাতি হাতিয়েছে সব। পোড়া দাওয়ার ওপরে উঠেছে হাঁটুসমান বিছুটি কচু আর তেলাকুচোর লতা। ওখানে কোনোদিন মানুষ ছিল, ছিল সংসার—কল্পনা যেন আজ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

তাকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশি করে মনে পড়ে বন্ধুর কথা, মনে পড়ে যুবাদিন

কথা। এই দেশের জন্তে লড়াই করে যে নিজের জান কোরবানি করে দিয়েছিল দেশের মাটিতে তার চিহ্ন মাত্র রইল না। ভারী তাজ্জব লাগে, কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। আর মেয়েটার জন্তে থেকে থেকে একটা তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা আর বেদনা তাকে পীড়ন করতে থাকে। যাওয়ার দিনে গোরুরগাড়িতে ওঠার আগে যখন অশ্রুভরা চোখে ফুলমণি তার পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করল, সেদিন তাকে বাধা দিতে পারে নি ফজলে রব্বি, একটা কথাও বলতে পারে নি। শুধু চলন্ত গাড়িটার ধুলোর মেঘের দিকে চোখ মেলে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ।

আজ এক বছরের মধ্যে কোনো খবর পায়নি ফুলমণির। কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। মাঝখানে শুধু একটা নদীর খেয়াঘাট পার হয়েই মানুষ কেমন করে এত দূরে সরে যায় কে বলবে।

—বুড়ো মিঞা ?

—কে ? একটু দূরের মানুষ আর ভালো করে ঠাহর হয় না আজকাল। ভুরুর ওপর হাতখানা তুলে ধরে ফজলে রব্বি বলল, কে ওখানে ?

—আমি মকবুল।

—কী খবর রে।

—ওপারে গিয়াছিলাম। তোমার ফুলমণির সঙ্গে দেখা হল।

ফুলমণি ! ফজলে রব্বি চমকে উঠল : কোথায় আছে তারা। ভালো আছে তো সব।

—শহরেই বাসা বেঁধেছে। কিন্তু ভালো নেই চাচা। সেই খবরটাই তোমায় দিতে বললে।

—ভালো নেই ! বুকের ভেতরে ধ্বক করে উঠল ফজলে রব্বির : কী হয়েছে ?

—কী একটা হাঙ্গামায় মানুষ খুন করে উধাও হয়েছে কান্তরাম। খাওয়া জুটছে না তোমার ফুলমণির। ওপারে বাট টাকা চালের মণ আজকাল।

ফজলে রব্বি বিমূঢ়ের মতো বসে রইল। খুন করে উধাও হয়েছে কান্তরাম, উপোস করছে ফুলমণি। দুটোই এত অসম্ভব, এমন অবিশ্বাস্য যে একটা অস্ফুট শব্দ পর্যন্ত বেরুল না ফজলে রব্বির মুখ দিয়ে। সেই ভীরু দুর্বল কান্তরাম মানুষ খুন করেছে আজ। মুমূর্ষু দোস্তের কাছে কসম খেয়ে যার দায় সে মাথা পেতে নিয়েছিল, আজ না খেয়ে উপোস করছে সেই মেয়ে !

এই দিনদুপুরেও ফজলে রব্বির কানের কাছে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল, আরো ঝাপসা হয়ে এল ঝাপসা চোখের দৃষ্টি। তাহের—তাহেরই ঠিক বলেছিল। কলমা পড়িয়ে ওই [illegible] সাথেই বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ফুলমণির। হিন্দুস্থানির [illegible]

মেয়েটাকে অমন করে বলি দেওয়ার চাইতে তাকে সুখী করলেই বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞার মর্যাদা বজায় থাকত তার। ভালো ছেলে মকবুল, চরিত্রবান, জমিজিরেত সব আছে। শুধু জাতের জন্য মেয়েটাকে নিজের হাতে জবাই করেছে সে—ভালো করতে গিয়ে ঠেলে দিয়েছে সর্বনাশের মুখে।

উঠে দাঁড়াতে চাইল ফজলে রব্বি, ইচ্ছে করতে লাগল ছুটে গিয়ে গলাটা চেপে ধরে কান্তরামের।

—আমি চলি বুড়ো মিঞা।—মকবুল বিদায় নিয়ে গেল।

একটা অসহ্য জ্বালায় ফজলে রব্বি জ্বলতে লাগল। উপায় করতে হবে যে করে হোক, বাঁচাতে হবে ফুলমণিকে। দরকার হলে আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে পাকিস্তানে। এবার তার নিজের মেয়েকে সে তার জাতের হাতে তুলে দেবে, যাতে তার ভাল হয়, তাই-ই সে করবে। সে কলমা পড়িয়েই হোক আর যে উপায়েই হোক।

বিকেলবেলায় তাহেরকে সে ডাকল।

—আধমণ চাল পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

—আধমণ চাল! কোথায়?

—ওপারে—শহরে। ফুলমণিকে দিয়ে আসবি।

শুনে বারকয়েক খাবি খেল তাহের।

—তুমি কি ক্ষেপে গেলে আব্বাজান?

—ক্ষেপব কেন?—ফজলে রব্বি চটে উঠল: যা বলছি তাই করবি। দিয়ে আসবি চাল।

তাহের করুণার হাসি হাসল: কী পাগলামি করছ? চাল নিতে দেবে কেন ওপারে?

—বোকা ভুলোচ্ছিস আমাকে, এত লোক নিয়ে যাচ্ছে—চোরা কারবার করছে চালের, আর তুই পারবি না? না হয় আটগণ্ডা পয়সা গুঁজে দিবি হাতে।

তাহের আবার সহিষ্ণু করুণার হাসি হাসল: দিনরাত তো ঘরেই বসে আছ আব্বাজান, দুনিয়ার হালচালের কোনো খবর রাখো না। আনসার আর ফৌজের ঘাঁটি বসেছে খেয়াঘাটের ধারে। এক দানা ধানচাল নিতে দেবে না ওপারে।

—ফৌজের ঘাঁটি!—ফজলে রব্বি ম্লান হয়ে রইল কিছুক্ষণ: বেশ তো—তা হলে রাতের অন্ধকারে—

—আস্তে আস্তে আব্বা! কারুর কানে গেলে ফাটকে যেতে হবে।—তাহের সভয়ে বললে: রাতের অন্ধকারে? কিছু বোঝো না তাই বলছ এসব কথা। ও চেষ্টা

করতে গেলে ফৌজের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে যাবে। আইন হয়ে গেছে—সাঁঝের পরে খেয়া পেরুনো একদম বারণ।

—আইন থাকলে বে-আইনও আছে। তর্ক করিসনি আমার সঙ্গে।—নিরুপায় ক্রোধে ফজলে রব্বি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : আমি বলছি তোকে নিয়ে যেতে হবে।

—অসম্ভব কথা বলো না আব্বাজান। আধমণ চালের জন্যে আমি জান দিতে পারব না। তাহের আর কথা বাড়াল না, সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করে দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

ফজলে রব্বির মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে।

কিন্তু ফজলে রব্বিও পারল না।

পরের দিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন কাঁধে আধমণ চালের বোঝা নিয়ে খোঁড়া বুড়ো ফজলে রব্বি খেয়াঘাট থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আঘাটায় নেমেছে নদী পার হওয়ার জন্যে তখন তার মুখের ওপর এসে পড়ল কড়া টর্চের আলো। হাঁটুসমান কালো জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

—শালা বদমাস !

গর্জন করে উঠল একজন। আর একজনের হাতের লাঠিটা প্রবল বেগে এসে আছড়ে পড়ল তার মাথায়।

ঝুপ করে জলের মধ্যে খসে পড়ল চালের বস্তাটা, পড়ে গেল ফজলে রব্বিও। নদীর কালো জলের চাইতেও আরো কালো আরো প্রখর অন্ধকার স্রোতের মধ্যে ভেসে গেল তার চেতনা।

শুধু ফজলে রব্বি একটা জিনিস জানতে পারল না। জানতে পারল না লাঠি যে মেরেছে সে মাত্র আট মাস আগে পাকিস্তানে পালিয়ে এসে মুসলমান হয়েছে। আগে তার নাম ছিল কান্তরাম—এখন সে ইয়ার মহম্মদ।

মশা

অফিস থেকে বেরিয়ে, একটা পানের দোকান থেকে দুটো পান কিনে একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে, রাজভবনের পাশ দিয়ে—বাতিল-হয়ে-যাওয়া বিধানসভার কোন বিষণ্ণ এম-এল-এর মতো ধীর অবসন্ন পায়ে—অপূর্ব এসে ময়দানে নামল।

লালচে রুক্ষ ঘাসের ওপর এখন শেষ বেলার রোদ। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ছে। সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পর এখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ পাঠিয়েছে দক্ষিণের সমুদ্র।

শুকনো কুটোর সঙ্গে উড়ে আসছে হলদে ফুলের পাপড়ি। আশপাশে মানুষ, চীনে-বাদাম, মুড়ির ঠোঙা, আইসক্রীম।

পড়ন্ত রোদটাকে আড়াল দিয়ে, বনেদী একটা পাথরের মূর্তির পেছনে পিঠ এলিয়ে বেশ আরাম করে বসল অপূর্ব। বাড়ী ফেরবার কোন তাড়া নেই—আদৌ না। উত্তর-পূব কলকাতার যেখানে আদ্যিকালের জলাগুলি বুজিয়ে হালে নতুন সব উপনগর তৈরী হচ্ছে, সেইখানেই তার আস্তানা। দিনের বেলা বেশ লাগে দেখতে—চকচকে সব বাড়ী, ছড়ানো সবুজ গাছপালার উঁকিঝুঁকি, পাখিদের যাওয়া-আসা। কিন্তু বেলা ডুবতে-না-ডুবতেই বিভীষিকা। কয়েক কোটি মশা তখন অবাধে রাজত্ব করতে থাকে। দাঁড়ানো যায় না, বসা যায় না, পড়া যায় না—শুধু দু'হাতে নিজের সর্বাঙ্গ থাবড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না তখন। মশারির মধ্যে অবশ্য ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু বাইরে যখন কেবল একটি মনোরম সন্ধ্যা, হাওয়ায় যখন কারো টবের বেলফুল কিংবা কারোর বাগানের হেনা গন্ধ ছড়িয়েছে, যখন খোলা আকাশ আর নতুন তারার নীচে বসে গল্প করবার সময়—তখন মশারির জীবন্ত সমাধি কি কল্পনাও করা চলে ?

তার চাইতে একটু দেরি করে ফেরা ভালো। সাড়ে আটটা—ন'টা—সাড়ে ন'টা। তখন মশারা খেয়ে-দেয়ে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত, হুলের ধার কিছুটা ভোঁতা এবং তখন রাতের খাবার গিলে মশারিতে ঢোকবার পরম লগ্ন। অতএব অপূর্ব এখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গড়ের মাঠে অপেক্ষা করতে পারে। দু'আনার বাদাম কিনে চিবোতে পারে, এক ভাঁড় চা খেতে পারে—একটা আইসক্রীম—না, আইসক্রীম নয়—বাঁদিকের একটা দাঁতে কনকনানি উঠেছে—এক ভাঁড় চা খেয়ে, একটু কোল-আঁধার ঘনিয়ে এলে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়েও পড়তে পারে।

আর ভাবতে পারে।

সেই ভাবনাটা বাসে যেতে যেতে ভাবা যায় না—কারণ পাতিপুকুর অঞ্চলের নিয়তির মতো রাস্তা যে-কোনো মানুষকে পরম নির্ভাবনায় পৌঁছে দেয় ; সে ভাবনা বাসায় বসে চলে না, কারণ রেশন-বাজার-মায়ের অসুখ—ভাইদুটোর স্কুল-কলেজের খরচ সেখানে সবটুকু জুড়ে আছে ; অফিসে এসে অনেকের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে হয়—সকলের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে হয়, সেখানেও নিজের জন্যে ভাববার মতো ফাঁকা মেলে না।

অথচ, অপূর্বর ভাবনাটা খুব ছোট।

শান্তার ভাবনা। সেই আগে যখন শ্যামপুকুর স্ট্রীটে থাকত—সেখানকার তিনটে বাড়ীর পরের মেয়েটি। ছোট চেহারার শ্যামবর্ণ মেয়ে, মুখের দিকে চাইলেই বড়ো

বড়ো কালো চোখ দুটো প্রথমে নজরে আসে। গলাটি খুব মিষ্টি—বাড়ীতে বাড়ীতে ছোট ছোট মেয়েদের সে গান শেখায়।

শ্যামপুকুরে থাকতেই সে শান্তার কথা ভাবত, এখানে এসেও ভাবে। তখন নিজের ঘরে বসে ভাবা যেত—এখন ময়দানে এসে ভাবতে হয়।

ভাবনাটা ছোট। বেশ মেয়েটি। দেখলে মন খুশি হয়, কথা বললে ভালো লাগে, একটুখানি সঙ্গ পেলে আরো ভালো লাগে। আর এইসব মিলিয়ে যে দরকারী কথাটা তার শান্তাকে বলতে ইচ্ছে করে, সেই কথাটা কিছুতেই আর বলা হয় না।

শান্তা কখনো বলবে না—অপূর্ব জানে। তার মতো মেয়েরা কোনো দিন এগিয়ে এসে মনের আড়াল সরিয়ে দেবে না। শান্তার মা-বাবা বলবেন না, কারণ মেয়ের টিউশনির টাকায় তাঁদের দরকার আছে; অপূর্বর মা বলবেন না—তাঁর কাছে এখন রেশন-বাজার আর ছোট ভাই দুটোর স্কুল-কলেজের খরচের ভাবনাটা ঢের বেশি জরুরী।

অগত্যা রোজকার মতো শান্তার কথা ভাবতে লাগল অপূর্ব। একাই ভাবতে লাগল।

সেই জরুরী কথাটা শান্তাকে বলতে পারলে বেশ হয়। অপূর্ব জানে, শান্তা খুশি হবে। মুখ ফুটে সে বলতে চাইবে না, কিন্তু তার চোখ দুটো কথা বলে। এখানে এই ছায়ার মতো অন্ধকারে যেমন চারিদিকের অনেক অলক্ষ্য আলোর কণাগুলো কাঁপতে থাকে, তেমনি তার কালো তারায় অনেক কথার কণা ঝিকমিক করে, যেমন করে এই সন্ধ্যার হাওয়ার গাছের পাতাগুলো কথা বলে, তেমনি করে তারও চোখের পাতায় কথারা শিউরে ওঠে।

একটু বাতাসের অপেক্ষা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে বাতাস। সেই সমুদ্র অপূর্বর মন। সেখান থেকে হাওয়া উঠলেই শান্তার ছায়ায় ছায়ায় আলোর কণা দুলবে, পাতারা সাড়া দেবে, হলুদ ফুলের পাপড়িরা উড়ে আসবে।

কিন্তু চার বছর ধরে সেই ছোট দরকারী কথাটা বলা হল না। বলাই হল না।

কেন হয় না? অপূর্ব ঠিক জানে না। সময় আসে—অপূর্ব টের পায় না; সময় চলে যায়—তখনো টের পায় না অপূর্ব। তারপর একা হলে—একটা পানের দোকান থেকে পান-জর্দা কিনতে কিনতে—কখনো বা দোকানের আয়নায় নিজের বোকাটে ছায়াটা দেখতে দেখতে তার মনে হয়—আজ বেশ সুন্দর সময়টা ছিল, আকাশ মেঘলা ছিল, ভিজে ভিজে হাওয়া ছিল; শান্তার মনে একটা গানের সুর গুন গুন করছিল আগাগোড়া, আজ বেশ বলা যেত।

ময়দানে বসে বসে বাসার সেই কোটি কোটি দুঃসহ মশাকে এড়াতে একা শান্তার

কথা ভাবতে ভাবতে মাটির ভাঁড়ের গন্ধে ভরা স্যাকারিনে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে—আজ হঠাৎ পৌরুষ জাগলো অপূর্বর। চেষ্টা করা যাক্ না—আজই চেষ্টা করা যাক্ না?

আধ-খাওয়া চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলল, খুলে-ফেলা জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিলে, তারপর উঠে পড়ল। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেকটা দূরে সরে গেছে সে, এর পরে শান্তা হয়তো তাকে ভুলতে আরম্ভ করবে।

দেরি হয়ে গেলে, দূর হয়ে গেলে, কে না ভোলে?

বাড়ী পর্যন্ত যেতে হল না—ট্রামরাস্তার মুখেই দেখা হয়ে গেল।

'এই যে শান্তা।'

'এই যে।'

'তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলুম।'

'ও।'—শান্তা একটু চুপ করে রইল। যেন অস্বস্তি বোধ করছিল একটা।

'বেরুচ্ছিলে?'

'হাঁ। গানের টিউশন।'

'একটু দেরি করে গেলে হয় না?'

একবার রোগা মণিবন্ধের ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল শান্তা। কপাল কুঁচকে ভাবল একটুখানি। বললে, 'নিজেরও একটু—সে যাক, আধঘণ্টা সময় পাওয়া যেতে পারে।'

'যথেষ্ট।'—অপূর্ব একবার শান্তার চোখের দিকে তাকালো: 'আধঘণ্টাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে আমার ছোট্ট একটু কথা ছিল কেবল।'

'বেশ, চলো আমাদের বাড়ীতে।'

'না—তোমাদের বাড়ীতে নয়।'

'কোথায় তা হলে?'—আশ্চর্য হল শান্তা। এর আগে অপূর্ব কোনোদিন তাকে কোথাও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়নি।

অপূর্ব বললে, 'অন্য যেখানে হোক। ধরো একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে? কিন্তু তুমি তো জানো, আমি বেশি চা খেতে পারি না।'

'গানের গলা খারাপ হয় বুঝি?'

শান্তা হাসল: 'না। সন্ধ্যের পরে চা খেলেই কেমন যেন মাথা গরম হয়ে যায় আমার। রাতে ঘুম আসে না।'

'তা হলে চা খাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কোনো একটা কোল্ড্ ড্রিংক্স?'

'বেশ—চলো।'

নির্জনতা এ তল্লাটে কোথাও পাওয়ার উপায় নেই। ভিড়-ভিড়-ভিড়। এখানে দক্ষিণ-সমুদ্রের হাওয়ায় শালপাতা আর ছেঁড়া-কাগজ ওড়ে; এখানে অন্ধকারের টুকরো মুখ থুবড়ে থাকে কোনো গলির ভেতরে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা এক-আধটা নোংরা দেওয়ালের পাশে। এখানে পথের ধারের শীর্ণ গাছ রিকেটি বাচ্চার মতো অস্থিসার আঙুল মেলে আকাশ হাতড়ায়।

অনেক খুঁজে-পেতে এক জায়গায় খালি কেবিন পাওয়া গেল একটা।

'দু গ্লাস সরবৎ।'

'অরেঞ্জ? পাইন অ্যাপল? ম্যাংগো?'

'অরেঞ্জই আনো।'—শান্তাই জানিয়ে দিলে।

বাইরে ফুটবল-রাজনীতি-সিনেমার তর্ক। পথে ট্রাম-বাস-মানুষের হুড়োহুড়ি। কেবিনের ভেতরে শব্দ করে করে ছোট পাখা ঘুরছে। তার হাওয়াটা গরম। দক্ষিণ সাগর এখানে নেই।

সরবৎ না আসা পর্যন্ত দু'জনে চুপচাপ। যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।

বেয়ারা গ্লাস রেখে গেল। স্ট্র দিয়ে একটা বরফের টুকরোকে নাড়াচাড়া করতে করতে শান্তা বললে, 'কেমন আছো?'

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

'নতুন বাসায় বেশ ভালোই লাগছে—তাই না?'

'চারদিক খোলা-মেলা, মন্দ কী।'

'বেঁচেছ বলো।'—শান্তা আলতোভাবে ঠোঁটে স্ট্র-টা ঠেকালো: 'যা ঘিঞ্জি এ-সব জায়গায় আর কী লোক বেড়েছে।'

'কিন্তু ভীষণ মশা ওখানে সন্ধ্যের পর।'

'খুব?'

'খুব।'

'স্প্রে করা যায় না?'

'অ্যাটম বোমা মারলেও কিছু হবে না।'

শান্তা হাসল, অপূর্ব হাসল। আর অপূর্ব বুঝল, মশার কথাটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না শান্তা। ও-তল্লাটে যারা থাকে না, তারা কেউই নেয় না। মশা তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে সরবৎ খেল দু'জন। মাথার ওপরে ছোট পাখাটা বিরক্তিকর ভাবে কট-কট করছে। হাওয়াটা গরম। দোকানের বেসুরো রেডিয়োতে শ্রোতাহীন রবীন্দ্র-সংগীত। 'প্রখর তপন তাপে—'

শান্তা বললে, 'অফিসের খবর কী?'

'নতুন কিছু নেই। সেই একভাবেই চলছে।'

'তোমাদের একটা স্ট্রাইকের কথা শুনেছিলুম না?'

'আপাতত হচ্ছে না। আলোচনা চলছে ইউনিয়নের সঙ্গে। হয়তো একটা মিটমাট হয়ে যাবে।'

'খুব ভালো।'

'ভালোই তো। ওসব ঝঞ্ঝাট কে চায়?'

শান্তা আবার স্ট্র দিয়ে গ্লাসের ভেতরটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। অপূর্ব প্রথমে তার রোগা আঙুলগুলো দেখল, তারপর পাশে রাখা হ্যাণ্ড-ব্যাগটা দেখল। ব্যাগটা পুরোনো আর জীর্ণ হয়ে গেছে, স্ট্র্যাপের একটা ধার ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকে রেখেছে সেখানটা। এখন এই ব্যাগটা শান্তার বদলানো দরকার। কিন্তু ওর হাতে নিশ্চয় টাকা নেই।

টাকা অপূর্বরও হাতে নেই। থাকলে একটা ভালো চামড়ার ব্যাগ সে-ই প্রেজেন্ট করত শান্তাকে। কিন্তু কী দিনই পড়েছে। মাইনের শ-চারেক টাকা যে কোথায় চলে যায়!

অপূর্ব আস্তে আস্তে বললে, 'আমার কথা তো হল, এবার তোমার কথা বলো।'

'আমার কথা আর নতুন কী বলব। চলছে একভাবে।'

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'তোমার বাবা?'

'আরথ্রাইটিস কখনো সারে?'

'কবিরাজী করাচ্ছিলেন না?'

'সব একরকম। মনের সান্ত্বনাই শুধু।'

সরবৎ দুটো প্রায় শেষ হয়ে এল। পাখার হাওয়াটা তেমনি গরম। রাস্তায় কিসের একটা জোরালো চ্যাঁচামেচি উঠেছে। দোকানের ছেলেমানুষ বেয়ারাটা বোধ হয় দেখে এল একবার। কাকে যেন বললে, 'ও কিছু নয়—একটা পাগল খ্যাপাচ্ছে।' দোকানের রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা শূন্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

শান্তা বললে, 'সেলাই-করা পাঞ্জাবি পরেছ কেন?'

'এমনি।'

'জামা নেই বুঝি ?'

অপূর্ব হাসল। জবাব দিল না।

'আগে তো পরতে না।'

'অখিল কলেজে ভর্তি হয়েছে—সায়েন্সে। অনেক খরচ।'

'তা হোক। দু-একটা ভালো জামাকাপড় তোমার দরকার। বাইরে তো বেরুতে হয়।—'

সমবেদনায় স্নিগ্ধ আর সিক্ত হয়ে উঠল শান্তার স্বর।

জামা-কাপড় তোমারও দরকার, অপূর্ব বলতে চাইল। শান্তার শাড়ীটা পুরোনো, রং জ্বলে গেছে বোঝা যায় ; ব্লাউজের গলার কাছটা ঘামে মলিন। একটা সেফ্‌টিপিন যেন সেখানেও দেখা যায়। এই মলিন দীনতা ভালো লাগে না। অথচ বাইরেই কাপড়ের দোকানের শো-কেসে—

'কয়েকটা জামা-কাপড় তোমারও কেনা উচিত'—এমনি একটা কিছু শান্তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারল না অপূর্ব। তার বদলে শান্তার কথারই জবাব দিলে।

'ধুতি-পাঞ্জাবি আর পরব না ভাবছি।'

'কী পরবে তবে ?'

'শার্ট-ট্রাউজার। অনেক কম খরচ। ধুতি-পাঞ্জাবির লাক্সারি আর পোষাচ্ছে না।'

'কিন্তু শার্ট-ট্রাউজারে তোমাকে মানাবে না।'—শান্তা প্রতিবাদ করল।

'ওটা চোখে দেখার অভ্যেসে বলছ। দুদিন পরেই সয়ে যাবে।'

আবার একটু চুপ করে থাকা। সরবতের গ্লাস শেষ হল অপূর্বর—স্ট্র'র টানে সবটুকু তলানি উঠে এল, বাতাসের আওয়াজ উঠল একটা। শান্তার পড়ে রইল খানিকটা—গ্লাসটা সরিয়ে দিলে একদিকে।

শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে। অপূর্ব কথা খুঁজছিল। এতক্ষণ যে আলোচনা হল—জামা-কাপড় ছাড়া—তার সব পুরোনো, সব হাজারবার বলা আর শোনা। একটা নতুন কিছু বলা দরকার—সেই দরকারী বিষয়টার সূচনা করা উচিত।

কিন্তু এবারেও পুরোনো প্রশ্নই বেরিয়ে এল।

'ক'টা গানের টিউশন করছো এখন ?'

'চারটে।'

'নিজের জন্যে গান গাও না আর ?'

'সময় কই ?'

'আর অডিশন দিয়েছিলে রেডিয়োতে ?'

'দিয়ে কী লাভ? হবে না।'

'কী আশ্চর্য—কেন হবে না?'—ব্যথিত আর উত্তেজিত হল অপূর্ব: 'এত ভালো গান করো তুমি।'

'তোমার ভালো লাগলেই তো আর হবে না—' শীর্ণ রেখায় হাসল শান্তা: 'ওখানে যাঁরা জাজ—তাঁদের পছন্দ হলে তো।'

'সব পার্শিয়ালিটি। তদ্বির ছাড়া হয় না।'

'বলতে নেই ও-রকম। আমিই বা কতটুকু শিখেছি।'

বেয়ারা গ্লাস নিতে এল। হাতে বিল। অপূর্ব পয়সাটা মিটিয়ে দিলে। আর হাত-ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল শান্তা।

'আমার বোধ হয় এবার ওঠা উচিত। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো অপূর্ব।

'বেশ চলো।'

আবার পথ। ভিড়—ভিড়—ভিড়। দক্ষিণের হাওয়া এঁটো শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে—পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধ মেখে ধুলোমুঠি ছড়িয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর। রিকেটি বাচ্চার আঙুলের মতো শীর্ণ গাছের শুকনো ডালগুলো ছাইরঙা শূন্য আকাশে যেন মাকে হাতড়াচ্ছে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কতগুলো ট্রাম—ব্রেকডাউন। একটা তেলেভাজার দোকান থেকে উঠে আসছে পোড়া বাদাম তেল আর ফেটানো-বেসনের উচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার ময়দানে হাওয়া থাকলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে বৃষ্টি দরকার। খুব অনেকক্ষণ ধরে ঝিরঝিরানো ঠাণ্ডা বৃষ্টি—ন্যাড়া গাছগুলোতে ক'টা সবুজ পল্লব ধরানো বৃষ্টি। ছাই রঙের আকাশে মেঘ নেই। ক'টা ঘষা তামার পয়সার মতো মিটমিটে তারা।

কয়েক পা একসঙ্গে হেঁটে—মধ্যে মধ্যে মানুষের ভিড়ে শান্তার পাশ থেকে সরে গিয়ে, অপূর্ব জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় টিউশন? কত দূরে যেতে হবে?'

'কাছেই। মোহনবাগান রো।'

'চলো, এগিয়ে দিই।'

'বেশ তো।'

কিন্তু এগিয়ে দেওয়া পর্যন্তই। শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে, আর অপূর্ব কথা খুঁজছিল। সেই দরকারী আলোচনাটার ভূমিকা। কিছুতেই সেটাকে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'কী বিশ্রী গরম পড়েছে কলকাতায়।'

শান্তা বললে, 'হ্যাঁ, খুব।'

'একদম বৃষ্টি নেই। অথচ ওয়েদার ফোরকাস্ট রোজ বলছে বিকালে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।'

'ওরা ওই রকমই বলে।'

'বোগাস।'

'তোমাদের ওদিকটা ঠাণ্ডা—না?'

'একটু। কিন্তু বেলা পড়লেই ভীষণ মশা।'

'ওঃ, তোমার সেই মশা!'—শান্তা একটু হাসল।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল অপূর্ব। ও অঞ্চলে যাদের থাকার অভ্যেস নেই, তারা কেউ মশার কথা সিরিয়াসলি নেয় না। কেউ বা বুঝতেই পারে না।

বেলফুলের মালা বিক্রী করছিল একজন—শালপাতায় রেখে। গলির ভেতরে, হাওয়াটা একটু মধুর হল, একটু কোমল হল তার গন্ধে। শান্তা তাকালো অপূর্বর দিকে। অনেক আলোর কণা লুকানো তার গভীর চোখের ছায়া দেখল অপূর্ব।

'কী একটা দরকারী কথা আছে বলছিলে না?'

বেলফুলওলা দূরে সরে গিয়েছিল। কাদের উনুনে যেন দেরিতে আগুন দিয়েছে—ঘুঁটে আর কয়লার খানিকটা ধোঁয়া হাওয়ায় পাক খেতে খেতে এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর।

একটু দ্বিধা করে অপূর্ব বললে, 'আজ থাক।'

আঙুল বাড়িয়ে সামনের একটা লাল বাড়ী দেখালো শান্তা।

'ওখানে আমি গান শেখাই।'

'আমি আসি তা হলে।'

'আচ্ছা'

'মশারির মশাহীন বিরুদ্ধতা'র বাইরে লক্ষ লক্ষ মশার গর্জন। বাতাসটা পড়ে গেছে, দম-চাপা গরম। ঘাড়ের নীচে বালিশটা ঘামে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে। ঘুম আসবার আশা কম। কান পেতে মশার গুঞ্জন থেকে যেন কিছু অর্থবোধ করতে চাইল অপূর্ব। দক্ষিণ সমুদ্রের সব হাওয়া, টবের বেলফুল আর কাদের বাগানের হেনার গন্ধ—সব চাপা দিয়ে তারা ঘামে-ভেজা ব্লাউজ, সেলাই করা পাঞ্জাবি আর অনেক—অনেক ভিড়ের ক্লান্তির খবর পৌঁছে দিচ্ছে তাকে।

সেই দরকারী কথাটা হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না অপূর্বর।

দিনান্ত

॥ ১ ॥

প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন, 'রবিবার দিন একবার যাবেন আমার ওখানে। এই ধরুন বিকেল চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে।'

'আচ্ছা স্যার, যাব।'

কথাটা আলতোভাবে বলেছিলেন, মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ ছিল না। থাকবার কথাও নয়। আসল গরজটা ছিল হিমাংশুর নিজেরই।

প্রিন্সিপ্যাল নতুন এসেছেন। বয়েস অল্প, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের এধারে নয়, কিন্তু দস্তুরমতো ভারিক্কী গম্ভীর চেহারা। চোখমুখ দেখলে বেশ শান্ত আর বিবেচক বলে মনে হয়। কেন কে জানে, প্রথম দৃষ্টিতেই হিমাংশুর ধারণা জন্মেছিল যে লোকটি তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন, প্রতিকারও করবেন দরকারমতো।

কিন্তু গরজ হিমাংশুর বলেই প্রিন্সিপ্যাল ভুলে গেছেন। হাজারো কাজের ভেতরে বুধবারের একটুকরো কথা রবিবার পর্যন্ত মনে থাকবে এমন আশা করা অন্যায় হয়েছিল হিমাংশুর। তারই উদ্যোগ করে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি কালও যখন কলেজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়েছে, তখনও বলতে পারত—'স্যার, রবিবার বিকেলে কিন্তু আপনার ওখানে আমার যাওয়ার কথা আছে।'

সেই কথাটাই বলা হয়নি। এবং আজ দুপুরে প্রিন্সিপ্যাল তাঁর বন্ধু ধরণী রায়ের সঙ্গে কোন্ এক ফরেস্ট বাংলোয় বেড়াতে গেছেন। ফিরবেন কাল সকালে।

চাকরের কাছ থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করে হিমাংশু ফিরে আসছিল। এমন সময় বসবার ঘরের বড়ো একটা জানলা খুলে গেল। জানলার পর্দা সরিয়ে ফ্রেমের ভেতরে ছবির মতো ফুটে উঠল একটি মেয়ে। কাঁধের ওপর এলো চুলের গুচ্ছ নেমে এসেছে, কপালে গাঢ় একবিন্দু রক্তের মতো জলন্ত সিঁদুরের টিপ, তাকে ঘিরে লাল শাড়ীর পটভূমি।

আর জানলার ওপার, ছাতের ওপরে যে আকাশ ছিল, হিমাংশু দেখল শরতের হলুদ রোদে তার রঙ কাঁটালিচাঁপার পাপড়ির মতো। একটুকরো ভবঘুরে মেঘ সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন একটা সাদা প্রজাপতি। অনেক দূরে দু'টো শকুনের ডানা ভাসছিল কি ভাসছিল না। জানলা, মেয়েটি, আকাশ, মেঘ—সব একসঙ্গে মিলে ফ্রেমে বাঁধা, অথচ ফ্রেম ছাপিয়ে পড়া একখানা ছবি হয়ে রইল, তেমনি কে যেন হিমাংশুর পা দু'টোকেও পুঁতে দিলে মাটির ভিতরে—লনের ফুলধরা কাঞ্চন গাছটার পাশে সে-ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সময়ের হিসেবটা মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল বিদ্যুতের চমকে। এগারো বছর। না—আরো দু-এক মাস বেশি হয়েছে হয়তো। আকাশে সেদিন শরতের রঙ ছিল না—একটা তপ্ত দিনের রুদ্র আভাস ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। একটা স্যুটকেস হাতে করে মাথা নামিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হিমাংশু। ফসলহীন মাঠ আর রুক্ষ আলোর ওপর দিয়ে দেড় মাইল স্টেশনের রাস্তা পাড়ি দিতে দিতে অমিতার জন্যে শেষ যন্ত্রণায় জলেছিল সে।

যদি বিকেলের আলো চারদিকে এত ধারালো হয়ে না থাকত, যদি জানলার ফ্রেমের ভেতরে প্রায় কোমর পর্যন্ত ফুটে না উঠত অমিতার, যদি তার দিকে চোখ পড়তেই অমিতা ছবির চাইতেও নিথর হয়ে না যেত, তা হলে এমন একটা সম্ভাবনার কথা হিমাংশু ভাবতেও পারত না। কোনো পড়ন্ত বেলার ছায়ায়, কোনো রাত্রির আলো-অন্ধকারে দূর থেকে হঠাৎ দেখে হয়তো খুব চেনা কারো একটা আদল মনে আসত, তারপরেই ভাবত—এমন তো কত হয়। ওই মেয়েটিই যে একান্তভাবে অমিতা—এগারো বছর কয়েক মাসের ওপার থেকে কোন্ একটা দুর্বোধ বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে আবার হিমাংশুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এ-কথা ভাববারও তার দরকার পড়ত না। কিন্তু আশ্চর্য, তাই ঘটল।

মেয়েটি অমিতা। নিজের অস্তিত্বে যদি হিমাংশুর সন্দেহ না থাকে তা'হলে এতেও সন্দেহ নেই।

খোলা জানলাটা আবার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, আচমকা যেন একটা রিভলভারের আওয়াজ শুনল হিমাংশু। ঘাড় না ফিরিয়েও সে বুঝতে পারল, জানলার ফ্রেমে ছবির চাইতেও নিশ্চল ছবিটা আর নেই। কোনো এক অন্ধকার ঘরে আরো গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে সেখানেই লুকোতে চাইছে সে। কিন্তু পালানোর জায়গা কি অমিতারই দরকার? হিমাংশু মুখ লুকোবে কোন্‌খানে? গেটের বাইরে সে সাইকেলটা রেখে এসেছে, ওই সাইকেলে চড়ে এই ঝকঝকে দিনের আলোয় এখন শহরের আর এক প্রান্তে যেতে হবে তাকে। না—হিমাংশুর পালাবার জায়গা কোথাও নেই।

কিন্তু আচমকা জানলা বন্ধ হওয়ায় ওই রিভলভারের মতো শব্দটা হিমাংশুর নিশ্চল অসাড় শরীরটাকে সজীব আর সজাগ করে তুলল। যেন তাড়া খেয়েছে, এমনিভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে সে বেরিয়ে এল গেটের বাইরে, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তার সাইকেল।

শুধু এই শহরের শেষ প্রান্তেই নয়, হাজার হাজার মাইল দূরে পালাতে পারলে তবেই যেন নিষ্কৃতি পেতো হিমাংশু। কিন্তু দ্বিতীয়বার পালাবার সাহস আছে তার?

মা মৃত্যুশয্যায়, ছোট বোনটার বিয়ে হয়নি—চারদিকের এই অসংখ্য দায়-দায়িত্ব ফেলে সে কোথায় পালাবে ?

অথচ অমিতার জন্যে তাকে পালাতে হবে। কিংবা নিজের জন্যেই। হিমাংশুর সাইকেল থেকে কেমন একটা বেয়াড়া আওয়াজ উঠতে লাগল, যেন যন্ত্রণার গোঙানি ফুটে বেরুচ্ছে কারো।

কাঁটালি-চাঁপার পাপড়িরঙা আকাশে তেমনি করে নিথর হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল দু'টো কালো কালো বিন্দু শকুন।

॥ ২ ॥

শহরের বাইরে বহুকালের পুরানো একটা দরগা। বছরের দু'টি একটি দিন ভক্তেরা এখানে চেরাগ জেলে দিয়ে যায়, কবে যেন একবার শিরনিও পড়ে। তা'ছাড়া একেবারে নির্জন। বৃষ্টিতে ফকিরের সমাধির ওপর শ্যাওলা পড়ে, রোদে সে শ্যাওলা কালো হয়ে যায়। দুপুরবেলা ঘুঘু ডাকে, রাতে ঝিঁঝিঁর ডাক ঝম্‌ঝম্ করে বাজতে থাকে চারদিকে। অনেকদিন আগে নাকি একটা চিতাবাঘ এসে একবার এই দরগাতেই আস্তানা নিয়েছিল।

চিতাবাঘের দোষ নেই। সামনে একটা পুরোনো আমবাগান, ঝাঁকড়া, ঝুপসী—বয়েসে আর অযত্নে কেমন কদাকার আর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। আম প্রায় হয়ই না, যে দু-চারটে হয় তা এমন অখাদ্য টক যে খুব সম্ভব বাদুড়ে পর্যন্ত খায় না। সকালের রোদেও বাগানের ভেতরে খানিকটা বিষণ্ণ ছায়া মুখথুবড়ে পড়ে থাকে, কেউ তার ভেতর দিয়ে চলতে গেলে মুখে চটচট করে উড়ে পড়ে পোকার ঝাঁক।

দরগার আর এক দিকে ওই রকম পুরোনো একটা পুকুর। শ্যাওলা আর কলমীতে তার বারো আনাই অদৃশ্য, কেবল ঘাটের কাছে একটুখানি কালচে জল চোখে পড়ে। কখনো-সখনো ভক্তেরা এখানে হাত-পা ধোয়, রাত্রে শেয়ালে জল খায়। চিতাবাঘের আশ্রয় নেবার মতো জায়গাই বটে।

কিন্তু আজ চিতাবাঘ নয়, হিমাংশু তার সাইকেলটা ঠেলে পুকুরধারে নিয়ে এল। আজ এখানে তারই লুকোনো দরকার। বড়ো বড়ো ঘাস গজানো ঘাটের পৈঠাগুলোর দিকে চেয়ে দেখল একবার, একবার হয়তো ভাবল ফাটলগুলোর মধ্যে সাপ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেই কতকগুলো বিবর্ণ ঘাসের ওপর সাইকেলটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘাটের ওপর বসে পড়ল। আকাশের দিকে হলুদের ওপর তখন লালের ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে।

একটি লাল শাড়ীর ছায়া।

সে প্রায় বারো বছর হতে চলল। বি-এ পরীক্ষা দেবার পর বন্ধু কেশবের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

দিনগুলো বেশ কাটছিল। বেশ কাটছিল—সেই রাতটা না আসা পর্যন্ত।

রাত বোধ হয় একটার কাছাকাছি, গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল হিমাংশু। হঠাৎ মশারি তুলে তাকে একটা ধাক্কা দিলে কেশব।

'এই ওঠ্—উঠে পড়্ চটপট।'

হিমাংশু লাফিয়ে উঠে বসেছিল।

'কী হয়েছে, ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়ীতে?'

'তার চাইতেও রোমাঞ্চকর।'

'মানে?'

পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেশব হেসে উঠেছিল: 'আরে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা মজার নাটক জমে উঠেছে, দেখতে চাস তো চল।'

'কী পাগলামি হচ্ছে কেশব এই রাতের বেলায়? ঘুমুতে দে আমাকে।'

ঘুমুতে কেশব দিল না। তার বদলে ঘর থেকে টেনেই বের করে আনল এক রকম।

নাটকটা জমেছিল দু'খানা বাড়ীর পরেই।

প্রচুর গণ্ডগোল সেখানে। সামনে বিরাট জটলা। অনেকগুলো লণ্ঠন, টর্চের আলো। সব গোলমালকে ছাপিয়ে একজনের গলা: 'সব ওই বুড়োর জন্মেই। এই বয়সে বিয়েটা না করলেই চলছিল না? অমন জোয়ান ছেলে ঘরে, মেয়েটা বড়ো হয়েছে—'

'বুড়োকে পুলিসে দিন মশাই। এ তো সুইসাইডের ব্যাপার নয়—রেগুলার খুনের চেষ্টা!'

কেশব বলেছিল মজার নাটক, হয়তো তার হিসেবে জিনিসটা নিদারুণ মজার। হিমাংশুকে আলতো ভাবে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা দেখতে হলে চলে আয় এদিকে।'

এদিকে মানে বাড়ীটার খোলা সদর দরজার সামনে।

সেখানেও একদল লোক অপরিসীম কৌতূহলে বকের মতো গলা বাড়াচ্ছিল ভেতরে। কে যেন মোটা গলায় ধমক দিয়ে বলছিল, 'এখানে আপনারা ভিড় করছেন কেন? চলে যান—যান—'

দু'একজন সরে এল বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। এক

ধরনের অশ্লীল আনন্দে তাদের চোখমুখ উদ্ভাসিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যখন উঠেই এসেছে, তখন নাটকটার আরো কিছু অংশ না দেখে চলে যাওয়ার পাত্র নয় তারা। যাত্রাটা কেবল জমে উঠেছে, এখন বৃষকেতুর পুনর্জীবনটা না দেখে তারা যায় কী করে ?

মোটা গলায় যে লোকটি ধমক দিচ্ছিলেন, বোঝা গেল তিনি ডাক্তার। মাথায় ছাইরঙের পাতলা চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গলায় স্টেথিস্কোপ। ছুটে আসতে হয়েছে বলে আর গ্রামের ডিস্পেন্সারির ডাক্তার বলে জামাটা পর্যন্ত গায়ে পরেন নি, গেঞ্জিটা গুঁজে দিয়েছেন ধুতির ভেতরে। তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন : 'মজা দেখছেন নাকি আপনারা ? এদিকে একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর আপনারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখানে ?'

কে একজন রুক্ষ স্বরে বলল, 'বেশি মেজাজ দেখাবেন না, ডাক্তারবাবু। আমরা প্রতিবেশী, আপদে-বিপদে এসে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।'

হাত জোড় করলেন ডাক্তার।

'আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করবেন। কিন্তু এখন তো আমি রয়েছি, আমাকে সাহায্য করবার লোকও কেউ কেউ আছে। এখন আর আপনাদের কিছু করবার নেই। যদি দরকার হয়, নিশ্চয় ডাকব আপনাদের। দয়া করে আপাততঃ আপনারা যান—আমার কাজের ভারি অসুবিধা হচ্ছে।

'ওঃ, ভারি ডাক্তার এসেছেন। ও-রকম কত দেখলাম।' গজর গজর করতে করতে ভিড় খানিকটা পাতলা হয়ে গেল। হিমাংশু বলল, 'কেশব, ফিরে চল।'

পাড়াগাঁয়ের আড়িপাতা বেহায়া মেয়ের মতো কেশব তবু চোখ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তেই চায় না।

'তুই থাক তবে, আমি চললুম।'

হন হন করে পা বাড়াতে কেশব এসে সঙ্গ ধরল।

'আরে, অত ছটফট করছিস কেন ? একটু দেখে গেলে ক্ষতিটা কী !'

'কী আর দেখবি ? তা'ছাড়া ডাক্তার—'

'ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। ডাক্তার আমার আপন বড়ো মামা—তা জানিস ? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্পেন্সারিতে বসে বসে পাড়াগেঁয়ে চাষাভুষোর পেট টিপে আর তাদের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে বড়ো মামার মেজাজটাই খিটখিটে হয়ে গেছে। ওতে মাইণ্ড করতে নেই।'

'মাইণ্ড না করলেও আমার ভালো লাগছে না। চললুম।'

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশবও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। হিমাংশু তার

কলেজের বন্ধু, ছুটিতে তাদের বাড়ীতে অতিথি। অতিথির সঙ্গে অভদ্রতা চলে না।

দু'জনে বাড়ী ফিরে এল। সেখানেও তখন জটলা। জানা গেল, কেশবের মা তখনো ও-বাড়ীতে আছেন, গোকুল মল্লিকের স্ত্রী তাঁর হাত ধরে কেঁদে বলছে—'দিদি, ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, আমাকে ফেলে আপনি যাবেন না।'

হিমাংশুর ঘরে ঢুকে কেশব তার মশারিটা তুলে ফেলল, বসে পড়ল তার পাশে। অর্থাৎ এখন আর হিমাংশুকে সহজে সে শুতে দেবে না। কেশবের মুখের দিকে চেয়ে হিমাংশু বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে অজস্র কথা সোডার ফেনার মতো গজগজিয়ে উঠছে তার পেটের ভেতর, সেগুলোকে উগরে না ফেলা পর্যন্ত কেশবের শান্তি নেই।

মুখের ওপর একটা অদ্ভুত কুশ্রী হাসি টেনে কেশব বললে, 'দেখলি কিছু ?'

'দেখেছি! দু-তিনজন লোক একটি মেয়েকে ছেলেপুলের মতো হাঁটাচ্ছে ভেতরের বারান্দা দিয়ে। মেয়েটা জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব বলে চলেছে মাতালের মতো।'

কেশব বলল, 'হুঁ, আফিং খেয়েছিল।'

'আফিং ?' দারুণ রকমের চমক খেল হিমাংশু: 'হঠাৎ কেন খেতে গেল ?'

'আরে সে হল সেই পুরোনো আদ্যিকালের গল্প। গোকুল মল্লিকের ছেলে রেলে চাকরি করে, মেয়েও বেশ বড়ো হয়েছে—নিজের চোখেই তো দেখলি। মজাটা কী জানিস, এরই মধ্যে ছেলের জন্যে একটা পাত্রী খুঁজতে গিয়ে মল্লিক হঠাৎ কি রকম ক্ষেপে গেল। দশ বছর বৌ ছিল না, মল্লিকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিও ছিল না, কিন্তু আজ সাতান্ন-আটান্ন বছরে পৌঁছে দুম করে একটা বিয়ে করে ফেলল। রেগে আগুন হয়ে ছেলে আদ্রা থেকে চিঠি দিয়েছে—তুমি তোমার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সুখে ঘর-সংসার করো, আমার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আর সেই জন্যে মেয়েও হঠাৎ আফিং খেয়ে বসল ?'

'না—সেজন্যে নয়। নতুন বৌ—কি বলে, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় হা-ঘরের মেয়ে।'—বেশ মেয়েলী ঢঙে চোখ গোল গোল করে কেশব বলে চলল—'বাড়ীতে খেতে পেত না, এখানে এসে জমিজমা, গোরু-বাছুর পুকুর-বাগানের গিন্নী হয়ে বসল। মল্লিক তো বলতে গেলে একেবারে শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে রইল আর ওর গিন্নী দু'বেলা দাঁতে কাটতে লাগল অমিকে।'

'অমি ? মেয়েটির নাম ?'

'হ্যাঁ, ওর ভালো নাম অমিতা। জানিস, মেয়েটা বোকা নয়। আমাদের এদিকে তো কাছাকাছি মেয়েদের হাই স্কুল নেই, যা পড়েছিল ওই ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। তারপর নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ম্যাট্রিকের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বড়ো মামাকে তো

দেখলি—ডাক্তারীতে যাওয়ার আগে মামা আই. এসসি পাস করেছিল—কখনো কখনো ওকে পড়ায়। ছেলেদের স্কুলের হেডমাস্টারও বই-টই দেন। মানে—বুঝলি—সব দিক থেকে খুবই ভালো মেয়ে। আর চেহারাও তো দেখলি।'

'তা দেখেছি। দেখতে ভালোই।'

'শুধু ভালোই? রীতিমত সুন্দরী।'—হিমাংশু উত্তেজিত হল: আমাদের গ্রামে ওর মতো সুন্দরী মেয়ে একটিও নেই। আর এই মেয়েটাকে মল্লিকের দ্বিতীয় পক্ষ যে কী কষ্ট দেয় ভাই, সে আর তোকে কী বলব। মেয়েছেলেকে তো আর কিছু বলা যায় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার হাত দস্তুরমতো নিশপিশ করে ওঠে। ইচ্ছে হয়, মল্লিককে ধরে ঘা-কতক কসিয়ে দিই।'

একটু চুপ করে রইল হিমাংশু। চারদিকেই কথার আওয়াজ, বাড়ীর সামনে দিয়ে মানুষের চলার শব্দ, এই রাতে গ্রামটা মল্লিকের বাড়ীকে কেন্দ্র করে জেগে আছে—আলোচনা করছে—উত্তেজিত হচ্ছে। দূরে বারকয়েক শেয়ালের ডাক উঠল—জুড়িদারেরা সাড়া দিলে ইতস্তত:, তারপর মানুষকে অতিমাত্রায় সজাগ দেখে তারা থমকে গেল।

কেশব একটা বিড়ি ধরালো। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—অল্পবয়স থেকেই বিড়িতে অভ্যস্ত।

'বিড়ি দেব একটা?'

'না—থাক। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মেয়েটা আফিং যোগাড় করল কোত্থেকে?'

'আরে, মল্লিক খায় যে! শহরে যায়, একবারে পনেরো দিনের আফিং নিয়ে আসে। তাই দুধে গুলে সবটা খেয়ে নিয়েছিল মেয়েটা। কেউ টের পায়নি। হঠাৎ ওর গলা থেকে কি রকম আওয়াজ বেরুচ্ছে শুনে বুড়োর সন্দেহ হয়, দুধের বাটিতে পায় আফিঙের গন্ধ—দৌড়ে খবর দেয় বড়ো মামাকে। বড়ো মামা ছুটে এসে স্টমাক-পাম্প দিয়ে সবটা প্রায় বের করে ফেলেছেন। আর একটু দেরি হলেই—'

হাঁ, আর একটু দেরি হলেই মুক্তি পেতো মেয়েটা।

হিমাংশু আবার বসে রইল চুপ করে। দরজার ভেতর দিয়ে যা দেখেছিল, তা এখনো চোখের সামনে একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো অদ্ভুত হয়ে আছে। বাড়ীর লম্বা বারান্দায় সারি সারি লণ্ঠন, যেন দীপালি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, চারদিক আলোয় আলোময়। আর সেই বারান্দা দিয়ে এক মাঝবয়েসী বিধবা আর জন-দুই পুরুষ মেয়েটির হাত ধরে একবার বারান্দার এ-প্রান্তে, আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি বোজা, সে চলতে চাইছে না, প্রত্যেক

মুহূর্তে তার সারা শরীরটা যেন ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। সোনার পাতের মতো পা দুটি পড়ছে অসংলগ্ন ভাবে, গুচ্ছ গুচ্ছ নীল চুল বুকের ওপর এসে পড়েছে, আঁচল খসে যাওয়ায় লজ্জা ঢাকতে চাইছে, ঘুমের ঘোরে যেমন করে পাখিরা ডেকে ওঠে, তেমনি করে একটা অস্পষ্ট কাকলি শোনা যাচ্ছে তার মুখে। হিমাংশু একবার যেন শুনতেও পেয়েছিল—'ঘুমুতে দাও—আমাকে ঘুমুতে দাও না তোমরা—'

বারান্দার নীচে, উঠোনে বসে ছিল আর একজন। বসে ছিল নিজের ভেতরে মাথা মুখ গুঁজে কুণ্ডলি-পাকানো একটা কুকুরের মতো। ওপরের সারি সারি লণ্ঠনের আলো হিংস্রভাবে তার ছাঁটা ছাঁটা চুলগুলোর ডগায় ডগায় জ্বলছিল—যেন একটা জানোয়ারের গায়ের রোঁয়ার মতোই দেখাচ্ছিল সেগুলোকে। গায়ের ফতুয়াটার ওপর গলার কাছে চিকচিক করছিল একটা সরু সোনার হার—গোকুল মল্লিক।

কেন ও-ভাবে বসে ছিল সে? অনুতাপ করছিল? শুধু ছবিতে একজন ছিল না —সে মল্লিকের স্ত্রী। খুব সম্ভব কেশবের মা'র হাত ধরে কোনো অন্ধকার কোণায় ভয়ে কাঠ হয়ে বসে ছিল সে।

নাটকই বটে। কিন্তু মজার নাটক নয়। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে হিমাংশু বলল, 'মেয়েটা বাঁচবে?'

'বাঁচবে বই কি। বড়ো মামা ঠিক টাইমলি এসে গিয়েছিলেন যে। পাম্প দিয়ে সব বের করে ফেলেছেন।'

'তবে ও-ভাবে হাঁটাচ্ছে কেন? শুতে দিচ্ছে না কেন মেয়েটাকে?'

'ঘুমিয়ে পড়লে ফল খারাপ হতে পারে। সেই জন্তেই জাগিয়ে রাখতে হয়, হাঁটাতে হয়।'

'ও।'

'হয়তো আজ সমস্ত রাত ওইভাবে হাঁটতে হবে মেয়েটাকে।'

'সমস্ত রাত?'

আবার সেই ছবিটা ফুটে উঠল ফ্রেমের মধ্যে। লম্বা টানা বারান্দাটার ওপর দিয়ে সোনার গড়া পা দুখানা আর চলতে পারছে না, যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। বন্ধ চোখের কোণায় বুঝি জলের বিন্দু। নীল রুক্ষ চুলের রাশ বুকের ওপর। ঠোঁটের একপাশে রক্তের দাগ, পাম্প দেবার সময় বোধ হয় চিরে গেছে মুখটা। অতল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইছে সে—'ঘুমুতে দাও, ঘুমুতে দাও আমাকে।'

কী বেদনায় ভরা ছবিটা। কী অসম্ভব করুণ।

কেশব বলল, 'নে, শুয়ে পড় তা'হলে। কী হল জানা যাবে কালকে সকালে।'

ঘুমো।'

চলে গেল।

কিন্তু ঘুম সেদিন আসেনি। সারারাত শুধু একটি বিনিদ্র কাকলি দু'কান ভরে বেজেছিল তার, জাগিয়ে রেখেছিল তাকে—'আমাকে ঘুমুতে দাও।'

হিমাংশুর চমক ভাঙল খানিকটা সর্‌সর্‌ খর্‌খর্‌ আওয়াজে। চেয়ে দেখল, মধ্যরাতের সেই দূর গ্রাম নয়, সেই ফ্রেমে আঁটা ছবিটিও নয়; এগারো বছর আগেকার সেই উপন্যাসের মতো রাতটাকে মুছে দিয়েছে শরতের লাল রোদ। সে বসে আছে পীরের দরগার ফাটলধরা ঘাটলার ওপরে, একটু দূরে বড়ো বড়ো ঘাস ভেঙে অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে একটা কদাকার গো-সাপ, জিভটা তার হিল হিল করছে। থেকে থেকে গো-সাপটা আড়চোখে লক্ষ্য করছে তাকে—যেন তার মতলবটাকে বুঝে নিতে যায়।

হিমাংশু চোখ সরিয়ে নিল। ওই গো-সাপটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। ওর কুৎসিত চেহারা, কদর্য চলনের সঙ্গে তারও যেন মিল আছে কোথাও। ও যেন তারই প্রতিচ্ছায়া একটা।

হিমাংশুভূষণ বসু নামে যে পাড়াগাঁয়ের ছেলেটি একটু বেশি বয়েসে ম্যাট্রিক পাস করেছিল, তারপর বি এ. পরীক্ষায় একবার ফেল করে কেশবের সঙ্গ ধরেছিল, এতদিন তার জীবনে স্বপ্ন-কল্পনার দৌড় বেশি দূর পর্যন্ত ছিল না। সে বড়ো জোর কোনো কোনো সিনেমার নায়িকার মুখওলা ক্যালেণ্ডার এনে ঘরে টাঙাত, উপন্যাস পড়ে নায়কের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করত, মিলন না হলে কিংবা নায়িকা হঠাৎ মারা গেলে কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে এক-আধটু কেঁদেও ফেলত। অর্থাৎ হিমাংশুর জীবন খুব সহজ ছিল, খুব সহজ হতে পারত। আজ এগারো বছর ধরে যে যন্ত্রণা তাকে চেতনে অচেতনে বিঁধছে, এই সাদাসিধে জীবনের ছোটখাটো দুঃখ-সুখের ভেতরও তাকে কখনোও সম্পূর্ণ করে হাসতে দেয়নি। অকারণে এক-একটা বিনিদ্র রাতকে তার চোখের পাতায় ঘনিয়ে এনেছে, সেগুলো কিছু ঘটত না—যদি সেই রাতটা না আসত।

সেই এক-একটা রাত—যা চক্ষের পলকে মানুষকে অন্য জগতে নিয়ে যায়, তাকে নতুন করে গড়ে দেয়। যে দুঃখ তার জীবনে কখনো আসত না, একটা বটের অলক্ষ্য সূক্ষ্ম বীজের মতো সঞ্চার করে তাকে; নিজের যে পরিচয় সে কখনো পেতো না, একটা জাদুর আয়না মুখের সামনে ধরে তারই ভেতরে তাকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তোলে; যেখানে পাথরের একটা নিরনুভব দেওয়াল ছিল, সেটা ভেঙে বেদনার নদী বইয়ে দেয়।

সেই রাত!

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হিমাংশুর। চেয়ে দেখল সামনের পুকুরের জলে শরতের শালুক ফুটে উঠেছে দু-চারটে। পুরোনো দরগার এই নিঃসঙ্গ জীর্ণতার ভেতর, চারদিকের এই শূন্যতার মাঝখানেও কয়েকটা রাঙা শালুক আর একটা জীবনের ইঙ্গিত। সেই রাতে হিমাংশুর বুকের মাঝখানেও এমনি করে একটা ফুলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ঝপাং করে শব্দ হল একটা, গো-সাপটা মাছের আকর্ষণে ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। একবারের জন্যে চমকে উঠল হিমাংশু, চেয়ে দেখল শ্যাওলা-পানার ভেতর দিয়ে কুমিরের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে গো-সাপটা। ঠক্-কঁর— ঠক্-কঁর-র্—শব্দে একটা তক্ষক রব তুলতে লাগল দরগার ভেতর। তখন মনে হল, বেলা পড়ে আসছে, রোদের রঙ লাল হল—এইবার এখানে আর একটা জীবনাতীত জগতের কাহিনী শুরু হবে।

তা হোক। কিন্তু হিমাংশু এখনি উঠবে কোন্ লজ্জায়? কী করে যাবে এখান থেকে—যখন চারদিকে আলো যখন চারদিকেই মানুষের মুখ?

সেই রাত। আর একটি মানুষ ঘুমুতে চেয়েও ঘুমুতে পারছে না, তার অনিচ্ছুক শরীরটাকে—যা ভেঙে পড়তে চাইছে, যা গলে যেতে চাইছে—যা মিলিয়ে যেতে চাইছে যমের অতল সমুদ্রে, তার সেই সমস্ত রাতব্যাপী যন্ত্রণার কথা ভেবে হিমাংশুও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারল না। ঝিমুনি এল ভোরবেলায়, কেশব তাকে টেনে তুলল বেলা সাড়ে আটটায়।

'কিরে, জেগে কাটিয়েছিস নাকি রাতভোর? বৌদি দুবার তোর চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে।'

'না—ঠিক জেগে নয়, মানে অসময়ে ঘুম ভেঙে মাথাটাই কেমন যেন গরম হয়ে গেল।'—একটু অপ্রতিভ বোধ করল হিমাংশু: 'ভালো কথা, সে মেয়েটি কেমন আছে রে?'

'ভালো। আউট অব ডেঞ্জার।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী?'—কেশব একটু হাসল: পুলিশ কেস হবে এর পরে। অ্যাটেমপ্‌টেড সুইসাইডের জন্যে হয়তো মাস ছয়েক জেল হয়ে যাবে।'

'জেল।'—প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল হিমাংশু।

মিট মিট করে হেসেছিল কেশব: 'সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে সিম্প্যাথি বুঝি উথলে উঠছে তোর? এ সব তো ভাল লক্ষণ নয় হিমাংশু!'

'ফাজলামী করতে হবে না। সত্যি বল তো, মেয়েটার জেল হবে নাকি?'

'আইনতঃ তাই তো হওয়া উচিত। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। সেই হাত যে দিয়ে বসে আছে, তাকে কে বাঁচাতে পারে, বল?'

বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল হিমাংশু। মেয়েটির যে যন্ত্রণার চেহারা নিজের চোখে সে দেখে এসেছে, তার পরেও জেল খাটতে হবে? এর চাইতে নির্মমতা কল্পনাও করা যায় কখনো? হিমাংশুর মনে হল একটা ফুটন্ত পদ্মকে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ের তলায় সযত্নে পিষে ফেলছে কেউ। এই নিষ্ঠুরতার কথা জানলে কশাইয়ের ছুরিও শিউরে উঠত!

একটু চুপ করে থেকে হিমাংশু বললে, 'শাস্তি হবে এই মেয়েটারই? আর যারা যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তাকে আত্মহত্যার পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাদের কোনো বিচারই নেই?'

কেশব বললে, 'আমার মেজদা কাল বাড়ীতে এসেছে—দেখেছিস তো? মেজদা হল মোক্তার। তুই শুয়ে পড়লি, তারপর আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের ভেতরে এ নিয়ে আলাপ করছিলুম। মেজদা বলছিল, মেয়েটি দরকার হলে তার বাপ-মার নামে নিষ্ঠুরতার জন্যে আদালতে নালিশ করতে পারত, কিন্তু কোনো কারণেই সে সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করতে পারে না। কেস হবে, জেলও অনিবার্য।'

হিমাংশু পাথর হয়ে বসে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না।

কেশব বললে, 'যাক গে, তুই আর ও নিয়ে মন খারাপ করে কী করবি! তুই এ গ্রামের লোক নোস, ওদের সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক নেই, এমন কি এক জাত পর্যন্ত নয়। মেয়েটা মরুক আর ফাঁসিই যাক, তোর কী আসে যায়—বল্? তুই তো এখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা ভুলে যাবি।'

হিমাংশু ক্ষুণ্ণ হল।

'কী ভাবিস তুই আমাকে? হার্টলেস ব্রুট?'

'ব্রুট ভাবব কেন?'—আবার মিটমিটে হাসি দেখা দিল কেশবের মুখে: 'যা স্বাভাবিক, তারই কথা বলছি আমি। সে যাকগে—মিথ্যে এসব নিয়ে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে তোর জন্যে জলখাবার তৈরী করে বসে আছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খাবি চল!'

কিন্তু খাবারে সেদিন আর হিমাংশুর রুচি ছিল না। সব বিস্বাদ ঠেকেছিল মুখে।

আসলে 'মেয়েটির জেল হয়ে যাবে'—এই কথাগুলো নিতান্তই ঠাট্টা করে বলেছিল কেশব। সাত মাইল দূরের থানায় রিপোর্ট করবার আসল মালিক হলেন কেশবের বড়ো মামা—ডাক্তারবাবু। কিন্তু তিনি গ্রামের লোক, এই মেয়েটির [illegible]

ইতিহাস তিনি জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভালোবাসতেন মেয়েটিকে ; তাই তার এত দুঃখ-যন্ত্রণাকে আর অপমান দিয়ে তিনি কালো করতে চাননি। ব্যাপারটা ধামা-চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। খুব সম্ভব আইননিষ্ঠ ডাক্তার জীবনে এই প্রথম আর এই শেষবার আইন ভঙ্গ করেছিলেন স্বেচ্ছায়।

অনেক গল্প হয়েছিল তাঁর ডিসপেনসারিতে বসে।

'গোকুল মল্লিকটাই ক্রিমিন্যাল। ওরই জেল হওয়া উচিত।'—তিক্তস্বরে ডাক্তার বলেছিলেন, 'এখন মধ্যে মধ্যে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে আসে। বলে, ভারি ভুল করেছি। কেন, বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না? অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে দেখেই মাথাটা একেবারে ঘুরে গেল?'

'সংসারে যখন অশান্তি, তখন গোকুলবাবু নিজের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো পারেন।'

'মেয়ের বিয়ে দিতে হলে খরচ করতে হবে না?'—ডাক্তারের গলায় বিষ মিশল : 'মল্লিক হাড়-কেপ্পন, ভুল করে হাত দিয়ে একটা পয়সা গলে গেলেও তার বুক ফেটে যায়। আমি তো বলেছিলুম, মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, লেখাপড়া করতে চায় দিন না টাউনে পাঠিয়ে। হোস্টেলে থাকবে, পড়াশুনো করবে। সে কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল মল্লিক। "হোস্টেলে রেখে মেয়েকে পড়াব! দেউলে হয়ে যাব যে!" রাস্কেল্! ও দেবে মেয়ের বিয়ে?'

'কী অন্যায়!'—এ ক্ষোভও বেরিয়ে এসেছিল হিমাংশুর মুখ থেকেই।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'টু বী ফ্র্যাঙ্ক, সুইসাইড্ করবার চেষ্টা না করে মেয়েটা যদি কারুর সঙ্গে পালিয়েও যেত, তাহলেও আমি খুশি হতুম। সতেরো-আঠারো বছর তো বয়েস হল, সাবালিকা যদি না হয়ে থাকে, তাহলেও তার কাছাকাছি। এটুকু বুদ্ধিও কি মাথায় আসে না? কিন্তু ও-সব কিছু করবে না, একেবারে শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, কারুর দিকে চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত জানে না। সংসারে এরাই বাঁধা গোরুর মতো মার খেয়ে মরে। হত দজ্জাল, ওই শয়তান সৎমা আর সেনিলিটি-ধরা বাপকে সায়েস্তা করে দিতে পারত।'

সেই সোনার পাতের মতো পা দুখানি মাটিতে পড়তে পারছে না—যেন তরল হয়ে এখনই গলে যাবে। দুটি চোখ মৃত্যুর স্বপ্নে বোজা। নীল রুক্ষ চুলগুলো তার বুকের ওপর, ঠোঁটের কোণায় রক্তের রেখা, নেশায় জড়ানো পাখির কাকলির মতো তার গলা। সেই ছবিটা হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিঁধে রইল ছোরার মতো।

আর সেই ছোরা নিয়েই নিজের বাড়ীতে ফিরে এল হিমাংশু।

...আমবাগানের ওপর সূর্যটা নেমে এল, বেলা শেষের সূর্য। মজা পুকুরের জলের

ভেতর থেকে কখন উঠে গেছে গো-সাপটা। কলমী বনের ভেতর দিয়ে, শালুক পাতায় পা ফেলে ফেলে শিকার খুঁজছিল জলপিপি। একটা ফড়িঙের স্বচ্ছ সোনালি পাখা কাঁপছিল হিমাংশুর কানের কাছে। আকাশের রঙ আরো নিবিড় নীল হয়ে এল— এর পর সোনা মেখে কালো হয়ে যাবে। হিমাংশুর মনে হল, এবার তার বাড়ী ফেরা উচিত। কিন্তু এখনো অন্ধকার নামেনি—এখনো আত্মগোপনের উপায় নেই, এখনো লোকে তার মুখ দেখতে পাবে।

সে চিঠি লিখেছিল কেশবকে।

'যদি মল্লিক মশাইয়ের আপত্তি না থাকে, আমি অমিতাকে বিয়ে করতে চাই।'

জবাবে কেশব লিখল: 'আশ্চর্য হইনি, তোর মুখচোখ দেখে মনে হয়েছিল সিমপ্যাথি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রস্তাব ভালো, পাত্র হিসেবে তুই চমৎকার, কিন্তু মল্লিক মশাই স্বর্ণবণিক—সেটা খেয়াল আছে? জাতের বালাই কাটাতে পারবি? আমি বড়োমামাকে তোর চিঠিটা দেখিয়েছিলুম। মামা বললেন, বুড়ো মল্লিক আপত্তি হয়তো করবে না, আর আপত্তি করলেও মামা তাকে ম্যানেজ করে নেবেন। কিন্তু সত্যিই তোর সাহস আছে? তাহলে আর একবার চলে আয় এখানে। মেয়েটির সঙ্গেও একটু আলাপ পরিচয় হোক। তারপর—'

তারপর—

সন্দেহ নেই, বড়োমামা সাহায্য করেছিলেন অনেক। তাঁর বাড়ীতে মেয়েটি যখন পড়তে আসত, তখন নানা কাজের ছুতোয় উঠে যেতে হত তাঁকে, পড়াবার ভার হিমাংশুই নিত। কেশবও আবহাওয়া তৈরী করত সাধ্যমতো, ফাঁক পেলেই গুণ-কীর্তন শোনাতো হিমাংশুর—বলত, এমন ভালো—এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আর হয় না। হিমাংশু যে এক বছর বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছিল এবং এবার সে কোনোমতে পাস করলেও করে যেতে পারে, এ-সব তথ্য বেমালুম গোপন করে গেল কেশব।

আর হিমাংশু দেখল, ছবির ফ্রেমে যতটুকু ধরা পড়েছিল মেয়েটি তার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর। তার যে চোখদুটি মৃত্যুর স্বপ্নে সেদিন মগ্ন হয়ে ছিল, আজ তারা অনেক সন্ধ্যা, অনেক সকালের আলোয় তার কাছে জীবনের ভেতর ফুটে উঠল। হিমাংশু দেখল সেখানে কত ভয়, কত শূন্যতা। বার বার মনে হল, এই শূন্যতার ভেতরে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে?

শুধু একটা জায়গায় তার জিৎ ছিল। গানের সুর ছিল তখনো তার গলায়।

'তুমি গান শেখো না কেন অমিতা?'

'কে শেখাবে?'

'আমি শেখাতে পারি।'

'আপনাকে কোথায় পাব? দুদিন পরেই তো চলে যাবেন।'

তারপরেই বলা চলে, যদি যাই, একলা যাব না—তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু মেয়েটির চোখদুটির দিকে চেয়ে সে-কথা বলতেও যেন ভয় করে। মনে হয়—নিজের অগোচরে কখন তাকে আঘাত দিয়ে বসবে, যে যন্ত্রণার ভেতর সে তলিয়ে আছে প্রতিদিন, নতুন করে রক্ত ঝরাবে তা থেকে।

কাজেই মুখের কথা রূপ পেলো গানে।

'একদা তুমি প্রিয়ে
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে-কথা কি গেছ ভুলে?'

আলোয় চোখদুটো বেঁচে উঠতে চাইল। হিমাংশু অনুভব করল: বলা যায়—এখনি বলা যায়। তবু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। শেষ পর্যন্ত বলবার ভার কেশবকেই দিতে হল। দেরি করবারও আর উপায় ছিল না, কারণ বন্ধুর বাড়ীতে এসে পড়ে থাকারও একটা ভদ্ররকম সীমা আছে—সে বন্ধু যতই প্রিয়তম হোক।

কেশব এসে বললে, 'ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা।'

রক্তে অনিশ্চয়তার ঝড়। অবরুদ্ধ গলায় হিমাংশু জিজ্ঞেস করল: 'রাজী, না অরাজী?'

'অরাজী মানে? হাতে স্বর্গ পেয়েছে।'

'ওর বাবা? গোকুল মল্লিক?'

'পণ দিতে হবে না, মিনিমাম খরচ, সে বুড়ো তো লাফিয়ে উঠবে। তা ছাড়া নিজের জাত না হলেও কুজাত তো নয়, আপত্তিই বা করবে কেন? ওর দ্বিতীয় পক্ষের প্যাঁচাটির হাড়ে বাতাস লাগবে নিশ্চয়। তবু যদি গাঁইগুঁই করে—মামা আছেন। বুড়োর—' একটু গলা নামিয়ে কেশব বললে, 'কয়েক বছর আগেও এটা-ওটা দোষ ছিল, কোত্থেকে খারাপ রোগও বাধিয়ে এসেছিল। মামাই গোপনে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। সে-সব অস্ত্র মামার হাতেই আছে—তাই ওঁকে যমের মতো ভয় করে বুড়ো।'

'বুড়োর তো অনেক গুণ তাহলে।'

'অনেক।'—কেশব মাথা নাড়ল: 'কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো আশ্চর্য ভালো, মনে হয় যেন আলাদা একটা জগৎ থেকে এসেছে ওরা। আসলে ওর আগের স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীর প্রতিমা—এরা তাঁরই পুণ্যের ফল। খুব জিতে গেলি ভাই হিমাংশু, জীবনে তুই সুখী

হবি। জাতের সংস্কারটাও যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিস, দেখিস ভগবান তোকে আশীর্বাদ করবেন।'

কেশবের ভারী বিশ্বাস ছিল ভগবানের ওপর।

তারপরের অংশটা যেমন দ্রুত, তেমনি সংক্ষিপ্ত।

দশদিন পরে বিয়ের দিন ঠিক করে—গোকুল মল্লিকের সম্মতি আদায় করিয়ে—হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ী ফিরেছিল হিমাংশু। সেদিন তেইশ বছর বয়সে তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা খুব সহজ জায়গা, এখানে সব কিছু একটি নিশ্চিন্ত সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে। অসবর্ণ বিয়ে করে, একটি অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে—যে অতুল কীর্তি সে রাখতে যাচ্ছে, তার জন্য বাবা তাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

করেন নি।

চা খাচ্ছিলেন, প্রস্তাবটা শোনবামাত্র তাঁর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা মেজের পড়ে চুরমার হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'মেয়েটি সুবর্ণবণিক?'

'হুঁ।'

'তুমি কী জানো?'

'জানি।'

'না—জানো না! অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশে তোমার জন্ম।'

'বাবা, বৈষ্ণবেরা জাতিভেদ মানতেন না।'

'থামো। বৈষ্ণব ধর্মের তুমি কিছু জানো না, একটা কথাও বলবে না তা নিয়ে।'

'বলব না। কিন্তু এই মেয়েকে আমি বিয়ে করবই। কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছ? কিন্তু আমিও কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে কখনো এ অনাচার আমাদের বংশে ঘটতে দেব না। আজকাল কলকাতা নরককুণ্ড হয়ে গেছে, সেখানে বামুনের মেয়ে মুদ্দোফরাসের সঙ্গে হাসিমুখে মালা-বদল করে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ও-সব শ্রীক্ষেত্তর এখনো তৈরী হয়নি, এ-বিয়ে আমি হতে দেব না।'

হঠাৎ যেন হিমাংশু অনুভব করছিল তার বাবা তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান, তাঁর যুক্তির জোর যাই থাক—একটা কঠিন ভয়ঙ্কর শক্তি দিয়ে তিনি হিমাংশুকে অভিভূত করে ফেলেছেন। তবু সাধ্যমত সে মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখতে চাইল, বলল, 'আমি বিয়ে করবই।'

'করবে?'

বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, দেওয়ালের কোণায় ফিট করা বন্দুকটা দাঁড় করানো ছিল, অভ্যস্ত হাতে দুটো টোটা পুরলেন তাতে। তারপর নিজের গলায় নল ঠেকিয়ে, ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে বললেন, 'করো বিয়ে, কিন্তু তার আগে আমার রক্ত দেখে যাও।

বিয়ে করার জন্যে যদি নিজের বাপকেই খুন করতে না পারলে, তা'হলে আর উপযুক্ত পুত্র হবে কী করে।'

মা হাহাকার করে ছুটে এলেন, বাবার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। বন্দুকে ফায়ার হয়ে গেল একটা—বজ্রের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল ঘর, মা'র চীৎকারে বিদীর্ণ হল চারদিক। কিন্তু মা'র টানাটানিতে বন্দুকের নল সরে গিয়েছিল ; তাই গুলিটা বাবার গায়ে লাগেনি—টিনের চাল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'একবার ফসকেছে, কিন্তু বার বার ফসকাবে না।'

মা হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে, চোখ থেকে জলের বদলে যেন রক্ত ঝরিয়ে বিকৃত গলায় চীৎকার করতে লাগলেন : 'ওরে খুনে—আমাকেও শেষ করে দে তোর বাপের সঙ্গে। আর দেরি করছিস কেন ?'

যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে, এইভাবে ঘরের মেজেতে মিলিয়ে গেল হিমাংশু।

কেশব চিঠি লিখল বারো দিন পরে।

'ভেবেছিলুম তুই দেবতা, দেখলুম জানোয়ারেরও অধম, গোকুল মল্লিকেরও পায়ের ধুলোর যোগ্য নোস। চিঠি তোকে দিতুম না—প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, কিন্তু একটা খবর না জানালেই নয়। এতদিনে সত্যিই তোদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে অমিতা। কাল শেষরাতে সে যে কোথায় কোন্ দিকে চলে গেছে কেউ জানে না।'

তারও পরের দিন লজ্জায় গ্লানিতে, ভোরের আলোয় একটা তপ্ত বৈশাখের পূর্ব-সংকেত দেখা দেবার আগেই, ফসলহীন মাঠের রুক্ষ কাঁটাভরা আলের ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিয়েছিল হিমাংশু।

তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তখন অমিতার জন্য শেষ যন্ত্রণার বহ্ন্যুৎসব।

সেই জ্বালা কতদিন জ্বলেছিল ?

কে বলতে পারে—নিশ্চিত করে কে তার হিসেব রাখে ! যন্ত্রণার খাতাটা লুপ্ত করে দিতে পারলেই খুশি হয় স্মৃতি। এগারো বছরের ওপর।

বাবা নেই, হিমাংশু দ্বিতীয়বার বি-এ ফেল করে শহরের কলেজের ক্লার্ক। মাকে এনেছে নিজের কাছে, মা মৃত্যুশয্যায়। ছোট বোন দু'টো সঙ্গে আছে—তারা বড়ো হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে তাদের। যে হিমাংশুর বুকের ভেতর এক রাতে একটা অপূর্ব নির্ঝর জেগেছিল, একটা অচেনা দরজা খুলে গিয়েছিল, তার সেই মুক্তির উৎস-গুলো ঢেকে দিয়ে আবার দেখা দিয়েছে সেই নিরস্কুভব পাথরের দেয়াল। হিমাংশু আর গান গায় না, চর্চা ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল ; আজ, যদি পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পায়, রেডিয়োতে বাজছে—'আজি কি সবই ফাঁকি, সে-কথা কি গেছ ভুলে'—

তা হলেও হিমাংশু একবারের জন্যে থমকে দাঁড়াবে না।

আট বছর ধরে এই কলেজের সে কেরানী-কাম-টাইপিস্ট্। দু' দফা মিলিয়ে মাইনে দু'শোর কাছাকাছি। তাতে সংসার পনেরো দিন চলে। তারপর টুকটাক টিউসান, দু-একটা ছোটখাটো ইন্স্যুরেন্স, সেই সঙ্গে অন্য কোনো ধরনের দালালী জোটানো যায় কিনা তার ভাবনা। এর মধ্যে অমিতা কোথাও ছিল না—কোথাও থাকবার উপায়ও ছিল না।

শুধু একটি জায়গায় হিমাংশু নিজের মনকে সহজ করতে পারেনি। বিয়ে করেনি সে। মা'র বার বার অনুরোধের জবাবে বলেছে, 'আমি বিয়ে করে কী করব, স্ত্রীকে তো খাওয়াতে পারব না।' তার উত্তর মা সহজেই দিতে পারতেন। বলতে পারতেন, 'একদিন যেচে পাত্রী ঠিক করেছিলে, সেদিন তো খাওয়ানোর ভাবনা মনে আসেনি।' কিন্তু মা সেকথা বলেন না। দুঃখ দিতে চান না বলেই বলেন না।

তবু অমিতা সুদূর ছিল। তার স্মৃতির চাইতেও হিমাংশুর কাছে অনেক বেশি সজাগ ছিল আত্মগ্লানি। সেই কারণেই এতদিন সে বিয়ে করে নি। কিন্তু অমিতা যে আবার এগারো বছর পরে ওপার থেকে ফিরে আসবে, ফিরে আসবে নতুন প্রিন্সি-প্যালের বাড়ীর জানলায়, ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো শরতের আলোয় ঝলমল করে উঠবে—কে ভাবতে পেরেছিল এই সম্ভাবনার কথা!

দুটো ছবির মধ্যে কী তফাৎ!

সেই এগারো বছর আগের রাত্রে অন্ধ চোখে সে মৃত্যুর ভেতরে পরিক্রমা করছিল; তার সোনার পুতুলের মতো শরীর যন্ত্রণার উত্তাপে গলে ভেসে যেতে চাইছিল, তার নীল চুলের গোছা যেন অনন্ত রাত্রিকে তরঙ্গিত করে আনছিল তার ওপর। আজ শরতের রোদেও আবার তাকেই দেখতে পেলো সে। আজও কালো চুলের গুচ্ছ তার কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তার মুখ আজ অন্ধকারের আড়াল থেকে এক নিঃশব্দ সূর্যোদয়। আজ লাল শাড়ীর পটভূমি, তাকে ঘিরে ঘিরে সাদা মেঘের ওপর অরুণ রাগ—রাত্রির সহচর হিমাংশু সেখানে কোথায় দাঁড়াবে!

হিমাংশুর সম্বিৎ ফিরে এল। দরগার মলিন শ্যাওলাধরা প্রাচীরগুলো এখন কালো হয়ে গেছে। সূর্য নেমে গেছে পশ্চিমে, জংলা আমবাগানের মাথায় তার শেষ রঙ। পুকুরের ধার থেকে দু'টো বক আকাশে ডানা ছড়িয়ে দিল। দীর্ঘ ছায়া পড়ল আশপাশে, তীব্র ঝিঁঝির ডাক উঠল।

বাটলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বুকের মধ্যে একটা ব্যাকুল কান্না ফেটে পড়ছিল—'ফিরে যেতে হবে—তাকে ফিরে যেতে হবে। কাল প্রিন্সিপ্যাল তাকে আবার তাঁর বাসায় যেতে বলবেন, আর—'

সন্দেহ নেই, মেয়েটি অমিতাই। যদি জানলার ফ্রেমের ভেতর তার কোমর পর্যন্ত ধরা না পড়ত, যদি তাকে দেখে মেয়েটি অমন করে স্তব্ধ হয়ে না যেত, তা হলে—

কিন্তু এ কী করে সম্ভব হল? কোন্ পথে—কী উপায়ে দূর গ্রামের সেই মেয়েটি—আত্মহত্যার চাইতেও নিষ্ঠুর ভাগ্যের মধ্যে যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, কী করে প্রিন্সিপ্যাল অজয় পালচৌধুরীর স্ত্রী হল সে? কোন্ ঘটনাচক্রে—কী যোগাযোগে?

হিমাংশু তা কোনোদিন জানবে না—জানবার পথ নেই।

॥ ৩ ॥

সাতদিন পরে, আবার ভাঙা ঝরঝরে সাইকেলটা চালিয়ে হিমাংশু এল সেই নির্জন দরগার কাছে। আজ সে নিশ্চিত হয়েই এসেছে। সঙ্গে এনেছে শক্ত একগাছা দড়ি, পকেটে আছে একখানা চিঠি—'কেহই দায়ী নয়।'

না—কেহই দায়ী নয়।

এই এক সপ্তাহে হিমাংশু তিনবার গেছে প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রীর কাছে। প্রিন্সিপ্যাল পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী নমিতা।'

নমিতা—অমিতা নয়। তবু নমিতা হতে অমিতার কতক্ষণ সময় লাগে? জীবনের ছাঁচে এমন করে দু'জন এক হয় না, বোধ হয় যমজও নয়। অমিতার কোনো যমজ বোনও ছিল না।

অমিতা তাকে চেনেনি। কোনোদিন আর চিনবে না। শুধু শরতের রোদে খোলা জানলার ভেতর একখানা ছবির মতো সে যে জমাট বেঁধে গিয়েছিল—সে মুহূর্তটা মিথ্যে কথা বলেনি।

এখন দূরে সরে গিয়েও হিমাংশুর আর মুক্তি নেই—অমিতা তাকে চিনবে না—এই যন্ত্রণা তাকে পাগল করে দেবে, আর সে এখানে থাকতে অমিতারও শান্তি নেই—রাহুর ছোঁয়া যে অমিতারও লেগেছিল, বিয়ের দিন ঠিক করে চলে আসার আগে, একটি নিভৃত অবসরে, ভাবী বধূর সসঙ্কোচ সরলতায় সে যে মুখখানি হিমাংশুর মুখের দিকে তুলে ধরেছিল—সে গ্লানিই বা সে কেমন করে ভুলবে!

সাইকেলটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল হিমাংশু। চেয়ে দেখল বেলা-শেষের আকাশে শেষ আলোর একটা রক্তিম দীর্ঘ রেখা—যেন অমিতার রক্তাক্ত ঠোঁটের মতো। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে নিলে হিমাংশু, মোটা দড়িটাকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল আমবাগানটার উদ্দেশে—যেখানে ছায়ারা এখন মৃত্যুময় অন্ধকারের পর্দা খুলছে একে একে॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইখানি অনেকদিন ছাপা ছিল না। সেজন্য আমিই দায়ী, শারীরিক অসুস্থতা এবং নানা কাজের চাপে যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিতে পারিনি।

বর্তমান সংস্করণে তিনটি নতুন প্রসঙ্গ সংযোজিত এবং একটি বর্জিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি লেখারও কিছু কিছু পরিমার্জনা করে দিয়েছি। ফলে বইখানি আয়তনে একটু বড়ো হয়েছে এবং তার জন্য অপরিহার্য ভাবেই যে মূল্য বৃদ্ধিটুকু ঘটেছে, আশা করি তা ক্ষমাযোগ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের শিল্পিসত্তা

॥ ১ ॥

আধুনিক কালে কাব্য-ব্যক্তিত্বের চাইতে ঔপন্যাসিক-ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এ-যুগের 'ইমেজিজ্‌ম' এবং প্রতীকিতার অঙ্গরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তত বহিরংশে এমন একটা সাধারণধর্মিতা এসেছে যে তা থেকে স্বভাবতই কোনো কবির একান্ততা বেছে নেওয়া কঠিন হয়—যদি না সেই কবি কোনো বিশিষ্ট দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন। অপেক্ষাকৃত পূর্বগামীদের মধ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সমর সেন এবং আধুনিকতর পর্বে সুভাষ-সুকান্তের যে সুস্পষ্ট আত্মবলয় আছে—বাংলা দেশের অন্যান্য অধিকাংশ কবিদের, সহজে সেভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এ কথার মধ্যে এমন ইঙ্গিত অবশ্যই নেই যে এঁরা ছাড়া বাংলা-সাহিত্যে আর কেউ স্মরণযোগ্য কবি নন। আরো অনেকেই ব্যক্তি-বৈচিত্র্যে দীপ্ত, অনেক কবিই শক্তি এবং সততার সঙ্গে লেখনী চর্চা করেছেন, তাঁদের জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়ারও কারণ আছে। তালিকা দীর্ঘ না করে কয়েকজনের মাত্র উল্লেখ করলাম। আমার বক্তব্য হল, এঁদের প্রধান অংশই যতটা গোষ্ঠিক, ততটা ব্যক্তিক নন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। (অবশ্য শিল্প-ব্যক্তিত্বের কথাই বলছি—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নয়।) জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং ঈয়েট্‌সের সহধর্মিতা আছে তবু রবীন্দ্রনাথ আর ঈয়েট্‌স এক নন। অথবা অতটা দূরবিস্তৃত না হয়েও খুব কাছাকাছি এবং সহজ দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে বলা যায় বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্তের গোত্র এক হলেও রচনা-পদ্ধতিতে ও চিত্রকল্পে ওঁদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জীবনদর্শন এক হলেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তির তারতম্য, সাংকেতিকতা এবং চিত্রকল্পের নিজস্বতা—এইগুলোই কবির চরিত্রবৃত্তি। আর এই চারিত্রিকতার অভাব ঘটলে কবি অনুচ্ছেদ হতে পারেন, কিন্তু পরিচ্ছেদ হতে পারেন না।

কবিতা, ছবি এবং গান—শিল্প হিসেবে এরা যতটা আত্মলীন ও ভাবকেন্দ্রিত, কথা-সাহিত্য তা নয়। এমন কি নাটকেও এ-যুগে যতটা বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়িতা চোখে পড়ে (সাংকেতিক নাটকের সাহায্যে যার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এ-কালের সাত্রের নাটকে যার উৎকর্ষ লক্ষণীয়)—উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস রূপক হতে পারে—সার্ভেন্টিস্ তা লিখেছেন, আনাতোল ফ্রাঁসের 'পেঙ্গুয়িন আইল্যাণ্ড' বা 'রিভোল্ট্ অব দি এঞ্জেল্‌স' আমরা পেয়েছি—অতি আধুনিক কালে লাগেরভিস্টের 'দি ডোয়ার্ফ' ও

রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের সাংকেতিক হওয়া একেবারে অসম্ভব কিনা জানি না—তবে সহজ যে নয়, এ-কথা ঠিক।

তার কারণ বোধ হয় এই। আর্ট হিসেবে উপন্যাস সব চেয়ে আটপৌরে এবং কবিতা, ছবি, গান কিংবা সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রের মতো পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের সেখানে অতটা অধিকারী-ভেদ নেই। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যই হল সর্বজনীনতা। আর যে শিল্প সার্বিক, সেখানে শিল্পগত রূপও স্পষ্টরেখ। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব সোচ্চার। ঈয়েট্স্ যদি উপন্যাস লিখতেন তা হলে 'গোরা' কিংবা 'ঘরে বাইরে'র লেখকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নির্ণয় করতে কিছুমাত্র সময় লাগত না। নাট্যকার গল্সওয়ার্দির ভূমিকা ইংরেজি সাহিত্যে নির্বিশেষ—কিন্তু 'ফরসাইট সাগা' অনন্যতায় চিরদীপ্ত।

ছবি, কবিতা কিংবা গান (এমন কি নাটকও) স্বস্থানে স্বমহিম। এরা দৈনন্দিন লোক-ব্যবহারের জন্যে নয়—মন, মেজাজ এবং অবসর নিয়ে এদের কাছে পৌঁছুতে হয়, এদের প্রয়োজনের রূপ যতখানি তার চাইতে বেশি প্রসাধনের রূপ। উপন্যাস পথের মানুষ, কাছের লোক, দিনযাত্রায় সম্পর্কিত। এহেন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের পৃথক করে আমরা সহজেই চিনে এবং জেনে নিতে পারি। একান্ত প্রতিভাদৈন্যের যুগেও যে-কোনো অন্য শিল্পের চাইতে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট।

এইজন্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা খুব স্পষ্ট করেই চিনি। আমরা জানি তিনি শরৎচন্দ্র নন, শৈলজানন্দ নন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর নন। আর শুধু ব্যক্তি-পার্থক্যই নয়; বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক-বৈশিষ্ট্যের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এতই অসাধারণ যে, সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের খুব কম ঔপন্যাসিকই তাঁর সমপর্যায়ী।

বিভূতিভূষণ বহুধাব্যাপ্ত লেখক। উপন্যাস, ছোট গল্প, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী-সাহিত্য, অতি-প্রাকৃত এবং 'বিচিত্র জগতে'র ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সব কিছু সম্পর্কেই তাঁর 'উৎকর্ণ' কৌতূহল। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' থেকে 'দেবযান' পর্যন্ত বিভূতিভূষণের একটি মাত্র পরিচয়ই প্রধানত অভিব্যক্ত। আর তাঁর সেই মূল ব্যক্তিত্বটিই এই প্রসঙ্গের আলোচ্য।

বাঙলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা, আর ভাগলপুরের বনজঙ্গলে জমিদারী কাজের অভিজ্ঞতা—মোটামুটি এই হল বিভূতিভূষণের কর্মজীবন। তাঁর সাহিত্যও বিশেষভাবে গ্রামিক এবং আরণ্যক। এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া বাংলা উপন্যাসে নাগরিক মনন তেমন নেই বললেই চলে। সুতরাং গ্রামিক মানুষের দিক থেকে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যের চিরচলিত ধারাকেই আশ্রয় করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের গ্রামীণতা

শরৎচন্দ্রীয় নয় ; শরৎচন্দ্রের পল্লী যেখানে চণ্ডীমণ্ডপ এবং গ্রাম্য জটলায় অভিব্যক্ত— যেখানে তা প্রাচীন সমাজের অবক্ষয়ের প্রতি সচেতনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, বিভূতিভূষণের গ্রামীণতা সেখানে আমের জামের বনে, নিবিড় কলমীদামে ছাওয়া পুরানো দীঘি আর ইতিহাসের কুহেলী মাখানো প্রাচীন প্রাসাদের আশপাশে, আঁশ-শ্যাওড়া আর কালকাসুন্দির ঝোপে ছাওয়া একচিল্‌তে সরু পথ দিয়ে মেটে খরগোস আর নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে যাত্রা করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে গ্রাম-জীবনের এক সুপ্রবীণ অভিজ্ঞতা আর বিভূতিভূষণের মধ্যে কাশফুলের দোলনলাগা শরতের দুপুর-বেলায় ঘর-পালানো একটি কিশোর মনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এই কৈশোরই একান্তভাবে অন্তর্লীন। কৈশোরের আরও একটি দিকও আছে- তার বিদ্রোহ, তার প্রতিবাদ—তার উদ্দামতা। কিন্তু বিভূতি-ভূষণের 'অপু'র মধ্যে কোথাও 'ইন্দ্রনাথ' নেই। বিভূতিভূষণ অস্বীকার করেননি—এড়িয়ে গেছেন। 'বিদ্রোহী নবীন বীবে'র জন্যে সাধনা করেননি তিনি—'ছিন্নবাধা পলাতক বালকে'র আত্ম-সন্তুষ্টিতেই তিনি নিমগ্নচেত।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়—বিভূতিভূষণ আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন। জীবনের ব্যাখ্যাতার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি, তিনি জীবনের উপভোক্তা। বৈষ্ণবেরা বলেছেন, অবসজ্ঞ কাক জ্ঞাননিম্বফলের তিক্ততা খোজে—আর রসজ্ঞ কোকিল প্রেমরূপ আমের মুকুলের মধু পান করে থাকে। বিভূতিভূষণ কোকিলবৃত্ত।

যে-কালে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণেব আবির্ভাব, সেটি সোজাসুজি প্রশ্নের যুগ। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন', রবীন্দ্রনাথেব 'যোগাযোগ', 'কল্লোলে'ব দহনদীপ্তিতে যুগমানস উত্তেজিত ও উত্তপ্ত। বাঙালীর বুদ্ধিবাদের মধ্যে নৈরাশ্য এবং ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তির্যক আক্রমণ, রাঢের দগ্ধ তৃণপ্রান্তর থেকে তারাশঙ্করের রূঢ় রুক্ষ পদক্ষেপ। দেশে অসহযোগ আন্দোলন এবং তার অন্তরালে বিপ্লববাদের আগ্নেয়-স্তম্ভ। সুকঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তিক্ততার চরম।

এক কথায় বাঙালীর মন এবং বাংলা সাহিত্য তখন অঙ্গারশয্যা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো সাধননিষ্ঠ চেতনা পর্যন্ত বিচলিত। এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কোনো সুমহান নাগরিক সাহিত্য যে গড়ে উঠেছে তাও নয়—সেটা অসম্ভবও বটে, কারণ যে-কোনো একটি প্রত্যয়ের ভিত্তি না থাকলে উপন্যাসের সামগ্রিক কারুশিল্প রচিত হতে পারে না। পারম্পর্যহীন খণ্ডছিন্ন নাগরিক জীবনের টুকরোগুলো তখন অসংখ্য ছোট গল্পে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করবার মতো—একমাত্র বিভূতিভূষণ ছাড়া সে-যুগে স্মরণীয় উপন্যাস কেউই লিখতে পারেননি—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তখন স্পষ্টতই ব্যর্থতায় আচ্ছন্ন।

পূর্ণ সংশয়ের যুগে—শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র কালে বিভূতিভূষণই একতম সিদ্ধ ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক-সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও কিছু পরে—এবং তা হয়েছে রাজনৈতিক বোধের সুনিশ্চিত প্রত্যয়ভূমিতে। আর বিভূতিভূষণের এই কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে তাঁর 'অস্তিবাদে'র মধ্যে।

নিশ্চিন্দিপুরের ছায়ানিবিড় জীবন পরিবেশ থেকে বিভূতিভূষণ যে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এলেন—তাকে গ্রহণ করতে বাঙালী পাঠক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা করল না। যেন অঙ্গারশয্যার ওপরে শীতল পদ্মপাতা বিছিয়ে দিলেন তিনি—পদ্মদীঘির মিষ্টিজল নিয়ে এলেন তৃষ্ণার্তের জন্যে। তাঁর ছোট 'জলসত্র' গল্পটি যেন তাঁর শিল্প-চিন্তারই প্রতীক। যারা পল্লী-কৈশোরের (এবং পল্লী-শৈশবেরও) সহজ স্বপ্নে ভরা দিনগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছে, তারা তাঁর কাছ থেকে তা নতুন করে ফিরে পেল; যাদের সে জীবন কখনো ছিল না—তারা পেল এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান। বাস্তব জল-মাটি আকাশ-অরণ্যের পটভূমিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠল এক রূপকথার পৃথিবী।

ঠিক কথা। 'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণ রূপকথাই শোনালেন। আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, অভিযোগ ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম। মনে হল, "এখনো অনেক রয়েছে বাকী।" শহরের জীবনে যখন নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান—তখন এই বাঙলা দেশেরই গ্রামপ্রান্তে একটা 'সব পেয়েছি'র জগৎ আছে। সেখানে দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা শোক সবই আছে, কিন্তু তাদের সমস্ত কিছুতে এমন একটি মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখনো নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে

॥ ২ ॥

বিভূতিভূষণের 'অপু' শহরে এল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্দিপুরের ছেলেটি নিজের অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য ভোলেনি। নাগরিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে সে, বিচিত্র মানুষকে দেখেছে, কিন্তু তারা কেউই তার শৈশব-চরিত্রকে একান্তভাবে প্রভাবিত করেনি। ঘরছাড়া বহিঃপ্রকৃতির আহ্বান নিজের ভেতর থেকে সে সঞ্চারিত করে দিয়েছে তার উত্তর পুরুষের মধ্যে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে এমন অভিন্নতা খুব বেশি চোখে পড়ে না।

অপু বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বেরই প্রতিনিধি।

যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই জীবন-দর্শন থাকে। কখনো তা ব্যক্তিক, কখনো গোষ্ঠিক, কখনো সামাজিক; কখনো সে দর্শন অভিনব—কখনো ঐতিহ্যানুসারী।

বিভূতিভূষণের দর্শন ঐতিহ্যকে অতিক্রম করেনি তিনি তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো নিজস্বে দীপ্তিমান নন।

খুব সহজেই চোখে পড়বে—যাকে নতুন কথা বলা যায়, বিভূতিভূষণের মধ্যে তা নেই ; কোনো নতুন সত্যের দিকে তিনি অভিযান করেননি—তাঁর রচনায় যুগ-সচেতন সাহিত্যিকের প্রশ্ন-চিহ্ন লক্ষণীয়ভাবেই অনুপস্থিত। ঝড়ের যুগে বিভূতিভূষণের প্রশান্তি ঈর্ষা করবার মতো। তাঁর কোনো কোনো রচনায় সামাজিক সমস্যার 'অধৈ জল' যে আভাসিত হয়ে ওঠেনি তা নয়—কিন্তু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণ নির্মোহ। চারদিকের তরঙ্গিত সমুদ্রের মাঝখানে তিনি দ্বীপে বাস করে গেছেন।

এই আত্মতৃপ্তি কি ভালো ?

সে আলোচনা থাক। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই আত্মতৃপ্তিই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সামগ্রিকতা এনে দিয়েছে—তাঁর উপন্যাসকে দিয়েছে একটা নিটোল পরিপূর্ণতা।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্বই হল তাঁর বিশ্বাসপ্রবণতা। এই সরল ভাগবত-প্রাণতার জন্যেই তাঁর রচনায় প্রশ্ন নেই। বাঙলার গ্রাম এবং বাঙালী পরিবারের (বিশেষত, বাঙালী নিম্নবিত্তের) নিখুঁত চিত্র তাঁর অসংখ্য গল্প উপন্যাসে আছে। ছোট সুখ, ছোট ব্যথা, ব্যর্থ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারুণ্যে তাঁর বহু চিত্র, বহু চরিত্র অশ্রুস্নিগ্ধ। কিন্তু দেশ-কালের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের সংঘাতে, তার নানামুখী আত্মদ্বন্দ্বে যে গভীরব্যাপ্ত ট্র্যাজেডি বিকশিত হয়—সেই ট্র্যাজেডির প্রচণ্ডতা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এমন যে 'অনুবর্তন'—সেখানেও শিক্ষকজীবনের রূপটি মাত্র কারুণ্যঘন—তা থেকে সমাজের চিরলাঞ্ছিত এই সম্প্রদায়টির ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নের কোনো ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ আমাদের বুকের মধ্যে আলোড়ন তোলে না—একটা শান্ত সহানুভূতিই সেখানে আমাদের আচ্ছন্ন করে তোলে।

যে জীবন দৈবায়ত্ত—সেখানে অশ্রুমোচন করা যায়—প্রতিবাদ করা চলে না। বিভূতিভূষণও প্রতিবাদ তোলেন নি। তারাশঙ্করের পুরুষকার বিভূতিভূষণে নেই, তিনি বৈষ্ণবদের মতো সমর্পিত প্রাণ। বলা বাহুল্য, আত্মসমর্পণের মধ্যে যে প্রশান্ত আনন্দ আছে, তার আকর্ষণ পরম প্রলোভনীয়। যে তন্ময়তার মধ্যে বিভূতিভূষণ নিবিষ্টচিত্ত, তা আমাদের প্রলুব্ধ করে তোলে। তাই তাঁর শান্ত রসাশ্রিত ঐশ্বরিক প্রীতির স্থায়ী ভাবের মধ্যে আমরাও একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাই।

ব্যক্তিজীবনেও বিভূতিভূষণ বাসা বেঁধেছিলেন বনগ্রামের একটি পল্লী অঞ্চলে আর সাধনক্ষেত্র নির্বাচিত করেছিলেন ঘাটশিলায় পাহাড় জঙ্গলে। গ্রামীণ বিভূতিভূষণ স্বাভাবিক নিয়মেই এমনভাবে অরণ্যপথের পথিক হয়ে উঠেছেন। প্রত্যক্ষ জীবনের

মাঝখানে বাস করে তার সংঘাত—তার জিজ্ঞাসাগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তারা অবাঞ্ছিত হলেও অনাহূত আগন্তুকের মতো অনিবার্য ভাবেই এসে পড়তে চায়। সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত 'আরণ্যকে'ই তাঁর বাঞ্ছিত মুক্তি—'কুশল পাহাড়ী'র তীর্থযাত্রায় তাঁর বিস্তীর্ণপক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য।

বিভূতিভূষণের ঐশ্বরিকতা রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রবণতা আচার-আচরণে আশ্রিত হয়নি ; তা উপনিষদের নিরঞ্জন উপলব্ধি—তার স্বরূপটি বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়ী। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ লোকসংস্কারের অনুগামী। তিনি অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস করেছেন—'তারানাথ তান্ত্রিকে'র গল্পগুলি সেই বিশ্বাসসিদ্ধ ; 'দৃষ্টি-প্রদীপ' তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক—'দেবযান' নাকি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল ! প্রকৃতি সম্পর্কে আত্মতন্ময়তা ছাড়াও ধর্মসংস্কারের প্রতি এই অনুরাগ, এবং অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি একটা বিমুগ্ধ আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলি যুক্তিসিদ্ধও। বর্তমানের স্পষ্টরেখ বাস্তবতা এবং নিষ্ঠুরতার কাছ থেকে অপসৃত হওয়ার পক্ষে এদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার তার উপর চাপিয়ে দিতে চায় ; তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্নকর্তা থাকে না, থাকে একটি কৌতূহলী মন —যে বিহ্বল বিমুগ্ধ চিত্তে সব কিছু দেখতে চায়, সুতীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।

এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে বিভূতিভূষণ নিজেকে নিয়ে গেছেন অরণ্যে : **'To the wild woods and the plains !'** তাঁর অরণ্যবিলাসী মন নিত্যকালীন আদিম প্রকৃতির প্রাণক্ষেত্রে একটি অপূর্ব পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর প্রকৃতি-পিপাসা এইখানে আকণ্ঠ তৃপ্তিলাভ করেছে—বনশ্রীতে দু-চোখ তিনি ভরে নিয়েছেন। অরণ্যের নিধন তাঁর মনে জাগিয়েছে ইংরেজ কবির সেই বেদনা :

> **"The poplar's are fell'd, farewell to the shade**
> **And the whispering sound of the cool colonade—"**

এখানকার মানুষগুলিকে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে, যারা বনের ফুলের মতো সহজভাবে ফোটে—সহজভাবেই ঝরে যায়। বনের একটি পাখি, একটি প্রাণীর মতোই মানুষের জীবনও এখানে সমাজের শক্তিতে চালিত হয় না—তাকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাভাবিকতা আর এই স্বভাবের নেপথ্যে গুহাহিত শক্তি : বিভূতিভূষণের ঈশ্বর।

শুধু এইটুকুই সব নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সে ক'টি জিনিস 'আদিম' দিনের প্রতিবিম্বিত করে, তারা হল আকাশ-সমুদ্র-পাহাড় এবং অরণ্য। ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে

আকাশের আবহ তো আছেই—সে সর্বময় ; সমুদ্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনোভাব জানা যায় না—বোধ হয় সমুদ্রের মধ্যে দেবতার চাইতেও দানবিক শক্তিকেই তিনি বেশি করে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, 'The gentleness of heaven is on the Sea' ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ দৃষ্টি তাঁর নেই। কিন্তু পাহাড় এবং জঙ্গল সম্পর্কে নিবিড় প্রীতি আর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিপুলভাবে উৎসারিত।

ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের এমন ক্ষেত্র আর কী হতে পারে ? বহুকালের অক্ষয় শিলার স্তরে স্তরে অতীতের কত ইতিহাস যে প্রচ্ছন্ন আছে কে জানে ? প্রাগৈতিহাসিক কালের ফসিল থেকে আরম্ভ করে অগণ্য সাধক সন্ন্যাসী এই পাহাড়ের আশ্রয়েই তাঁদের সিদ্ধিলাভকে চিহ্নিত করে রেখে গেছেন। এ এক গভীর গম্ভীর মহাকাল মূর্তি। আর অরণ্য ? এইখানেই মানুষের আধুনিক অবিশ্বাসের যন্ত্রপাতি এবং জগৎ, আদিম প্রাণ আর ধ্যানী মানুষের মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়াতে পারে না।

তাই বিভূতিভূষণ এমন ভাবে অরণ্যচারী। তাঁর প্রথম জীবন প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিল বাঙলার পল্লীর ছায়ানিবিড় পথে-ঘাটে, সেই প্রকৃতির পূর্ণতর আধ্যাত্মিক রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যেই উত্তরকালে তিনি অরণ্যে এসে পৌঁছেছেন। অরণ্যের অকৃত্রিম আদিমতায় বিশ্বনিহিত শক্তির সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মিলন সাধিত হয়েছে। লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, প্রয়াসহীন আত্মসমাহিতি—এরা সকলেই সেই সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক-একটি উপায়ন মাত্র।

কিন্তু এই আলোচনা থেকে এ কথা মনে করবার কারণ নেই যে জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ মমত্বহীন। বরং বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের এত বিচিত্র পরিচয় খুব বেশি লেখক দিতে পারেননি এবং তাদের ছোটখাটো দুঃখ সুখ আশা অভীপ্সার কথা এক শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কেউই বিভূতিভূষণের মতো করে বলতেও পারেননি। কখনো কখনো যেন তিনি শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অজস্র অশ্রুবিন্দু তাঁর সাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু এই সহানুভূতি সেই মানুষেরই—যিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই হয়—একে স্বীকার করো। এ কথা তাঁর কাছে শোনা যায় না : এ হওয়া উচিত নয়, একে স্বীকার করব না। যেমন প্রতিটি সৎ মানুষেরই অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ঘৃণা থাকে, বিভূতিভূষণেরও তা আছে ; কিন্তু থাকলেও তা ঈশ্বরানুগতায় ক্ষমাস্নিগ্ধ—তার বিরুদ্ধে না মানসিক —না ঘটনাগত কোনো প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াই নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনদৃষ্টি এবং তারাশঙ্করের পুরুষকারের প্রেক্ষাভূমিতে বিভূতিভূষণের এই ভূমিকাটি তাই কৌতূহলোদ্দীপক।

আর এই কারণেই 'অপু' নামিক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বটি ছাড়া—তাঁর এতগুলি রচনায় কোনো বিশেষ মহান চরিত্র পাওয়া যায় না। জীবনের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর অনেক চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা হয়তো এনেছে—কিন্তু স্মরণীয়তা আনেনি। 'টাইপ' চরিত্র অনেক আছে—তারা পর্যবেক্ষণজাত—সৃষ্ট নয়। এমন হয়েছে খুব স্বাভাবিক কারণেই। যুগ এবং সমাজের বিরোধকে যিনি পাশ কাটিয়েই যেতে চেয়েছেন—তাঁর কাছে সংক্ষুব্ধ কালের কোনো প্রশ্নজর্জর জটিল কালসত্তাকে দাবি করলে সেটা অবিচার হয়েই দাঁড়াবে।

আত্মসমাহিত প্রশান্তিতে এবং করুণার স্নিগ্ধতায় বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট-চিহ্নিত। সমুদ্রের মাঝখানে তাঁর দ্বীপটিকে দেখতে এবং চিনতে ভুল হয় না। তাঁর অস্তিবাদী জগতে প্রবেশ করতে পারলে, তাঁর আরণ্যক ধ্যানলোকে মগ্ন হতে পারলে এখনো এমন শান্তি আর সান্ত্বনা মেলে—যার সন্ধান অন্যত্র দুর্লভ।

আর স্বাভাবিকতার সেই রাজ্যটিতে পৌঁছুবার পথ বিভূতিভূষণের স্টাইল। এত সহজ ভাষা এবং শিল্পরীতি বাঙলা সাহিত্যে বোধ হয় আর কারোরই নেই। এ স্টাইল আদর্শ কিনা জানি না, কিন্তু এর মধ্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বটি আরো পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে। সহজ গুণই এই স্টাইলের বিশেষত্ব—আর এ কথা কে না জানে যে সব চাইতে সহজ করে বলতে পারাটাই সব চাইতে কঠিন কাজ।

তারাশঙ্করের সাহিত্যজগৎ

তখন কেবল দেশ বিভাগ হয়েছে, কিন্তু পাসপোর্টের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়নি। শুধু কাস্টমসের তুটি ঘাঁটিতে ঘণ্টা দুয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করেই যাত্রীরা দার্জিলিং মেলে সোজা শিলিগুড়িতে গিয়ে পৌঁছুত।

তারই একটি দীর্ঘ স্লিপিং কোচে একজন কাস্টম্স্ অফিসারের আবির্ভাব হল রাণাঘাট স্টেশনে। আর জনৈক যাত্রীর স্যুটকেসে আবিষ্কৃত হল কয়েকটি পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন।

কাস্টম্স্ অফিসার একটু কড়া ধাঁচের লোক। বললেন, আপনাকে নামতে হবে।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, সামান্য ক'টা ওষুধ—বাড়িতে অসুখের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি—কেন গণ্ডগোল করছেন এ নিয়ে?

একটু পরেই ব্যাপারটা হয়তো মিটে যেত, ভদ্রলোক ছাড়ানও পেতেন, কিন্তু গোল বাধালেন একজন তৃতীয় ব্যক্তি। এস ডি ও ছিলেন, সবে রিটায়ার করেছেন;

কিন্তু হাকিমি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি তখনো। অকারণে একটি আপার বার্থ থেকে তিনি বলে বসলেন, নামালেই হল ট্রেন থেকে? ইয়ার্কি নাকি? যত সব ঘুষখোরের দল!

সুশিক্ষিত তরুণ কাস্টম্‌স্ অফিসার ক্ষেপে গেলেন। পুলিশ ডাকলেন তিনি। প্রাক্তন এস ডি ওকে সুদ্ধ টেনে নামাবেন গাড়ি থেকে। এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং।

কুৎসিত অবস্থা একটা।

আমার পাশের বার্থের সহযাত্রীটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছেছে দেখে তিনি বললেন, দয়া করে আমার দু'একটা কথা শুনবেন আপনারা?

পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি বললাম, ইনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফল হল অদ্ভুত। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে তাঁর দিকে ঘুরে গেল। কাস্টম্‌স্ অফিসার উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, হি ইজ দি মোস্ট্ রেস্‌পেক্‌টেবল্ প্যাসেঞ্জার ইন দিস ট্রেন। এঁর কাছেই আমি সত্যিকারের বিচার চাই।

তিন মিনিটের মধ্যে সব সমাধান হয়ে গেল।

জীবনে অনেক সম্মান এর পরে পেয়েছেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদামী পুরস্কার, সর্বভারতীয় লেখকদের নেতারূপে সেদিনও তিনি তাশখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেই আবেগমুগ্ধ কণ্ঠস্বরটি আমার কানে এখনো বাজছে: হি ইজ দি মোস্ট্ রেস্‌পেক্‌টেবল্ প্যাসেঞ্জার ইন দিস ট্রেন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় তারাশঙ্কর আর কখনো পাননি।

দেশের মানুষ তারাশঙ্করকে শ্রদ্ধা করে। প্রিয় লেখকরূপে প্রীতি অনেকেই পান, কিন্তু অসাধারণ একটি ব্যক্তিরূপে এমন অসামান্য শ্রদ্ধা বাংলা দেশের খুব সামান্য ক'জন লেখকই পেয়েছেন। তারাশঙ্কর সেই ভাগ্যবানদের একজন।

এই শ্রদ্ধার উৎস কোথায়?

স্রষ্টা হিসেবে তারাশঙ্কর অমিত শক্তিমান। কিন্তু এই শক্তি তাঁর উপন্যাস বা ছোট গল্প রচনার শিল্পগত সাফল্যের মধ্যেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে নেই; তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টির মধ্যে, একটি পরিপূর্ণতার ভেতরে।

পৃথিবীর প্রধানাংশ লেখকই কেমন করে লিখতে হবে সে কথা জানেন, কিন্তু কী লিখতে হবে সে-কথাটা ভালো করে জানেন না। জীবনকে নানা দিক থেকে প্রকাশ করা যায়, সমালোচনা করা চলে, তার সামান্য একটি সঙ্কেতকে আশ্রয় করে পরমাশ্চর্যের ব্যঞ্জনা আনা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আর এক পৃথিবী, জীবনের

ভেতর আর এক জীবনকে গড়ে তুলতে পারা—ইংরেজীতে যাকে বলে : "Creating one's own World", তা-ই হল মহৎ শিল্পীর নিরিখ। বিশ্বনীতির মতো লেখকের জীবনদর্শন সেই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মের ব্যত্যয়ে সেখানে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়, তারই আনুগত্যে সেখানকার মানুষ মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করে। ঈশ্বরের জগৎকে নকল করা নয়, তাকে ব্যাখ্যা করা নয়, তার ভেতরে স্বয়ংবৃত্ত স্বায়ত্তশাসন, পৃথিবীর সমুদ্রে ব্যক্তিত্বের প্রবালবলয়িত একটি লেগুন। তলস্তয়ের জগৎ, রবীন্দ্রনাথের জগৎ, এমন কি হার্ডি, উইলিয়াম ফকনারের জগৎ। যে কোনো মহান লেখকেরই সমগ্র সৃষ্টি এমনি একটি পরিপূর্ণ সাম্রাজ্য, একে গড়ে তোলবার জন্যই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

তারাশঙ্কর এই দলের। তার অর্থ এই নয় যে তলস্তয় রবীন্দ্রনাথের তিনি সমশ্রেণীর ; হার্ডি-ফকনারের ব্যাপ্তি ও শিল্পগত সূক্ষ্মতাও তাঁর কাছে দাবি করলে অন্যায় হবে। কিন্তু জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্করই একমাত্র ঔপন্যাসিক যিনি ধ্রুব সাহিত্যের ধ্রুবপদে তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পেরেছেন। তিনিও একটি নিজস্ব ভৌগোলিক এবং মানবিক জগতের ভাগ্যবিধাতা।

তারাশঙ্করের এই জগতে সকলেই মনের আশ্রয় অনুভব করবেন কিনা জানি না। ফকনারের জগতে, তাঁর য়্যাংচুয়ারির পৃথিবীতেই বা ক'জন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবেন ? ওটা ব্যক্তি ও মানসিকতার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু একথা বলতেই হবে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র নীহারিকায় যার সূত্রপাত, 'বিচারকে'র নিশ্চিত বক্তব্যে তার পরিপূর্ণ গ্রহরূপ। স্বরাজ্যে তারাশঙ্কর স্বরাট। এইখানেই তাঁর আসল মহিমা।

যতদূর মনে পড়ে, তারাশঙ্করের প্রথম গল্পের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল স্কুল-জীবনে। লেখাটির নাম 'মধু মাস্টার', বেরিয়েছিল 'বঙ্গশ্রী'তে। এমন কিছু আকর্ষণ করেনি। চমক লাগলো আরো কিছুদিন পরে।

আজকের এই 'দেশ' পত্রিকা তখন আয়তনে বিরাট, দামে অসম্ভব সস্তা। চার টাকা চালের মণের দিনেও সে সুলভতা বিস্ময়কর। তখন সবে কলেজে পা দিয়েছি এবং আমার সুপ্রচুর পদ্য-প্রলাপ নির্বিচারে 'দেশ'-এর পাতায় মুদ্রিত হচ্ছে। সেই সময় 'দেশ'-এর কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রথম আবিষ্কার করলাম তারাশঙ্করকে—তাঁর 'নারী ও নাগিনী' গল্পে।

কী সে রোমাঞ্চ। কী বিস্ময়।

সেদিন প্রায়-নবাগত তারাশঙ্করের আত্মপ্রত্যয় জাগেনি। সেদিন তাঁর সংশয় ছিল, হয়তো পাঠকের কাছে এই বিচিত্র জৈব গল্প অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। তাই গল্পের কয়েকটি ডিটেল সম্পর্কে তিনি বোধ হয় একটুখানি ভীরু পাদটীকা জুড়ে

দিয়েছিলেন, যেন বলেছিলেন, 'সাপুড়িয়াদের মুখে শুনিয়াছি—'

কিন্তু কী প্রয়োজন ছিল তার? কোনো বিশেষ সময়ে সাপকে আকর্ষণ করবার জন্যে সাপিনীর গা থেকে কোনো বিচিত্র গন্ধ বেরোয় কিনা—সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার কোনো আবশ্যকই স্রষ্টার ছিল না। আগাগোড়া গল্পটিকে তারাশঙ্কর এমন আশ্চর্য সুরে বেঁধেছিলেন, রেখায় রেখায় এমন অপরূপ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ইঙ্গিতে সংকেতে এমনি একটা উদগ্র আদিমতাকে রূপায়িত করেছিলেন যে, এই পাদটীকাটুকু তাতে ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে শক্তি-সচেতন তারাশঙ্কর ওটি বর্জন করেছেন। ভালোই করেছেন।

এই 'নারী ও নাগিনী'ই তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা মৌলিক সত্যকে প্রকাশ করে। তাঁর বিশেষ ধরনের পটভূমি, তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির আশা-নিরাশা-কামনা-ব্যর্থতা—এমন স্বতন্ত্রতা আর অপরিচয়কে বয়ে আনে যে পাঠককে চমকে উঠে বলতে হয়: 'এ রকম মানুষ আছে নাকি আমাদের দেশে? আর এই জীবন?'

এরা যে আছে—এমনি একটা জীবন যে সত্য—তারাশঙ্করের প্রধানাংশ রচনাতে সেই কথাটাই জোরের সঙ্গে প্রমাণ করতে হয়েছে—যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে ফকনারকে তাঁর **'Yoknapatawpha County'**-র অস্তিত্ব। তারাশঙ্করের শক্তির রুদ্রলীলা যেখানে সবচাইতে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফকনারের সঙ্গে তাঁর কিছুটা আত্মিক সংযোগ অনুভব না করেই উপায় নেই।

'নারী ও নাগিনী' লিখবার সময়েই তারাশঙ্কর জানতেন তাঁকে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে বলতে হবে। তাঁর গল্পের স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্য—তাঁর গড়া চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য—সহজে এদের কেউ মেনে নেবে না—মানাতে হবে তাঁকেই; ডোমের ছেলে কবিয়াল নিতাই, বেদের ঘরে মানুষ পানু, হাঁসুলী বাঁকের করালী—সাহিত্যে এদের জায়গা করে নিতে হবে নিজের জোরেই। রাখাল বাঁড়ুজ্জে, পূর্ণ চক্রবর্তী কিংবা ডাইনী—সামান্য শক্তি দিয়ে এদের কাউকেই প্রত্যয়ের মধ্যে নিয়ে আসা চলবে না। এরা যে 'কিউরিয়ো' নয়— অতি স্পষ্ট বাস্তব, সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব তাঁরই—যেমন ভাবে এরস্কিন কল্‌ড্‌ওয়েল্‌কে **'Tobacco Road'**-এর অভিশপ্ত ভূগোলের অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে হয়েছিল।

কী পার্থক্য বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে! একজন আমাদের সকলেরই শৈশব আর কৈশোরকে কী আশ্চর্য সুন্দর করে ফুটিয়েছেন, আমাদের চির-চেনা বাংলা দেশকে কী রূপ-রসেই ভরে তুলেছেন। আর একজন আমাদের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর থেকে আবিষ্কার করেছেন গূঢ়-নিহিত এক বিশাল মহাদেশকে—যা আফ্রিকার চাইতেও অন্ধকার—তার অরণ্যের চেয়েও হিংস্র।

অতি-পরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের মাধুর্য আরোপে তারাশঙ্করের শিল্পী-সত্তার উল্লাস নেই ; অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে মনঃ-সমীক্ষার গভীরে তিনি যেতে চান না ; ভাবাবেগ প্রচুর থাকলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য-সুষমা তারাশঙ্করের ভাবলোকে উপস্থিত নয়। তারাশঙ্করের সাহিত্য-ভূমিতে একদিকে আদিমতার নগ্ন প্রকাশ—অন্যদিকে আদর্শবাদের সংহত প্রশান্তি। সব মিলিয়ে তারাশঙ্কর বিশাল আর বিচিত্র। এত বস্তু-বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে আর কারো লেখাতেই নেই ; আর কোনো লেখকই একসঙ্গে 'রাইকমল', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁক' 'নাগিনী কন্যা', 'পঞ্চপুত্তলি', 'আরোগ্য নিকেতন' বা 'বিচারক' লিখতে পারতেন না।

এই কারণেই তারাশঙ্করের যে-কোনো উপন্যাসে পাঠক নতুনত্বের সন্ধান পাবেন। অভাবিত চরিত্র—অভিনব পরিবেশ। স্বভাব-সিদ্ধ নাটকীয়তায় আগাগোড়া কৌতূহলের সজীবতা। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ঈর্ষা করবার মতো। আর সে অভিজ্ঞতাকে গল্পের মাধ্যমে পরিবেষণ করার কাজেও তিনি অনন্য।

দূর থেকে তারাশঙ্করকে দেখলে মনে হয় তিনি স্বল্পভাষী, আত্মমুখ, সহজে তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যাবে, মানুষটি একেবারেই অন্য জাতের। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পাইনি—তাঁর জীবিতকালে আমরা নিতান্তই নাবালক। আমার অভিজ্ঞতায় তারাশঙ্করের মতো এমন বৈঠকী মেজাজের লেখক আমি আর দেখিনি। প্রীতিস্নিগ্ধ এবং সহৃদয় অনেকেই আছেন—কিন্তু এমনভাবে গল্প জমাতে আর কেউ-ই পারেন না।

শুনেছি, তারাশঙ্কর ভালো অভিনেতা। তাঁর অভিনয় কখনো দেখিনি—কিন্তু তাঁর মুখে গল্প শুনেছি অনেকবার। চোখে, মুখে, কণ্ঠস্বরে এবং বর্ণনায় সে গল্প যে কী জীবন্ত হয়ে ওঠে—যাঁরা কখনো শোনেননি—তাঁরা তা অনুমানও করতে পারবেন না। একবার একটি নিশি-পাওয়া মানুষের কাহিনী তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—বর্ণনার কৌশলে সারা শরীরে আমার রোমাঞ্চ জেগেছিল। পরে তাঁর 'বিচিত্র' বইতেও গল্পটি পড়েছি, কিন্তু মুখে শোনার সেই স্বাদটি তাতে আর ততখানি পাইনি।

আমার মনে হয়, তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ এই নাটকীয়তা—এই থ্রিল। তারাশঙ্কর জীবনের গোপন রহস্য যতখানি আবিষ্কার করেন, তার চাইতেও বেশী আবিষ্কার করেন তার নাটককে। এইজন্যেই তারাশঙ্করের উপন্যাস ঘটনা ও বর্ণবৈচিত্র্যে মুখর। পাঠককে যতখানি মুগ্ধ করে—চঞ্চল করে তার চাইতেও বেশি। বুদ্ধি এবং দার্শনিকতার শান্ত বিস্তৃতির চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে উগ্র স্নায়বিক উত্তেজনা। এ-ও সাধারণ গুণ নয়। জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে উদ্ঘাটন এবং তাদের উজ্জ্বল বিন্যাসও অসাধারণ শক্তিমত্তারই অভিব্যক্তি, তা-ও উৎকৃষ্ট উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ।

'রাইকমল', 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন' কিংবা 'বিচারক'—'সপ্তপদী' পর্যন্ত প্রতিটি বইতে এই নাট্যগুণের দীপ্ত নির্ভুল প্রকাশ। শুনেছি তারাশঙ্করের নিজের সবচাইতে প্রিয় বই 'আরোগ্য নিকেতন'। মৃত্যুর এই কাব্যময় রূপকে আবহ সঙ্গীতের মতো রক্ষা করে তারাশঙ্কর যে দ্বন্দ্ব এতে ফুটিয়েছেন, এবং পরিশেষে জীবন মশাই ও প্রদ্যোত ডাক্তারের যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন, তার নাট্যরসই প্রতিটি পাঠক প্রধানত আস্বাদন করেন ; মৃত্যুতত্ত্বের আবেদন কতদূর পর্যন্ত পৌছোয়, জানি না।

জীবনের এই নাটকীয়তাকে আনুকূল্য করেছে অপূর্ব 'ডিটেল্‌স' এবং পারিপার্শ্বিক রচনার ক্ষমতা। কোনো উপন্যাসে (কিংবা গল্পেও) যে মঞ্চটি তিনি রচনা করেন, তার সজ্জায় এবং সমারোহে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেন না। যে-কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতোই নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা ঘটনা তিনি উপন্যাসে নিয়ে আসেন। কখনো কখনো পাঠকের কাছে মূল ঘটনাটির চাইতে পার্শ্বচরিত্র ও পার্শ্বঘটনাগুলিই বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। প্রধান কাহিনীর বক্তব্য যেমনই হোক—পরিবেশের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যিক সফলতার এ-ও একটি বড়ো কারণ। 'কালিন্দী' উপন্যাসটিই ধরুন। কাল্পনিক ব্যাধিগ্রস্ত রামেশ্বরের কাহিনীতে নাটকীয়তা ও উৎকণ্ঠা এই উপন্যাসের ঐশ্বর্য নয় ; পড়বার পরে পাঠকের মনে জেগে থাকে গল্পের সাধারণ মানুষগুলি—চরের বাসিন্দা সাঁওতালদের দল ; লেখকের রোমান্টিক কল্পনা নিয়ে গড়া 'রাঙাবাবু' তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

'চৈতালি ঘূর্ণি'র নীহারিকা থেকে ক্রম-পরিণত হয়ে 'বিচারক'-এ একটি সম্পূর্ণ গ্রহরূপ তারাশঙ্করের সাহিত্যে গড়ে উঠেছে, এ কথা গোড়াতেই বলেছি। তাঁর জ্বলন্ত নিরবয়বতা আছে 'নারী ও নাগিনী' 'অগ্রদানী' ও 'বেদিনী'তে, আছে 'চৈতালি ঘূর্ণিতে', 'নীলকণ্ঠে', 'আগুনে'। এই সব লেখায় মহানাগের বিষ-নিঃশ্বাসে জর্জরিত ছাতিফাটার মাঠের আগুনের হল্‌কা আসে, শুকনো নদীর তপ্ত বালির উপর অসহ্য তৃষ্ণা এসে মুখ থুবড়ে পড়ে—আকাশে যেন পোড়া ছাইয়ের রাশি উড়তে থাকে, সেই অগ্নিদহনে-ভরা বিরাট প্রান্তরটি পার হয়ে এসে চোখে পড়ে 'রায়বাড়ি'র ধ্বংসস্তূপ। সেখানে শ্রীহীন পরিত্যক্ত রংমহলে মৃত রায়েদের প্রেতাত্মা ছায়াশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিশাল শূন্য দালানে নিঃসঙ্গ বিশ্বম্ভর রায়ের জুতোর আওয়াজ কালপুরুষের পদধ্বনির মতো শোনা যায়।

রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা আর অস্তগামী আভিজাত্যের নৈরাশ্যে তারাশঙ্করের শিল্পী-চেতনা প্রথম পর্যায়ে বিমুখী। বাজে পোড়া তালগাছ কিংবা পত্রহীন কণ্টকময় বাবলা

গাছের মতো কতগুলি মানুষ একদিকে তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, আর এক দিকে মৃত্যুযাত্রী অতীত তাঁর মমতার অভিসেচন লাভ করেছে। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য ফুটে ওঠেনি, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে পরিচয় তাঁর ঘটেছিল—তার ফলে ক্রমে তাঁর মনে একটা আদর্শ রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীবাদী ও বিপ্লববাদের প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'। কিন্তু গান্ধীবাদের দিকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ক্রমশ 'পঞ্চগ্রামে' এসে দেবু পণ্ডিতের মাধ্যমে গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারাশঙ্করের নীহারিকা-জগৎ ভৌমিক ও ভৌগোলিক হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের এই মানস-বিকাশ একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে—মন্বন্তরের কল্পনাতীত বীভৎসতায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সর্বাত্মক কদর্যতায় প্রতিটি বাঙালী লেখক হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠলেন—তাঁদের কলমে তলোয়ার জলতে লাগল। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন তারাশঙ্কর, লিখলেন 'মন্বন্তর', '১৩৫০'। এমন কি 'মন্বন্তর' পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল যে তারাশঙ্কর বুঝিবা কমিউনিজমের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন।

কিন্তু কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধক তারাশঙ্করের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। জান্তব-জীবনের নৈরাজ্যচর্চার ভেতরেও তাঁর ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন বার বার কোনো নিশ্চিত শান্ত—কোনো ধ্রুব সান্ত্বনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে। তাঁর রাঢ়ভূমির একদিকে বেদে, বাউরি, কাহার, সাঁওতাল, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত আর ক্রমক্ষীয়মাণ জমিদারতন্ত্র; অন্যদিকে পুরনো মন্দির, তান্ত্রিক সাধনপীঠ আর কঙ্কালীতলার মতো মহাশ্মশান। একদিকে দুঃখ-বঞ্চনা, বিকার-জীর্ণতা, আর একদিকে জাগ্রত দেবতার মহিমচ্ছায়া—শ্মশানের উদার বৈরাগ্য। দিনের রৌদ্রদহন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে, কিংবা নিভন্ত চিতার শেষ অঙ্গার-দীপ্তি যখন রাত্রির কালো জলে ঝকমক করে ওঠে, তখন তারাশঙ্করের সমস্ত মানসিক চঞ্চলতা—জ্বালা-যন্ত্রণা এক গভীর শান্তি আর বিনম্র ভক্তির মধ্যে নির্বাণ লাভ করে

তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনাও সমস্ত ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ অনিশ্চয়তা অতিক্রান্ত হয়ে এই রহস্যময় অধ্যাত্ম-চেতনার তটে উত্তরণ। তাই 'মন্বন্তর' রচনার জন্যে আজ তাঁর মন কুণ্ঠিত, তাই '১৩৫০'-এর কালচিহ্নিত গ্রন্থটির তিনি লুপ্তি ঘটিয়েছেন। সাম্যবাদের সাময়িক প্রবণতা তাঁর সত্য-সন্ধানের পথে একটা অধ্যায় মাত্র। কৃষ্ণেন্দু গুপ্তের

পরিণামে—বিচারক জ্ঞানেন্দ্রের আস্তিক-দীক্ষায়, রাত্রির শ্মশান আর সন্ধ্যার মন্দিরই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। তাই নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সমস্যা আর জান্তব-জীবনের উন্মত্ততা—সবকিছুই একটি পরম সমাধানের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। এ গান্ধীবাদের আদর্শও নয়। হিউম্যানিজ্‌মের সঙ্গে আস্তিক্যবুদ্ধির মিলনে তারাশঙ্করের ভাবলোক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

তলস্তয়ের সঙ্গে একটু সাদৃশ্য যেন পাওয়া যায়। কিন্তু অভিজাত-তন্ত্রের প্রতি সেই জ্বলন্ত ঘৃণা তারাশঙ্করের নেই, নেই সেই বিশাল দার্শনিক মনন—সেই গূঢ় অনুপ্রবেশ। তলস্তয় একজনই জন্মান; তবু বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর তাঁর ভূমিকা অনেকখানিই নিতে পারতেন বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আধ্যাত্মিক মননে। কেন সে চেষ্টা করলেন না তিনি? কেন বৈচিত্র্যের চাইতে আরো বেশি করে করলেন না গভীরের সাধনা—কেন আর একটু নিয়ন্ত্রণ করলেন না নাটকীয় প্রবণতাকে? কেন তীব্র আবেগের উপরেই নির্ভর করলেন তিনি? জীবিত লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর কেবল বাংলা দেশেরই নন—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বিশ্ব-সাহিত্যেও তাঁর স্থান নির্ণয় করতে পারলে আমাদের গর্বের অন্ত থাকত না।

তারাশঙ্কর নিজের জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মহান্ স্রষ্টাদের সঙ্গে সেইখানেই তাঁর আত্মীয়তা। বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ব্রাত্যদের তিনি টেনে এনেছেন অপরিসীম শক্তিতে। তাঁর মুখের গল্পের মতো কলমের গল্পেরও আকর্ষণ অসামান্য। কিন্তু সব কিছুর পরিণাম কি এই? এই কি তাঁর জগতের শেষ বৃত্তি?

আমরা কিন্তু অনেক বেশি আশা করেছিলাম। তিনি এত শক্তিমান বলেই তাঁর কাছে আমাদের দাবি ছিল এত বেশি। আরও একটি কথা মনে জাগে। মহৎ সাহিত্যিকরূপেই তিনি 'Prophet' হতে পারতেন—'Prophet সাহিত্যিক' না হলে তাঁর হয়তো এমন কিছু ক্ষতি হত না; বরং বাংলা দেশ লাভবান হত।

কিন্তু নিজের দায়িত্ব তারাশঙ্কর নিজেই জানেন—পাঠকের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আর তাছাড়া এ-ও তো কিছুটা রুচির প্রশ্ন। যে জগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন সেখানে অনেকেই হয়তো তাঁর মতো শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করবেন; তারাশঙ্করের কাছ থেকে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করবেন তাঁরা।

একজনকে আমার মনে পড়ছে। 'আরোগ্য নিকেতন' পড়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কী একখানা বই-ই পড়লাম মশাই। একে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।' অথচ 'আরোগ্য নিকেতন' সম্পর্কে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা।

এমন ভক্ত তারাশঙ্করের দেশময় ছড়িয়ে আছেন। অতএব রসবোধের পার্থক্য থাকবেই।

আর, তাছাড়া তারাশঙ্কর তো এখনো লিখছেন। এখনো হয়তো অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে

মোহিতলালের কবিমানস

উনিশ শতকের প্রথম অধ্যায়টা ইয়োরোপে বেদনাবাদের যুগ। শেলীর কবিতা থেকে শপ্যাঁর মেলোডি পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের সুর বাজছে। হাইনের রিক্ততা, শুবার্টের বিষাদ-মূর্ছনা আর আর্থার সোপেনহাওয়েরের দর্শন এ যুগের মানস-ক্ষেত্রের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি।

এর পেছনে একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল।

ফরাসী বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটল মধ্যপথেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধানতম প্রতিনিধি নাপোলিয়ঁার দিন কাটতে লাগল সেণ্ট হেলেনায় সমুদ্রের তরঙ্গ গুণে আর অ্যাল্‌-বাট্রসের কান্না শুনতে শুনতে। ব্যর্থ বিপ্লবের বেদনার সঙ্গে ব্যক্তি-ব্যর্থতার সেই কান্না ইয়োরোপের সাহিত্যে-দর্শনে-সংগীতে নানা ভাবে প্রতিফলিত হল।

তবু এই ক্ষণদীপ্ত জীবনের মধ্যেও কীট্‌স্‌ সম্ভোগের আরতি করে গিয়েছিলেন। সেই দেহমন্ত্র কবি-দার্শনিক ব্রাউনিঙের হাতে প্রাণসাধনায় দীপ্ত হয়ে উঠল। রোমান্টিক্‌ অধ্যায় মোড় ফিরতে লাগল বুদ্ধিধর্মের দিকে। ওদিকে নবজাগ্রত আমেরিকার নতুন জীবন-বিশ্বাসে উজ্জ্বল হুইটম্যান দেহ আর মানবতার জয়গান শোনাতে লাগলেন।

মোহিতলালের পরিশীলিত কবি-মানসের মধ্যে এই তিনটি অধ্যায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। উনিশ শতকের রোম্যাণ্টিক্‌ বেদনার সঙ্গে মিশেছে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, হুইটম্যানের মানবমুখিতার সঙ্গে ব্রাউনিঙের আধ্যাত্মিকতা, জীবন-সংবেদনশীল হয়েও জনসাধারণের প্রতি উচ্চনাসিকতা। সামগ্রিক বিচারে যদিও মোহিতলাল মুখ্যত দেহসাধনার কবি, কিন্তু লক্ষ্য করলেই তাঁর কবিতায় উল্লিখিত সব ক'টি বিশেষত্বেরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

কিন্তু তাই বলে বাংলা দেশ এবং বাঙালী সংস্কৃতিও তাঁর কবিতায় উপেক্ষিত নয়। মোহিতলালের দেহবাদের নেপথ্যে তাদেরও স্পষ্ট প্রভাব আছে।

বাংলাদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র যখন 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করলেন তখন সমস্ত জাতিরই অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরেছে। নবাবী আমলের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে কিন্তু ইংরেজী সংস্কৃতির বনিয়াদ পত্তন হয়নি। সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবনের মতোই বাঙালীর সংস্কৃতিও তখন 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড।' ধর্মসাহিত্যের

অস্তিবাদ আর জাতির মনে প্রেরণা যোগায় না—তার জায়গা দখল করেছে স্থূলভ ফারসী কেচ্ছার লালাসিক্ততা। কলকাতায় ইংরেজের দপ্তর বসার পরেও সে যৌনতার ধারা চলল অব্যাহত ভাবেই। কোম্পানির দালালি করে হঠাৎ পাওয়া কাঁচা টাকার প্রাচুর্যে আসর জাঁকিয়ে বসল সদ্যোজাত 'বাবুর' দল, কদর্য খেউড় গান শুনে তারা বকশিশ দিতে লাগল শাল-দোশালা। ছাপার যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হতে লাগল অসংখ্য প্রেমকাব্য—বীভৎস তার রুচি। কামিনীকুমার, 'চন্দ্রকান্ত' তো ছিলই, বাবু আর বাইজীর কলকাতা ছেয়ে গেল 'রতিমঞ্জরী' আর 'স্ত্রী-পুলকন-দীপিকা'য়। লং সাহেবের মতে **"These works are beastly equal to the worst of French School."**

প্রতিক্রিয়া হতে দেরি হল না। মিশনারী প্রভাবের ফলে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হল, সেই সঙ্গে আপনা থেকেই এল রুচির বিশুদ্ধতা। যুগের নেতৃত্ব নিলেন রামমোহন রায়। ওদিকে ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা তাঁর শিষ্য দীনবন্ধু যদিও দু নৌকায় অল্পবিস্তর পা রাখলেন—কিন্তু অভিজাত বঙ্কিম এলেন একেবারে খড়্গপাণি হয়ে, সাহিত্যের শুচিতা এবং শালীনতা রক্ষার জন্যে জীবনপণ করল "বঙ্গদর্শন"। মাত্রা এতদূর গড়ালো যে বলদেব পালিতের স্বচ্ছ সুন্দর দেহমূলক কবিতাকে পর্যন্ত বঙ্কিম নির্মম ভাষায় ধিক্কার দিলেন। ওদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মেরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন—সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য থেকে দেহও নির্বাসিত হল।

ফলে বাংলা সাহিত্যে দেহ-বিমুখতাও চরমে পৌঁছুল। দেবেন্দ্রনাথ সেন দেহ-কামনার সংবাদ অবশ্য কিছু শুনিয়েছিলেন, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাস লিখেছিলেন: "আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।" কিন্তু মোটের ওপরে এগুলিকে নিছক সঙ্কারী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ব্রাহ্ম এবং বঙ্কিমী শুচিতার শাসনে রোগ দূর হল বটে, কিন্তু রোগীও স্বাভাবিক হতে পারল না। বাংলা কবিতায় ভাবের ফানুস উড়তে লাগল—রক্তমাংসের উত্তাপ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেলীর সৌন্দর্যবাদ রবীন্দ্রনাথে এসে আরো ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর যৌবনের মাদকতা 'কড়ি ও কোমলে' প্রথম মুখর হয়ে উঠেই 'বিরহানন্দের' বাণপ্রস্থে নীরব হয়ে গেল। বাংলা কবিতায় 'উর্বশী'র বন্দনায় ত্রুটি ঘটল না, কিন্তু "বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দে" "অতি লঘুভার পাদপদ্ম" ছাড়া কবির আর দাবি রইল না কোথাও।

মোহিতলাল যে-কালে দেখা দিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যগগনে। বাঙালীর শুচিবায়ু তখন এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত নিরীহ কবিতাতেও

হিন্দু নীতিবাগীশ তখন দুর্নীতির সন্ধান পাচ্ছেন, এমন কি "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" কবিতাতেও নাকি আদিরসের উৎস মিলছে! দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো রবীন্দ্রনাথের অশ্লীলতা প্রমাণে তৎপর। এই সময় মোহিতলাল দেখা দিলেন অসামান্য দুঃসাহসের সঙ্গে। হয়ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, ভাওয়ালের পল্লীকবি গোবিন্দ দাসের প্রভাব কিছু থাকতে পারে, দেহলীলার সঙ্গে বিশ্ব সৃষ্টি-রহস্যের যে নিগূঢ় সংযোগ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখেছিলেন তার প্রভাবও কিছু তাঁর ওপর পড়তে পারে। অন্তত বাংলা সাহিত্যের নির্দেহ শুচিতা তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল নিশ্চয়ই। 'ভারতী'র পাতায় তখন জলতরঙ্গের টুং-টাং আর পল্লীসুরের আসর বসেছে। মোহিতলাল এই আসরে অভাবিত রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষুরধার ভাষার ঝলক তাঁর রচনাকে সহজেই বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র করে তুলল। রোমান্টিক্ আবেগকে বুদ্ধিবাদে এবং দার্শনিকতায় তিনি পরিস্রুত করে নিলেন।

কিন্তু মোহিতলালের বিকাশ কখনও সম্পূর্ণ হত না—যদি তখন 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব না হত। 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহবাদকে মিশ্র-রাগিণী বলাই সঙ্গত। উনিশ শতকের রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার সঙ্গে তখন প্রথম যুদ্ধোত্তর হতাশার ঢেউ এসে মিশেছে 'কল্লোলে'র পাতায়। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দল তিক্ত রিক্ত জীবন-জিজ্ঞাসায় নানা দিকে পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে তখন। বোদ্লেয়ার, ডি-এইচ্-লরেন্স থেকে কাউন্টি কালেন পর্যন্ত সকলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে ফিরছে তার মন। চারদিকের অনিশ্চিত নিরাশার ভেতরে সে কখনো অনুপ্রাণিত হচ্ছে ফ্রয়েডীয় দর্শনে; কখনো হুইটম্যানের পেশল দেহের বর্ণনায়, কখনো হাক্স্‌লির কাছে সে প্রেরণা পাচ্ছে, কখনো সে গ্রহণ করছে লরেন্সের **'crystalisation of sex!'** কিন্তু সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির প্রতি সে খড়্গহস্ত—দেহহীন প্রেমের আরতিকে আর সহ্য করতে পারছে না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অপেক্ষাকৃত বাস্তব-সচেতন দুঃখবাদ তার মনের সঙ্গে খানিকটা সুর মিলিয়েছে, সে স্পর্ধাভরে জিজ্ঞাসা করছে—এ রকম লাইন কখনো লিখতে পারেন রবীন্দ্রনাথ?

> "তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
> শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
> চেরাপুঞ্জির থেকে
> একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?"

যতীন্দ্রনাথের এই আক্রমণের পরোক্ষ লক্ষ্য কে, সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগে না। অসীমের অভিসারে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমন সঞ্চরণ করে ফিরছে, জীবনপঙ্কে নিবদ্ধচরণ

তরুণেরা তার প্রতি শাণিত শর-নিক্ষেপের দীক্ষা পেয়েছিল যতীন্দ্রনাথের কাছেই :

"অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় কাঁপা,
গভীর নিষ্ঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা—"

তাই 'জালিয়া সত্য' দুঃখের নগ্নমূর্তিই দেখানোর ভার নিয়েছিলেন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা।

এই "কল্লোল"-এ মোহিতলাল এলেন 'পান্থ'রূপে। 'পান্থ' কবিতায় তিনি সোপেনহাওয়েরের দুঃখবাদী জীবনদর্শনকে চ্যালেঞ্জ করলেন। নারীর রূপের মধ্যে সোপেনহাওয়েরের ভীমা ভয়ঙ্করীকে দেখেছিলেন, মানুষের যৌন-কামনার মধ্যে দেখেছিলেন তার সত্তার অপমৃত্যু :

"The lovers are the traitors who seek to pertuate the whole want and drudgery which could otherwise speedily reach an end, …here lies the profound reason for the shame connected with the process of generation"—(Durant)

যৌন-কামনাকে পরিহার করো, নারীকে মনে করো পরিপূর্ণ একটি বিষপাত্র। জীবন-বিদ্বেষের এই চরম রূপ মোহিতলালের মনে যে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল, তার অভিব্যক্তি ঘটল এই ভাবে :

"জীবনের দুঃখ সুখ বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো !
যাতনার হাহারবে গাই গান, তৃষার্ত রসনা
বলে 'বন্ধু উগ্র ওই সোমরস ঢালো আরো ঢালো।'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জালো !'

সোপেনহাওয়েরের কাছে যা **"perpetual drudgery"** মোহিতলালের কাছে তাই হয়ে দাঁড়ালো অখণ্ড অফুরন্ত জীবন-কামনা। 'কল্লোল'-এর মানসিকতা এই আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে এসে যেন নিশ্চিন্তভাবে অবলম্বন করার মতো একটা ভিত্তির সন্ধান পেলো। মুহূর্তেই 'কল্লোল'-এর "দ্রোণাচার্য" হয়ে উঠলেন মোহিতলাল।

কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে 'কল্লোল'-এর নেতৃরূপে দেখা দিলেও মোহিতলাল কখনোই 'কল্লোল'-এর ছিলেন না। যে-কালের সাহিত্য এবং পরিবেশের মধ্যে মোহিতলালের কবি-মানস উন্মেষিত হয়েছিল, সে-কালের সঙ্গে 'কল্লোল' যুগের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য শুধু পরিমাণগতই ছিল না, তা গুণগতও বটে। আসলে মোহিতলালের কাব্য-ভাবনায় যে পরিমাণে ব্রাউনিং ছিলেন, সে পরিমাণে হুইট্‌ম্যান ছিলেন না। হুইট্‌ম্যানের **"The love of the body of a man or woman balks account, the body itself balks account. That the male is perfect, that the female is perfect—"** শ্রমে-ঘর্মে-কর্মে রচিত এই দেহ-চেতনাও মোহিতলালের নয়। জীবনের ভোগবাদ তাঁর কাছে ছিল তত্ত্বগত—কবি তাকে আয়ত্ত করেছিলেন বুদ্ধির প্রেক্ষিতে। 'কল্লোল'-এর মধ্যে মধ্যবিত্ত সংসার থেকে বস্তিজীবন, এবং কয়লাখনি পর্যন্ত যে সর্বাঙ্গীণ ব্যাপ্তি ঘটেছিল, বুদ্ধির আভিজাত্যগর্বী মোহিতলালের সঙ্গে তার বিরোধেরই সম্বন্ধ ছিল, ঐক্যের নয়।

তবু মোহিতলাল যে 'কল্লোল'-এর অগ্রনায়ক হতে পেরেছিলেন তার কারণ এই যে তাঁর কবিতায় অন্তত এমন একটা সুর শোনা গিয়েছিল যা রবীন্দ্রানুসরণ নয়, যার মধ্যে জীবন একটা নির্দিষ্ট আবেগের প্রশান্তিতে আত্মস্থ হয়ে যায়নি। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার আঘাতে জর্জরিত জীবনকে তিনি আকুল বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছিলেন উন্মত্ত প্রেমিকের মতো :

"যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা।
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।
আঁখি অনিমিখ্, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই—"

শুধু দেহ-দাহন নয়, ভোগমন্ত্রে মোহিতলাল প্রায় অঘোরপন্থী। জীবন যদি শ্মশানও হয়ে যায়, তবু সেই শ্মশানেই তাঁর শব-সাধনা, করোটির পাত্রে তাঁর বুক-জ্বালানো নেশার মত্ততা :

"জীবন মধুর মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পায়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।
দেবতার মতো করো সুরাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয় বিষাণ শম্ভুর মতো তুলি'—
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, ধরো মড়ার মাথার খুলি!"

'কল্লোল'-এর কাছে এই উন্মত্ত উল্লাস একটা দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। 'দল্-মিল্ মজিল, ভাঙা ঘর সরা'য়ের, করে তুলি রজিল্ আয় ভাই মুলাকের—' এমন

দিল্‌খোলা আহ্বানে সাড়া না দিয়েই 'কল্লোল'-এর মুসাফেরদের উপায় ছিল না।

কিন্তু তবুও 'কল্লোল'-এর সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার কারণ, শ্মশানই বলুন আর যাই বলুন—পৃথিবী মোহিতলালের কাছে তার তরুলতা ফুল পল্লব নরনারী সব কিছু নিয়েই মধুমান্। রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, মোহিতলাল তাকেই দুই বাহুর মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছিলেন সম্ভোগের আনন্দে: "Escape me ? Never !" রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে ত্যাগের মধ্যে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন আর মোহিতলাল চেয়েছিলেন ভোগের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে। "হে সংসার, হে লতা"র কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও রবীন্দ্রনাথ অনন্ত প্রেমে যেমন তাকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, ভোগের সমস্ত তিক্ত বেদনার মধ্য দিয়েই মোহিতলালেরও দাবি ছিল তাই। সুতরাং বাইরে বৈসাদৃশ্য থাকলেও মোহিতলাল ছিলেন আসলে রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য, আমি অন্যত্র বলেছি, "দুর্বিনীত শিষ্য।" তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন:

> "আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে, জ্বলুক অসীম রাতি,
> ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত ভাতি।
> ধরার কুসুম বার বার আসে, বার বার ফিরে যায়,
> আঁধারে আলোকে জীবনে মরণে আমি হবো তার সাথী।"

আর 'কল্লোল'-এর কাছে জীবন তখন 'পোড়ো জমি', : **"The worlds revolve like ancient women gathering fuel in Vacant lots."** একদিকে তিক্ত নিরাশা, অন্যদিকে সর্বমূল্যবোধ বর্জিত আদিমতার আসক্তি। সংস্কার ভাঙবে বলেই সে ভাঙতে এসেছে, তার কাছে জোলার ন্যাচারালিজ্‌ম আর লরেন্সের দেহদর্শন একাকার। দেহ-সম্ভোগ তার কাছে একান্তই জৈব ধর্ম: "শুধিলাম বিধাতার দেনা।" লেডী চ্যাটার্লির সংস্কারমুক্তি, সীমান্তের পাঠান সৈন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষের কাছে ইংরেজ কন্যার মুগ্ধ দেহদান অথবা বস্তি কিংবা ভিখারী-জীবনের আদিম লালসা, সবই তার কাছে সাহিত্যের রসায়ন হয়ে উঠছে। দুষ্ট হামসুনের ক্ষুধা এবং দেহকামনার সঙ্গে যাযাবরী বিশৃঙ্খল জীবন তার পরম প্রলোভনের বস্তু। তার মন তখন বলছে: **"Farewell to the drawing-room's civilized cry !"** রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই 'বেদে' মনোভাবকে ধিক্কার দিয়ে তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "রিরংসার কালি পাউডার!"

অভিজাত মোহিতলাল দেহবাদের প্রবক্তা হয়েও এই কামবাদকে, এই যাযাবরী উদ্দামতাকে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা খুঁজে পেলেন না কল্লোলগোষ্ঠীয় লেখকদের ভেতরে। মার্জিত পরিশীলিত মোহিতলাল স্বভাবতই সরে

দাঁড়ালেন তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে—সত্যসুন্দর দাসের ভূমিকায় তাঁর একদা-শিষ্যদের বিরুদ্ধেই তিনি অস্ত্রধারণ করলেন। যিনি শুনিয়েছিলেন "পাপ কোথা নাই, গাহিয়াছে ঋষি অমৃতের সন্তান—" তিনিই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন পাপ-মোচনের দুরূহ ব্রত।

বাইরে থেকে মোহিতলালের এই রূপান্তর বিস্ময়কর মনে হলেও এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। মোহিতলালের কাছে দেহকে আশ্রয় করে কাম সার্থক, আর কল্লোলীয়দের কাছে কামের জন্যই দেহ, অথচ সেই সম্ভোগের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক তৃপ্তিও নেই, জৈবকর্তব্য পালনের তিক্ত পরাভব-চেতনাই তার শেষ ফলশ্রুতি :

"Only we go
Forward, we go forward together, leaving
Nothing except a worn-out way of living—"

সুতরাং বিরোধ ছিল সূচনাতেই। উত্তরকালে সাহিত্যের শুচিতা রক্ষায় যখন মোহিতলালকে অগ্রসর দেখতে পাই, তখন হঠাৎ চমক লাগলেও একটু তাকিয়ে দেখলেই আর অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

* * * * *

মোহিতলালকে অনেকটাই চেনা যাবে তাঁর রচনার আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখলে। দৃঢ়বদ্ধ কঠিন ভাষা—প্রতিটি শব্দ-ব্যবহারে এমন সতর্ক আভিজাত্য রবীন্দ্রনাথেও নেই। আর সব মিলিয়ে যেন উগ্র একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, তাঁর ভাষা এবং বৈদগ্ধ্য সাধারণ পাঠককে সে-রচনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

রচনার এই বহিরঙ্গ তাঁর কাব্যপাঠেরই সূচীপত্র। দেহের সাধক হয়েও মোহিত-লালের অবস্থান জীবনের কাছ থেকে অনেক দূরে। নারী তার আদর্শনিষ্ঠ তন্ত্র-সাধনার উত্তরসাধিকা। আত্মমগ্ন কবি এখানেও রোম্যান্টিক যুগের সাধনায় তটস্থ, তাঁর মনের নেপথ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই প্রেরণা।

মোহিতলাল শঙ্করাচার্যকে ব্যঙ্গ করেছেন, বুদ্ধকে ধিক্কার জানিয়েছেন, "নারী-স্তোত্রে" এবং "পান্থ"তে সোপেনহাওয়েরকে অস্বীকার করে সৃষ্টি-শক্তির জয়গান গেয়েছেন। দেহ-অরণির মন্থনে অগ্নিকণা জ্বালিয়ে মদনের আরাধনা করতে চেয়েছেন তিনি। তবু এত সব সত্ত্বেও কেন তাঁর মনে হয় : "আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি যত হেরি তাঁর মুখ ?" তার কারণ, মুখ্যত রোম্যান্টিক কবি এই দেহভোগকে কিছুতেই বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন নি। জীবনের সমগ্রতার ভেতরে মহত্তম সৌন্দর্যের যিনি সাধক, এই আত্মবর্জিত প্রেম—প্রকৃতিতাড়িত জৈববৃত্তি, এই কামার্ততার মধ্যে তিনি ক্লান্তি আর বিষণ্নতার দীর্ঘশ্বাসই ফেলেছেন।

আশ্চর্য এই, সোপেনহাওয়েরকে বিদ্রূপ করেও মোহিতলাল যেন কোথায় তাঁকে অনেকখানি মেনে নিয়েছেন। নারীর রূপ সম্বন্ধে সোপেনহাওয়ের বলেছিলেন : "With young girls, Nature···dowers them with a wealth of beauty and is lavish in her gift of charm, at the rest of their lives, so that during those years they may capture the fancy of some men—" (Durant)

অর্থাৎ নারী শুধুই সৃষ্টির উপায়ন—ফুল ফোটানো এবং ফল ধরানোই তার শেষ কথা। তার মন কিংবা আত্মার কল্পনা নিতান্তই অবান্তর, কারণ সে "incapable of taking a purely objective interest in anything !" কিন্তু সোপেনহাওয়েরের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকেও মোহিতলাল প্রায় একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন তাঁর 'নারীস্তোত্রে'। নারী বন্দনার সমস্ত উৎসাহ সত্ত্বেও পরোক্ষে এই কবিতায় নারী অস্বীকৃত, তার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এখানে যান্ত্রিক, সে নিতান্তই প্রকৃতির ধর্মমাত্র। তার আত্মার প্রসঙ্গ অনাবশ্যক :

"দেহই অমৃতঘট—আত্মা তার ফেন অভিমান !
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মাভয় বন্ধন-জর্জর
ফিরিছে প্রলয়পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণতীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান।"

সুতরাং সম্ভোগ-উল্লাসের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের দুর্বারতা স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়, "নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি !"

এই মনোভাবের পেছনে কাইজারলিঙের বায়োলজীর সূত্র কাজ করছে। প্রকৃতির নিয়মের কাছে বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণের একটা পরাজয়ের বেদনাই উচ্চারিত হয়েছে এখানে। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, শেষ পর্যন্ত তার কাছেই অনিচ্ছুক আনুগত্য। এই কারণেই মোহিতলালের দেহবাদ বার বার স্ববিরোধে বিভ্রান্ত হয়েছে আর তাই শেষ পর্যন্ত "দেহের মাঝারে দেহাতীত ক্রন্দনই" কবির ভালো লেগেছে। নিজের দেহজ কামনাকে নিজেই তিনি ধিক্কার দিয়েছেন "অ-মানুষ" নাম দিয়ে :

"আমি তোদের কেহই যে নই ! দেহের আমার নেই যে ছায়া।
আমি যাহার আপন—তারো নেই যে আমার মত কায়া !
নদীর ধারে ভাঙন যেথায়
ঘরখানি মোর বাঁধব সেথায়—
শ্মশান স্বপন বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর জায়া
জনম জনম এমনি কাটে, ঘুচল নাতো ছায়ার মায়া !"

এই আত্মবিলাপ কেন ? কেন তাঁকে বলতে হচ্ছে :

"পূজার প্রসাদ আমার লাগি আবার কেন থালায় ধরো ?
ওগো আমার হাত ধোয়ানো বন্ধু ! প্রেমিক,
—সরো—সরো—?"

'নারীস্তোত্রে'র স্তুতির সঙ্গে এর যোগ আছে। এর মূল প্রসারিত রয়েছে শপ্যার মেলোডির শূন্যতায়, 'ডন জুয়ানে'র ব্যঙ্গবাণীর ভেতরে, বিলাপের মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদের কারুণ্যই প্রধান হয়ে বাজছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত :

"ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ
ধারা বরিষণে তিতিল যে দেহ,
শেষ ক্রন্দন ধ্বনিও তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
দুইপথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হনু যবে !"

দেহভোগের ঘুরপথে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মোহিতলাল যাত্রা সাঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথে এসে, উনিশ শতকের রোম্যান্টিক্ বেদনাবাদে। দেহস্বরূপিণী হয়ে দাঁড়িয়েছেন "মানস-লক্ষ্মী"। পৃথিবী এবং জীবনাসক্তিতে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথেরই অপেক্ষাকৃত ছদ্মবেশী সহচর—পরিণামে তাঁকে চিনতে কিছুমাত্র ভুল হয় না।

* * *

তবু রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে মোহিতলালই অগ্রণী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইণ্টেলেক্টের দীপ্তিবিলাস বলতে গেলে আমরা মোহিতলালের কবিতাতেই প্রথম দেখতে পাই। 'ভারতী'র ক্লান্তিকর ভাষাবৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সুর-বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। অতীন্দ্রিয় শুচিবাদের ভেতর তিনি প্যাশনের উত্তাপ এনে দিয়েছেন—'কল্লোল'-এর স্বদলীয় না হলেও তিনি সেদিনের তরুণ বিদ্রোহীদের অগ্রনায়ক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহিতলালের ব্যক্তি-চেতনার অতিসজাগ অভিমান তাঁর কবিতাকে একটা সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখল। তাঁর পূর্বগামী রবীন্দ্রনাথ ধাপে ধাপে যখন জনজীবনের নিকট-সান্নিধ্যে নেমে এলেন—তখনো মোহিতলাল তাঁর আত্ম-পরিবৃতি ছেড়ে বাইরে আসতে পারলেন না। তাঁর 'ফর্মে' যে আত্মকেন্দ্রিক আভিজাত্য আছে তাঁর 'কনটেন্টে'ও তাই। সেই জন্যই তাঁর কবিতার দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো সজাগ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর দু-একটি বিচ্ছিন্ন কবিতায় সমসাময়িক এক-আধটি রাজনৈতিক ঘটনার আভাস অবশ্য আছে, যেমন

'হেমন্ত গোধূলিতে' কোনো প্রায়োপবেশনব্রতী দেশপ্রেমিক যুবার প্রতি তাঁর "প্রশ্ন"। কিন্তু এই "প্রশ্নের"র মধ্যেও আত্মত্যাগী যুবককে তিনি কুণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা করছেন, তার এই ত্যাগে দেশ কি সত্যি-সত্যিই উদ্বুদ্ধ হবে?

"ও রূপ নেহারি স্বজাতি তোমার হবে কি জাতিস্মর?
আপনা চিনিবে? মরণে জিনিবে?—তাহারি অধীশ্বর
না হয়ে, শুধুই প্রান্তরে-পথে করিবে না ছুটাছুটি
যত আলেয়ার আলোকের পিছে, জীবনে লইয়া ছুটি?
মৃত্যুই শুধু হবে না তো বড়? ভেবে দেখ, বলীয়ান,
হে মোর দেশের যুবন্ প্রাণের প্রতীক মূর্তিমান!"

এখানেও ব্যক্তির সাধনাই কবির সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছে, "counting the noses" যে million, তার প্রতি কবির আস্থা ফুটে ওঠেনি। বিশুদ্ধ সাহিত্যের সাধক মোহিতলাল রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার স্বরূপকে কখনো সাহিত্যভাত করেননি। যেটুকু আছে তা নিরঞ্জন—তার কোনো বিশেষ রূপ নেই। মোহিতলাল দাবি করেছিলেন, তাঁর "আমি" প্রবন্ধ (নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' পুনর্মুদ্রিত) থেকে নজরুল "বিদ্রোহী" কবিতার উৎস পেয়েছেন। হতেও পারে। কিন্তু এই দুটি রচনাকে পাশাপাশি রাখলেই দুজনের মানস-ধর্মের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। "আমি"র মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চরম প্রকাশ, কিন্তু "বিদ্রোহী" অ্যানার্কিক্যাল হয়েও সামাজিক এবং রাজনৈতিক চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ। মোহিতলালের "অকালজলদ উদিয়াছে কালো কালাপাহাড়ে"র সঙ্গে "কোথা তৈমুর, কোথা চেঙ্গিস্, কোথায় কালাপাহাড়"-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন করে না।

অথচ যে-যুগের মধ্যে মোহিতলাল বাস করে গেছেন, সে-কালে রাজনৈতিক তরঙ্গের তো অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ থেকে থেকে চমকে উঠেছেন, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণায়, মানুষের প্রতি অত্যাচারে তাঁর শান্ত লেখনীও ঘন ঘন বজ্রশিখায় জলে উঠছে। ছন্দঃ যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর 'ফুলের ফসলে'র মধ্যে থেকে উৎকীর্ণ হয়ে উঠেছেন:

"নতুন খাতার বেদাগ পাতায়
স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে?
তৈরী থাকো—তরুণ উষায়
অরুণ জীবন আসবে নেবে।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কলমে সমাজচেতনার স্পষ্ট বাস্তব বক্তব্য বিঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেই সে-যুগের বরণীয় ও প্রবল কবিপ্রতিভা মোহিতলাল বিস্ময়কর-

ভাবে নীরব। তাঁর "পুরুষ" যখন "কাল রাত্রি"র তপস্যায় বসেছে তখন সে তপস্যাও নিছক আত্মগত, সে শব-সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিক সিদ্ধি।

এর জন্যে তাঁর উগ্র অহম্মন্যতাই দায়ী। আঙ্গিকের নিষেধের সাহায্যে তিনি বহু ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠককে তাঁর কবিতায় প্রবেশের অধিকার দেননি, আর এই কারণেই তাঁর কবিতাতেও সর্ব-জনীন ও -কালীন সত্য নির্বাসিত। তাই যুগের অগ্রণী কবি হয়েও যুগের সঙ্গে তিনি এগিয়ে চলতে পারলেন না। সমস্ত উৎকর্ষ, সমস্ত স্বাতন্ত্র্য নিয়েও তাঁর সৃষ্টি প্রধানভাবে অ্যাকাডেমিক হয়েই রইল। মোটামুটি দেহপ্রেমের একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আনন্দ ছাড়া মোহিতলালের জীবনদর্শন শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ অ্যাব্‌সট্রাক্‌শনেই পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ স্পষ্ট রেখায় উচ্চারিত ; তা স্তরে স্তরে বিকশিত হয়েছে, কালের সঙ্গে পদক্ষেপ করতে পেরেছে সহজ সৎসাহসের সঙ্গে। কিন্তু মোহিতলাল নিজের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছেন। কামনা-নির্বেদ-ক্লান্তি এবং রোমান্সের জট ছাড়িয়ে তার কোনো পরিণাম নিরূপণ করাই কঠিন। পরম বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাঁর প্রথম কাব্য "স্বপনপশারী" থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত কোনো মানসিক ক্রমবিকাশের সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সাহিত্যে নানা লেখকের নানা ভাবে গোত্রান্তর ঘটেছে ; ব্রাউনিংকে লস্ট্‌ লীডারের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে, মদের সঙ্গী ছন্নছাড়া র‍্যাবোঁকে গুলি করতে গিয়ে জেল খেটে এসে পল ভার্লেন আধ্যাত্মিক হয়েছেন, একদা প্রো-সোভিয়েত আঁদ্রে জিদ্‌ 'থিসিয়ুস' লিখে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন—তত্ত্বভিক্ষু রোমঁ্যা রোলাঁ শেষ পর্যন্ত জীবনবাদী সংগ্রামে ঘোষণা করেছেন "I will not rest !" কিন্তু জাতপ্রাজ্ঞ মোহিতলাল আশ্চর্য অপরিবর্তিত ও নিরাসক্ত। তাঁর যে-কোনো বই থেকে একটি কবিতাকে তুলে নিয়ে অন্য বইতে সন্নিবেশ করা চলে—তাতে কোথাও কোনো স্বরচ্যুতি ধরা পড়বে না। মনঃপ্রকর্ষের উচ্চমঞ্চে যে "সংকীর্ণ বাতায়নে" তিনি বসেছিলেন, সেখান থেকে জীবনের একটি মাত্র দিককেই তিনি দেখে গেলেন—গতির বহুবিচিত্র আনন্দে তা সহস্রধারায় উচ্ছলিত হল না।

মোহিতলাল বাঙালী পাঠকের কাছে সুবিচার পাননি—এ অভিযোগ আছে। কিন্তু তার জন্যে কবির দায়িত্বও কিছু রয়েছে। আত্মপ্রত্যয় বড় জিনিস নিঃসন্দেহ, তবু তারও মাত্রা-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন স্বীকার্য। সাধারণের প্রতি অবিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই সংকীর্ণ করে ফেলতে হয়—মোহিতলালেও তাই ঘটেছে। তাঁর অ্যাকাডেমিক কবিতার টীকা-ভাষ্য পণ্ডিতেরা করবেন, কিন্তু বুদ্ধির আভিজাত্যের জন্য তা কোনোদিন জনসাধারণের অকুণ্ঠ সংবর্ধনা পাবে কিনা, সে সম্বন্ধে সঙ্গত সন্দেহ আছে।

তাঁর "কাল-বৈশাখী" পড়তে গিয়ে শেলীর "West Wind" মনে পড়ছে :

"এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি, ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নব-বিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ"—

"নববিধানে"র কথা তো কবি ভেবেছেন। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে : তা হলে কেন এই "নববিধানে"র কথা তিনি আরো কিছু আমাদের বলে গেলেন না? শেলীর "ওয়েস্ট্ উইণ্ড" পর্যন্তই যদি তিনি এসেছিলেন, তা হলে "ওড টু লিবার্টি" কি আর খুব বেশি দূরে ছিল?*

জীবনানন্দ দাস

"আমার আকাশ কোথা চলে গেছে
আমারি সীমানা ছাড়ায়ে—
অপার নীলের তরঙ্গ তুলে
কাল-কালান্ত হারায়ে॥"

জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে অনন্য—এই একটি ছাড়া কী আর বলা যায় তাঁর সম্পর্কে? পর্যাপ্ত না হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা পণ্ডিত আর বিদগ্ধ জনেরা করেছেন। যতদূর জানি ব্যক্তিগতভাবে কবি এই সব আলোচনার কোনোটিকেই নিজের কাব্যের প্রামাণ্য ভাষ্য বলে মেনে নেননি। জীবনানন্দ 'নির্জন' বা 'নির্জনতম' কবি, তাঁর লেখা 'সিম্বলিক্' কিংবা 'সুর্‌রিয়্যালিস্ট্'—এ সব নিয়ে যতই মতভেদ থাক, কবির নিজের বক্তব্য এই : এরা 'প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো অধ্যায় সম্পর্কে—সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" অতএব "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধিতে এত তারতম্য।" [শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা]

তাহলে জীবনানন্দের কাব্য-ব্যাখ্যায় সমালোচকের যত সংকটই ঘটুক, পাঠকের ভূমিকা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'তে নিজের রচনা সম্পর্কে কবিশেখর যে-কথা

* উত্তরকালে প্রাবন্ধিক মোহিতলাল বিবেকানন্দ, হিন্দুত্ব এবং সুভাষচন্দ্রের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা এ প্রসঙ্গের অন্তর্গত নয়।

বলেছিলেন, সেইটেই একটু বদলে বলা চলে : 'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কথাটা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, এই উক্তিটি আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, এমন আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

সাহিত্যে জীবনানন্দের আসন কোথায়—এ বিচার বর্তমানে সহজ নয়। যে-কোনো সমকালীনেরই মূল্যবিচার জটিল ব্যাপার, 'সাতটি তারার তিমির' বা 'মহাপৃথিবী'র কবির ক্ষেত্রে তা জটিলতম। দীর্ঘদিন ধরে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। কবির ইচ্ছে ছিল একদা নিজ কাব্যের কুঞ্চিকা তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেবেন ; কিন্তু তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু সেই সুযোগ থেকে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করল। আপাতত আমরা যারা পাঠক, তারা তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি কথাই বলতে পারি। তিনি অনন্য।

লক্ষ্য করবার মতো রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা কাব্যে তাঁর মতো কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমন কি, যাঁরা সাম্যবাদী কবি, তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় যাঁরা কাব্যকে সর্বদা সজাগ করে রাখতে চান, তাঁদের ওপরেও জীবনানন্দের 'ইমেজিজম্' আর দুরান্বয়ী বাগ্‌ভঙ্গির ছায়া পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ তথা পরোক্ষ শিষ্যও অনেকে রয়েছেন। তথাপি জীবনানন্দ একান্তভাবে একক। তিনি অনুকৃত হয়েছেন, কিন্তু অনুসৃত হতে পারেন নি। তাঁর যে-হৃদয় 'হাওয়ার রাতে' 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে', যাকে মনে হল 'একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো একটা দুরন্ত শকুনের মতো'—সে-হৃদয়ের অনুসরণ সহজ নয়। কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহিরঙ্গের দিক থেকে জীবনানন্দের একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে। সে আঙ্গিক অসামান্য মৌলিক। এ-কথা বললে অন্যায় হয় না, তাঁর কাব্য-বিচারের [এবং আস্বাদনেরও] প্রচেষ্টা অনেক সময় এই বাইরের কাঠামোতে এসেই থমকে গেছে। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকখানিই নিরূপিত হয়েছে এই বহিরঙ্গের ওপরে। জীবনানন্দের আঙ্গিককে আয়ত্ত করা তাঁর কাব্যে প্রবেশের প্রথম পাঠ।

সেই পাঠের পরে আসে তাঁর মন আর মননকে বোঝার পালা। এ কাজ আরো কঠিন। তার কারণ, বাঙলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে আত্মগত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রাথমিক প্রয়াসের পরে জীবনানন্দের মধ্যে এই ধারার প্রধানতম প্রকাশ।

'লিরিক' কবিতামাত্রেই স্বগতোক্তি। তবু সাবধানী কবি মঞ্চের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন ; তাঁর শিল্পীসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে হয়, তন্ময় চিত্তে

অভিনয় করবার সময়েও তিনি তাঁর দর্শকদের ভুলতে পারেন না। কোন্ দৃশ্যে কোথায় হাততালি পাওয়া যাবে, অভিনেতা এ সম্বন্ধে যেমন অবহিত থাকেন, তেমনি কবিও জানেন, কোন্ কৌশলে তাঁর পাঠকের আবেগকে তিনি সহজেই আলোড়িত করতে পারেন ; ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্র-কল্পনায় কোথায় তাঁর ঐন্দ্রজালিক কৃতি, সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের জন্যেই, তাঁর সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্বভাবতই আয়াসলভ্য। বোধের চাইতে সহমর্মিতার আশ্রয়ই সেখানে নির্ভরযোগ্য। জীবনানন্দের কবিতাকে আস্বাদন করতে গেলে [সবটা করা সম্ভব কিনা জানি না] এই সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। বাঙলা সাহিত্যে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত কবি। সুতরাং সমালোচকের মিতিবিদ্যা যতই উদ্‌ভ্রান্ত হোক, অন্তত পাঠক অন্তর-যোজনার উপায়নে জীবনানন্দের কাছে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। যে-কোনো কবিকেই সমালোচকের চেয়ে পাঠকের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়—জীবনানন্দ সম্বন্ধে সেটা সর্বাধিক সত্য।

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি। এই প্রকৃতি বস্তুত মহাপার্থিব। এর এক দিকে :

> নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
> খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
> বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
> নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।

এখানে অকৃত্রিম বাংলা দেশের অন্তরঙ্গ গন্ধ-স্পর্শ, আমাদের সহজ পরিচিতির নম্র নিবিড় নৈকট্য। আবার অন্যত্র :

> হাজার বছর খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
> চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
> বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—
> দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গা থেকে যেমন তিনি পান "রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ", অন্যদিকে 'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে কেঁসে' তাঁর মানস-নাবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালির থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোকগুলো' পর্যন্ত।

জীবনানন্দের এই প্রকৃতি-চারণার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জগতে কোথাও কোনো কালের যতিচিহ্ন নেই। হাজার হাজার

বছরের পুরোনো অতীত আর এই মুহূর্তের অন্তরঙ্গ বর্তমান একটি অখণ্ড সময়ের বৃত্তে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দচর্যা সীমানাহীন সময়ের মধ্যে প্রসারিত।

এই কালহীন কালের প্রতীক হিসেবে তিনি নিয়েছেন প্রান্তরকে—প্রধানত হেমন্তের প্রান্তরকে। কার্তিকের মৃদু-কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাভরা মাঠ তাঁর এই দূরান্তীর্ণ কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের' একটি মানুষকে নিয়ে গেছে লাসকাটা ঘরে ; যখন 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে', তখন অপেক্ষাতুর হৃদয় ভেবেছে, 'হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকী।' কার্তিকের জ্যোৎস্নায় কয়েকটি মাঠে-চরা ঘোড়া কবির মনকে আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করেছে সময়হীন সময়ের প্রান্তরে :

> মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায়
> কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
> প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
> পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।

'এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' জীবনানন্দের মানসিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বর্ষা আর নদীর কবি বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ হেমন্ত আর প্রান্তরের কবি। মৃদু ধূমল জ্যোৎস্না—দিকচিহ্নহীন মাঠ এক অপূর্ব জাগর-স্বপ্ন সৃষ্টি করে তাঁর মনে—এক বিচিত্র সুর-রিয়্যালিজমের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে মগ্ন করে।

এই কল্পনার অনুষঙ্গী 'বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা।' 'কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে' 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে' মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে' প্রহর জাগে পাখি। ইঁদুর আর পেঁচারা এই হেমন্তের জ্যোৎস্নাতেই তাদের শিকার খুঁজে বেড়ায়।

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিক মন হৈমন্তী-চন্দ্রালোকের রহস্যে মিস্টিকের মতো সমাহিত। আর সে-রহস্যকে জানবার চাইতেও আস্বাদ করবার আনন্দ তাঁর নিবিড়তর। নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাঁর অতর্ক অপ্রশ্ন আত্মলীনতা। হেমন্তের রাত্রে যখন বুনো হাঁস পাখা মেলে দেয়—'জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে', তখন কবিরও সেই স্মৃতির জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার :

> মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
> উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
> কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
> উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

এই হেমন্ত জ্যোৎস্নাতেই 'বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা' শব্দমালার আবির্ভাব। কে

'বনলতা সেন' জীবনে একবার, মাত্র একবারের জন্তেই চকিত-প্রেক্ষণে অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, এই সেই ব্রতচারিণী মনোলালিতা :

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর।

প্রধানত জীবনানন্দের সুর বিষণ্ণতার আমেজ-মাখানো—রোম্যান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত। নগ্ন-নিষ্ঠুর কর্মক্ষুব্ধ সংসার থেকে তাঁর স্বভাবতই অপসরণ। এক গভীরতর, নিবিড়তর সমাধান জীবনের কোথাও আছে—সমস্ত জিজ্ঞাসা যেখানে তিমির-স্তব্ধ ; যেখানে কোনো এক বোধ—কোনো এক স্বাদ আছে যা 'অগাধ—অগাধ।' সেই অগাধ স্বাদের সাধনাই জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব।

যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংস ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব

দুঃসহ পরাভূত বিকৃতির মধ্যে কবি এই অগাধ গভীর স্বাদের সঞ্জীবন সন্ধান করেছেন। এই স্বাদ তাঁকে প্রকৃতিই দিতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। মেঠো পথ, ধানসিঁড়ি, হেমন্তের ধান, 'রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল', 'আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের নাচ'—এই আদিম প্রাকৃতিক সারল্যে কবি যেন জীবনের জটিলতার গ্রন্থি-মোচন করতে পেরেছেন :

রোধ—অবরোধ-ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিক সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং।

তার চাইতে ভালো উদ্যমহীন, উৎসাহহীন আত্মলুপ্তি। হেমন্তের ক্ষেতে চৈতালী আলোয় কিংবা 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে' নিজের সমস্ত জাগরসত্তা নিঃশেষিত হোক :

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে।
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিব অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ ভালোবেসে।

তবুও সে-সাধ সহজে মেটার নয়। সেই অগাধ-গভীর স্বাদের সাধনা কী নির্মম-ভাবেই বিঘ্নিত! দক্ষিণের হাওয়ায়, 'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ'-মাখা চৈত্র-রাত্রিতে, হরিণ-হরিণীর মিলন-মুহূর্তে দেখা দেয় শিকারীর বন্দুক। খাবার ডিশে মৃত হরিণের মাংসের ঘ্রাণ। জীবনের এই সিম্বলিক ট্র্যাজেডি তাই তাঁকে বার বার ডেকেছে সেই ধানকাটা মাঠে—যেখানে একটি মানুষ নিবিড় নিদ্রিত শান্তিতে একান্ত :

শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

এই ক্লান্তি আর বেদনার পীড়নেই কবি খুঁজেছেন 'মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পরে মাইল।' তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন সেই দুপুরের বিশ্রান্ত বাতাসকে—যা 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়।' আশ্চর্য মৌলিক চিত্র-রচনায়, ভাষার কোমল কারুশিল্পে জীবনানন্দ এক ঐন্দ্রজালিক বিরামলোক লাভ করেছেন তাঁর কাব্যে। আমাদের ঘাত-জর্জর দৈনন্দিনতায়, আমাদের রক্তঝরা প্রহর-পরিক্রমায়, আমাদের অশান্ত মনের উগ্রতায় আর অবদমনে তাঁর কাব্য এক মাধুর্যস্নিগ্ধ মরূদ্যান, কোনো রাত্রির হ্রদে শীতল অবগাহন। বিরাট পৃথিবী চলেছে অনন্তকালের নিরবধি পথ দিয়ে, কত সুসা-নিনেভ-গ্রীক্‌-হিন্দু-ফিনিশীয় সভ্যতার সমাধিস্তূপ পার হয়ে, কত বিম্বিসার-আটিলার কীর্তি-অকীর্তির স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি বহন করে'। কী ক্লান্ত, কী দুঃসহ এই পথচলা! তার চেয়ে সব কিছুর ওপর চির-বিরামের যতিপতন ঘটুক—আসুক অন্ধকার—যেখানে ভূগোলের রেখাজটিলতা নিঃশেষলুপ্ত—যেখানে কালের কল্লোল সীমাহীন সময়ের তমসা-সমুদ্রে বিলীন!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময় গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

'ধানসিড়ি নদীর কিনারে' চিরনিদ্রার পৌষের রাত্রিই তবে আসন্ন হোক। আসুক তা হলে চিরকালের স্বপ্ননিবিড়তার সেই সঙ্গিনী :

'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

এ যেন ডি-এইচ্‌ লরেন্সের সেই প্রেম-মৃত্যু-মুক্তি :

"In the darkness we all are gone, we are gone
with the trees

And the restless river ;—we are lost and gone
with all these."

পৃথিবী থেকে যখন দেহসত্তার বিদায় নেবার সময় আসবে,—এই 'পরণ-কথার দেশ'—জলসিড়ি নদীর কলধ্বনিতে ভরা—লক্ষ্মীপ্যাঁচার ডাকে মুখরিত-সন্ধ্যা 'রূপসী বাংলার' বিশালাক্ষীর মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে শুনতে কবির দু'চোখ গভীর তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে। সময়হীন, ভূগোলহীন মহাপৃথিবীর কবি বাংলার পল্লীকুটিরের একটি ছোট বাতায়ন থেকেই তাঁর দৃষ্টি অসীমতার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন—বাংলার শ্যামল মুকুরে তাঁর মহাবিশ্ব বিম্বিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' আমাদের মনে এক অপরূপ 'nostalgic' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—তার চিত্রে, ধ্বনিতে, ঘ্রাণে এবং অনুভবে আমরা এক অপ্রাপ্য মাতৃভূমির বুকে যেন ঘন নিবিড় মমতার গভীর শান্তি লাভ করি। জীবনানন্দ কল্লোলোত্তর কালের একমাত্র কবি, যিনি বাংলা ও বাঙালীর প্রতি ভালোবাসার অকুণ্ঠ সুস্নিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। তাই তাঁর অন্তিম প্রার্থনার সঙ্গে আমরাও একস্বর হয়ে উঠি :

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায় ;—
সেদিন র'বে না কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি।……
বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাঁসা আম কামরাঙা কুল।

জীবনানন্দের কাব্যে উত্তর-পর্বে আর একটি সঞ্চারী সুর এসেছিল। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক্ কবির মতোই এই রক্তকলঙ্কিত কাল—যুদ্ধ আর মৃত্যুর প্রেতলীলা—তাঁকে জীবনের প্রেমে চকিত করে তুলেছিল। আত্মবৃত্ত কবি সহসা এক মহাপৃথিবীর মহত্তম প্রার্থনায় উঠেছিলেন উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর সুরে এসেছিল 'তিমিরহননের গান' —এসেছিল 'সূর্যতামসী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় এক মহৎ সূর্যের

বাণী এনে দিয়েছিল। 'হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক' থেকে নিজের 'তিমির-বিলাসী সত্তা'কে তিনি 'তিমির-বিনাশী' শক্তিতে চেয়েছিলেন প্রাণিত করতে। এই নবলব্ধ চৈতন্য তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল এক সুবিপুল বোধির মধ্যে। ইতিহাসের গতি আজো শেষ হয়নি, বহু মানুষ, বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে সে ইতিহাস চলেছে কাল-কালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার ? কোথাও কি দেখা দিয়েছে 'অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর' ? কবি তার উত্তর পান নি, তবু সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অবসানে, মানুষের সমস্ত পরীক্ষা আর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে, এক নিবিড় পরিচয়ে, কোনো এক সর্বপ্লাবী আনন্দের মধ্যে তার জীবন কি অবলীন হয়ে যাবে না ? সেই প্রত্যাশিত আগামী-সম্ভবের অভিমুখে জীবনানন্দের এই বন্দনা মন্ত্রোচ্চারের মতোই অনুপম :

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

॥ ১ ॥

যাঁদের অকাল মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্য সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের ভেতরে সর্বপ্রথমে মনে পড়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা। আর শুধু বাঙলা সাহিত্য কেন, বাঙালীর রেনেসাঁসের ইতিহাসেও এ ক্ষতি অপরিসীম। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জন্ম হয়, ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে পরম শোকাবহ অকালমৃত্যু ঘটে। মাত্র ত্রিশ বৎসরের এই সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিধির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বাঙালী জাতি এবং বাঙলা সাহিত্যের জন্যে যে সাধনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তার তুলনা হয় না।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন জন্মেছিলেন অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। পিতৃবিয়োগ ঘটে শৈশবে এবং কৈশোরেই বিপুল বিত্ত-সম্ভার এসে পৌঁছোয় হাতের মুঠোতে। অতএব বাবুতন্ত্রের কলকাতায়—তখনকার প্রথা

অনুযায়ী অধঃপতনের পথ কালীপ্রসন্নের পক্ষে অতিশয় সুগম ছিল। একদিকে পুতুল-নাচ, বাঈনাচ এবং গণিকা চর্চার বনেদী বাবুয়ানা, অন্যদিকে মদ্যপান এবং চলনে-বলনে-লেখনে বিকৃত ইংরেজিয়ানা (কখনো কখনো ছদ্ম ব্রাহ্মিকতাও)—গ্রীক পুরাণের য়ুলিসের মতো এই শিলা এবং ক্যারিব্ডিসের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে একটি খাঁটি মানুষ হয়ে তরী পার করেছিলেন কালীপ্রসন্ন। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ সে-যুগে একমাত্র কালীপ্রসন্নের মধ্যেই সার্থকভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির অভেদ সমন্বয় হয়েছিল কালীপ্রসন্নের জীবনে। উনবিংশ শতকের পূর্ণ প্রতিনিধি তিনি। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা যে তাঁর ছিল তার উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান হল বহু ব্যয়সাধ্য "মহাভারতের" বিপুল অনুবাদ। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে তখনকার সমস্ত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট কাজে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন। মাত্র এই "মহাভারতের" জন্যেই কালীপ্রসন্ন বাঙালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেবল ঐতিহ্যচর্চার মধ্যেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি। রামমোহনের প্রভাবের ফলে সমকালীন সমাজের যা কিছু কুপ্রথা—যা কিছু ভণ্ডামি—তাদের সকলের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেম। বিদ্রোহী কালীপ্রসন্নের একটি বিচিত্র কীর্তি তাঁর "টিকি মিউজিয়াম"। তথাকথিত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের ধর্মপ্রাণতা যে কী পরিমাণে অন্তঃসার বিবর্জিত, সেইটি প্রমাণ করবার জন্যে অর্থমূল্যের বিনিময়ে তিনি তাদের টিকি কেটে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এমন মর্ম-ভেদী 'Practical joke'-এর দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'টিকিমেধ যজ্ঞ' কবিতায় কালীপ্রসন্নকে এই ভাবে অভিনন্দিত করেছেন :

"সমাচ্ছন্ন টিকির প্রতাপে
অর্ধধরা, ব্যাখ্যা হৈল 'অহো টিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।'
সেই পুচ্ছ আধ্যাত্মিকী···সেই টিকি···কালো ঝিকিমিকি
নির্মূল করিল সিংহ,—তার রৌপ্য কাঁচিটির চাপে।
সর্পযজ্ঞে জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে,—
টিকিমেধ যজ্ঞে তার,···নষ্ট হইল সর্পসম ফুঁসি
বাহিরে দেখায়ে রোষ, মনে মনে মূল্য পেয়ে খুসি
টিকির মালিক যত।···শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান ;
কলিযুগে কালী সিংহ উদ্ধারিল দেবতার মান।"

এই 'শিখামেধ' যজ্ঞের পেছনে কালীপ্রসন্নের যে মনোভঙ্গি নিহিত ছিল—"হুতোম

প্যাঁচার নক্‌সা" তার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি।

কালীপ্রসন্নের সংকীর্তি এবং সহৃদয়তার তালিকা অফুরন্ত। মাত্র তেরো বৎসর বয়েসে যিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করে সু-সাহিত্যসৃষ্টি এবং সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন; প্রগতিশীল নাট্যধারার প্রবর্তনের জন্যে যিনি গড়ে তুলেছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এবং নাটক রচনাও করেছিলেন তার সঙ্গে; 'মেঘনাদ বধের' কবিকে প্রথম গণ-সংবর্ধনা জানিয়ে যিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন কৃতজ্ঞ বাঙালীর মানপত্র এবং প্রীতির পানপাত্র; কুখ্যাত "নীলদর্পণে"র মোকর্দমায় রেভারেণ্ড লঙের জরিমানার হাজার টাকা বেরিয়ে এসেছিল যাঁর তেজস্বী মুষ্টি থেকে; নীলকরদের শয়তানী চক্রান্তে জর্জরিত "হিন্দু পেট্রিয়টের" লোকান্তরিত হরিশ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে যাঁর উদার অর্থসাহায্যই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল—সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের ঋণ বাঙালী কোনো দিনই পরিশোধ করতে পারবে না। এ ছাড়াও সংবাদপত্র সেবায়, দানে-দাক্ষিণ্যে, দেশপ্রেমে, শিক্ষার আনুকূল্যে—এমন কি নিজব্যয়ে কলকাতায় প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবর্তনে—এক কথায় সমসাময়িক জীবনের সমস্ত প্রগতিশীল ভূমিকাতেই আমরা কালীপ্রসন্নকে দেখতে পেয়েছিলাম। এই বিরাট মানুষটির অপূর্ব জীবন-সাধনার পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জীবনী-গ্রন্থটিতে সবিস্তারে পাওয়া যাবে।

আমরা সত্যিই আত্মবিস্মৃত। তা না হলে বৎসরে অন্তত একবারও তাঁর স্মরণোৎসবের আয়োজন করে নিজেরাই চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রেনেসাঁসের অন্যতম দীপ্তিমান নক্ষত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভুলে যাওয়ার দুর্ভাগ্য আমাদের পরমতম লজ্জার বস্তু!

॥ ২ ॥

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' দ্বিতীয়রহিত সমাজচিত্র। শুধু চিত্র বললে ঠিক হয় না—বইটি আসলে চিত্রশালা—'পিক্‌চার গ্যালারী'। চড়ক-পার্বণের রঙ্গ, বারোয়ারীর নামে সামাজিক দুর্নীতি, মড়াফেরা, ছেলেধরা, মিউটিনি, সাতপেয়ে গোরু আর দরিয়াই ঘোড়ার বিচিত্র হুজুকের ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ; নানারকম বুজরুকির নমুনা, হঠাৎ অবতার বাবু পদ্মলোচন দত্তের শ্লেষতিক্ত উপাখ্যান, মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা, রামলীলার হট্ট-উৎসব এবং নব-প্রবর্তিত রেলওয়ের অতি বাস্তব বিবরণী—হুতোমের নক্‌সা থেকে এরা কেউই বর্জিত হয়নি। শুধু বিশুদ্ধ সমাজচিত্র নয়—সংস্কার-ব্রতীর উপদেশও নয়—রসসৃষ্টি হিসেবেও নক্‌সার উৎকর্ষ অসামান্য; বইটি উপন্যাসের চাইতেও সুখপাঠ্য। এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থের সঙ্গে সচরাচর আমাদের পরিচয় ঘটে না।

'নক্সা' অবশ্য এই পর্যায়ের প্রথম বই নয়। সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভ্রান্তি-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে লেখনী ধরেছিলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিশ্রুতনামা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাবু উপাখ্যানে' তার আরম্ভ এবং পরিণতি যথাক্রমে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নব বাবুবিলাস' এবং 'নব বিবিবিলাস'-এর মধ্যে। সেকালের কলকাতার সমাজক্ষেত্রে বিশেষত নব্যতন্ত্রীদের ভেতরে যে-সব অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, ভবানীচরণের ক্রোধাগ্নির লক্ষ্য ছিল সেইদিকেই। তাঁর কলমে ধার ছিল, আক্রমণের মধ্যে সত্যতাও ছিল। কিন্তু তবুও এ-কথা ভোলা যায় না যে ভবানীচরণ সে-যুগের রক্ষণশীল মনোভাবের প্রধানতম প্রবক্তা। সমসাময়িক অধিকাংশ প্রগতিপন্থী আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন—রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে তাঁর ভূমিকা সবচাইতে লজ্জাকর। তৎকালীন ভট্টপল্লীর প্রতিক্রিয়া এবং শোভাবাজার রাজবাড়ীর দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সদিচ্ছাসত্ত্বেও ভবানী-চরণের ব্যঙ্গচিত্র একদেশদর্শী। তাঁর রুচিরও প্রশংসা করা চলে না—সেদিক থেকে তিনি 'রসরাজে'র গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য এবং ঈশ্বরগুপ্তের সমধর্মী। কুরুচিকে আঘাত করতে গিয়ে ভবানীচরণ নিজেই যে কতখানি রুচিহীন হয়ে উঠেছেন, 'নব বাবুবিলাস' এবং বিশেষ করে 'নব বিবিবিলাস' তার পরিচয় বহন করে।

সমাজ-রসচিত্র রচনায় ভবানীচরণের পরবর্তী স্মরণীয় প্রতিনিধি হলেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' সর্বাদি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। 'আলাল' বেচারামবাবু এবং তস্য দুলাল কাহিনীর নায়ক (অথবা 'ভিলেন') মতিলাল, বালীর বেণীবাবু, স্কুল মাস্টার বক্রেশ্বর আর সর্বোপরি স্বনামধন্য ঠক চাচার অপূর্ব চরিত্রচিত্র রচনা করেছেন টেকচাঁদ। ভাষার দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য—তাঁর প্রায়-লোকায়ত সহজশৈলীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরী গম্ভীর মধুর রচনা পদ্ধতির মিলনেই বঙ্কিমী স্টাইলের জন্ম।

কিন্তু সামাজিক আলেখ্য রচনার চাইতেও প্যারীচাঁদের উপন্যাস রচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সে উপন্যাস 'রমন্যাস' নয়—আদর্শবাদী প্রচারণায় নিবদ্ধদৃষ্টি প্যারীচাঁদ তাঁর উদ্দেশ্যকে কখনো গুহানিহিত করে রাখেননি। একদিক থেকে ভবানী-চরণ যেমন প্রাচীনদলের মুখপাত্র, প্যারীচাঁদ তেমনি অপরপক্ষে নব্যদলের বাণীবহ। প্রাচীন গোত্রীয়দের অন্যতম সরোষ লক্ষ্যবস্তু ব্রাহ্মসমাজের সুনীতি ও সুরুচির প্রধান আদর্শগুলোই প্যারীচাঁদের লেখার মধ্যে ফুটে উঠছে। লেখকের আদর্শবাদিতার আরো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'অভেদী'তে, কিংবা 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়ের' মধ্যে। তাই আত্যন্তিক আদর্শবাদ-চিহ্নিত 'আলালের ঘরের দুলাল'কে

আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাজচিত্রের মূল্য দিতে পারি না—এর ওপর 'স্কুল বুক সোসাইটি'র কিছু হস্তাবলেপ লক্ষ্য করা যায়। "আলালের" গুরুত্ব এবং মহিমার ক্ষেত্র আলাদা। আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গটিতে সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

'আলাল' প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' আবির্ভূত হয়। আবির্ভাব যে চাঞ্চল্যকর হয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; তার কারণ এই 'নক্সা'র মধ্যে কাল্পনিকতার স্থান নেই বললেই হয়। দুঃসাহসী কালীপ্রসন্ন দেশের মূঢ়তা, ভণ্ডামি, কুপ্রথা এবং ইতরামির একেবারে ফোটোগ্রাফিক ছবি যেন ক্ষুরধার দৃষ্টির একস্-রে লেন্সে ধরে ফেলেছেন। কোথাও বাস্তব নামধাম বজায় রেখে, কখনো বা সামান্যমাত্র আবরণ টেনে তিনি অনেক তথাকথিত "বিখ্যাত" ব্যক্তির খাঁটি চরিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে যা বলেছিলেন—কালীপ্রসন্ন সম্পর্কেও সে উক্তি প্রযোজ্য : তিনি তুলি ধরে সামাজিক বৃক্ষে সমারূঢ় বানরের ল্যাজসুদ্ধ ছবি এঁকে নিয়েছেন।

মধুচক্রে যে লোষ্ট্রপাত ঘটেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যাঁদের গাত্রদাহ আরম্ভ হল, তাঁদের পক্ষ থেকেও প্রত্যুত্তরের চেষ্টার অভাব হল না। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উতোর গাইলেন 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। কিন্তু হুতোমের সত্য স্পষ্ট-ভাষণে তাঁরই দল ভারী হয়ে উঠল। হুতোমের অনুবর্তী 'সমাজ কুচিত্রের' লেখক 'নিশাচর'—অর্থাৎ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুতোমকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে এইভাবে ভোলানাথকে বিধ্বস্ত করলেন :

'বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদমায়েসের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চমকে উঠলো, আমরা জেগে উঠ্লুম, চিড়িয়ার নানাপ্রকার স্বর শোনা যেতে লাগলো। "আপনার মুখ আপনি দেখ" এগিয়ে এলো। আমরা চেনো চেনো কোরে ধোরে ফেল্লেম সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়্লো।' (সমাজ কুচিত্র—আমাদের গৌরচন্দ্রিমা)

সব চাইতে কৌতুকের ব্যাপার এই শেষ পর্যন্ত এই ভোলানাথকেই কালীপ্রসন্নের অসীম অনুকম্পার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্যে ভোলানাথ কালীপ্রসন্নের কাছে যে সকাতর আবেদন জানিয়েছিলেন "শ্রীভোলাহুল ব্ল্যাক্-ইয়ার, প্রকাশক" স্বাক্ষরিত 'নক্সা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সে ভিক্ষাপত্রটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্ল্যাক্ ইয়ার' (অথবা হুতোম ?) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

'ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্সার উত্তর দিতে অগ্রসর হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই

হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন ঐ ব্যবসা চল্লো না।...এমন কি ঐ গ্রন্থকার খোঁদ হুতোমকেই তাঁর সাহায্য কর্ত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন।'

ভোলানাথের চিঠির শেষে একটি অধ্যাত্ম-ভাবমূলক কবিতা আছে। হুতোম নিজের নাম প্রকাশ করেননি—ভোলানাথেরও নয়—কিন্তু এই কবিতার মধ্যে দুজনের নামই সংকেতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

"কা, য়া রূপ কারাবাসে : কা, লে কালে আয়ুনাশে :
ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনে : চ লি, তে সুজন সনে :
হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদা প্র, মোদেতে মত্ত : ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্ব :
নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরি : বৃথা র স, পান করি :
মন ম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত ন্ন, তা করি : অভেদ ভিন্ন, তা হরি :
দেখাইছ মু, ক্তির সোপান—"

প্রথম পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয়ের তৃতীয়, চতুর্থের চতুর্থ এবং পঞ্চমের পঞ্চম অক্ষর একসঙ্গে মেলালে পাওয়া যাবে 'কালীপ্রসন্ন'—প্রায় মাঝখানেও নামটির পুনরুক্তি আছে। 'ভোলানাথ মু' পর্যন্ত পাওয়া যাবে প্রথম পংক্তির সমাপ্তি পূর্ব দশম অক্ষর, দ্বিতীয় পংক্তির নবম, তৃতীয়ের অষ্টম, চতুর্থের সপ্তম এবং পঞ্চমের ষষ্ঠ যোজনা করলে। অথবা 'কমা' চিহ্নিত অক্ষরগুলিকে নীচের দিকে পড়ে গেলেই আরো সহজে পাঠোদ্ধার করা যাবে।

এই ভিক্ষাপত্রের দ্বারা একটি তত্ত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। 'হুতোমের' জয়-যাত্রার পথে সেদিন কোনো প্রতিপক্ষই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তার কারণ, অকৃত্রিম দেশপ্রেম আর সত্যের শক্তিই ছিল কালীপ্রসন্নের অমোঘ যুদ্ধাস্ত্র।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদকে প্রশংসা করেছেন—অভিনন্দনও জানিয়েছেন। কিন্তু হুতোম তাঁর প্রীতি-কটাক্ষ লাভ করতে পারেননি। হুতোমের ভাষা বঙ্কিমের ভালো লাগেনি —বক্তব্যও নয়। কিন্তু যুগ-সম্রাট বঙ্কিমের রাজকীয় উপেক্ষাসত্ত্বেও 'নক্‌সা' তার নিজস্ব মর্যাদায় স্বমহিম।

হুতোম তাঁর ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, "এই নক্‌সায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার হয় নাই।" এর ভেতরে ব্যক্তিবিশেষ তাঁর নিজস্ব প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেও লেখকের বক্তব্য নির্বিশেষ। "আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ং নক্‌সার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" এক কথায় এটি তৎকালীন কলকাতার সমাজ এবং ব্যক্তিচরিত্রের একটি সামগ্রিক চিত্র। কালীপ্রসন্নের মনোগত অভিলাষ ছিল দীনবন্ধুর মতো একটি 'দর্পণ' হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু লং, মধুসূদন ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির প্রতি নীলকরদের বর্বর প্রতিহিংসার কথা ভেবে তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে :

"দর্পণে আপনার কদর্য মুখ দেখে কোনো বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির কত্তে থাকেন, কিন্তু নীল দর্পণের হাঙ্গাম দেখে শুনে ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে সাহস হয় না—"

তাই, তাঁকে 'সং সেজে রং কত্তে' হয়েছে। কিন্তু এই 'রং'-এর উদ্দেশ্য তাঁর ব্যর্থ হয়নি। হুতোমের ঠোঁটের ঘায়ে জর্জরিত হয়ে গেছে সামাজিক মর্কটের দল। 'আজব শহর কল্‌কেতা'-র কোনো আজব বস্তুটিই তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

রুচির দিক থেকে হুতোম যথাসাধ্য সংযত। এক 'মাহেশের স্নানযাত্রা'র সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বইখানি প্রায়শঃ নির্মল কৌতুকে উদ্ভাসিত। অথচ ইচ্ছা করলেই কালীপ্রসন্ন ভবানীচরণের মতো প্যারডির ছলে প্রচুর কুরুচির সরসতা পরিবেষণ করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের প্রতি অবিচার করেছেন।

'নক্‌সায়' সমস্ত স্তরেরই মানুষের ছবি আছে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন প্রধানত আঘাত হেনেছেন 'হঠাৎ বাবু'র গোষ্ঠীকেই—সে যুগে নানারকম জাল-জোচ্চুরি এবং ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে যাঁরা রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, শহরের গ্লানি-মন্থনের কাজে যাঁদের অপভূমিকাই ছিল মুখ্য। বীরকৃষ্ণ দাঁ আর পদ্মলোচন দত্তজার দল তার সার্থক উদাহরণ। অন্যায়-সঞ্চিত অর্থের বাষ্পে হঠাৎ ফেঁপে-ওঠা বেলুনের মতো এই সমাজ-শত্রুরা হুতোমের শাণিত বিদ্রূপের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাঁর কলমে হঠাৎ-অবতার পদ্মলোচনের বিশ্লেষণ এই রকম :

'হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যেরকম হয়, এক দম গাঁজাতেও তা হয় না।···কিছু-দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে শহরের বড় দলে গণ্য হলো যে কলকেতার ন্যাচ্‌রাল হিষ্ট্রির দলে আর একটি নম্বরে বাড়্‌লো।'

এই ছবির সঙ্গে দেশের দুর্গতির জন্যে অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন লেখক। বাঙালী ধনী-সম্প্রদায়ের হাতে দেশ ও জাতির সর্বোতোমুখী উৎকর্ষ সাধিত হবে—এই প্রত্যাশাই তাঁর ছিল। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে "Ill-begotten money" বলে—তা দেশকে আরো বেশি করে সর্বনাশের দিকেই এগিয়ে দিলে। 'যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্যে কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহা পাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বড়ো আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে।'

এই সদিচ্ছাই "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"র মূল অনুপ্রেরণা। শুধু আক্রমণের তিক্ত-তাই নয়—পত্রে পত্রে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছে। তিনি আঘাত যত দিয়েছেন, নিজে আহত হয়েছেন তার চাইতেও বেশি। শ্রেষ্ঠ শ্লেষশিল্পী—স্যাটায়ারিস্টের এইটিই আদর্শ রূপ। জাতি এবং সমাজকে ব্যঙ্গ করবার অধিকার মাত্রই তাঁরই আছে—যিনি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। যেখানে প্রীতি নেই, সহানুভূতি নেই, হৃদয়হীনতার সেই আঘাতের মধ্য দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারে না। তার নির্মমতায় জাতির কল্যাণ হয় না, মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত হয় না—বরং হিংস্র ক্ষোভে সে উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতি ও বেদনার অশ্রুরেখাই "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা"র ধ্রুবপদ।

কালীপ্রসন্নের সমবেদনার উজ্জ্বলতম চিত্র হল 'রেলওয়ে'। সাধারণ দরিদ্র মানুষ, যারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী—তাদের যে ছবি কালীপ্রসন্ন ফুটিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে এমন এক মর্মভেদী কারুণ্য প্রকটিত হয়েছে যে কৌতুকের আবরণকে তা বারে বারে ছাপিয়ে গেছে। কিভাবে এই মানুষগুলি পদে পদে বঞ্চিত হয়, কেমন করে অসাধু রেল-কর্মচারীর দল তাদের উপর উৎপীড়ন করে, জমাদার আর চাপরাসীদের বেত কী নির্মম অত্যাচারে তাদের ওপর নেমে আসে এবং সর্বশেষে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কিভাবে গাড়ীতে স্থান লাভ করে কালীপ্রসন্নের সে বর্ণনাগুলির তুলনা নেই :

'যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্ল্যাক্‌হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে একদিন এঁদের এজেন্ট, ও লোকোমোটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্ল্যাক্‌হোলবদ্ধ যন্ত্রণা থেকে অধিক নয়!'

ব্যক্তিজীবনে কালীপ্রসন্ন নির্ভীক দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'তেও তা আছে। সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস্ মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের যোগ্য প্রতিনিধি—তাঁর বক্তব্য ছিল "বাঙালীরা মিথ্যাবাদী ও বব্বলের (বর্বরের ?) জাত।" এই স্পর্ধার প্রতিবাদে দেশের নেতারা রাজা

রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে যে বিরাট সভা করেন, সেই সভায় কালীপ্রসন্ন জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'নক্‌সা'তে সে কাহিনীও আছে। সেই সভা থেকে এক প্রতিবাদলিপি ইংল্যাণ্ডে সেক্রেটারী অব স্টেটসের কাছে পাঠানো হয়। দেশের একদল ইংরেজ-পদলেহী এই সভার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যঙ্গ করে হুতোম বলেছেন : 'ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙালিরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয় কায়মনে তার চেষ্টা করতে লাগলেন।' কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই সভায় জনমতের নির্ভয় অভিব্যক্তি ঘটল, 'দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ-সাহেবের (স্যার চার্লস উড-এর) কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।' অর্থাৎ স্যার চার্লস উডের নির্দেশে গবর্ণর জেনারেলের ধমকে ওয়েল্‌স্‌ ঠাণ্ডা হয়ে যান।

'মিউটিনি' প্রসঙ্গে বাঙালীর ভীরুতাকে লেখক তীব্রতম আঘাত হেনেছেন। 'পাদ্রী লং ও নীলদর্পণে' নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি তাঁর অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিচিত্র কাহিনী এবং টুকরো টুকরো টিপ্পনীর আশ্রয়ে কালীপ্রসন্ন এই বইটিতে জাতীয় জীবনের যে স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ।

তাই সমাজ-সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে 'নক্‌সা'র মূল্য অপরিসীম। এর রসের দিকও উপেক্ষণীয় নয়। রঙ্গে-ব্যঙ্গে, পর্যবেক্ষণে এবং চিত্র-রচনায় এর মৌলিকতা অসাধারণ।

যদিও কালীপ্রসন্ন উপন্যাস রচনা করেননি—তবু নক্‌সা পড়তে পড়তে মনে হয় তাঁর হাত দিয়ে প্রথম বাস্তবনিষ্ঠ বাঙলা উপন্যাসের আবির্ভাব অসম্ভব হত না। চরিত্র সৃষ্টি এবং বীক্ষণ-নৈপুণ্যে অনেক জায়গাতেই ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিশেষত তাঁর বীক্ষাশক্তি ঈর্ষা করবার মতো। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা এই রকম :

"সৌখিন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতার নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে বিদ্দেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়চে। পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখচে। স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড় কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের "ও গামচা-কাঁদে ভালো মাচ নিবি ?" "ও খেংরাগুঁপো মিনসে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে

মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা লাঠি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করচে।'

চমৎকার ছবি। পড়তে পড়তে পুরোনো কলকাতার বহুদূর-অপসৃত একটি সন্ধ্যা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে। সমসাময়িক পুলিসের আর একটি অনবদ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক :

'(সকাল বেলায়) পুলিসের সার্জন দারোগা জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন, সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক পরিপূর্ণ। হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না...মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোরকাপ বোঝেন না, চার পাঁচজন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে, "হারমোনিয়াম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান!' কলুষিত পুলিস-ব্যবস্থা এবং নিরীহ মানুষের দুর্গতির এমন বাস্তব আলেখ্য পূর্বতন বাঙলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

আঙ্গিকের দিক থেকে বইটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল ভাষা। একেবারে সর্বজনবোধ্য চলতি ভাষায় লেখা বই হিসাবে বাংলা গদ্যে এইটিই প্রথমতম। আলালের ঘরের দুলালে চলতি রীতির একটা মোটামুটি ধাঁচ আছে বটে, আসলে তার ভিত্তি সরলীকৃত সাধুভাষা। ভাষার প্রয়োগে কালীপ্রসন্ন সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত। অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে যেমন তিনি তাঁর নক্‌সার বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, তার উপযোগী লেখনশৈলীও তিনি স্বহস্তেই গঠন করেছেন। তাঁর কথাবস্তুর সঙ্গে এই ভাষার মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে।

চলতি ভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ফলে লেখায় কিছু কিছু অসংযম প্রকাশ পেয়েছে —অশালীন শব্দ কিংবা বাগ্‌ধারার (Idiom-এর) অবাঞ্ছিত প্রয়োগও ঘটেছে। তাঁর ভাষায় বিদ্রোহের চাইতে অ্যানার্কি বেশি—এ সত্যও অনস্বীকার্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে—চলতি ভাষা, 'প্রাকৃত জনানাং" ভাষা-ই যে আগামী সাহিত্যের বাহন, বীরবলের 'সবুজ পত্রে'র পাতায় এ বাণী ঘোষিত হওয়ার অনেক আগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ তার সূচনা করে দিয়েছিলেন। আধুনিক গদ্যরীতির তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। প্রথম প্রয়াসের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে তাঁর সৎসাহস ও শক্তিমত্তা আপন গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। একান্ত পরিতাপের কথা, কালীপ্রসন্নের এই উদ্দেশ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করতে পারলেন না। যদি পারতেন তা হলে অনেক আগেই তাঁর পরম বাঞ্ছিত

লেখনীর ছোঁয়ায় বাঙলার সাহিত্যিক গদ্যে নব-যৌবনের জোয়ার আসত।

বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ অমর। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' মৃত্যুহীন কৃতিত্ব॥

প্যারীচাঁদ : আলালের ঘরের দুলাল

॥ ১ ॥

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র কীর্তিমান পুরুষ। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক সময়ে তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন পাঠাগার 'দি ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিক লাইব্রেরি'র সাব্‌ লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। এই লাইব্রেরিই ছিল তাঁর জীবনের মহত্তম সাধনা। প্রধানতঃ তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ও অর্থ সংগ্রহে ক্যাল্‌কাটা পাবলিক লাইব্রেরির নিজস্ব গৃহ 'মেট্‌কাফ হলে'র নির্মিতি সম্ভব হয়। অসাধারণ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার ফলে প্যারীচাঁদ ক্রমশ এর লাইব্রেরিয়ান সেক্রেটারি নিযুক্ত হন—সে যুগের কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এই সম্মান সুলভ ছিল না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের ফলে পরবর্তী জীবনে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থালয়ের বৈতনিক পদ পরিত্যাগ করেন—কিন্তু তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁকে 'ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিক লাইব্রেরির' কিউরেটার এবং কাউন্‌সিলারের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শুধু এই গ্রন্থাগারই নয়, দেশের প্রায় প্রত্যেকটি জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অঙ্কুর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সভা বীটন সোসাইটি (Bethune Society), 'পশুক্লেশ নিবারণীসভা' (C. S. P. C. A.) এবং 'বঙ্গদেশীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা'র তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ও হর্টিকাল্‌চারাল্‌ সোসাইটির' সদস্য ছিলেন—ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। উত্তরজীবনে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির থিয়োসফিক্যাল্‌ সোসাইটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে তিনি মহিলাদের উপযোগী একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন—'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়াও তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গলদের' মুখপত্র 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' ও 'জ্ঞানান্বেষণে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সামাজিক জীবনেও প্যারীচাঁদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অনারারি জাস্টিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

উনিশ শতকের নবজাগরণে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরূপে প্যারীচাঁদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চার আনুকূল্য ঘটেছিল ক্যালকাটা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে। তার ফলে বাঙলা সাহিত্যই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের সূচনা করে দিয়েছে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'; তাঁর 'রামারঞ্জিকা' এক সময়ে বাঙালীর পরিবারে অবশ্যপাঠ্য নীতিগ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; 'অভেদী'তে ধর্মসমন্বয়গত ঔদার্যের একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তিনি রেখেছেন, তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায়'—তৎকালীন মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনে 'সধবার একাদশী' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মতো বিশিষ্ট দায়িত্ব বহন করেছিল।

সমাজসেবী সাহিত্যিকরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের পাশাপাশি অন্যতম দীপ্ত ব্যক্তিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্র।

॥ ২ ॥

বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে সমাজ সমালোচনার একটি ধারাও প্রবাহিত হতে থাকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রসঙ্গেই আমরা স্মরণ করেছি, এর সূচনা করেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিখ্যাত সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'নব বাবুবিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়' সমসাময়িক যুগের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা। রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্ত্য মনোভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভবানীচরণ সমকালীন নব্যগোষ্ঠীকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের প্রয়োজনে ভবানীচরণ তাঁর ব্যঙ্গরচনায় কিছু কিছু কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটা মোটামুটি যোগসূত্রও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতগুলি খণ্ডচিত্রের সহায়তায় সামাজিক বিকৃতি-বিভ্রান্তির উদ্ঘাটনই ভবানীচরণের উদ্দেশ্য ছিল, আর সেই জন্যেই তাঁর রচনায় কোন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গড়ে ওঠেনি। কালীপ্রসন্নের নক্শা সম্পর্কেও ঠিক একই সিদ্ধান্ত করা চলে।

এই সম্পূর্ণ সামাজিক কাহিনী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন "টেকচাঁদ ঠাকুর", ছদ্মনামী প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর "আলালের ঘরের দুলালে"। বাংলা সাহিত্যে এই বইটিই সর্বাদি সামাজিক উপন্যাস।

"আলাল"ও সমাজ সমালোচনা। কিন্তু ভবানীচরণের সঙ্গে প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির

মৌলিক পার্থক্য আছে। কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছি—ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীলদলের প্রবক্তা, আর প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল'দের একজন—রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সমধর্মী।

কিন্তু প্যারীচাঁদকে ঠিক উগ্র 'ইয়ং বেঙ্গল'ও বলা যায় না। ডিরোজিয়োর ছাত্র হয়েও তিনি সম্পূর্ণভাবে যুগের বন্যায় ভেসে যাননি। ব্যবসায়ী জীবনে সাধু ও সতর্ক-বুদ্ধি প্যারীচাঁদ যে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিক্ষেত্রেও আমরা সেই সংযত সতর্কতারই পরিচয় পাই। 'ইয়ং বেঙ্গলদের' প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের উদ্দামতাকে নয়; যে উগ্রতার তাড়নায় রামগোপাল ঘোষের মতো কীর্তিমান পুরুষও অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন, যে অসংযমের ফলে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভার ওপরেও অকাল যবনিকা নেমেছিল—প্যারীচাঁদ নিজেকে সন্তর্পণে তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই তাঁর ব্যক্তি ও কর্ম-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।

প্যারীচাঁদের পক্ষে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ফলে। শিক্ষিত বাঙালী এবং ভট্টপল্লীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে সেদিন একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সংযোগসূত্র রচনা করতে পেরেছিল। আর শুধু সংযোগ-সূত্রই নয়—সেদিন যদি ব্রাহ্মসমাজ ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হত—তা হলে তৎকালীন শিক্ষিত সাধারণের ভেতরে হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষাই বোধ হয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টা মুখ্যত ছিল দ্বিমুখী। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনিবার্য অবক্ষয়কে ঔপনিষদিক ধর্মমতের ঔদার্য দিয়ে পুনর্জীবিত করবার দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিল, তেমনি উগ্র ইংরেজিয়ানা, দেশবিমুখতা এবং সুরাপ্রবণতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে শান্ত, সুস্থ এবং সংস্কারমুক্ত ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত নিয়েছিল। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ হিন্দু হয়েও বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস এই ব্রাহ্ম ভাবধারাতেই প্রাণিত। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'রামারঞ্জিকা' এবং 'অভ্রভেদী'ও এই ব্রাহ্ম-মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায়—দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হয়েও উত্তরকালে তিনি প্রচলিত লোকাচরিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ 'আলালের ঘরের দুলালে' সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুশিক্ষা, নীতিবোধ, সুরুচি, সেবাধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাই (এই আধ্যাত্মিকতা পূজা-পার্বণে নেই, আছে প্রার্থনা ও উপাসনায়) সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য। বইটির আদর্শ-চরিত্র বরদাবাবুর চিন্তা ও কর্মধারা যেন ব্রাহ্ম সুশিক্ষার দ্বারাই একান্তভাবে গঠিত

ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—যদিও লেখক সে কথা স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেন নি।

আর ব্রাহ্মিকতার জন্যেই বইটি অত্যন্ত সংযত এবং পরিচ্ছন্ন। কুরুচির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্যগুলিকেও তিনি যথাসাধ্য শালীনতা এবং সুরুচির সাহায্যে উপস্থিত করেছেন। তাই 'আলাল' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। এর মর্মগত সুশিক্ষার বাণী, একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক আখ্যান, চরিত্রসৃষ্টিতে চমৎকার নৈপুণ্য এবং সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার সংযত প্রয়োগ-প্রয়াস—সমস্ত কিছু মিলিয়ে 'আলাল' অসাধারণ সুযশের অধিকারী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে সহ্য করেন নি, কিন্তু প্যারীচাঁদকে সংবর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন :

"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

এর চাইতে আর বড় কথা 'আলাল' সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। সংস্কৃতগন্ধী এবং লোক-ব্যবহার্য, উভয়বিধ ভাষার মিশ্রণেই আদর্শ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হবে—'আলালে'র মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সে সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের ভাষা সম্পর্কে তাই তিনি বলেছিলেন :

"এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবণতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।"

এই কীর্তি যথাযোগ্য স্বীকৃতিই লাভ করেছিল। কেবল বাঙালীই যে বইটিকে মর্যাদা দিয়েছিল তা নয়—এর দুটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিদেশীরা এর ভাষা ও বক্তব্যকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

৩ ॥

নীতিহীন ধনী পরিবারের আদরের সন্তান কিভাবে কুশিক্ষা এবং প্রশ্রয়ের ফলে চূড়ান্ত অধঃপাতে যায়, গল্পের নায়ক মতিলাল তার নিখুঁত নিদর্শন ; আবার অন্যদিকে সৎপ্রভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষায় আর একজন কেমন করে সার্থক মনুষ্যত্ব অর্জন করে, বরদাবাবু প্রভাবিত মতিলালের অনুজাত রামলাল তার প্রতীক। অসংখ্য বিচিত্র

চরিত্র এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই বক্তব্যটিই 'আলালে' উপস্থিত করা হয়েছে।

কিন্তু 'আলালে'র বৈশিষ্ট্য তার আদর্শবাদের মধ্যে নিহিত নেই, নীতিশিক্ষার দীপ্তিতেই 'আলাল' মহিমান্বিত হয়। তা যদি হত, তা হলে ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রকাশিত স্কুল বুক সোসাইটির ছাপমারা নারীশিক্ষামূলক 'সুশীলার উপাখ্যান'ও অমরত্ব লাভ করত। 'সুশীলার উপাখ্যান' আজ বিস্মৃত—কিন্তু 'আলাল' স্ব-গৌরবে ভাস্বর। এই গৌরবের উৎস কোথায়?

বস্তুতঃ বরদাবাবুর মতো মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মতো সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল—এরা কেউই 'আলালে'র মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে—কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ—জীবনের স্পর্শস্বাদ, তা এই চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। 'আলালে'র অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটি অপরূপ সৃষ্টি—ঠকচাচা। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও সামান্য সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে প্যারীচাঁদের সাদৃশ্য এইখানে লক্ষ্য করবার মতো। মহৎ, সৎ বা উন্নত আদর্শবাদী চরিত্র-সৃষ্টিতে দুজনেই যান্ত্রিক ও অসফল; কিন্তু যেখানেই ছোট ছোট টাইপ চরিত্রের প্রকাশ—সেখানেই দুজনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধুর তোরাপের পাশাপাশি প্যারীচাঁদের ঠকচাচা অক্ষয় খ্যাতি লাভ করেছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। প্রেমনারায়ণ মজুমদার, কবিরাজ ব্রজনাথ রায়, গুরুমশাই, মৌলভী, উৎকলীয় পণ্ডিত, এমন কি আদালতের ঘুষখোর পেশকার পর্যন্ত প্রত্যেকেই সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সংযত পরিহাস-প্রবণতায় এদের রূপ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দু-কথায় স্বার্থপর ভণ্ডশিক্ষক বক্রেশ্বরের পরিচায়িকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন? সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর। স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপেচুপে রাখিতেন। কেবল বালকদিগকে যখন পড়াইতেন, মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিকসনেরি দেখ। ছেলেরা যাহা কিছু তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাস্টারগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন।"

চরিত্র হিসেবে প্যারীচাঁদের "ঠকচাচা" তুলনারহিত। মামলাবাজ, কূটবুদ্ধি এবং বাবুরামের রন্ধ্রগত শনি, এই ব্যক্তিত্বটি সমগ্র বাংলা-সাহিত্যেই অদ্বিতীয়। ঠকচাচার ফার্শিমেশানো সংলাপ যেমন অনবদ্য, তার জীবন-দর্শনও তেমনি সহজিয়া: "দুনিয়াদারি করতে গেলে ভালা-বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?"

তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের ওপর যে দুর্নীতির উৎপীড়ন চলেছিল—সমাজ সচেতন প্যারীচাঁদ তা-ও নানাভাবে উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের একটি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। আদালতে বিচারের নামে কী মর্মঘাতী প্রহসন চলত এবং তথাকথিত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট্ কিভাবে মামলার নিষ্পত্তি করতেন—তার ছবি এই রকম:

"সাহেব শিস দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবেণ্ডর ওয়াটার মাখান হাত রুমাল বাহির করিয়া মুখ পুছিতেছেন।" সেরেস্তাদার গানের সুরে তাঁর কানের কাছে মামলার বিবরণ পড়ছে আর হাকিম: "খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারী চিঠিও লিখিতেছেন, এক একটা মিছিল পড়া হইলেই জিজ্ঞাসা করেন—ওয়েল কেয়া হোয়া? সেরেস্তাদারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায় সাহেবেরও সেই রায়।"

॥ ৪ ॥

একান্ত ভাবে বাঙালীর সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টাই প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্যে, তাঁর ভাষার স্বাতন্ত্র্যও সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। 'আলালে'র গদ্যের ভিত্তি সাধুভাষা। কিন্তু এই সাধুভাষায় পণ্ডিতী সংস্কৃতিয়ানার উপদ্রব নেই; সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। অপর দিকে, কালীপ্রসন্নের বেপরোয়া দুঃসাহসও তাঁর ছিল না। তিনি মধ্যপন্থী এবং সাবধানী। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন " 'আলালেই' আমরা আদর্শ বাংলা উপন্যাসের ভাষার সর্বপ্রথম সন্ধান পাই।"

প্যারীচাঁদ তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখে যে সমস্ত সংলাপ বসিয়েছেন—তা তাঁর অপূর্ব রসজ্ঞান ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় বহন করে। বাবুরামের শ্রাদ্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্ক তার অতি উপাদেয় উদাহরণ।

বাবুরামের খানসামা হরি বলছে: "মোশায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বসেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসেচি।" ঠকচাচার ভাষা আরো অপরূপ: 'মুই

চুপ করে থাকবার আদমি নয়—দোশমন পেলে তেনাকে চেপ্টে কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।"

অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে 'আলালে'র ভাষা আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তৎকাল-প্রচলিত বাংলা প্রবাদের একটি মূল্যবান সংকলন বলা যেতে পারে এই বইখানিকে।

প্যারীচাঁদ মিত্র বিশুদ্ধ রসসাহিত্য রচনা করেননি—নীতিপ্রচারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনরসিকতা তাঁর নীতিজ্ঞানকে বারে বারে ছাপিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট চরিত্র ও খণ্ড খণ্ড ঘটনা সাহিত্যিকের বঙ্কিম দৃষ্টি-সম্পাতে ও কৌতুকের ছোঁয়ায় রসনিষ্পত্তি লাভ করেছে।

'টাইপ'-চরিত্রের রচনায় প্যারীচাঁদের অসামান্য দক্ষতা। মতিলালের বিবিধ অভিযানে, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার কূট চক্রান্তে, বাবুরামের নির্বুদ্ধিতায়, বটলর সাহেব ও জান সাহেবের কাহিনীতে, আদালতের বিবরণে এবং এমন কি সোনাগাজীর গুরুমশায়ের পাঠশালা বর্ণনায়—সর্বত্রই 'টাইপ' রচনার অপূর্ব কৌশল সার্থকভাবে প্রকটিত। প্যারীচাঁদের "আলালেই" "হুতোমের" চিত্রশালার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে।

'আলালের ঘরের দুলালে' গভীরতা নেই—অন্তর্জগতের গহনগূঢ় বার্তাও অনুপস্থিত। কিন্তু সে অভাব পূরণ করা হয়েছে বৈচিত্র্যে, ঘটনার বহুলতায় ও সমাজের বহুবিধ মানুষের অসংখ্য রেখাচিত্রে। প্রথম বাংলা সামাজিক উপন্যাসের পক্ষে এ সাফল্য সামান্য নয়। সে যুগের ইংরেজি উপন্যাসেও অন্তর্মুখীনতা কোথাও ছিল না।

প্যারীচাঁদের "রামারঞ্জিকা" "অভেদী" কিংবা "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই প্রচারধর্মী। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ ঘোষণা করে এবং যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে এরা এখন ঐতিহাসিক পঙ্ক্তীতেই একান্তভাবে আশ্রিত। কিন্তু প্রচারমূলকতা সত্ত্বেও জীবনরসের কিঞ্চিৎ অভিসেচনে "আলালের ঘরের দুলাল" কালজয়িতা অর্জন করেছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা যত বেশি অনুরক্ত হয়ে উঠব, সেই পরিমাণেই "আলালে"র মূল্যও দিনের পর দিন ক্রমবর্ধিত হয়ে চলবে।

'রুচি ভাবে'র কবি

॥ ১ ॥

'ভারতী' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর লেককেরা যখন প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত, তখন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নিজস্ব উল্লেখযোগ্য ভাবেই চোখে পড়ে।

বাংলা মতে যতীন্দ্রনাথ 'ইত্যাদি'র দলে নন—তিনি একটি স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যায়।

তাঁর ভাষায়, বক্তব্যে, উপমা-অলঙ্কার-চিত্রকল্পে এবং সর্বোপরি একটি নিজস্ব দার্শনিকতায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-যুগের প্রথম বিদ্রোহী কবি।

'মরুশিখা-মরীচিকা-মরুমায়া'র কবি কর্মজীবনে যেমন বাস্তববাদী ছিলেন, কাব্য-জীবনেও তেমনি এক নতুন বাস্তবতার স্বর এনেছিলেন। তাঁর চোখে মোহাঞ্জন ছিল না—ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন জিজ্ঞাসা। উত্তরকালীন 'কল্লোলীয়'দের অগ্রনায়করূপে মোহিতলালের পূর্বভূমিকায় যতীন্দ্রনাথ স্মরণীয়।

তাঁর প্রতিবাদই সেদিনের জ্বলন্ত প্রতিবাদ, তাঁরই ভাষায় সেকালের 'বন্দীর বন্দনা' :

"আগুনের তাপে শাঁড়াশির চাপে আমি চির নিরুপায়
তবু স্বগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ীর ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ
আমার বুকের কোমল অংশ কে বলিল তারে খাদ?"

এই স্বরই সেদিনের তরুণ মনের অনুরণন—এই তীব্র জ্বালাই সেদিন 'কল্লোলে'র বিদ্রোহীদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইকবালের বিদ্রোহী কাব্য 'শেকোয়া'র মতো, তাঁর 'ঘুমের ঘোরে', 'প্রথমা', 'বন্দীর বন্দনা' আর 'অমাবস্যার' প্রাথমিক অনুপ্রেরণা।

আধুনিক বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাতেই প্রথম দেখা দিয়েছে মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্টোচ্চারিত অভিযান, নিমীলিত নেত্রে সৌন্দর্য-রতির উদ্দেশে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণ-সংযোগের প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের যুগে তিনি পথিকৃৎ কবি—গণকাব্যের সূচনাও তাঁরই হাতে।

॥ ২ ॥

বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই সেই প্রথম কবি—যিনি নিজের কাব্য-মানসকে একটি বিশিষ্ট নামে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, নিজেকে বলেছেন 'দুখবাদী বৈরাগী'। আর এই দুঃখবাদ প্রসঙ্গেই তিনি প্রচলিত কাব্যধারাকে ব্যঙ্গের আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছেন, সুচির-স্বীকৃত মূল্যবোধগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছেন, মানুষ এবং জীবনের কোনো রমণীয় কল্যাণময় পরিণামকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

প্রভাতে হৃদয়-বনে ছুটে মায়ামৃগ,
দু'পরে বুকের মরুপারে মরীচিকা,
আঁখির 'জলায়' সাঁঝে আলেয়ার খেলা,
নিশীথে হারায় পথ প্রাণ-খদ্যোতিকা।

হায় কবি, কথা কেটে কোনো ফল নেই,
'দুঃখ বল', 'সুখই বল,' জীবন তো এই। (জীবন)

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে বেকনের 'Life' স্বতঃই মনে আসে :

"The world's a bubble, and the life of a man
less than a span :
In his conception wretched, from to the womb
so to tomb,
Crust from his cradle, and brought up in years
With cares and fears.
Who then to frail mortality shall trust
But limms of water, or but writes in dust ?"

বৌদ্ধ-দর্শন, বেদান্ত, আর্থার সোপেনহাওয়ার, ফন হার্টম্যান—দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবাদের এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক শৃঙ্খল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অহেতুক অতি-বিস্তারের ভূমিকা নেবে। কিন্তু এই সমস্ত দর্শন ও দার্শনিকের চিন্তাধারা থেকে নৈরাশ্যবাদে'র (Pessimism-এর এইটেই উপযুক্ত পরিভাষা বলে মনে হয়) কয়েকটা সাধারণ সূত্র পাওয়া যেতে পারে। দার্শনিক লাইব্‌নিৎসের 'Theodice´e' সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে সুনিপুণ শৃঙ্খলা, একটি সজ্ঞান পরিচালনার নেতৃত্ব এবং পরিপূর্ণতার অভিমুখে জগৎ ও জীবনের যে অভিযাত্রা নির্দেশ করেছিল, সেই আশাবাদী দর্শনের বিরোধিতাই কালে কালে নৈরাশ্যবাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ 'নির্বাণে', বেদান্তের 'জগন্মিথ্যায়' কিংবা সোপেনহাওয়ারের 'Will'-তত্ত্বে তারই বিচিত্রমুখী অভিব্যক্তি।

মূল কথা হল, মানুষের অন্ধ ইচ্ছাশক্তি তার বুদ্ধির অঙ্কুশ তাড়নায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর শেষ যতি কোথায় ? কোথাও নেই। বায়রনের ভাষায় "tis something better not to be !" আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান জর্জরিত করবে মানুষকে, জ্ঞান সেই অতৃপ্তির ইন্ধন যোগাবে মাত্র, কোনোদিন সে শান্তি পাবে না। জগতের নেপথ্যে যদি কোনো সক্রিয় সর্বব্যাপী শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হয়, তাহলে মানতে হবে সে শক্তি অন্ধ, বধির ও নিষ্ঠুর—কোনো 'Divine Justice" তাতে নেই—তার রথচক্রে মানুষের হৃৎপিণ্ডকে দলিত-মথিত করে নিজের খেয়াল-খুশিতে সে ছুটে চলেছে। সুখ কী ? 'All pleasure is but withdrawal of pain !' অতএব মানুষ চির অভিশপ্ত—'Doomed'। যদি একমাত্র কখনো সৃষ্টিধারা স্তব্ধ হয়ে যায়, যদি জন্মপ্রবাহ মহাশূন্যনির্বাণের বর্ণহীন অন্তহীন কোনো মরুভূমিতে গিয়ে মরণমুক্তি লাভ করে, তা

হলেই জীবের সর্বদুঃখের অবসান ঘটতে পারে।

তাই যদি হয়, তবে কোথায় ঈশ্বর—কোথায় কে! কী আশা আছে—কোন্ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে? কবির কণ্ঠে তাই আর্তধ্বনি শোনা যায়:

"Tired with all these, for restful death I cry—
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jolity,
And purest faith unhappily forsworn,
And glided honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled"—

—সনেট, শেক্‌স্‌পীয়র

যতীন্দ্রনাথের কবিতায় নৈরাশ্যবাদের এই মূল বক্তব্যগুলো একবারে অনুপস্থিত নয়। তাঁর 'ঘুমের ঘোরে' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাগুচ্ছটি—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ডনের Satires-এর সঙ্গে যার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন—তার প্রতিটি ঝোঁকেই যেন যতীন্দ্রনাথ পেসিমিজমের এক-একটি সূত্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'Theodice'e'র নিপুণ শৃঙ্খলা নয়,—'জগৎ একটা হেঁয়ালি, যত বা নিয়ম তত অনিয়ম, গোঁজামিল খামখেয়ালী'; দেবতা? সে তো রাক্ষস—'চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথির সিঁদুর চেটে, বিশ্বম্ভর হে গণেশবর যোগায় তোমারি পেটে।' ভক্তি? 'প্রবলের সাথে একতরফা সে সন্ধি।' জীবনের পরিণাম? 'ধান ভানা ছাড়া কোনো উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে'। আর ঈশ্বর সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত:

"তুমি শালগ্রাম শিলা,
শোয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্তযজ্ঞ ঘোড়া;
মোদেরি পাকানো প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠানো দড়ি;
তারি সাহায্যে বাসনা—তোমার যজ্ঞ অশ্ব ধরি!"

আর শেষ পর্যন্ত 'ঘুমিওপ্যাথিই' কবির সমাধান—মৃত্যুর পরম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত নির্বাণের মহড়া:

"ঝুম্ ঝুম্ নিঝ্ঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জমে আয়—ঘুমের উপর ঘুম!

ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন তো !"

॥ ৩ ॥

কিন্তু এই পর্যন্ত এসেই যতীন্দ্রনাথ যদি থেমে যেতেন, তা হলে তাঁর সম্পর্কে সামান্যই বক্তব্য থাকত। আসলে রোম্যান্টিক্ অভিভবের আতিশয্য, ক্লান্তিকর রাবীন্দ্রিক অনুসরণ, আনন্দবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মোহাচ্ছন্নতা এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতার অতি-প্রত্যক্ষতাই যতীন্দ্রনাথকে বিপরীত দিক থেকে জীবন ও জগৎকে দেখবার প্রেরণা দিয়েছিল। মূলত তিনি মানবপ্রেমিক—মানুষের দুঃখ-অপমান-লাঞ্ছনাই, রোম্যান্টিক্ ভাববিলাস এবং আত্মতৃপ্তিপরিচর্যার বিরুদ্ধে তাঁকে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। তাই 'ঘুমের ঘোরে'র শেষ পর্যায়ে এসে দুঃখের দেবতার সঙ্গে তিনি অশ্রুধারার রাখী-বন্ধন রচনা করেছেন, তাই প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দীপ্ত প্রতিবাদধ্বনিত তাঁর কবিতায় মানুষের উদ্দেশ্যে এই বন্দনা :

"শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমাদের ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখ-পথ যাত্রী।"

সেই জন্যেই যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদ' শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যের অন্ধকারে—পরিণামহীন শূন্যতার পথে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কোনো বিবর্ণ মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যায় নি। তাঁর শ্লেষের আঘাত আত্মধ্বংসমূলক নয়—তা আত্মসমীক্ষামূলক ; ভণ্ডামি, মূঢ়তা, বঞ্চনা আর বাষ্পাবিলতার বিরুদ্ধে তাঁর খরধার আক্রমণ। কপট দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে তাঁর 'ফেমিন রিলিফ' কিংবা 'দেশোদ্ধারের' আঘাত রীতিমতো মর্মভেদী :

"সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্র বাদলে রচিয়া অন্ধকার,—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষী নই—চাষার ব্যারিস্টার।"

'সবার উপরে যে মানুষ শ্রেষ্ঠ', 'আশী শতাব্দীর' দৈন্যের পীড়নে অস্থিশিরামাত্রসার যে 'চির-নাবালক চাষা'—তারই সমর্থনে যতীন্দ্রনাথের এই রোষদাহ, স্বার্থসর্বস্ব ভণ্ডদের প্রতি নিবেদিত তাঁর 'পিছু হটার গান'। 'কৃষ্ণা' কবিতায় অবমানিত

নারীত্বের প্রতি তাঁর বজ্রমন্ত্র বোধন-বাণী।

তাই প্রকৃতি-বিহ্বলতায় যতীন্দ্রনাথের রুচি নেই। ডারউইনের অনুসরণে সমগ্র নিসর্গের মধ্যে তিনি দেখেছেন এক নিরবচ্ছিন্ন জৈব-সংগ্রাম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিশ্বাসী ভক্ত মন প্রকৃতির কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেছিল, প্রজ্ঞা ও সত্য আহরণ করতে চেয়েছিল তার কাছ থেকে। যতীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রকৃতির এই জৈবতার তুচ্ছ সীমারেখা অতিক্রম করাই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব, কারণ 'খাদ্য-খাদকে বাদ্য-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য'। 'বাংলার শ্যামল-স্যাঁতানো কোলে'র অশ্রু-বিগলিত বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর কাছে কাপুরুষতার বিলাপ, ক্লীবের পরাভূত মনোমন্থন। তাই তিনি মরুভূমির যাত্রী—বৈশাখের অগ্নিহোত্রে রুদ্রের জন্যে তাঁর আহুতি, সেই যজ্ঞশিখা থেকে সমাবির্ভূত হবেন সর্বখর্বতাদাহী কালপুরুষ, মৃত্যু ও বেদনাকে জয় করবার শিবতেজ সঞ্চার করবেন দেশব্যাপী মুমূর্ষু জনসাধারণের শিরায় শিরায়।

বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি কী সীমাহীন মমতা তিনি অন্তরে অন্তরে বহন করে গেছেন, তার নিদর্শন তাঁর 'মানুষ', 'চাষার বেগার' কিংবা 'বার নারী'। যতীন্দ্রনাথের এক চোখে ক্রোধের অগ্নিচ্ছটা, অন্য চোখে করুণার অকৃত্রিম অশ্রু। যতীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে সেদিন এমন করে 'পাঁচীর ছেলে'র মৃত্যুকাহিনী লিখতে পারত—এমন করে বেদনাবিদ্ধ ভাষায় কে আর লিখতে পারত সেই মর্মন্তুদ ইতিহাস :

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি বেঁচে সে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের কসল ফলে,
তাই তুলে চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচী যদি শুখা কাঠ কুড়ায়ে পেতো।
শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যবে যার বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাঁথা টেনে ফেলে
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে যেমনি তোলে,
'মাগো!' ব'লে ছুটে এসে পড়িল ট'লে।

অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু ইংরেজ কবি ব্লেক—যিনি একটি পিঞ্জরবন্দী বিহঙ্গের মধ্যে দেবলোকের অভিসম্পাত শুনেছিলেন, তাঁর আরাধ্য ছিলেন দরিদ্রের প্রাণপুরুষ খ্রীষ্ট। সেই করুণাঘন মানব-পুত্রের শরণ নিয়ে বেদনা-জর্জরিত ব্লেক তাঁর 'Holy Thurs-

day'-তে বলেছেন :

"Is this a holy thing to see
In a rich and fruitful land,—
Babes reduced to misery,
Fed with cold and usurous hand ?
Is that trembling cry a song ?
Can it be a song of joy ?
And so many children poor ?
It is a land of poverty !
And their sun does never shine,
And their fields are bleak and bare,
And their ways are filled with thorns,
It is eternal winter there.
For where'er the sun does shine,
and where'er the rain does fall,
Babe can never hunger there,
Nor poverty the mind appal !"

এইভাবেই যিনি দরিদ্র, যিনি ভিখারী, সংসারের সমস্ত কালকূট সেবনে যিনি নীলকণ্ঠ—প্রথমে নাস্তিক যতীন্দ্রনাথের কাব্যে শেষ পর্যন্ত তিনিই ইষ্টদেবতা। মানুষের বেদনা ও অপমানে মর্মাহত কবি শেষ পর্যন্ত বিশ্বের 'বঞ্চিত রাজ' শঙ্করের শিষ্য হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ শৈব। কিন্তু তাঁর শিব যোগরূঢ় যতীন্দ্র নন—ত্রিলোকবন্দিত আগম-নিগম-পুরাণের প্রবক্তা পঞ্চানন মহেশ্বরও নন। যতীন্দ্রনাথের শঙ্কর লোকনাথ—তিনি মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা। তাঁর পক্ষে নিখিল বিশ্বের বেদনা—তিনি দুঃখ-দুর্গত মানুষের প্রতিনিধি।

প্রাচীন বাঙলা দেশের চাষীরা শিবকে লাভ করেছিল একান্ত আত্মজন রূপে। তারা দেবাদিদেবকে প্রত্যক্ষ করেনি—উমাকান্তের শশাঙ্কমৌলি ঐশ্বর্য রূপের সন্ধানও তারা জানত না, দীনের দেবতাকে ডাক দিয়ে তারা বলেছিল :

'আমার বাক্য ধর গোসাঞি, তুহ্মি চস চাস,
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস—'

যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও তার বিস্ময়কর পুনরুক্তি হয়েছে। তিনিও জনগণের দেবতাকে, দরিদ্রের সহমর্মী ভোলানাথকে একই মন্ত্রে আহ্বান জানিয়েছেন, শঙ্করকে

তিনি দেখতে চেয়েছেন 'সঙ্কর্ষণ' রূপে :

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।

যতীন্দ্রনাথের এই শিবসাধনা তাঁর কাব্যেরই মর্মকথা।

দীন দরিদ্ররূপী শঙ্কর আজ পথে পথে দিগ্‌বাস হয়ে ঘুরছেন, ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে কখনো পা'ন ভাং ধুতরো, কখনো শ্মশানের ছাই, কখনো বা পৃথিবীর যা কিছু উদ্গীর্ণ গরল। হাতের করোটি-পাত্রে নিজের অশ্রুই তাঁর একমাত্র পানীয়। স্বার্থপর লোভী মানুষের পুঞ্জ পুঞ্জ উপেক্ষা আর অপমান বর্ষিত হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশে। বৈশাখের খররৌদ্রের মতো তাঁরই কণ্ঠের বিষজ্বালায় দিগ্‌দিগন্ত আজ জর্জরিত।

কিন্তু এই শিব একদিন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন নব-জীবনের কর্ষণায়; তাঁর লাঙলের ফালে উপড়ে যাবে মাটির আগাছার জঞ্জাল—নিঃশেষ হবে কীট-পতঙ্গের দল—সমষ্টির প্রান্তরে ফলবে সমগ্রের ক্ষুধার অন্ন :

মাঠে মাঠে মোরা ফলাবো ফসল
ঘাটে ঘাটে তরী হবে চঞ্চল,
আগে বাঢ় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই অনাগত ফসলেরই স্বপ্নকামনা। মোহাচ্ছন্ন জীবনের আত্মরতির বিরুদ্ধে তাঁর দুঃখবাদ—অনাগত সামগ্রিক প্রাণনার সপক্ষে তাঁর শিবরাত্রি যাপন। যতীন্দ্রনাথের শিবপূজা ব্যর্থ হয়নি। শীতপ্রাতে তুষার-বর্ষণের মধ্যে যেমন করে দরিদ্ররূপী ভগবান এসেছিলেন তলস্তয়ের কাছে—তাঁর কবিতাতেও তেমনি 'কচি ডাবের' পশরাবাহী বৃদ্ধ তেমনি এক হিমের রাত্রিতে নীলকণ্ঠরূপে দেখা দিয়েছেন।

'কচি ডাব' শুধু যতীন্দ্রনাথেরই একটি প্রধান কবিতা নয়—সমস্ত বাংলা সাহিত্যেরই একটি অনন্য সৃষ্টি। 'ঘুমের ঘোরে'র অবিশ্বাসী অজ্ঞেয়বাদী (নাস্তিক নন) কবি

মানুষের প্রতি মমতায় এইখানে এসে তাঁর মন্ত্র-দীক্ষার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন এই কবিতাতেই সব চেয়ে বেশি উচ্চারিত। পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি নিবিড়তম বেদনাবোধে, দুঃখহত জীবনের প্রতি আত্মীয়তার অনুভবে—বিশ্বব্যাপী দীনদরিদ্রের সপক্ষে এইটিই তাঁর বলিষ্ঠতম ঘোষণা :

দারুণ শীতের সাজ হে আমার নটরাজ
কোন রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগর মন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে ! ...
যে-মোহিনী স্বর্ণ টাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা !
তাই তুমি নানা ছলে আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো কাঁদি ব'লে ভালোবাসো
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায় !

'কচি ভাবের' কবিকে বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী গণ-শিল্পী রূপে চিনে নিতে বাঙালী পাঠক কোনোদিনই ভুল করবে না। ছন্দে, শব্দ-চয়নে এবং আন্তর-ধর্মে লোকায়তিক শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর আরাধ্য শঙ্করের মতোই আমাদের একান্ত আত্মজন।

নজরুল

নজরুলকে প্রথম আবিষ্কার করি খুব সম্ভব ১৩৩৬-৩৭ সালে—যখন সবে দুগ্ধপোষ্যতার সীমাটা মাত্র পেরিয়েছি। বয়েসে নিতান্ত নাবালক হলেও তখনকার বিপ্লব আন্দোলনের আশেপাশে আর ছায়ায় ছায়ায় আমরা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছি—অপরিণত বালকমনে রূপকথার মতো স্বপ্ন ঘনিয়ে আনছে রিভলভার আর ফাঁসির দড়ি। ঠিক এমনি সময়ে সে যুগের দাদারা পড়তে দিলেন "অগ্নিবীণা"।

বয়সের অনুপাতে একটু বেশি রকমে পরিপক্ব হয়েছিলাম—অন্তত কবিতা পড়বার ব্যাপারে। অর্থবোধের বালাই বোধ হয় ছিল না, কথায় ঝঙ্কারই ঢেউয়ের মতো দুলিয়ে দিত মনকে। সেদিন তাদের একটা বিশেষ অর্থ নিজের মনের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে একটা কোনো বিশেষ তাৎপর্যের স্বাদ পেতাম কি না আজ তা স্মরণের বাইরে চলে গেছে। তবে এটা মনে আছে যে দশ-এগারো বছর বয়সেই আধখানা

'চয়নিকা' প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল আমাদের। আর যখন-তখন সেই কবিতা এলোমেলো ভাবে গুন্‌গুন্ করতে বড় ভালো লাগত—রোম্যান্টিক্ ছেলেবেলায় যেমনটা হয়ে থাকে।

কিন্তু কবিতার রোম্যান্স তখন মৃত্যুর রোম্যান্সে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপনে খাতার পাতায় কানাইলালকে নিয়ে কাব্যচর্চা করছি—নিজের জীবনে ক্ষুদিরামের আসন্ন সম্ভাবনাকে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হচ্ছি প্রত্যেকদিন। আর ঠিক সেই সময়টিতেই এল "অগ্নিবীণা"।

পাতা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল :

> আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু—
> এই স্রষ্টার শনি, মহাকাল ধূমকেতু—

শুধু চমক লাগল না, স্তম্ভিত করে দিল। বাস্তব জীবনে যে রিভলভারের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কবিতাতেও তার অগ্নি-গর্জন প্রত্যাশা করিনি। যেটুকু বাকী ছিল তাকে সম্পূর্ণ করে দিল, যখন পড়লাম :

> "মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
> আমি সেইদিন হবো শান্ত
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
> আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
> অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
> ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—"

যে কবিতা পড়ি আর জীবনের যে পথ দিয়ে চলছি—তার মধ্যে যেন সাদৃশ্য ছিল না, একটা ফাঁক আর ফাঁকি কোথাও অনুভব করছিলাম। চিন্তায় আর জীবনে, অথবা আরো স্পষ্টভাষায় রুচি আর গতিপথের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে ফিরছি তখন। হয়তো খানিকটা অবচেতন ভাবেই তখন এমন কবিতার সন্ধান করছি যা মনকে ভোলাবে না, মনকে জ্বালাবে। নজরুলের কবিতা সেই ফাঁক পূরণ করে দিল। শুধু কি আমরাই? যাঁরা সেদিন আমাদের নেতা ছিলেন, সেই বড়োদের মুখেও শুনতে পেতাম : কবি বলতে গেলে নজরুল—রবীন্দ্রনাথ একেবারে জোলো!

মনে আছে কী আশ্চর্য সমমর্মিতা পেয়েছিলাম নজরুলের কবিতায়। আমাদের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত আগ্নেয় যন্ত্রণা যেন তাঁর লেখার প্রতিটি পংক্তিতে দীপ্যমান হয়ে উঠত। তাঁর কবিতা তখন আমাদের কাছে বেদমন্ত্র হয়ে উঠেছিল, স্বপ্ন দেখতাম আমাদের রক্তরাঙানো দুঃখের যাত্রায় তিনি চলেছেন অগ্রগামী যাত্রিক—হাতে তাঁর উদগ্র মশাল। গলায় কোনোকালে কিছুমাত্র সুর নেই যাদের, তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ

মেলাবার জন্যে সমস্ত বুকের ভেতর থেকে তাদেরও গান জেগে উঠত :

"মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
মোরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়।
যুগে যুগে সিক্ত হল
রক্তে মোদের পৃথীতল
আমরা ছাত্রদল—"

'সর্বহারা', 'জিঞ্জির', 'ফণীমনসা'; লুকিয়ে পড়া বাজেয়াপ্ত 'বিষের বাঁশী'। তারপরও পরে এল 'সঞ্চিতা'—বুকের আগুনটাকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখবার অফুরন্ত ইন্ধন যেন পেয়ে গেলাম আমরা।

শুধু একটা জিনিস মধ্যে মধ্যে বড় খট্‌কা লাগাত। এমন অগ্নিক্ষরা যাঁর কণ্ঠ, বেদনার কালীদহে জন্ম নিয়ে যিনি দেখা দিলেন কালীয় নাগের মতো, কবি-কল্পনার কুসুম মাল্য নয়—যিনি রচনা করতে এলেন বিষদিগ্ধ কাঁটার মালা, তিনি কেমন করে লিখলেন, "বাগিচায় বুলবুলি তুই—" গজল? যাঁর আকাশে মহাকাল ধূমকেতুর প্রসারিত পুচ্ছে জেগে থাকত যুগান্তরের প্রলয়শিখা, তিনি কেমন করে সেই আকাশেই দেখতে পেলেন, 'কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা ভোর গগনের দরদালানে'?

আজকে অবশ্য আর সে খটকা লাগে না। সে ছেলেমানুষী বিচারবোধও নেই। আজ জানি মহৎ প্রতিভার ধর্মই হল বৃহৎ ব্যাপ্তি—মেসোপোটেমিয়ার রণ-প্রান্তর থেকে আমাদের ভালোবাসা আর আনন্দ-বেদনা দিয়ে গড়া ছোট ঘরখানি পর্যন্ত তার অবাধ উন্মুক্ত সঞ্চরণ। তাছাড়া বিদ্রোহী কবিকে সে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে গ্রামোফোন্ কোম্পানীর কাছে প্রতিভাকে করুণভাবে বিক্রী করে দিতে হয়, এ সত্যটাও তখন পর্যন্ত জানা ছিল না।

* * *

আজ কখনো কখনো মনে হয়, নজরুল যতটা ইমোশন্যাল, ততটা লজিক্যাল্ নন। রচনায় পরিমিতিবোধ সম্পর্কে তিনি অনেকটাই অসতর্ক, শিল্পীর স্বভাব-সুলভ মাত্রা বজায় রেখে অনুভূতির বিকিরণের চাইতে, তার উন্মত্ত বিদীরণটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশি।

কিন্তু সেইখানেই তো নজরুলের পরিচয়। তা যদি না হত তা হলে ছন্দে, ভাবে, ভাষায় পরিপূর্ণ বিদ্রোহ এনে তিনি ওই বিপুলকায় অগ্নিগর্ভ "বিদ্রোহী" লিখতেন না, —লিখতেন রবীন্দ্রনাথের মতো সংযত, পরিমিত নিখুঁত নিপুণ স্বচ্ছন্দ-যতি একটি

ভাবগর্ভ চতুর্দশপদী : "আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি"—

নজরুল তা লেখেননি।

তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ যুগোত্তর আর নজরুল একটি পরিপূর্ণ যুগ। মনে রাখতে হবে সেই যুগ : যখন বাংলার যুবশক্তির আবেগোদ্বেল প্রাণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী-নীতির নরম ও মোলায়েম প্রায়-নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠেছে। বাংলার অগ্নিপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গড়ে তুলেছেন তাঁর গরমপন্থী 'স্বরাজ্যদল', আর দেশবন্ধুর পরম অনুগত পার্শ্বচর, যুদ্ধ-ফেরৎ নজরুল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সে যুগে বাংলার প্রাণের মধ্যে বহ্নিবন্যা বয়ে যাচ্ছিল। দিকে দিকে প্রধূমিত হচ্ছিল বিপ্লব আন্দোলনের জ্বালামুখী। মহাত্মাজীর অহিংস নেতৃত্ব বাঙালীর প্রাণে কোনো দিন খুব বেশি সাড়া জাগায়নি, বাংলা দেশে সেদিন তার ভিত্তি ছিল বোধ হয় সব চাইতে শিথিল। নজরুলের কণ্ঠেই আমরা ধিক্কার শুনেছিলাম :

"সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি !"

সে যুগে হিসাব ছিল না, বিচারও ছিল না। অসন্তোষ আর বিক্ষোভের ধারা-প্রতিধারা চার দিক থেকে এসে আছড়ে পড়ছিল। এক স্বাধীনতার একটা অস্ফুট এবং প্রায়-নিরর্থক স্বপ্ন ছাড়া দেশের যুবশক্তির মনের মধ্যে যে তুফান বইছিল, তাকে 'অ্যানার্কি' বললে অন্যায় হয় না। অতৃপ্তি এসেছে, অসন্তোষ এসেছে, অস্বীকৃতি এসেছে ; একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমরা প্রায় সব কিছুই চাই না—প্রায় সব কিছুই আমাদের জ্ঞান, কর্ম আর গতিপথে দাঁড়িয়ে আছে বাধার একটা উত্তুঙ্গ প্রাচীর তুলে। এদের ভাঙতে হবে, চুরমার করতে হবে, মুছে দিতে হবে এদের অস্তিত্বকে। দূর করতে হবে নারীর অমর্যাদা, ধনতান্ত্রিক অসাম্য, পরজীবী বৈদেশিকের শোষণ, আর ধর্ম-গুরুদের ভণ্ডামি। তাই নজরুল সমুচ্চকণ্ঠে ধ্বংসের দেবতাকেই ডাক দিয়েছেন। একদিকে যেমন 'ধর্মসংস্থাপক' সব্যসাচীকে আহ্বান জানাতে তাঁর বাধেনি, তারই পাশাপাশি যুগে যুগে কলঙ্কিত তৈমুর, চেঙ্গিস, কালাপাহাড়ের মতো মানবতার ঐকান্তিক শত্রুকেও তিনি অসঙ্কোচে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একদিকে তিনি সাম্যবাদে একান্ত বিশ্বাসী ; অন্যদিকে এমন নেতার বন্দনা করেছেন—যাঁর সঙ্গে সাম্যবাদ অহি-নকুল সম্পর্কে সম্পর্কিত। এরই নাম অ্যানার্কিজম্, জীবন সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ নেতিবাদ।

নজরুলের কবিতাকে একদিক থেকে যুগমানসের নীহারিকা বলা যায়। তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ডের বুকে

কতকগুলো বিচিত্রবর্ণ ধাতব-শিখার মতো জ্বলছে ; তাদের মধ্যে সব আছে—কিন্তু আপাতত অসহ দাহন ছাড়া তাদের আর কোনো স্পষ্ট নির্দিষ্ট রূপ পাওয়া যাচ্ছে না। যখন সেই সামগ্রিক অগ্নিপিণ্ড থেকে তারা কয়েকটি গ্রহরূপে ছড়িয়ে পড়বে—আবর্তনের ছন্দে দিনের পর দিন শীতল সংহত হয়ে সুস্পষ্ট সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেখা দেবে, সেকাল তখনো অনাগত। "ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়"—নজরুলের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এবং তাঁর শেষ কথা :

"পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি,
রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-
লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগ যা-ই হোক, তাঁর মর্ম-সংযোগের সত্য অত্যন্ত স্পষ্টোচ্চারিত। অহিংস সত্যাগ্রহকে ভারতের মুক্তিদাতা বলে তিনি কখনো বিশ্বাস করেন নি, তাঁর প্রতীতি : "উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার"। ফাঁসির মঞ্চে যে জীবনের জয়গান তিনি শুনতে পান—তার প্রতি মহাত্মা গান্ধীর কোথাও কোনো অনুমোদন নেই।

কিন্তু এই রক্তাক্ত বিপ্লববাদী ভাবনার ওপরে তখন আর একটি ছায়া পড়েছে। "লাঙল" পত্রিকা, মুজফ্ফর আমেদের সান্নিধ্য, রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য, সোশ্যালিজ্মের দিগন্তরেখা—বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত বিপ্লবীর স্থানিকতা অতিক্রম করে বিশ্ববিপ্লবের বাণী আনছে। নজরুলের 'সর্বহারা' বইটির নামকরণেই লুকিয়ে আছে সেই প্রেরণাটি : 'পৃথিবীর সর্বহারাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই।' তাঁর সাম্যবাদী যেন 'কম্যুনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোকে' সামনে রেখেই রচনা করা হয়েছে :

"কালের চর্কা ঘোর্,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে—চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।"

'ইণ্টারন্যাশনাল গীত', 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান' কিংবা 'ধীবরের গান'—এই সাম্যবাদী চিন্তাধারারই ফল।

"মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে।
আবার নতুন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥
ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয়রে ধ্বংস সাথী।
ধর হাথিয়ার, সাম্‌নে প্রলয় বাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়্‌বি চল।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।"
(শ্রমিকের গান)

অথবা:

(ও ভাই) আমরা মাটির খাঁটি ছেলে
দূর্বাদলশ্যাম,
(আর) মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন
রাবণ-অরি রাম
(ঐ) হালের ফলায় শস্য উঠে
সীতা তাঁরি নাম
(আজ) হরছে রাবণ সেই সীতারে—
সেই মাঠের ফসল॥

* * * *

(আজ) জাগ্‌রে কৃষাণ, সব তো গেছে
কিসের বা আর ভয়
(এই) ক্ষুধার জোরে করব এবার
সুধার জগৎ জয়।
(ঐ) বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার
হয়কে করব নয়,
(ওরে) দেখবে এবার সভ্য জগৎ
চাষার কত বল॥ (কৃষাণের গান)

অর্থাৎ কবি যে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছেন, এই সব কবিতা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্যবাদী ভাবনাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ ভাবে, যুক্তির মাধ্যমে ও সংগঠনমূলক কর্মধারায় গ্রহণ করা সম্ভবত নজরুলের নীহারিকাধর্মী আগ্নেয়মননের পথে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল না। সোশ্যালিজ্‌ম আবেগের তরণীকে ঝড়ের সমুদ্রে ভাসায় না, তার সংযত সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি চলে, প্রয়োজন হলে লেনিনের ভাষায় তাকে 'তিন পা পিছিয়ে এক পা অগ্রসর হতে হয়'। নজরুলের ব্যক্তিত্বে এবং স্বভাবত শিল্পেও, সে ধৈর্য কোথাও ছিল না। বিশুদ্ধ আবেগজীবী নজরুল অত্যাচারিতের প্রতি সমর্থনে, শোষক-সম্প্রদায়ের প্রতি মহৎ ঘৃণায় এবং সর্বমানবিক কল্যাণ-বোধের আমন্ত্রণে সাম্যবাদের কাছে এসেছেন, কিন্তু তার ধীর স্থির অনুশীলনে, প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের ক্রমাপসরণে, 'সিজ্‌নড্‌ টিম্বারে'র সহিষ্ণুতায় দিনে দিনে প্রস্তুত হয়ে ওঠা—এই সম্পূর্ণতা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, রুশ-বিপ্লবের জাতীয় কবি মায়াকোভ্‌স্কিকেও এই আবেগজীবিতার জন্যেই বহুদিন পর্যন্ত লেনিন বিশ্বাস করতে পারেন নি, অনেক দিন ধরে মায়াকোভ্‌স্কির সাম্যবাদী কবিতা সততার পরীক্ষা দিয়েছে।

তাই মোটের উপর বিদ্রোহী নজরুলকে যদি অ্যানার্কিস্ট্‌ বলে চিহ্নিত করা যায়, তা হলে অন্যায় সিদ্ধান্ত হয় না। কিন্তু একথা সর্বতোভাবে সত্য যে মধ্যবিত্তের পরম বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহবোধ প্রথমে এই অ্যানার্কিজম্‌কেই আশ্রয় করে—এরই ভিত্তিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে উত্তরকালের পূর্ণতর রাষ্ট্রচেতনা। নিহিলিজ্‌ম না এলে বোলশেভিজ্‌ম আসতে পারত না এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। সেদিনের সংগ্রামী-বাংলার বিদ্রোহ-তরঙ্গিত ঐতিহ্য থেকেই পরবর্তী সামগ্রিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা এসেছে।

নেতিবাদী যুগে আতিশয্যটা স্বভাবধর্ম, তার প্রকৃতিসিদ্ধ। ভালোমন্দ সব কিছুর বিরুদ্ধে তার অসংযত উত্তাল প্রতিবাদ, বিপ্লবের রক্তশিশুর সে দুঃসহ জন্মযন্ত্রণা। এই যন্ত্রণাকে যেমন যুক্তি দিয়ে সংযত করা যায় না, বেদনার্তের আর্তনাদকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বিচার ও শিল্পবোধের মানদণ্ড দিয়ে, নজরুল সম্পর্কেও এই কথাটিই সত্য। তাঁর কবিকণ্ঠে সমগ্র বাংলাদেশের কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই, তাঁর অসংযত, বেহিসেবী ক্ষিপ্ত বিদ্রোহবাদ সে যুগের বিদ্রোহী বাঙালীর মর্মবাণী।

তাই নজরুলের কবিতা শুধু কবিতাই নয়, তা একটা যুগ ; তার শিল্পমূল্যের চেয়ে ঢের দামী তার সত্যমূল্য। সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাবগীতি বলা উচিত তাঁর কবিতাকে—তাঁর কবিতা সে যুগের মানস-ইতিহাস।

আর সে ইতিহাসের কাছে এ যুগের ঋণ অপরিসীম ; তাঁর কালাপাহাড় বন্দনার প্রয়োজন হয়তো আমাদের ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সাম্যবাদীর আমরা নিঃসংশয় উত্তরাধিকারী।

আর একটি কথা আছে নজরুলের গান সম্পর্কে। প্রথম জীবনে তাঁর বিপ্লবী-বিদ্রোহী কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে গানগুলোকে কেমন বেসুরো লাগত—তাই মনে হত আমাদের অধিনায়ক কবির চিন্তা-চেতনার সঙ্গে যেন তারা একাত্ম নয়। কিন্তু আজ জানি রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদ ছাড়া আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ গীতিকার নজরুল—সংখ্যার দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান।

আমার মনে হয়, কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলের যে অসংযম—গানে তা অনেকখানি সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা গান কেবল সুর-নির্ভর নয়, কথা যে তার অন্যতম প্রধান উপকরণ, রবীন্দ্রনাথ সে সত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তাই গানের একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে ভাবের উদ্দামতাকে সংহত ঘন-পিনদ্ধ করে নজরুলের শিল্পকলা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হতে পেরেছে।

"আঁধারের এলোচুল দু হাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বনছায়ে"

কিংবা

"কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন,
যার রূপ দেখে শিব বুক পেতে দেয়
যার হাতে ওই মরণ-বাঁচন"—

এগুলি ভালো কবিতার রূপলাভ করেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা দীর্ঘছন্দ "পূজারিণী"র চাইতে :

"তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগ্‌ল ভালো
লাগল ভালো
পথিক আমার পথ ভুলালো সেই নয়নের জলে।
আজকে বনে পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে"—

আমার অনেক বেশি উপভোগ্য বলে মনে হয়।

রাজনৈতিক কবিতায় বাংলা সাহিত্যে অন্তত ঐতিহাসিক গৌরব দাবি করবেন নজরুল ; আর তাঁর গান নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহিত্যিক মহিমার দিক থেকে স্মরণীয় করবে।

বাংলা গদ্যের খাত-বদল

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের স্তরগুলো পার হয়ে আধুনিক বাংলা গদ্য যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, সেটা নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো। সংস্কৃতের বনিয়াদের ওপর ইংরেজি উপকরণের সহযোগিতায় আধুনিক বাংলা গদ্য একটা চমকপ্রদ রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে এসেছে। আধুনিক বাংলা গদ্য কি স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ বাঙালীর জীবন থেকে উৎসারিত হয়েছে, না তাকে সচেতন-ভাবে অন্য কোনো খাতে বইয়ে দেওয়া হয়েছে?

এ-কথা ঠিক যে, ইংরেজের হাতে গড়া কলকাতার যে বাবু-সংস্কৃতি তৈরী হয়ে উঠেছিল, দেশের প্রাণের সঙ্গে তার সংযোগটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না। তার অনেকটা আকস্মিক—অনেকখানিই স্বয়ম্ভু। কলকাতার দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল দিয়ে পল্লীবাংলা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়েছে। নবাবী আমলে শহর আর গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিকটতর ছিল, সমৃদ্ধিগত পার্থক্য থাকলেও জাতিগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজের তৈরী কলকাতার সঙ্গে বৃহত্তর বাঙলা দেশের যে ব্যবধান রচিত হল তা কেবল গোত্রান্তরই নয়—ধর্মান্তরও বটে। নদীয়া শান্তিপুরের মতো দু-চারটি শহরে সেই গোত্র-বদলের কিছু কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়ল, কিন্তু সমগ্রভাবে বাবুকেন্দ্রিক কলকাতার যে রূপান্তর ঘটে গেল—বৃহত্তর বাঙলা দেশের কাছে তা সম্পূর্ণ বিজাতীয় হয়েই রইল।

অতএব কলকাতার এই নবতম বাবুগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে যে যে বাংলা ভাষা গড়ে উঠল, তার রূপগত কিছু স্বাতন্ত্র্য যে থাকবেই সে কথা অস্বীকার করা যায় না। শহর মাত্রেরই কিছু-না-কিছু 'কক্‌নি' থাকে—লণ্ডনেরও আছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের খাত-বদলের আসল রহস্য সেখানে নেই। মনে হয়, এর আরো গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

ইংরেজ আসবার আগে দেশে ছিলেন মুসলমান রাজা। কিন্তু তখনও ভাটপাড়া ইত্যাদির গোঁড়া পণ্ডিতসমাজ আঞ্চলিক সংস্কৃত-ঘেঁষা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে রেখে-ছিলেন। ওই পদ্ধতির লেখকেরা বিদ্যাসাগরের রচনার নিন্দাবাদ করতেন, অপরাধ—দশখণ্ড সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য না নিয়েও সে ভাষা লোকে বুঝতে পারে। তাঁরা 'অস্মদ্‌গণের এবম্প্রকার' দিয়ে লেখা আরম্ভ করতেন। এই ভাষা সীমাবদ্ধ ছিল মূলত পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যেই—সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তা হলে বৃহত্তর বাংলা দেশের গদ্যরীতি কী ছিল?

তার নিদর্শন মেলে প্রাচীন বাংলার পত্র-লেখন পদ্ধতিতে, 'ব্রাহ্মণ-রোম্যান্ ক্যাথলিক সংবাদে' আর মানোএল্‌-দা আসুম্‌স্‌ সাম্‌-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'। শেষ বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিস্‌বোয়াঁতে। যতদূর জানা

গেছে এইটিই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই এবং বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন।

রোমান্ হরফে ছাপা এই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। গুরুশিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে রোম্যান কাথলিক ধর্মের মহিমা প্রচারই বইখানার লক্ষ্য। বইটির বাংলা অংশ মানোএল্-এর লেখাই হোক কিংবা অন্য কোনো বাঙালীই এর রচয়িতা হোন—এর দুটি স্মরণীয় বিশেষত্ব আছে। প্রথমত, এর ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় কথন-রীতির প্রভাব—দ্বিতীয়ত, এর সরলতা।

যে যুগে গদ্যের কোনো মানই ছিল না, সে-কালে লেখার মধ্যে অন্বয় প্রভৃতির বিপর্যয় থাকবেই। তবু এই ভাষাই সর্বসাধারণের ভাষা। দেশী চল্‌তি শব্দ, ফার্সী শব্দ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দ এর মধ্যে সহজভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি থেকে যথেচ্ছ একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক:

" 'হিসপানিয়া' দেশে মাদ্রিদ শহরে (শহরে) দুই কলিম পুরুষ শত্রু আছিল বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল, দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিনে ছয় ঘড়ি দুই প্রহর বাদে তাহারা জনে-জনেরে লাগাল পাইল। দুইজনেও তরোয়াল খসাইয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত, সে আরও এক চোট দিল, সে মাটিতে পড়িয়া রহিল, পরাজয় হইল।"

দেখা যাচ্ছে 'কলিম' 'ঘড়ি' 'তালাস' 'দাদের' সঙ্গে 'শত্রু' 'প্রহর' 'তেজবন্তের' বেশ সহজ সমন্বয় ঘটেছে। এই ভাষাই বাঙলার প্রাকৃত জনের ভাষা। সমস্ত বইটিতেই ফার্সী, সংস্কৃত ও দেশী (এবং প্রাদেশিক) শব্দের অসংকোচ মৈত্রী রচনা করা হয়েছে। অবলীলাক্রমে জন-সংযোগ রচনা করাই এর উদ্দেশ্য। কারণ সর্ব-সাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করাই ছিল গ্রন্থ-রচয়িতার অভিপ্রায়।

এই অকৃত্রিম বাংলা গদ্যের আর-একটি নিদর্শন রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। ১৮০১ সালে প্রকাশিত এই বইখানি রচিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। রামরাম নিজে ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত ছিলেন, স্বভাবতই তাঁর রচনা কিছু অলংকৃত ; সংস্কৃত শব্দেরও অপ্রতুল নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে বানান সম্বন্ধে রামরাম সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। এ যে তাঁর অজ্ঞতা—সে কথাও বলা যায় না। খুব সম্ভব উচ্চারণগত বানানের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁর দুঃসাহস উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু রামরাম বসু প্রধানত নিন্দিত হয়েছেন তাঁর রচনায় অতিরিক্ত আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগের জন্যে। এই নিন্দাবাদ করেছেন কোন্ দল ? যাঁরা প্রধানত বাংলাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে নিয়ে তার থেকে ফার্সী শব্দের বৈদেশিক প্রভাব মুছে ফেলতে

চেয়েছিলেন—তাঁরাই। এ ছাড়া সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবেও রামরাম বসুর বই যে পরবর্তী সমালোচকদের কাছ থেকে সুবিচার পায়নি—এ সম্পর্কেও সন্দেহ নেই।

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আসলে কিন্তু ফার্সীমূলক নয়। যে-সমস্ত ফার্সী শব্দ এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, তারা তৎকালচলিত স্বাভাবিক প্রয়োগ। 'ওফাত' 'মোরচাবন্দি' 'আঞ্জাম' 'সরবরা' 'শওগাত' বা 'খালিশা দাখিলের' অকৃপণ প্রয়োগ রামরাম বসুর মুসলমান-প্রীতির পরিচয় দেয় না। এই বইতে একদিকে যেমন 'তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরের যে বক্রি কর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কর্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে'—অন্যদিকে তেমনি 'সে দিবস এবং ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগনস্পর্শীয় প্রলয় অনলাকার হইল'—পাশাপাশিই রয়েছে। অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতীর মধ্য দিয়েও রামরাম বসুর ভাষা লোক-সংযোগ হারায়নি।

পরিবর্তনটা এল এর পরে। ফার্সীনবীশদের জায়গা দখল করতে লাগলেন সংস্কৃতনবীশের দল। উইলিয়ম কেরী নবদ্বীপ ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে যে-সমস্ত পণ্ডিত আমদানি করেছিলেন, তাঁরা ক্রমশই সচেতন ভাবে বাংলা গদ্য থেকে ফার্সী শব্দকে বিদায় করতে সচেষ্ট হলেন। কারণ তখন ইস্‌লামিক শাসনের সূর্য অস্তমিত, ইংরেজ ক্রমশ মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নতুন রাজার অনুগ্রহে পণ্ডিতেরা আর্য ভাষার পুনরুদ্ধারে পরমোৎসাহে মনোনিবেশ করলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা পুরুষ। তাঁর কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইচ্ছে করলে চল্‌তি ভাষায় কী আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ গদ্য রচনা করতে পারতেন, তার নিদর্শন তিনি রেখেছেন। কিন্তু আসলে মৃত্যুঞ্জয়ের দীক্ষা ছিল সংস্কৃতে। যে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় তিনি বিশ্ববঞ্চকের এমন মনোরম সংলাপ লিখতে পেরেছেন, সেই বইতেই তাঁর সংস্কৃতঘেঁষা ভাষার নমুনা এই রকম :

'তাঁহার পুত্র বীরকেশরী নামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো পথ ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিতনসুন্দর ইন্দীবর কৈরব কোরক সুন্দরীমুখ মনোহরান্দোলিত্যোৎফুল্ল রাজীব নির্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসানসময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্য-জনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন।'

দেখা যাচ্ছে 'তাঁহার' শব্দটি গোটা কয়েক ক্রিয়াপদ এবং কয়েকটি বিভক্তি-চিহ্ন বর্জন করলে এ ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। 'মোরচাবন্দি' 'শওগাত' বা 'আঞ্জামের' যুগ

শেষ হয়ে গেছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' যে খাঁটি বাংলা অন্বয় দেখা গেছে, রামরাম বসু যে বাংলাকে উচ্চারণানুগ পদ্ধতিতে রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং শব্দ ব্যবহারের উদার দানছত্র খুলে দিয়েছিলেন, তাও এখানে সংকুচিত। বস্তুত, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদির 'চল্‌তি' বাংলা লেখা কিছুটা বৈচিত্র্য সম্পাদন মাত্র, তাঁরা সচেতন ভাবেই বাংলা গদ্যের গোত্রান্তর করে চলেছিলেন। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র অল্প পরবর্তী রাজীব মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' বইতেই এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে।

এই প্রতিক্রিয়ার আরো ভালো নিদর্শন পাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থটিতে। গোঁড়া রক্ষণশীল ভবানীচরণ সে-যুগের দিক্‌পাল সাংবাদিক। তিনি বিচিত্রমুখী লেখক—তখনকার বাবু সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আক্রমণ করে কয়েকটি রস-রচনাও তাঁর আছে। এই সমস্ত রস-সৃষ্টিতে ভবানীচরণ চল্‌তি শব্দ এবং লৌকিক রীতি আশ্রয় করেছেন, কিন্তু সে কেবল 'প্যারডি' করবার জন্যে। ফার্সী এবং বিদেশী শব্দ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী ছিল, 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে:

"বি. প্র. ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন, যথা—কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি ক-কার হইতে ক্ষ-কার পর্যন্ত এবং ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই, তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না, স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না। যথা—' এই বলে ভবানীচরণ প্রায় দুশো শব্দের তালিকা দিয়ে তাদের পরিহার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এই শব্দ-তালিকায় 'কল, কায়দা, কিনারা' থেকে 'জঙ্গল' 'ঠাণ্ডা' 'হাওয়া' পর্যন্ত বাদ পড়েনি! এমন কি 'ভিতর' শব্দও তাঁর মতে ভদ্রজনের ব্যবহারযোগ্য নয়—তিনি তার প্রতিশব্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন: 'মধ্য, মধ্যস্থল!' একমাত্র যে-সব ফার্সী ও ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ অপ্রাপ্য, তাদেরই তিনি নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করতে বলেছেন—তাঁর মতে এগুলো 'বিষয়-কর্মনির্বাহার্থে কিম্বা হাস্যপরিহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে'দোষ নেই!

ভবানীচরণের মনোভাব অবশ্য গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদেরই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। কিন্তু সাধারণভাবে বাঙলা দেশের লেখকেরা যে সংস্কৃতায়নের দিকেই ঝুঁকেছিলেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। এর ফলে বাংলা গদ্যের সর্বাঙ্গীণতা ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। নবজাগ্রত কলকাতা যেমন পল্লী-বঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছিল —বাংলা গদ্যরীতির এই নবীন গতিও তেমনি একান্তভাবে বিদগ্ধ-কেন্দ্রিক ও নাগরিক হয়ে দাঁড়ালো।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে বৃহত্তর দেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল। বিদ্যাসাগর পণ্ডিতী বাংলাকে অনেকখানি সরল ও সুষমামণ্ডিত করেছিলেন—গদ্যের মধ্যে কাব্যের সুরভিসঞ্চার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনিও এই ভাষারই অনুবর্তী। তা সত্ত্বেও তাঁর রচনার সরলীকৃত রূপ পণ্ডিতদের ভালো লাগেনি। সহজবোধ্য ভাষায় কিছু লেখা হলেই সংস্কৃতপন্থীরা ব্যঙ্গ করে বলতেন : 'এ যে সাগরী ভাষা হয়েছে—পড়লেই বোঝা যায়!'

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। সেজন্যে তাঁকে 'শবপোড়া মড়াদাহ' বলে গালও খেতে হয়েছে। কিন্তু ফার্সীমিশ্রিত বাংলা গদ্যের প্রতি তাঁরও কতখানি বিরাগ ছিল, বঙ্গদর্শনে তাঁর গ্রন্থ-সমালোচনায় তার পরিচয় আছে। জনৈক মুসলমান লেখকের রচনাকে তিনি এই বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন যে, এই লেখকের ভাষায় পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নেই! আসলে ইংরেজোত্তর কালের বাঙালী লেখকেরা বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলেই ধরে নিয়েছেন, আর্যত্বের গৌরব-চেতনার প্রভাবে তাঁরা এ-কথা ভাবতে চেষ্টা করেন নি যে বস্তুত বাঙালী একটি মিশ্র জাতি এবং তার ভাষার প্রাণশক্তিও এই মিশ্রণ-প্রভাবেই সমুদ্ভূত।

এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অন্যত্রও ঘটতে শুরু করেছিল। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' বা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' যে সামগ্রিক মাতৃভাষার সন্ধান মিলেছিল—তা ক্রমশ দ্বিধাবিভক্ত হল। বাঙলাদেশে জন্ম নিল এক অপূর্ব মুসলমানী ভাষা, যার নমুনা হল : 'পরহেজগার হয় যদি বখিল নাদান!' ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যেরও সৃষ্টি করল কিনা—সে সম্পর্কে এখানে কোনো মতামত দেওয়া সঙ্গত হবে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে বাংলা গদ্যের এই শুদ্ধীকরণ—তার শক্তি বৃদ্ধি তো করেইনি, বরং জাতি হিসেবে তাকে দুর্বল করেই ফেলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল, আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজি এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা রীতি তাতে আরো সমৃদ্ধি আর সূক্ষ্মতা লাভ করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে, আজও তা সমান্তরাল সরল রেখার মতোই চলছে। কলকাতার সঙ্গে বাঙলার গ্রামের মতো, এই সংস্কৃতে শুদ্ধীকৃত বাংলার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার মিলন দূরে থাক—তার ব্যবধান বোধ হয় বেড়েই চলেছে। আজ যখন বাঙালী লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে, তখন সেই অভিযোগের পেছনে শুধু নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়—দেড়শো বছর আগে বাংলা গদ্যের নব্য-বিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাটাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

'ছিন্নপত্রে'র রবীন্দ্রনাথ

যে কোনো মানুষকে বোঝবার পথে চিঠিপত্রের ভূমিকা অপরিহার্য। একটি সমগ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে এই চিঠিগুলো কুঞ্চিকার কাজ করে। এদের মাধ্যমে মানুষের দার্শনিক এবং লোকব্যবহারগত দ্বৈত সত্তারই সন্ধান মেলে। তাই রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করতে হলে "ছিন্নপত্র", "ভানুসিংহের পত্রাবলী" এবং "চিঠিপত্র" একেবারে প্রাথমিক পাঠ। "য়ুরোপ যাত্রীর পত্র" একটু আলাদা জাতের—ওখানে রবীন্দ্রনাথের চোখে সমালোচকের দৃষ্টি এবং ওগুলো পত্রাকারে প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গেলে আমাদের প্রধানত বাকী তিনখানির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

এ-দিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র জনপ্রিয়তা যেমন বেশি, তার গুরুত্বও তেমনি অসামান্য। এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত —মোট দশ বছর ধরে এরা রবীন্দ্রনাথের ডায়েরীর কাজ করেছে। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র আসল যুগ শুরু হয়েছে ১৮৯১ থেকে—বিলেত থেকে ফিরে এসে পতিসরে জমিদারী তত্ত্বাবধানের পর্বে।

সময়টা লক্ষ্য করবার মতো। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ—জীবনের পূর্ণ বসন্ত—কাব্যেরও তাই। মানসী, সোনার তরী আর চিত্রার কাল—ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ।

একজন বিদেশী সমালোচকের লেখায় পড়েছিলাম, ত্রিশোর্ধ এবং অনুত্তীর্ণ চল্লিশ—যে কোনো লেখক বা শিল্পীর জীবনের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণ—একদিক থেকে সংকটক্ষণও বটে। প্রথম যৌবনের সহজ উচ্ছল নির্ভাবনা তখন পরিণত বুদ্ধির আবির্ভাবে শাসিত, অথচ জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ রূপটিও তখন পর্যন্ত আয়ত্ত হয়নি—মনের মধ্যে একটা নীহারিকার পালা চলছে। এক পা অতীতে, আর এক পা ভবিষ্যতের মধ্যে। বর্তমানটা আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ এবং ভবিষ্যৎটা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।

খুব সম্ভব কথাটা ঠিক। অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্যটি লক্ষণীয়।

'ছিন্নপত্রে'র কালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই অনিশ্চয়তার সুরটি বিশেষ করে বেজে উঠেছে। 'মানসী' একদিক থেকে যন্ত্রণার কাব্য। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হতাশা-জর্জর শূন্যময়তা—অন্যদিকে চলতি রাজনীতির ওপরে সুকঠিন ব্যঙ্গের আঘাত —'মানসী'র ভাবরূপকে মোটামুটি চিহ্নিত করে দিয়েছে। 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আত্মস্থ—দেহগত প্রেম-সম্পর্কিত তিক্ততার স্তর পার হয়ে সৌন্দর্য-সাধনার মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ, সুগভীর জীবন-প্রীতিও অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত—তবু 'সোনার তরী'র ফলশ্রুতি হল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'চিত্রা'র ঘাটে সম্পূর্ণ উত্তরণের পূর্ব পর্যন্ত 'তরল-অনল' ঝলসিত গোধূলিবর্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে এক অনিশ্চিত রূপাভিসার।

উত্তর-তিরিশ এবং অনাগত-চল্লিশ : 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথের এই গোধূলি-মননের সংকেত।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই চাঞ্চল্য-বিরোধী। 'বিধাতার কাছে যাদের অনেক বাকী, খালি দৌড় লাগিয়েই যে তাদের দেনা' শোধ হয় না—এ-কথা বহুবার, বহুভাবে তিনি বলেছেন। এ নিয়ে দেশের সঙ্গে নানা উপলক্ষে তাঁর মতান্তর এবং মনান্তর ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের যৌক্তিকতা নির্ণয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র উপক্রমণিকায় কথাটি স্মরণ রাখবার প্রয়োজন আছে।

দেশে তখন উগ্রপন্থী রাজনীতির পদক্ষেপ। মহারাষ্ট্রে টিলকের বৈপ্লবিক আবির্ভাব, বাঙলা দেশে অরবিন্দ ঘোষ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো সমন্বয়ী নেতারা তখন অস্তাচলমুখী—রাজনীতির অগ্নিবর্ণ মেঘের আড়ালে বিপ্লববাদের বজ্র প্রচ্ছন্ন। বুঝতে অসুবিধা হয় না—দেশের এই রক্তসন্ধ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতা ঘটেনি। রক্ষণশীলদের সাবধানী পদক্ষেপ যেমন তাঁর ভালো লাগেনি, তেমনি দেশপ্রেমের অতি-প্রাথর্যও তাঁর অশুভ-সম্ভাবনার মতোই মনে হয়েছিল।

তাঁর মন চাইছিল মুক্তি—কোনো প্রত্যয়ের নিবিড় আশ্রয়, সন্ধান করছিল কোনো আত্মস্থতার একান্ত অবকাশ। সেই সুযোগ এল এই পদ্মার আহ্বানে :

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখে খররৌদ্র তাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল···সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

পদ্মার জল, দূরান্তবিস্তৃত প্রকৃতি আর বাংলা দেশের চিরন্তন প্রাণের সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ কী পেয়েছিলেন—এই কথাগুলি তার সাক্ষ্য।

জমিদারী-পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে বাঙলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর নিকটতম পরিচয়। পতিসর, শিলাইদহ কিংবা সাজাদপুরের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলি—লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো ফেনোচ্ছ্বসিত পদ্মা—আর সন্ধ্যাতারার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশাল চর,

এরাই রবীন্দ্রনাথকে বহু-বাঞ্ছিত একটি আশ্রয় এনে দিয়েছিল, দিয়েছিল নিজের অনিশ্চিত মনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-সাধনার একটি সম্পূর্ণ তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন, অন্য দিকে দেশের একটি বাস্তব রূপের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটছে। মানবিক প্রেমের সীমা-সংকীর্ণতাকে অনন্ত রূপ আর প্রেমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি; বেদের টোল, গ্রাম্য পোস্ট মাস্টার, নব-বধূর শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা কিংবা মাস্তুল ঠেলার খেলায় শিশু-মনের অভিব্যক্তিতে 'ছোট সুখ ছোট দুঃখ' কল্লোলিত একটি বাঙলা দেশের পরিচয় দিচ্ছেন তিনি—আবার বিক্ষুব্ধ-পীড়িত চিন্তা-চেষ্টাগুলোর হাত থেকে প্রকৃতির কাছে এইভাবে তাঁর অপূর্ব আত্মসমর্পণ ঘটছে:

"একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারিনে। একদল আছে তারা ছট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছিনে কেন', আর একদল ছটফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছিনে কেন'—মাঝের থেকে জগতের কথাটা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে। মাথাটা জানালার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ-হস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল-ছল শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়।'" (ছাব্বিশ)

এই জগতের কথা, অন্তরের কথা আর মানুষের কথাকে আবিষ্কার করবার বাসনা 'ছিন্নপত্রে'র ছত্রে ছত্রে। নাগরিক জীবন, তার বিচিত্র সমস্যা, তার কথা আর কোলাহল—এগুলো এখন রবীন্দ্রনাথের কাছে সুদূরের দুঃস্বপ্নের মতো। যে তীব্রতম অতৃপ্তির তাড়নায় রোম্যান্টিক মন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অসংলগ্নতাগুলির কাছ থেকে নিজেকে অপসৃত করে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে একটা সামগ্রিক তাৎপর্য এবং সৌন্দর্যের সন্ধান করে, পদ্মার অসীমব্যাপ্ত চরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে 'ছিন্নপত্রে' তার উপলব্ধিটি এই রকম:

"আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলেছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে; সেখানে এই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ—এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।" (উনচল্লিশ)।

জীবনপারের এই দৈনন্দিন তুচ্ছতার ক্লান্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয়ের সন্ধান করছেন—হৃদয়বিদারী এক মহা-সঙ্গীতের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন তিনি। সে সঙ্গীত এই লোক-ব্যবহারের সীমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে, তার বিপুল বিপ্লাবন ছোটখাটো সংশয়গুলিকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,—সীমাহীন আনন্দের মধ্যে সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই আনন্দ, সেই বিশ্বরাগিণী 'সোনার তরী'তে অস্ফুট গুঞ্জন তুলেছে, 'ছিন্নপত্রে' তার জন্মপূর্ব বেদনা।

পদ্মার জল, নদীর ঘাট, বালুর চর, ছোট ছোট গ্রাম, সাধারণ মানুষ—এরা কেউই এখন আর বিচ্ছিন্ন সত্তায় পর্যবসিত নয় ; একটি অখণ্ড উদার আনন্দময়তার মধ্যে এক অচ্ছেদনীয় যোগসূত্রে তারা একসঙ্গে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির এই কাব্য পড়তে পড়তে আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের মন উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে বিমুখ হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে, আধুনিক উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রই হল নাগরিকতা ; তার কাহিনী-ক্ষেত্র কোনো দূর-গ্রামের পটভূমিকে আশ্রয় করেও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি—তার জীবন বিচার এবং বিশ্লেষণের যে প্রয়াস—সমীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটি স্পষ্টতই নাগরিক। "কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস ; কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে-নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে, তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে।" সুতরাং এ উপন্যাসের ক্ষেত্র নয়,—মনস্তত্ত্ব নয়—সাংসারিক জীবনের সামান্যতম বস্তুগুলিকে ঘেঁটে "বিপর্যয় নথি" সৃষ্টি করবার অবসরও নয়। বরং "বাংলায় যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম—তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।" (চুয়াল্লিশ)

রূপকথা লিখবার এই আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্তি পেয়েছে "সোনার তরী"র কবিতা 'বিম্ববতী'তে—স্নো-হোয়াইটের বাংলা সংস্করণে। কিন্তু পদ্যে রূপকথা না লিখলেও রবীন্দ্রনাথের আকুলতা রূপায়িত হয়েছে তাঁর এই পর্বের ছোট গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলো একদিকে যেমন বাঙলা দেশের আন্তর-সত্তার নবতম আবিষ্কৃতি, অন্যদিকে প্রকৃতির এই মহাকাব্যে তারা যেন এক-একটি শ্লোক। 'বেশ ছোট নদীর কলরবের মতো ; ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাটো কথাবার্তার মতো ; বেশ নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘন ছায়া এবং সর্ষেখেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়, অনেকখানি আকাশ আলো

নিস্তব্ধতা এবং করুণায় পরিপূর্ণ। মারামারি, বোঝাবুঝি, কান্নাকাটি, সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহ-বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের নয়।"

লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পগুলি এই নিস্তব্ধতা আর করুণা দিয়েই ছাওয়া। স্বপ্ন, গীতিকাব্য আর প্রচ্ছন্ন বাঙলা দেশের বেদনা দিয়েই এর ভাববৃত্ত রচিত। 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় পর্বের যখন তির্যক সমস্যা আর মনস্তত্ত্ব এসে ভিড় করেছে—তখন তিনি নাগরিক, শিলাইদহ-পতিসর-পদ্মা-নাগর-ইছামতীর কাছ থেকে অনেকখানি দূরে।

প্রকৃতির বিশাল রাজ্য যেমন এক বিচিত্র রূপজগৎ—তেমনি এখানে যদি কোনো বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করতে হয়—তা হলে সে হল "আরব্য-উপন্যাস"। শহরের বাস্তবতা-ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক টানা-পোড়েন নয়—এখানকার এই "প্রাসাদে মানুষের হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি করা"। আর তা যদি না হয়—তা হলে প্রশান্ত নির্জন দুপুরে প্রকৃতির সঙ্গে মন মিলিয়ে দিয়ে 'পোস্ট মাস্টারে'র গল্প লেখা। "আমি লিখেছিলুম এবং আমার চারদিকে আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এইরকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে অল্পই আছে।" (একশো উনিশ)

'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে আগামী জীবনের পূর্ণতর পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করেছেন। এ যেন তাঁর ধ্যানের অবকাশ, তাঁর আত্মোপলব্ধির লগ্ন। 'মানসী-সোনার তরীতে' সেই উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি—কিন্তু খণ্ড-চেতনা থেকে যে মহাচেতনার দিকে তিনি ক্রমাগ্রসর—এই চিঠিগুলির মধ্যে তার নিভৃত স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর কবিতায় ভবিষ্যৎ রূপাভিসারের প্রথম চরণধ্বনি—রহস্যময় কাণ্ডারীর সঙ্গে অপরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা; আর ছোট গল্পগুলি তাঁর সেই সামগ্রিক উপলব্ধির এক একটি স্বসম্পূর্ণ শ্লোক। কিন্তু বুদ্বুদ যেমন স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তার অঙ্গ, স্বয়ংসিদ্ধ শ্লোকগুলির সমাবেশে যেমন মহাকাব্য—'ছিন্নপত্রে'র টুকরোগুলোও তেমনি বিরাটের খণ্ডাংশ। এরা একসঙ্গে মিশে গিয়ে আগামী দিনের যে অখণ্ডতাকে রচনা করবে—'ছিন্নপত্রে' তারই পূর্বভাষণ। উত্তর-তিরিশ থেকে অনাগত-চল্লিশের নীহারিকা-কাল।

আর একটা কথা। অসংখ্য কবিতা এবং ছোট গল্পের যে প্রাথমিক অঙ্কুরগুলো 'ছিন্নপত্রে' ইতস্তত বিকীর্ণ—তাদের ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।*

* সম্প্রতি 'ছিন্নপত্রে'র পরিপূর্ণ রূপ 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় স্পষ্টতর হবে।

রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন

॥ ১ ॥

মহাকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না। তাই মধুসূদন সম্পর্কে যেমন তিনি সুবিচার করতে পারেননি, তেমনি নিজের লিরিক-কল্পনাকে কটাক্ষ করে সকৌতুকে বলেছিলেন, 'পুরাণ চিত্র, বীর চরিত্র অষ্ট সর্গ, কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড নয়ন-খড়্গ।' এই কৌতুক তাঁর নাটককেও স্পর্শ করেছে। গীতি-কবিতা তাঁর মহাকাব্য সৃষ্টির যেমন অন্তরায় হয়েছে—তার নাটককেও সেইভাবে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধারায় নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা এবং মায়ার খেলার পর্যায় পার হয়ে তাঁর নাট্যকার সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল রাজা ও রানীতে। এর কিছু আগে অবশ্য নলিনী নামে আর একটি নাট্য-চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু রচনাগত ও বিষয়গত ভাবে সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অতএব গীত-প্রধানা নাটকগুলি বাদ দিলে রাজা ও রানী থেকেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু হল।

পরবর্তীকালে রাজা ও রানীও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রীতি লাভ করেনি। "এর নাট্য-ভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অতি শোচনীয়রূপে অসঙ্গত।" তা হলেও নাটকের যেটুকু সার্থকতা রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তা এই : "যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রমাণ করবার জন্য পর-জন্ম পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়নি, ইহ-জীবনেও কখনো কখনো সে-কাজ তিনি করেছেন। তাঁর সেই সমালোচনা সর্বত্র শোভন হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। আটাশ বছর বয়েসের লেখা রাজা ও রানী আটাত্তর বছরের কাছে উপযুক্ত মূল্য পায়নি। যে-কোনো নিরপেক্ষ পাঠকেরই মনে হবে রাজা ও রানী রীতিমতো উঁচুদরের ট্র্যাজেডি। অথচ লেখকের নিজের এই অন্যায় মন্তব্যটিই অধিকাংশ সমালোচকের কাছে নাটকটি সম্পর্কে অদ্ভুত একটা কুসংস্কার তৈরি করে রেখেছে।

কিন্তু এই অবিচার রবীন্দ্রনাথ কেন করলেন ? কেন নিজের একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর এই অভিযোগ ? এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া গেলেই তাঁর নাট্যসৃষ্টির বিবর্তন রহস্যটিও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

॥ ২ ॥

রাজা ও রানী শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির ট্র্যাজেডি। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব মহিষী সুমিত্রার রূপে উন্মত্ত, অন্তঃপুরের বাইরে তাঁর কোনো আনন্দ নেই। ফলে রাজকার্য উপেক্ষিত, রানীর কুটুম্ব কাশ্মীরী অমাত্যদের পীড়নে প্রজারা মৃতকল্প। রাজা নির্বিকার। কিন্তু সুমিত্রার অসহ্য হয়ে ওঠে: "অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।" প্রজাদের রক্ষার প্রয়োজনে এবং রাজার মর্যাদা বাঁচাতে সুমিত্রা পলায়ন করেন। বিক্রমের কামনার আদিমতা অন্ধ হিংস্রতার মধ্য দিয়ে উন্মত্ত হয়ে বেরোয়। সেই হিংসার তাণ্ডবে বীর কুমারসেনের শোচনীয় আত্মবলি, সুমিত্রার মৃত্যু।

পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে ইলা-কুমারসেনের কাহিনী এমন অসহ্য অতিরিক্ত নয়—বরং পশ্চাৎভূমিরূপে কিছু নাট্যিক সার্থকতা তার আছে। লিরিক অবশ্যই আছে, কিন্তু তারও প্রাচুর্য একান্ত দুঃসহ নয়। তা হলে রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ কেন?

সাধারণ ভাবে নাটক হল ঐকতান—তার পূর্ণ ফললাভ সমগ্রতায়। কিন্তু বা বাঁশির সুর—তা একক। যিনি বাঁশিতে নিজের নিঃসঙ্গ সুরটিকে বিকীর্ণ করতে চান, ঐকতান নিয়ন্ত্রণ করবার প্রবণতা সর্বক্ষেত্রে তাঁর না-ও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথেরও ঠিক তাই হয়েছে।

এই কারণেই রাজা ও রানীর বিচিত্র চরিত্র, তার বিভিন্নমুখী ঘটনা এবং আবেগের সংঘাত, উত্তরকালে একক সুরপন্থী রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। রস-সমন্বয়ের বিস্তৃত পটভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তিনি রসৈকতার সংকীর্ণ ক্ষেত্রই নির্বাচন করে নিয়েছেন; আর তারই ফলে সমগ্র মানুষের 'ধূসর-প্রসর রাজপথ' ছেড়ে ধীরে ধীরে ভাব-সর্বস্বতার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাংকেতিকতার জগতে, মিস্টিক্ অনুভূতির সূক্ষ্মতায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে একটু পরে আমরা প্রবেশ করব।

বহির্মুখ সংঘাতধর্মী নাটক এবং একক ভাবের পুষ্পিত উচ্ছ্বাস—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব সব চেয়ে করুণ হয়ে ফুটেছে রাজা ও রানীর পরবর্তী সৃষ্টি 'বিসর্জনে'। এই বহুখ্যাত নাটকটির প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব হল যে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র পরে এইটিই সবচেয়ে বেশি অভিনীত হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশিবার সে অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে। অভিনয়ের দুর্বলতা বা মঞ্চসজ্জার দৈন্যই মাত্র তার জন্য দায়ী নয়, এই ব্যর্থতার কারণ নাটকটির মধ্যেই গুহানিহিত।

হিংসাশক্তির সঙ্গে প্রেমশক্তির সংঘর্ষ এবং হিংসার বিসর্জনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা—নাটকের বক্তব্যটি এই। রাজর্ষি উপন্যাসের বিস্তৃত জটিল কাহিনীর মধ্য থেকে ভাবের এই অংশটুকুই রবীন্দ্রনাথ সযত্নে আহরণ করে নিয়েছেন। নাটকের এই উদ্দেশ্যটি প্রথম থেকেই অতিমাত্রায় স্পষ্ট—চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে বক্তব্যকে সিদ্ধান্তরূপে লিপ্যন্ত

করা হয়নি, প্রতিটি চরিত্র উদ্দেশ্যকে পরিক্রমা করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, যে রঘুপতি এমন অসামান্য বিরোধী শক্তিরূপে সংকেতিত হয়েছিলেন, তিনি প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে দেবার কাজে নাস্তিকের ভূমিকা নিয়েছেন, 'হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা জলে স্থলে' ইত্যাদি উক্তিতে ডারউইনের তত্ত্বে পৌছেছেন, 'মহা মিথ্যা'র সিদ্ধান্তে তাঁকে বৈদান্তিক বলে মনে হয়! গুণবতীর চমৎকার চরিত্রটি কলঙ্কিত হয়েছে ধ্রুবকে হত্যা করবার অহেতুক (তাঁর বিদ্বেষের কোনো পূর্ব ভূমিকা নেই) পৈশাচিক চক্রান্তে। মোগল এবং নক্ষত্র রায়ের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের বানপ্রস্থের সংকল্প রূপ নেয় নিছক কাপুরুষতায়; রাজার সিংহাসনে বসে যিনি অনুজকে নির্বাসন দিতে পারেন—সেই রাজাই কেমন করে মোগলের পরাধীনতাকে ভ্রাতৃপ্রেমের নামে ত্রিপুরাকে উপহার দেবেন—সে-কথা অনুমান করা কঠিন হয়!

কিন্তু এগুলি বাইরের প্রশ্ন। সব চাইতে বড়ো কথা এই যে, একমাত্র ভাবের একক সুরটিকে এই নাটকে ধরতে চেয়েছিলেন লেখক, কিন্তু প্রথাসিদ্ধ নাট্যরীতিকেও তিনি বর্জন করতে পারেননি। তাই এর নাট্যিক সংলাপ রাজা ও রাণীর মতো (কিছু আতিশয্য সত্ত্বেও) যথাবিন্যস্ত হয়নি—ঘটনার মৃত্তিকাভূমি ছাড়িয়ে বার বার ভাবাবেগে ঊর্ধ্বচারী হয়েছে। জনতার দৃশ্যের স্থূলতা নাটকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়—অকারণেই তারা রসহানি ঘটায়। অর্থাৎ ভাবধর্মিতার সঙ্গে বাস্তবতার অন্বয়-সাধন এতে হয়নি। এই সামঞ্জস্যহীনতার জন্যই বিসর্জনে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ এবং সমুন্নত বক্তব্য সত্ত্বেও এর নাট্যায়ন সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। অপূর্ব লিরিকের অসামান্য নৈপুণ্যে পাঠক এক ধরণের পরিতৃপ্তি পান, কিন্তু দৃশ্যকাব্যরূপে এর উপস্থাপনায় দর্শক অবচেতনভাবে এই ফাঁকটুকু অনুভব করতে থাকেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই প্রচলিত নাটকের বাস্তবভূমি থেকে, চরিত্র সংঘাত ও ঘটনার দ্বন্দ্বময়তা থেকে, একক ভাব—ঐক বক্তব্যের দিকেই তিনি অগ্রসর হলেন। বস্তুর প্রতি আনুগত্যে যে ভাবোচ্ছ্বাসকে তাঁকে বার বার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযত করতে হয়েছে, রাজা ও রানীতে এবং বিশেষ-ভাবে বিসর্জনে, তাকে নিরঙ্কুশ মুক্তি দেবার সুযোগ তিনি লাভ করলেন তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে। তাঁর সেই মুক্তির আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে পড়ল চিত্রাঙ্গদায়।

অবলম্বন 'মহাভারত'—কিন্তু কাহিনীর একটি সূক্ষ্ম সংকেত ছাড়া মহাকাব্যের কবির কাছে গীতি-কবিতার কবির আর কোনো আনুগত্য নেই। "এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্র্য-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ

লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়।" অতএব "এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী।"

অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে নাটক রচনা করবার বাসনাই এখানে মৌল প্রবণতা নয়; মহাভারতের এই মহাবীর্যবর্তী নারীটির চরিত্রমহিমা পরিস্ফুট করবার জন্যও নাটক লেখা যেত—কিন্তু সে উদ্দেশ্যের দিক দিয়েই লেখক যাননি। ভাবটিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য—চিত্রাঙ্গদা তাঁর প্রকাশ প্রতীক (Expressive Symbol) মাত্র। অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা ছাড়াও অন্য যে-কোনো প্রতীক তিনি আশ্রয় করতে পারতেন, অন্য যে কোনো জৈব উদ্দেশ্যমুক্ত চারিত্র্য-শক্তি দীপ্ত কণ্ঠে তিনি নাটকের মূল কথাটি ব্যক্ত করতে পারতেন:

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

চমৎকার রোম্যান্টিক কল্পনার বিস্তারে, পূর্ণ যৌবনের উজ্জ্বল প্রতিভায় ও প্যাশানের উত্তাপে চিত্রাঙ্গদা অপরূপ। টমসনের ভাষায়:

"The play has gained by its lucky birth in the full exuberence of his song-season. It is almost perfect in unity and conception, magical in expression ; a nearly flawless whole, knit toogether by the glowing heat of inspiration."

ভাব এখানে মুখ্য, লিরিক নির্বাধ। লেখকের আনন্দ চিত্রাঙ্গদার প্রতি পংক্তিতে বিচ্ছুরিত—পাঠক পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই আনন্দের আমন্ত্রণে যোগ দিতে পারেন। এ কেবল সৃষ্টির আনন্দই নয়—প্রচলিত নাট্যকলার বস্তবন্ধন থেকে মুক্তির উল্লাসও এতে অনুভব করা যায়।

সেই উল্লাসই তরঙ্গিত হয়েছে বিদায় অভিশাপে, দেখা দিয়েছে মালিনীতে। মহৎ প্রেম যে মহৎ ক্ষমাতেই নিজেকে প্রকাশ করে, সেইটিই দেখানো হয়েছে কচের

চরিত্রে। বিসর্জনের ভাববন্ধ নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে মালিনীতে, ক্ষেমঙ্কর আত্মিকভাবে রঘুপতির সঙ্গে সম্বদ্ধ, সুপ্রিয়র মধ্যে জয়সিংহের ছায়াভাস, মালিনী পরোক্ষ অপর্ণা। কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো, প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে ঐক্যভাবাশ্রয়ী কবিসত্তার দ্বন্দ্ব বিসর্জনের মতো এখানে প্রকট হয়নি ; ফলে রঘুপতির মতো হীন চক্রান্তকারীর ভূমিকায় নেমে ক্ষেমঙ্করকে কলঙ্কিত হতে হয়নি—মালিনী যখন বলে, 'মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে'—তখন নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ক্ষেমঙ্করের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়। অবশ্য নাটকীয় সংঘাতে মালিনী কিছু দুর্বল।

রাজা ও রানী বিসর্জনের অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা স্বমহিম ক্ষেত্রে স্থিত হয়েছে এই কাব্য-নাট্যগুলিতেই। একে একে দেখা দিয়েছে *গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস* এবং *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ*। মহাভারত বা ইতিহাস—কাহিনীগুলি যেখান থেকেই আহৃত হোক, একক ভাবের বিন্যাসই এদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং আখ্যানগত বহিরঙ্গটি প্রকাশ-প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। মধ্যে মধ্যে সুন্দর নাটকীয়তাও এসেছে, যেমন গান্ধারীর আবেদনে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন ও ভানুমতীর চরিত্রে, সতীর শেষদিকে বিনায়কের ভেতর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়গুলিতেও তাঁর এই কাব্য-নাট্যগুলি বিশিষ্ট। টম্‌সন এদের প্রশংসায় মুখর, *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ* অনুবাদ করবার আনন্দে ইংরেজ কবি জন মেস্‌ফিল্ড্ অনুপ্রাণিত। কিন্তু বিভিন্নভাবে সত্যের মহিমা উপস্থাপিত করবার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য নাট্যিক অনুষঙ্গকে অতিক্রম করে এদের মধ্যে কাব্যের প্রতিষ্ঠাই প্রধান হয়ে ওঠে :

"হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছো মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে
চেতনা প্রত্যুষে। পুরাতন সত্য সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি—"

অথবা—

"লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী,
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি

দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্‌ তার পথতলে।
ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্‌ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন—"

পাহাড়ের তুষারশিখর থেকে সোনালী ঈগল ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকাশে—সেখানে কোথাও কোনো বাধা তার থাকে না। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সমতলভূমি থেকে ক্রমেই চূড়ার দিকে উর্ধ্বারোহণ করেছেন ; পেছনে পড়ে থেকেছে দৈনন্দিনতার জনপদ, পার হয়ে এসেছেন জটিল অরণ্যের মনোগহন, তারও ওপরের স্তরে কাব্যের পুষ্পিত উপনিবেশ। তারপর বিবিক্ত তুষারশীর্ষ থেকে আকাশ-যাত্রার অসীমতায়।

রবীন্দ্র-নাট্যের তৃতীয় পর্বে এই নভোমুক্তির ক্রমবিকাশ।

॥ ৩ ॥

চৈতালি-নৈবেদ্যের পথ বেয়ে খেয়া। খেয়ার পরে গীতাঞ্জলি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রই জানেন, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনে এর মধ্যে অনেকখানি বিবর্তন ঘটে গেছে। রূপ থেকে চলেছেন অরূপের দিকে, সীমা থেকে অসীমে, মৃৎভূমি থেকে অধ্যাত্ম-চেতনায়। খেয়া তাঁকে নিয়ে চলেছে অসীমের তটে, গীতাঞ্জলিতে জীবন-বৃত্ত থেকে সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছেন তিনি :

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই, আছি বসে—
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।"

এই বিশ্বানুভূতি থেকেই রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায়ী নাটকের সূত্রপাত ঘটালো শারদোৎসব (ঋণশোধ)। রোম্যান্টিক চেতনা এইবারে মিষ্টিক অনুভূতির মধ্যে

উত্তীর্ণ হল। কাব্য-নাট্যগুলির ভেতরে যে আবেগ তিনি সঞ্চার করেছিলেন—সেগুলি ছিল ব্যক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু শারদোৎসবে সেই ব্যক্তির বন্ধনটুকুও আর রইল না। সমস্ত পৃথিবী শরতের নির্মল নীল আকাশের নীচে, ঝরা শেফালী এবং কাশের গুচ্ছে, বুনো হাঁসের চঞ্চল পাখায় পাখায় আনন্দের ঋণশোধ করছে। এই বিশ্বগত বক্তব্যটিই ধরা দিল শারদোৎসবে। চরিত্র এতে আছে, কিন্তু তারা কতকগুলি সর্বজনীন ভাবের বাহকমাত্র, কায়িক নয়; উপানন্দ, লক্ষেশ্বর, রাজা, সন্ন্যাসী-সম্রাট, ঠাকুরদা, ছেলের দল—এরা সবাই-ই প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে-কোনো মুহূর্তেই আবার তার মধ্যে তারা মিলিয়ে যেতে পারে।

দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা এইবার থেকে লুপ্ত হল। ব্যক্তিসত্তার সীমিত পরিচয় আর রইল না—চরিত্রগুলি হয় বিশ্ব-প্রকৃতি, নয় বিশ্ব-মানবতার এক একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো। সারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এখন থেকে ঘটনাগুলি অভিনীত হতে লাগল। বিশেষ পরিণতি পেলো নির্বিশেষের ভেতরে।

ঘটনাধর্মী এবং বাস্তবনির্ভর নাটক রচনার শেষ চেষ্টা দেখা গেল প্রায়শ্চিত্তে। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নব-রূপায়ণ এই নাটকটি। রাজর্ষি থেকে বিসর্জনে যেমন ভাববস্তুটিকে আহরণ করে আনা হয়েছে, এখানেও তেমনি তুলে ধরা হয়েছে হিংস্র শক্তিমত্তার সঙ্গে প্রেমের সংঘাতের তত্ত্বটি; কিন্তু বিসর্জনের মতো এই নাটকও বিকেন্দ্রিত। ধনঞ্জয় বৈরাগী কাহিনীর বস্তুমুখিতাকে ভাবের দিকে বইয়ে দিয়েছে, নাটক ছড়িয়ে গেছে এক আনন্দময় মুক্তির মধ্যে:

"আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর
ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।"

প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে চুক্তির পালা এইখানেই মিটিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এল সাংকেতিক নাটকের যুগ। অচলায়তন, ডাকঘর, রাজা, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ। নাটকের চরিত্র, সংলাপ, সঙ্গীত, ঘটনা—সমস্তই সংকেতের মধ্যে প্রসারিত হল, ব্যাখ্যা মুক্তি পেলো ব্যঞ্জনায়।

মেতারলিঙ্ক, সীঙ্গ, হাউপ্‌টম্যান (তাঁর রিয়ালিস্ট কিংবা ন্যাচারালিস্ট নাটক নয়—শেষদিকের মিস্টিক্ বইগুলি) কিংবা ঈয়েট্‌সের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ হয়তো আঙ্গিকগতভাবে কিছু প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যগত পার্থক্য অনুসারে সাংকেতিকতার সূত্রও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। তাই আইরিশ কিংবা জার্মান লেখকের মিস্টিক উপলব্ধি ভারতীয় পাঠকের কাছে যেমন

সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের "রাজা" (অরূপ রতন) কিংবা ডাকঘরও ইওরোপের কাছে তাদের সত্যিকারের তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে নি। টম্‌সনের বই থেকে আরম্ভ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পর্যন্ত সমালোচনার বিভ্রান্তির মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্র-মানসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু মন জীবন ও জগতের প্রতি মানবিক দায়িত্বকে কোনোদিন উপেক্ষা করেনি। তুষার-শীর্ষ থেকে ডানা মেলে দেওয়া সোনালী ঈগল সুদূর আকাশের আহ্বানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু অরণ্য-নদী-জনপদের সঙ্গে যে তার রক্তনাড়ীর সংযোগ, সেই কথাটিও সে কোনোদিন ভোলেনি। প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম পক্ষপাত। দিন বদলের পালায় নতুন মানুষের যে দামামাধ্বনি শোনা যাচ্ছে—মৃত্যুর পূর্বেও সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আশীর্বাদ জানাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

তাই উত্তর-পর্বের এই সংকেতধর্মী নাটকগুলিও দু-ভাগে বিভক্ত। বিশ্ব-নটরাজের রঙ্গশালায় ফাল্গুনী ডাক পাঠিয়েছে, মৃত্যু-মুক্তির আহ্বানে অসীমের পথে বেরিয়ে পড়েছে অমল, চোখের আলোর বহির্জগৎ থেকে অরূপের সন্ধানে নিরালোক অন্তরের মধ্যে ফিরে এসেছে সুদর্শনা। আর অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ ও রথের রশি সোজাসুজি জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যার মধ্যে অবতরণ করেছে।

অচলায়তন আর তাসের দেশের বক্তব্য সাধারণভাবে এক, নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার জড়ত্ব থেকে মুক্তি। রথের রশি গণশক্তির বন্দনা। রক্তকরবীতে ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মুক্তধারায় জাতিবৈর এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অচলায়তন, তাসের দেশ, রথের রশি আর মুক্তধারার পটভূমিতে ভারতবর্ষ সংকেতিত, রক্তকরবীতে মোটামুটি ইওরোপ এবং প্রধানভাবে আমেরিকার ছায়াপাত।

তবুও এই নাটকগুলিতে ঘটনা-সংঘাত পরোক্ষ, ভাব-সংঘাতই এদের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্রে, সংলাপে কিংবা ঘটনায় এরা কখনো কখনো রূপকের ব্যর্থতার কাছাকাছি আসে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। হয় ঠাকুর্দা আসেন—নইলে আবির্ভাব হয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর, নাটকীয় বক্তব্য অর্থের সীমা ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনার ভেতরে বিস্তৃত হয়।

রক্তকরবীর কথাই ধরা যাক। আপাত দৃষ্টিতে বইখানিকে খোলাখুলি রূপক বলে মনে হয়—ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের মতো অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। রক্তকরবীর শ্রমিক চরিত্রগুলি, তার সর্দারের দল এবং গোসাঁই—এদের রূপকার্থে চিনে নিতে দেরি হয় না। কিন্তু রাজা? সে নির্বিশেষ—সারা পৃথিবীর ধনতান্ত্রিকতার প্রচণ্ড শক্তিময়তার প্রতীক, রঞ্জন তারই প্রাণসত্তা—যাকে নিজের হাতে সে হত্যা

করেছে ; নারীরূপিনী নন্দিনী এসেছে রাজার নিজের গড়া জাল থেকে আনন্দ আর কল্যাণের মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে।

তাই শেষ পর্যন্ত নাটকের ফলশ্রুতিতে সমাজবাদী শ্রমিক-বিদ্রোহের একটা আপাত রূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেইটিই এর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে না। এমন কি যন্ত্র-সভ্যতা থেকে কৃষি-সভ্যতার মধ্যে ফিরে যাওয়ার ক্রীশ্চান 'মিলোনিয়াম'ও এর অভিপ্রায় নয়। আগামী দিনের নির্দিষ্ট কোনো সমাজ-ব্যবস্থার নির্দেশও রক্তকরবীতে নেই। তা হলে কী আছে ?

"মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল,—
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।"

পৌষের পাকা ফসলে ভরা ক্ষেত এক নির্বিশেষ সামগ্রীর কর্ষণার ভূমি—যেখানে সমস্ত মানুষের ক্ষুধার খাদ্য আনন্দের হিরণ্যে হরিতে অবারিত দিগন্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে তথ্যগত কোনো নিষ্পত্তি পাওয়া যায় না—নিজের ধ্বজদণ্ড ভেঙে দিয়ে রাজারূপ মানবশক্তি যে নব-জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে তা রূপকের বাস্তব-সন্নিহিতি অতিক্রম করে ভাবের ছায়াপথে প্রসারিত।

বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়ার এই প্রয়াস—দেশ-কালের খণ্ডতাকে অখণ্ডের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা, মুক্তধারাতে আরো ভালো করে লক্ষ্য করা যাবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা আগেই বলেছি। এর বস্তুভারে এবং ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জীর দায়ে পীড়িত রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে একান্ত ভাবনির্ভর করে নবজন্ম দিয়েছেন মুক্তধারায়। মুক্তধারা অত্যন্ত উঁচুদরের নাটক। রক্তকরবীর অতিভাষণ এবং রূপক ও সাংকেতিকের মিশ্রণগত বিশৃঙ্খলা থেকে নাটকটি প্রায় মুক্ত। প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক বৃত্ত ভেঙে গিয়ে তাঁর ক্ষমতা-লিপ্সা তত্ত্বরূপ নিয়েছে রণজিৎ নামের ভেতর ; উদয়াদিত্য অভিজিৎ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—কোনো জাতি-ধর্ম-দেশের গণ্ডি দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়নি, তিনি মুক্তধারার সন্তান। অন্ধা শোষণযন্ত্রের বলি কোটি কোটি সুমনের জননী, বিভূতি অর্থে অসাধ্যসাধন শক্তি। উত্তরকূট উত্তরকালের কূটবুদ্ধি সাম্রাজ্যবাদ ; শিবতরাই চির-মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাভূমি প্রাচী-পৃথিবী, ধনঞ্জয় বৈরাগী তারই আত্মিক শক্তি। পশ্চিমী শোষণবাদের নির্মম নিষ্ঠুরতার বাঁধ ভেঙে দিয়ে সমগ্র মানবতার জন্য যে মুক্তধারাকে মুক্তি দেবে, সে সর্ব দেশ-কাল-জাতির সংস্কারমুক্ত এক Universal Man—অভিজিৎ। 'ঐ মহামানব আসে'—সারা পৃথিবীই তার জন্তে অপেক্ষা করে বসে আছে। যে প্রায়শ্চিত্ত নাটক ছিল সূচনাতে মূলত পরিবার-কেন্দ্রিক, তা ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নিখিল মানবতার রূপায়ণে সিদ্ধিলাভ করেছে। এই নাটকের সমাপ্তিও কোনো তথ্যের মধ্যে

গিয়ে বক্তব্য শেষ করছে না, ভৈরবপন্থীদের সঙ্গীতের ধ্রুবপদে এক অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনায় বিচ্ছুরিত হয়েছে।

সুতরাং বস্তুরেখা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কাব্য-নাট্যের লিরিক্ উল্লাসে, তারপর রোম্যান্টিসিজ্‌মের অনির্দেশ আনন্দময়তা থেকে মিস্টিক অনুভূতির ধ্যান-প্রত্যয়ে; জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে অপার দিগন্তে আর দিগন্ত ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অনন্তে—রবীন্দ্রনাট্যধারার বিবর্তনের মূল সূত্রটি এই। বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেই সূত্রটিই মাত্র নির্দেশ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নাটক 'বাঁশরী' সমকালীন সমাজের সঙ্গে বহিরঙ্গগত সম্পর্ক রেখেও ভাবপ্রবণতার মধ্যেই পরিণত।

॥ ৪ ॥

অতএব রাজা ও রাণী রবীন্দ্রনাথের কেন ভালো লাগেনি, সে প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যিনি একক বাঁশির শিল্পী, ঐকতানের আসরে তাঁর তৃপ্তি নেই। আর সেই বাঁশির সুরকে যিনি আকাশের তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান—তাঁর পক্ষে এই পরিণতিই স্বাভাবিক।

তাই শেষ পর্যন্ত রাজা ও রাণীকে তপতী হতে হয়েছে। না হয়ে উপায় ছিল না। আর সুমিত্রার আত্মাহুতিতে মাত্র বিক্রমের অন্ধ হিংস্র কামনাকেই আহুতি দেওয়া হয়নি, পৃথিবীব্যাপী সমস্ত ব্যর্থ-বাসনা ও উদ্দাম জৈবতার প্রতি উচ্চারিত হয়েছে সামগ্রিক শান্তির মন্ত্রবাণী :

> "অদ্য দেবা উদিত সূর্যস্য।
> নিরহংসঃ পিপৃত নিরবদ্যাৎ॥
> পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ
> শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় আসে যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের আর কিছু দেবার থাকে না। তখন তাঁরা অসহায়ভাবে নিজেদেরই পুনরুক্তি করতে থাকেন, আত্ম-অনুকরণের একটা সকরুণ ব্যর্থতা তাঁদের প্রায় প্রত্যেকটি প্রয়াসের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কায়িকভাবে না হলেও সেইখানেই স্রষ্টার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের মতো দু-একটি প্রতিভা ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই এই বেদনাভরা মানস-মৃত্যু আমরা দেখেছি।

সেই জন্যেই, নির্মম হলেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, নির্বাপিত শিল্পীর

দৈহিক মৃত্যুর মধ্যে শোক আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই। তাঁর যা দেবার তিনি তা সম্পূর্ণভাবেই দিয়েছেন, সেই দানের যথার্থ মূল্য যদি থাকে, তা হলে ভাবীকালের কাছেও তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রইল। শিল্পী সেখানে অমর।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু শুধু ক্ষতি নয়, তা এমন একটা ক্ষতি যে সুদূর ভবিষ্যতেও তা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বাঙালীর গড়পড়তা পরমায়ুর হিসেবে তাঁর মৃত্যুকে অকাল-ঘটিত বলব কিনা জানি না; কিন্তু বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর শুধু শতায়ু নয়—তারও চেয়ে বেশি দীর্ঘায়ু হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, নাট্যশালা থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা রস-সাহিত্যের উৎপত্তি এবং প্রগতির ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। দেশ তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। কিন্তু এদিক থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছেন তার তুলনা হয় না। একটি মানুষ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের গণ্ডীর মধ্যেও নিষ্ঠা এবং অধ্য-বসায়ের সাহায্যে যে কী অসাধারণ কীর্তি রেখে যেতে পারেন—সর্বকালের বাঙালীর কাছে ব্রজেন্দ্রনাথ তার উদাহরণ হয়ে থাকবেন। ইংরেজোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রায় সর্ববিভাগকে তিনি যে শৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন, তার মূল্য যে কতখানি তা হয়তো আজও সাধারণ বাঙালী বুঝতে পারবেন না; কিন্তু এ সমস্ত জিনিস নিয়ে যাঁদের দৈনন্দিন কারবার, তাঁরা জানেন, ব্রজেন্দ্রনাথ দিগ্‌দর্শক-রূপে সম্মুখে উপস্থিত না থাকলে কী সীমাহীন অন্ধকারে তাঁদের হাত্‌ড়ে বেড়াতে হত! অজস্র ভুলে ভরা লং সাহেবের ক্যাটলগের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ। অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে পূর্বগামী সাহিত্য-সাধক এবং সাহিত্যের যে পরিচিতি তিনি রচনা করে গেছেন, তা হয়তো বহুতর সংশোধন ও সংযোজনের দাবিও রাখে; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রনাথের কীর্তিকে ভিত্তি করেই বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গবেষণা গঠিত হয়ে উঠবে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বাংলা সাময়িক পত্র' বা 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালায়' তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী শুধু সংকলনমাত্রই নয়। এদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, অনেকের মতো ব্রজেন্দ্রনাথ এগুলিতে শুধু ক্যাটালগই রচনা করেন নি, এই বইগুলিতে তাঁর নির্বাচন এবং নির্ধারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। ধারাবাহিক পঞ্জী নয়—সন তারিখ দলিল চিঠিপত্রের বিবৃতি নয়—এগুলির মধ্য থেকে তিনি এমন ভাবে উপকরণ নির্বাচন করেছেন যে তাদের ভেতর দিয়ে বাঙলা দেশের পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার তো মনে হয়, এক

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পড়লেই বিগত শতাব্দীর বাঙলা ও বাঙালীর সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, একটি সমগ্র লাইব্রেরিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রাণপণে মন্থন করলেও সেই জ্ঞান দুর্লভ্য।

উদাহরণস্বরূপ সংবাদপত্রে সেকালের কথায় তাঁর সংকলিত দুটি প্রসঙ্গ এখানে তুলে দিচ্ছি :

সহগমন ॥—ওলাওঠা রোগে অনেক বাঙালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুক্ত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

[সমাচার দর্পণ, ২২শে এপ্রিল, ১৮২২]

বরযাত্রিকের অবস্থা ॥—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসী রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়ণী গ্রামে মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহাদের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যাযাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢেঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশল ক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এক কালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া কোঁস কোঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্প ভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেম রে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহা ব্যস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাতি পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে ২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক ২ বৈবাহিক বরযাত্রিকদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।

[সম্বাদ কৌমুদী, ২১শে মে, ১৮২৫।]

ব্রজেন্দ্রনাথের আহরিত অসংখ্য প্রসঙ্গ থেকে মাত্র যে দুটি এখানে উদ্ধার করা হল, তা থেকে দেখা যাবে কিভাবে তৎকালীন সমাজ ও বাঙালী জীবনের গম্ভীর এবং সরস দিকগুলিকে ব্রজেন্দ্রনাথ অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে নির্বাচন করেছেন। এই নির্বাচন নিছক তথ্যজীবী ঐতিহাসিকের নয়, গবেষকের সন্ধিৎসাও নয়; চয়নে এবং উপস্থাপনে এদের

মধ্যে একটি সাহিত্যিক মনন, চেতন বা অচেতন ভাবে সক্রিয় থেকেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার সবিনয়ে জানিয়েছেন, তিনি সাহিত্যিক নন। হয়তো নন। কিন্তু তাঁর যে কোনও গ্রন্থের সংকলন এবং বিন্যাসের মধ্যে যে রুচি ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় মেলে তা শিল্পীসুলভ। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ হয়তো কোনোদিনই রসিক-মহলে স্বীকৃতি পাবেন না। কারণ যে কাজ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাতে খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, জনপ্রিয়তার অবকাশ নেই, মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত প্রীতি-নিবেদনও নেই ; এ কাজ শুধু মাত্র সাধকেরই—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই যাঁর শেষ কথা।

অথচ এর চেয়ে অনেক অল্প পরিশ্রম করেই ব্রজেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় হতে পারতেন। নামমাত্র মূলধন সংগ্রহ করে, বাগাড়ম্বরের ঘন ঘটায় গবেষক এবং স্রষ্টার জয়মাল্য নিয়েছেন বাংলা দেশে এমন ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু হাততালির মোহ ছিল না বলেই ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেকে বা দেশকে ফাঁকি দেওয়ার কথা কখনো কল্পনাও করেন নি। তাঁর সত্যনিষ্ঠ মন প্রতিটি জিনিসকে নির্ভুলভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছে। তাঁর উদ্যম এবং ঔৎসুক্যের মধ্যে কোথাও ক্লান্তি ছিল না। প্রতিটি তথ্যকে তিনি বারে বারে যাচাই করে নিয়েছেন, যতক্ষণ নিঃসন্দেহ না হয়েছেন ততক্ষণ তাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। এই প্রবন্ধের লেখক কোনো একবার একটি ছোট পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনার কথা বলাতে ব্রজেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তেই আসন ছেড়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সত্য সর্বদা তাঁর কাম্য ছিল। তাই রচনাকে সুপেয় পানীয় না করে তাকে তিনি পুষ্টিকর খাদ্য করে তুলেছেন ; আর এজাতীয় খাদ্যের প্রতি অরুচি আছে ব'লেই বাঙালীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটা আজ এমনভাবে পঙ্গু হয়ে আসছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণার একটি দিক বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজীতে যাকে "Open mind" বলে, তাঁর মধ্যে সেই সুস্থ ঔদার্য চমৎকারভাবে প্রকটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের যে কোনও আলোচনা এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই আরোপ করতে চাই, অর্থাৎ যোগফল আগে ক'ষে নিয়ে প্রয়োজন-মত সংখ্যা-সন্নিবেশ করি। সাহিত্য-বিচারে এ রীতি কখনও কখনও গ্রহণীয় হতেও পারে, কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে এ মনোভাব মারাত্মক। পূর্বকল্পিত একটি সিদ্ধান্তকে যেমন করে হোক প্রমাণ করতে হবেই, এ মনোভঙ্গী গবেষকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন অনেকগুলি সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, পৌর্বাপর্যহীন বিচ্ছিন্ন অংশকে পূর্ণাঙ্গ ব'লে চালাতে হয়, অর্ধসত্যকে সত্য বলে দাবী করতে হয় এবং নিঃসংশয় ভ্রান্তিকেও অন্ধ গোঁড়ামির সাহায্যে আঁকড়ে রাখতে হয়। শুধু অহমিকা এবং

আত্মতুষ্টির খাতিরে এজাতীয় আত্মবঞ্চনা বাঙলা দেশে বহুবারই আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এ-রকম কোনও পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর কাজে এগিয়ে আসেননি। তাঁর মন সংস্কারবিহীন, তাঁর বিচার অপক্ষপাত ; প্রিয় হোক আর অপ্রিয় হোক, সত্য জিজ্ঞাসাই তাঁর কাম্য, তিনি সত্যব্রত। নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ তিনি সব সময়ে গ্রহণ করেছেন, অপরের ঋণ সানন্দে স্বীকার করে গেছেন।

কিন্তু মজার কথা এই, তাঁর ঋণ অনেকেই স্বীকার করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা থেকে বহুজনেই বহুভাবে উপকরণ গ্রহণ করেছেন, অথচ তাঁদের মধ্যে একটা বৃহদংশ ব্রজেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

হয়তো তার একটা কারণ আছে। সাহিত্যে ব্যাকরণের নিয়ম মানতে গিয়ে আমরা যেমন বৈয়াকরণের উল্লেখ করি না, অথবা বানানের ভ্রান্তির জন্যে অভিধানের দ্বারস্থ হয়েও আভিধানিককে কৃতজ্ঞতা জানাই না, বাংলা-সাহিত্যমূলক গবেষণায় ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকাও ঠিক তাই। তিনি এমনি অপরিহার্য, এমনি স্বতঃসিদ্ধ যে তাঁকে শিরোধার্য করেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করি। আমি নিজে শিক্ষাব্রতী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাহিত্যের ইতিহাস পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আভিধানিক অথরিটি ; স্বীকৃতি কথাটা তুচ্ছ— তাঁকে আমরা আত্মসাৎ করে নিয়েছি।

এই জন্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের আরও বহুকাল বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রমতে অন্তত বাংলা দেশে, পঞ্চাশোর্ধে সাহিত্যপ্রতিভায় ভাঁটার টান পড়ে ; কিন্তু গবেষকের ক্ষেত্রে তার বিপরীত। তাঁর বয়স যত বাড়ে, অভিজ্ঞতাও তত বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়—তাঁর বিচারবোধ তত পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বলতাতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাতে ছেদ পড়ল। অনেকগুলি আরব্ধ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না, তাঁর সাধনার অনেকখানিই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। দুর্ভাগ্য এই, বাংলা দেশে তাঁর অসমাপ্ত কর্মভার তুলে নেবে—এমন মানুষও আর দেখা যাচ্ছে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর একটা কথা বার বার আমার মনে পড়ছে। সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় হয়তো তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায়— সম্ভবত অধুনালুপ্ত 'খোকাখুকু' মাসিক পত্রের পাতায় তিনি ছোটদের জন্যে যে সব ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করতেন, আমরা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তাঁর 'কেল্লা-ফতে' বা 'রণডঙ্কা' আমাদের শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিল। সরল সুন্দর ভাষায় সেদিন ইতিহাসের যেসব কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন, তাদের আকর্ষণ যে তখনকার দিনের রূপকথা-উপকথার চাইতে কিছুমাত্র কম ছিল না—সেকথা আজও

আমি ভুলি নি।

যত দূর জানি, পাকা সাহিত্যিকের কলম হাতে না থাকলে শিশুচিত্ত হরণ করা যায় না। অতএব সাহিত্যের পথে পদক্ষেপ ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে অনধিকারীর হত না। তবু সে পথ ছেড়ে দিয়ে কেন তিনি গবেষণার কণ্টকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার উত্তর খুঁজলেই ব্রজেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও তপস্যার খানিকটা পরিমাপ আমরা করতে পারব।

পরশুরামের কুঠার

নামে পরশুরাম, কিন্তু হাতে মাতৃঘাতী কুঠার নেই—আছে জল-দেবতার দেওয়া সোনার কুঠার। তাতে ভয়ের ভান আছে, কিন্তু ভয় নেই। বাড়তির ভেতরে আছে তার অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য—দীপ্তি আর দুর্মূল্যতায় তা চিরদিন সঞ্চয় করে রাখার মতো ঐশ্বর্য।

পরশুরামের লেখা সম্পর্কে এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পরশুরামের পূর্বসূরী হিসেবে স্বভাবতই মনে পড়বে 'কঙ্কাবতী'-খ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর 'ডমরুধরে'র সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ 'আই কেদার চাটুয্যে—নো জু-গার্ডেন'-এর আদিপুরুষকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারবেন। আসলে বীরবলী চাপা হাসি আর বিদগ্ধ ব্যঙ্গের যুগে বাঙালীর খাঁটি বৈঠকী রসিকতাকে যিনি নতুন করে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করলেন, তিনিই পরশুরাম। সেই জন্যেই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিগ্বিজয় করলেন।

এ কথা বললে ইতিহাসবিরোধী হয় না যে পরশুরাম বাংলা সাহিত্যে আসবার আগে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল শ্লেষের পালা। তাতে একদিকে আত্মসমালোচনা, অন্যদিকে আক্রমণ। 'পঞ্চানন্দ', 'লোকরহস্য' ইত্যাদিতে তার সূচনা আর 'নীল-লোহিতে' তার পরিণতি। মাঝখানের ক্রোড়পত্র ত্রৈলোক্যনাথকে প্রায় আমরা ভুলতেই বসেছিলাম, বিরাট রবীন্দ্রনাথের বিশাল জীবনকাব্যে 'হাস্য-কৌতুক' 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' একটুখানি পাদটীকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লেষের যুগে জন্মে পরশুরাম শ্লেষের নির্মোক নিয়েছেন—কিন্তু আসলে ওটা লক্ষণা—অভিধা নয়। শ্লেষ বস্তুটা বস্তুতান্ত্রিক, তার আক্রমণ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু কৌতুক, বস্তু থেকে উৎসারিত হয়েও বাস্তবাতীত—তার আবেদন ব্যক্তি সমাজকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে যায়। শ্লেষের কাঁটার ওপর একটুখানি স্বচ্ছ রেশমী আবরণ থাকে—মুগ্ধ হয়ে হাত বাড়িয়েই তার 'পরুষ পরশে' ক্ষতবিক্ষত হতে হয়;

আর কৌতুক জীবনের একটি বালির বিন্দুকে ঘিরে ঘিরে শুক্তির মতো লালাক্ষরণ করে—একটি চমৎকার মুক্তা সৃষ্টি হয়—বালুকণার কথা মনেও থাকে না।

পরশুরামের রচনাগুলি মুক্তো। বালির একটা কণা, একটু পাথরকুচি আছে বই, কি। গাণ্ডেরীরাম বাটপেরিয়া, ডাক্তার তপাদার, স্যর গব্‌সন টৌডি, লালিমা পাল (পুং) কিংবা জিগীষা দেবী—সেই অণুতম উপকরণ। যে-কোনো ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ সাহিত্যিক এদের নিয়ে তীব্র শ্লেষের আক্রমণ হানতে পারতেন—তাঁর চাবুকের জ্বালায় আমাদের সর্বাঙ্গ জর্জরিত হতে পারত। কিন্তু পরশুরাম এদের ওপর প্রসন্ন আনন্দের মধুলেপ দিয়েছেন একটির পর একটি—excess বা আতিশয্যের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন যেখানে পরমানন্দে তাঁর লেখা সমানে উপভোগ করতে পারে ওই গাণ্ডেরীরাম—লালিমা পাল—গবসন টৌডি আন্‌লিমিটেড!

শ্লেষের দর্পণে মানুষ নিজের প্রতিফলন দেখে শিউরে উঠতে পারে। কিন্তু পরশুরামের লেখা মায়া-দর্পণ: তাতে বাস্তব অসঙ্গতি, ভণ্ডামি ও মূর্খতাগুলো রূপকথার মতো রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'কচি সংসদে'র কথাই ধরা যাক। এক সময়ে বাংলা দেশে প্রচণ্ড বেগে তারুণ্যের অভিযান শুরু হয়েছিল—সেটা ইতিহাসের সত্য। সত্যেন দত্ত বলেছিলেন, 'যৌবনে দাও রাজটীকা'—আর রবীন্দ্রনাথ সবুজ প্রাণের গান শুনিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটা প্রায় প্যারডি হয়ে দাঁড়াল। এমন একটা কালও গেছে, যখন বাঙালী তরুণেরা লীলায়িত ভঙ্গিতে বাবরী দুলিয়ে পথ হাঁটতেন—কাঁধে দুলত বাসন্তী রঙের চাদর, সেই চাদরের কোণায় বাঁধা থাকত জুঁই কিংবা রজনীগন্ধা—লাল চটি টানতে টানতে তাঁরা থ্যাকার স্পিংক কিংবা নিউম্যানের দোকানে বিলিতী কবিতার বই কিনতে যেতেন। অনুকরণটা রবীন্দ্রনাথের—কিন্তু শিষ্যদের এই মূর্তি দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত আঁতকে উঠতে হয়েছিল।

'কচি সংসদ' এই তারুণ্য-তাড়িত তরুণদেরই রসরূপ; কিন্তু দার্জিলিঙের 'মুন-শাইন ভিলা'—কচিদের বিচিত্র সংবাদ আর কেষ্টর 'হাইকোর্টশিপ' সমস্ত জিনিসটাকে এমন অপূর্বতা দিয়েছে যে যাদের ওপর পরশুরামের আঘাত এসে পড়েছে—তারাও জানতে পারেনি এ আক্রমণ তাদেরই ওপর। এ যেন সেই বিচক্ষণ তলোয়ারীর গল্প। এমন নিপুণ হাতে আশ্চর্য সূক্ষ্মতার সঙ্গে সে প্রতিপক্ষের শিরশ্ছেদ করেছিল যে ছিন্নকণ্ঠ লোকটা পর্যন্ত সে দুর্ঘটনা জানতে পায়েনি; নিরুপায় ছেদনকর্তা তার নাকের সামনে ধরল একডিবে কড়া নস্যি—হাঁসির চোটে কাটা মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

পরশুরাম মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন—কিন্তু এই রকম সূক্ষ্মতার সঙ্গে। অথবা ওঁর হাতে ওটা সোনার কুঠার—ওতে ভয় নেই—ভয় দেখানোর ভানই আছে। ওটা নরহত্যার

জন্ম নয়—পরম সমাদরে তুলে রাখবার জন্ম।

কিন্তু ওটা যদি শ্লেষ হত ? তা হলে তার রূপ কী হতে পারত—বঙ্কিমচন্দ্রের "লোক রহস্যে"র পাতা থেকেই সেটা বোধগম্য হতে পারে। জুয়াচোর সাধু নিয়ে পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' গড়ে উঠেছে—কিন্তু যে কলম নিয়ে ভোল্‌টেয়ার ('বোল্‌তের') চার্চের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন—সে কলম পরশুরামের হাতে থাকলে ওই লেখার বিষাক্ত জ্বালায় সমস্ত সমাজ পুড়ে খাক হয়ে যেত।

প্রাচীন বাঙালী শ্লেষ জানত না—কৌতুক জানত। আধুনিক শ্লেষটা প্রধানত বিদেশ থেকে আমদানি—'ভ্যানিটি ফেয়ারে'র উত্তরাধিকার। পুরোনো বাঙলা দেশে গালাগালি ছিল—প্রচুর পরিমাণেই ছিল ; তার চেহারাও ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি নগ্ন। তাতে শ্লেষের নুন-লঙ্কার জ্বালা থাকলেও—উচ্চণ্ড অট্টহাসির প্রলেপে সে জ্বালা ঢেকে যেত। দাশরথি রায় তার প্রমাণ। পরশুরাম গালাগালি বাদ দিয়ে কেবল অট্টহাসিটুকুই বেছে নিয়েছেন। উপমা দিয়ে বলা যায়, যে মানুষ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ভেতর বড় জোর একটা 'সুগার কিউব' ফেলে দিয়ে মজা দেখেছেন—তার বেশি কিছুই নয়।

বিদেশী সাহিত্যের কার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে ? মার্ক টোয়াইন ? খানিকটা, সবটা নয়। জেরোম কে জেরোম ? কিছুটা। মুন্‌রো—'সাকী' ? কখনো কখনো। চার্ল্‌স্ ডিকেনস্ ? না—তাঁর মিস্টার পিক্‌উইক্ ডন কুইক্‌সোটের মতো অশ্রুসিক্ত। বিয়ারবোম ? উঁহু—দৃষ্টির পার্থক্য আকাশ পাতাল। একেবারে আধুনিক এরিক নাইট ? এরিক নাইট-এ 'ফান্'-এরই প্রাধান্য, তাঁর কল্পনা অদ্ভুত—তিনি নক্‌সা আঁকেন না—জমাট গল্প লেখেন। তা হলে অধ্যাপক ষ্টিফেন লিকক ? হ্যাঁ—অনেকখানি। তবুও সবটা নয়।

আসলে পরশুরামের হিউমার জাতিতে চাদর ধুতি পরা উচ্চবিত্ত শান্তিপ্রিয় বাঙালী—তার যথাস্থান রায়বাহাদুর বংশলোচনের বৈঠকখানা। 'অক্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের' বিশ্লেষণে কিংবা 'লেক্‌চারিং টুরে'র বর্ণনায় লিকক যে বিদগ্ধ ব্যঙ্গ-জগতের সৃষ্টি করেছেন—তার কাছ থেকে উদো, নগেন, বিনোদ উকিল, স্বয়ং বংশলোচন, এমন কি 'দি গ্রেট চাটুজ্জে' মশাই পর্যন্ত পালাতে পথ পাবেন না। রায়বাহাদুরের বৈঠক-খানা না হলে বাবা দক্ষিণ রায়ের এমন পাঁচালী আর কোথায় শোনা যাবে ?

> "ছাগল শুয়ার ভেড়া হিন্দু মুছলমান।
> প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান॥
> পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি।
> সকল জীবের প্রতি প্রভুর যে খাঞি॥

দোহাই দক্ষিণ রায় এই কর বাপা।
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা ॥"

লিকক যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন—তিনি এই 'পাঁচালীর' অকৃত্রিম বাঙালী রসে 'বঞ্চিত গোবিন্দদাস'। তবুও লিককের সঙ্গেই পরশুরামের কিছুটা সহমর্মিতা আছে! লিকক্ নক্সা এঁকেছেন—সম্পূর্ণ গল্প লেখেননি—পরশুরামও প্রায় তাই। লিকক্ অসামান্য পণ্ডিত—দিক্‌পাল অধ্যাপক; বিখ্যাত রাসায়নিক, একদা বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম প্রাণ-পুরুষ পরশুরাম সম্পর্কেও প্রায় একই কথা। লিককের রচনাতেও একটি ক্ষীণ আক্রমণের সূত্র আছে; কিন্তু পরশুরামের মতোই তাতে তাঁর কৌতুকখণ্ডগুলো 'মণিগণা ইব' দীপ্তি পায়—সূত্রের কথা কারুর মনেও থাকে না। লিককের অনবদ্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে পরশুরামের 'তিমিঙ্গিল' জাতীয় রচনাগুলোর স্বচ্ছন্দেই তুলনা করা যায়।

পরিণত বয়স—অসুস্থ শরীর, তবু আজও পরশুরাম "রটন্তীকুমারের" মতো মনোরম গল্প লিখছেন, এখনো "নীল তারা" পড়তে গিয়ে তাঁর সেই দিগ্বিজয়ী আবির্ভাবের কথা মনে পড়ে যায়। তবে কাল-প্রভাবেই কি না জানি না—ইদানীং তাঁর কোনো-কোনো রচনায় যেন অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছে—তাঁর কৌতুকদীপ্ত ললাটে ভ্রূকুটির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এই ক্রোধ তাঁর লেখায় রসাভাসের মতো মনে হয়। রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর নিশ্চয়ই থাকতে পারে—আক্রমণও তিনি অবশ্যই করতে পারেন—কিন্তু স্নিগ্ধ কৌতুক এবং উপভোগ্য ব্যঙ্গের মধ্যে রোষের জ্বালা ঠিকরে পড়লে ব্যথিত হওয়ার কারণ ঘটে।

শরীর অসুস্থ—বেশি লিখতে পারেন না—তবু তাঁর প্রতি আমাদের অনেক আশা। "রটন্তীকুমার" সে আশাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

মনে হয়, এক জায়গায় পরশুরাম বাংলা দেশকে ঠকিয়েছেন। সে হল কিশোর সাহিত্য। তাঁর রচনায় নির্মল গল্পের যে নিঃশঙ্ক আনন্দ, যে কৌতুকের বিস্তার, তা আমাদের বালকপাঠ্য সাহিত্যকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দিতে পারত। তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' 'দক্ষিণরায়' কিংবা 'লম্বকর্ণ'কে একটু এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে দিলে ছোটদের আসরে তা নিয়ে হুলুস্থুলু পড়বে—এ কথা জোর করেই বলতে পারা যায়। ছোটদের হাসির গল্পের যে-সব প্রধান উপকরণ, পরশুরামে তা ষোলো আনাই আছে। সেই অম্লান আতিশয্য, সেই সিচুয়েশন সৃষ্টির অভাবিত naughtiness, সেই অতুলনীয় সংলাপ: "এই যে দাড়ি দেখছেন, এর নাম ইম্পিরিয়াল! এর উদ্দেশ্য নাককে ব্যালান্স করা!" এই আশ্চর্য সম্ভার নিয়ে পরশুরাম যদি কিশোর-সাহিত্যে আসতেন,

তা হলে হয়তো সুকুমার রায় আর অবনীন্দ্রনাথের শূন্য জায়গার জন্যে আজ আমাদের আর ক্ষোভ করতে হত না।

কিন্তু কিশোর সাহিত্য, অবনীন্দ্রনাথ কিংবা সুকুমার রায়ের কথা থাক। বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের উত্তর-পুরুষেরাই বা কোথায়? যে যন্ত্রণার যুগ আমাদের ঘিরে আজ অগ্নিচক্রের মতো ঘুরছে—আজও যে ক্ষোভ আর নিরাশার পঙ্কে আমরা আকণ্ঠ—তার মধ্যে বিশুদ্ধ 'হিউমারে'র একটি নির্মল পদ্মও কি ফোটবার আশা আছে আর? 'সম্বুদ্ধ' ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু 'সম্বুদ্ধ' শুরু করতেই সারা করলেন, বাৎসল্যের করুণায় বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের লেখনী অন্য পথ ধরল। শ্লেষশিল্পী বনফুল এ-দিকে পা-ই বাড়ালেন না। মুজ্‌তবা আলী আছেন বটে কিন্তু তাঁর পদ্ধতি আলাদা—তিনি যতটা বাঙালী, তার চাইতে বেশি আন্তর্জাতিক। নৈরাশ্যবাদী আমরা নই, তবু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে: কৌতুকরসিক বাঙালী জাতির 'লাস্ট টাইটান' কি পরশুরাম?

* এই প্রবন্ধ পরশুরামের জীবিতকালে লেখা হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বক্তব্যের পরিবর্তন হয়নি বলে প্রবন্ধটিও অপরিবর্তিতই রইল।

আগন্তুক

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য

সুহৃদ্বরেষু

॥ চরিত্র ॥

মাধববাবু	...	প্রৌঢ় ভদ্রলোক
কুণাল	...	জনৈক তরুণ
ইরা	...	ঐ কন্যা
নীরা	...	ঐ
বৃন্দাবন	...	ধনী ব্যবসায়ী
খাঁদু	...	পাড়ার ছেলে
হেবো	...	ঐ
হরিবল্লভ	...	বাড়ীওয়ালার সরকার
পূর্ণেন্দু	...	মাধববাবুর জামাই

পুলিস ইন্সপেক্টর

তিনজন কনস্টেবল

লোক-সংস্কৃতি সংঘের প্রযোজনায় রঙমহলে
"আগন্তুক" প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপি

মাধব	...	প্রমোদ চৌধুরী
কুণাল	...	চিত্ত ঘোষাল
ইরা	...	লীলা দেবী
বৃন্দাবন	...	সতী মিত্র
হরিবল্লভ	...	হীরেন ভট্টাচার্য
পূর্ণেন্দু	...	অজয় নাগ
থাদু	...	শ্যামাচরণ দত্ত
হেবো	...	সুশীল দত্ত
ইন্সপেক্টর	...	রজত মল্লিক
কনস্টেবল	...	পান্না বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা :—প্রমোদ চৌধুরী

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সাধারণ কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর বসবার ঘর। অর্থাৎ এক কোণে সুজনি বিছানো একটি তক্তপোশ, একটি ময়লা ইজিচেয়ার, পুরানো বার্নিশ-ওঠা টেবিলের পাশে খান দুই চেয়ার। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার, একখানি রবীন্দ্রনাথের ছবি। সময় সকালবেলা আটটা সাড়ে আটটা হবে। একখানা খবরের কাগজ হাতে করে মাধববাবু ঢুকলেন। তক্তপোশে বসলেন, খুললেন কাগজখানা। তারপর এক জায়গায় চোখ পড়তেই।]

মাধব। (উত্তেজিত) এই যে বেরিয়েছে! ফার্স্ট প্রাইজ ৩, ২, ১—উঁহু, অত আশা নেই। ও সব বিড়লা-টিড়লাদের জন্য— আমাদের বরাতে শিকে ছিঁড়বে না। এই যে সেকেণ্ড প্রাইজ—পাঁচশো টাকা করে—অ্যাঁ! (আরো উত্তেজিত) ১-২-৭-ইস্, ফস্‌কে গেল! ৭-৮-উঃ, আটটা যদি পাঁচ হয়ে যেত! (কাগজটার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে) নাঃ, ওটা আটই বটে, পাঁচ কখনোই নয়! (কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন) টাকা বড়লোকের জন্য। যার খিদে নেই, ক্ষীরের বাটি তার পাতেই গিয়ে পৌঁছোয় চিরকাল। আর আমরা— (আর বলতে পারলেন না। উঠে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন) দুত্তোর, দুনিয়াটাই নেমকহারাম। তেলা মাথাতেই তেল পড়বে কেবল। কালই হয়ত দেখব দিল্লী কিম্বা বোম্বাই-এর কোনো এক কোটিপতি ডার্বি সুইপ মেরে দিয়েছে। আর আমাদের কপালে জন্মের সময়ই বিধাতা একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এঁকে দিয়েছেন—খালি পেটে কিল মেরে বসে থাকো। (একবার থামলেন, কী ভাবলেন, কাগজটার দিকে তাকালেন) ঠিক দেখেছি তো? ওটা পাঁচও তো হতে পারে! (কাগজ তুলে নিলেন) অনেক সময় ছাপার কালি পড়ে গিয়ে পাঁচকে আটের মতোও দেখায়। (কাগজ খুললেন) দেখি, ভালো করে দেখি! (মন দিয়ে দেখে দেখে সজোরে মাথা নাড়লেন) নাঃ—ঠিক আট। একেবারে পরিষ্কার জলজল করছে। উপরে এক শূন্য, নীচে আর এক শূন্য—একেবারে আমার ইহকাল পরকাল জুড়ে বসে আছে। দুত্তোর—(সজোরে কাগজটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন) বিধাতার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ! কিচ্ছু করার জো নেই!

[সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে ঢুকল। রোগা, সুশ্রী, পরনে আধময়লা ডুরেশাড়ী। মধ্যবিত্ত পরিবারের অযত্নে মানুষ হওয়া চেহারা। বোঝা যায় আর

একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারলে ওকে সুন্দরী বলা চলত। কাগজটা হাতে করেই মেয়েটি এসেছে। নাম ইরা, মাধববাবুর মাতৃহীনা ছোট মেয়ে।]

ইরা। কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন বাবা? কী হয়েছে?

মাধব। কিছুই হয়নি—কিছুই হয়নি।

ইরা। কিছুই হয়নি তো ছুঁড়ে ফেললে কেন? (ভাঁজ করে টেবিলের ওপর কাগজটা রাখল)

মাধব। কিছু একটা হওয়াতে চাই বলে। ঘটুক—অবাস্তর, অসম্ভব যা হয় ঘটুক। ম্যাজিক্-মিরাক্ল্-অবিশ্বাস্য—একটা কিছু ঘটে যাক। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেন দেখি, আমার সব দেনা শোধ হয়ে গেছে, ব্যাঙ্কে দু'লাখ টাকা জমা পড়েছে, মনের মতো একটি সৎ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পেরেছি—

ইরা। (বাধা দিয়ে) সকালবেলাতেই কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ বাবা! মির‍্যাক্ল্ এ যুগে তো ঘটে না।

মাধব। ঘটে, ঘটে। কেউ জানে না কখন কী হয়ে যেতে পারে। আর যদি না-ও ঘটে, অন্তত একবার ঘটলে ক্ষতি কী?

ইরা। আচ্ছা যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। তুমি বাজারে যাবে না একবার?

মাধব। হ্যাঁ, যেতে হবে বৈ কি! পুঁইডাঁটা কুঁচো চিংড়ির খদ্দেরও তো দু'এক-জন চাই। (তিক্তভাবে হাসলেন) তুই আমার বাজারের থলেটা এনে দে—(মেয়েটি যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, মাধব ডাকলেন) মা ইরা—(ইরা ফিরে তাকাল) এক কাপ চা যদি—

ইরা। দিচ্ছি এনে। কিন্তু তুমি পাগলামো ছেড়ে একটু চুপ করে বসো দিকি।
[ইরা ভেতরে চলে গেল। মাধব তক্তপোশে বসলেন।]

মাধব। উঃ!—বিধাতাপুরুষ! সে লোকটাকে একবার হাতের কাছে পেলে, তার মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি! পাঁচ নয় আট! উপরে নীচে একজোড়া শূন্যি! আমার ইহকাল পরকাল জুড়ে বসে আছে! ইম্‌পসিব্‌ল!

[কুঁজো বাঁদুর চেহারা একটি লোক ঢুকলেন। বৃন্দাবন ঘোষ এর নাম। বয়েস মাধববাবুর মতোই। বেশ শৌখিন। গায়ে গরদের চায়না কোট। দু হাতে গোটা আষ্টেক আংটি। হাতে ছড়ি। চোখে সোনার চশমা]

বৃন্দাবন। এই যে মাধববাবু! বসে বসে কী বিড়বিড় করছেন মশাই?

মাধব। (চমকে তাকালেন) যাক এসে গেছেন? (গলায় তিক্ততা ফুটে বেরুল)

বৃন্দাবন। (গলার স্বরে আরও ব্যঙ্গ মিশিয়ে) না এসে কী করি বলুন। আপনার পায়ের ধুলো তো আর গরিবের কুটীরে পড়বে না ! কাজেই পর্বতের কাছেই মহম্মদকে আনতে হল। (একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন)

মাধব। কী অনুগ্রহ ! কিন্তু কথাটা কি জানেন বৃন্দাবনবাবু, আপনার পাঁচতলার কুটীর থেকে, আমার এই একতলার রাজপ্রাসাদে এসে আপনারও যে খুব সুবিধে হবে, তা নয়।

বৃন্দাবন। মানে ? টাকা আপনি দেবেন না ?

মাধব। টাকা আমার নেই। থাকলে দিতুম।

বৃন্দাবন। তা হ'লে আমি নালিশ করতে পারি ?

মাধব। স্বচ্ছন্দে। Ex-parte Decree করে নিন। যা আছে ক্রোক্ করুন।

বৃন্দাবন। ক্রোক্ করব ! একখানা তক্তপোশ আর দুখানা ভাঙা থালা ! তাতে কটা টাকা উঠবে আমার !

মাধব। আমাকে জেলেও দিতে পারেন।

বৃন্দাবন। আপনাকে জেলে দিয়েই বা কী হবে আমার ! টাকা তো আর তাতে উশুল হবে না।

মাধব। গায়ের জ্বালা অন্তত মিটতে পারে। তা ছাড়া লাভ আপনার না থাকলেও আমার আছে। সিভিল জেলে পাঠালে আপনার খরচায় আমি বসে বসে খেয়ে বাঁচব মশাই, পেটের ধান্দায় দৌড়ে বেড়াতে হবে না।

বৃন্দাবন। (চটে) বাজে কথা রেখে দিন মশাই। আপনাকে দেখেশুনে তো ভিজে বেড়াল ভালো মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পেটে পেটে যে এত তা তো ভাবতে পারিনি।

মাধব। ভাবতে কেউই পারে না বৃন্দাবনবাবু, আপনি নন—আমিও নই। আমিই কি ভেবেছিলুম এম. এস্-সি পরীক্ষা দিয়ে পথে বেরিয়ে এসে আমার হীরেন, আমার একমাত্র ছেলে মোটরের তলায় চাপা পড়বে ? আপনার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার করে, বড়লোকের ঘরে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু তখন কি জানতুম, আমার অ্যাড্‌ভোকেট বেয়াইএর চামড়ার তলায় একটা জানোয়ার বাসা করে আছে ? কে ভেবেছিল আমার জামাই এমন মেরুদণ্ডহীন—এতবড় অপদার্থ ? (গলা ভারী হয়ে এল) কেউ জানে না বৃন্দাবনবাবু—কেউ কিছুই ভাবতে পারে না।

বৃন্দাবন। (একটু চুপ ; যেন চক্ষুলজ্জা বোধ করছেন, সামলে নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড পরে) আপনার অবস্থা যে একেবারে বুঝতে পারিনে তা নয়। কিন্তু

আসলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা—আমারই বা কী ক'রে চলে বলুন!

মাধব। আড়াই হাজার কেন—বিশ হাজার গেলেও আপনার কোন ক্ষতি হয় না বৃন্দাবনবাবু, আপনার লক্ষ্মীর ঝাঁপির একটি কড়িও কম পড়ে না। কিন্তু আপনার টাকা আমি দেব। আমাকে আর ক'টা মাস সময় আপনি দিন।

বৃন্দাবন। সারাজীবন সময় দিলেও টাকা আপনি শোধ করতে পারবেন না মাধব বাবু। সে আমি বুঝেছি।

মাধব। না, বোঝেননি। আপনার টাকা না মিটিয়ে আমি মরতে পর্যন্ত পারব না। প্রাণটা গলার কাছে এসে আটকে থাকবে। (ইরা এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল) এনেছিস চা? দে মা, ওটা বৃন্দাবন বাবুকেই দে। আমার বরাতে আর নেই দেখছি।

ইরা। (লজ্জিত হয়ে) ও আবার কী কথা বাবা। আমি এক্ষুনি আর এক পেয়ালা এনে দিচ্ছি। (বৃন্দাবনের দিকে পেয়ালা নিয়ে এল)

বৃন্দাবন। (ব্যস্তভাবে) না—না দরকার নেই। ও চা তোমার বাবাকেই দাও, মা। গ্যাস্ট্রিকে ভুগছি, যখন তখন ওসব আমার সয় না।

মাধব। ভগবানের রসিকতাটা একবার দেখছেন বৃন্দাবনবাবু? দু'বেলা পোলাও-কালিয়া খাওয়ার পয়সা আছে আপনার, অথচ অম্বলের জন্য কিছু খেতে পারেন না! আর আমরা বিশ্বসংসার হজম করতে পারি—আমাদের হাঁড়িতে ভরপেট পর্যন্ত মাপান নি! বেশ ইণ্টারেস্টিং, না?

বৃন্দাবন। হুঁ।

[ইরা বেরিয়ে গেল, বৃন্দাবনবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন]

বৃন্দাবন। এইটি বুঝি আপনার ছোট মেয়ে? তা এরও তো বিয়ের বয়স হয়েছে দেখছি।

মাধব। কিন্তু আপনি ভাববেন না। এর বিয়ের জন্য আপনার কাছে আর হাত পাতব না।

বৃন্দাবন। (একটু লজ্জিত হয়ে) কী যে বলেন তার ঠিক নেই মেয়েটি কিন্তু আপনার খাসা। বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে।

মাধব। লক্ষ্মী আজকাল কেউ চায় না মশাই। তাঁর ঝাঁপির ওপর যে লক্ষ্মী প্যাঁচাটি থাকে, তারই দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই।

বৃন্দাবন। আপনার কথাবার্তাই কেমন বেয়াড়া হয়ে গেছে আজকাল। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। টাকার কথাটা কিন্তু একটু মনে রাখবেন দয়া করে।

মাধব। বলেছি তো, আপনার টাকা না দিয়ে আমি মরতে পর্যন্ত পারব না।

(বৃন্দাবন যেতে উদ্যত) এক মিনিট দাঁড়ান। ৩-২-১ কি আপনার?

বৃন্দাবন। (বিস্মিত) ৩-২-১! সে কি?

মাধব। তাহলে ১-২-৭-৮, মানে 1-2-7-8?

বৃন্দাবন। অ-হ, টেলিফোন নাম্বারের কথা বলছেন? আমার হ'ল গিয়ে—

মাধব। (বাধা দিয়ে) না—না, টেলিফোন নম্বর নয়। লটারির টিকিট। (উত্তেজিত হয়ে) নিশ্চয় পেয়েছেন আপনি। আপনার মতো লোকেরাই পায়। বলুন পেয়েছেন কিনা? (কাছে এগিয়ে গিয়ে) বলুন—

বৃন্দাবন। কী বকছেন আপনি মাধববাবু? লক্ষণ তো ভালো নয়! মাথার চিকিৎসা করান মশাই, মাথার চিকিৎসা করান। (বেরিয়ে গেলেন)

মাধব। (ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন) 1-2-7-8! কিছু বলা যায় না। হয়ত কালই কাগজে বেরুবে—ভুলে ৫-এর জায়গায় ৮ ছাপা হয়েছিল। টেলি-ফোন একটা করে দেখব নাকি কাগজে?

[বাইরের দরজার সামনে সুদর্শন একটি তরুণ এসে দাঁড়ালো। গায়ে লং কোট, পরণে পা-জামা। হাতে একটি ট্র্যাভ্‌লিং কিড্‌। চুলগুলো এলো-মেলো—চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক।]

মাধব। কী চাই?

তরুণ। (যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে আছে, ঠিক এমনি গলায়) কী যে ঠিক চাই তা নিজেও জানি না।

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—"

মাধব। (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে) কে হে বাপু তুমি? আমি মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি কাব্য করবার আর জায়গা পেলে না?

তরুণ। কাব্য করবার জায়গা পৃথিবীতেই কোথাও নেই। আপনি না হয় একটু দিলেনই। আপনার এই তক্তপোষে আমি কি কিছুক্ষণ বসতে পারি?

মাধব। না—পারো না। যে পথে এসেছিলে, সেই পথেই বেরিয়ে পড়ো।

তরুণ। যাব?

মাধব। হাঁ, অনুমতি তুমি পেয়েছ। আর যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাও। তুমি কখনো লটারীর টিকিট কিনেছ?

তরুণ। (হা-হা করে হেসে উঠে) জীবনটাই তো লটারীর টিকিট। কেউ আমায় কাটিয়ে দেয়, কেউ বা একেবারেই বাজী মেরে দেয়। এই আমার কথাই

ধরুন না। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে হঠাৎ একটা হীরের খনির সন্ধান আমি পেয়ে গেলাম কি করে?

মাধব। (চমকে) হীরের খনি! ছোটনাগপুরের পাহাড়ে!

তরুণ। হাঁ—পদ্মরাগ, চুনী, পান্না, চন্দ্রকান্ত মণি। তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়। শুধু তুলে আনবার অপেক্ষা। সারা বাংলাদেশের অভাব তা দিয়ে দূর করা যায়, সমস্ত মানুষকে পেট ভরে খেতে দেওয়া যায়, ঘরে ঘরে যত দুঃখিনী মা আছে সকলের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া যায়। আনবো—আমিই তা তুলে আনবো। মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আচ্ছা চলি—(যেতে উদ্যত)

মাধব। না না, যেও না, দাঁড়াও—একটু দাঁড়িয়ে যাও। হীরের খনির সন্ধান তুমি পেয়েছ বুঝি?

তরুণ। পেয়েছি। একমাত্র আমিই পেয়েছি। কিন্তু (হঠাৎ চমকে উঠে) ছিঃ—ছিঃ—বলে ফেললুম? যাই—আমি যাই—

মাধব। (বাধা দিয়ে) আহা বোসো—বোসো। আমার তক্তপোশে বসতে চাইছিলে—বোসোই না একটু! তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

তরুণ। বলুন—চটপট বলে ফেলুন।

মাধব। শোনো—তুমি তো হীরের খনির মালিক? সত্যি বলছ তো?

তরুণ। (চোখ জ্বলে উঠল) জীবনে আমি কখনো মিথ্যে বলিনি। আর যে আমাকে মিথ্যেবাদী বলে, আমি তার মাথাটা তৎক্ষণাৎ গুঁড়িয়ে দিই।

মাধব। সর্বনাশ। না না বাবা, রাগ কোরো না! দেখছই তো আমি বুড়ো মানুষ! আমি বলছিলুম কি (একটু কাশলেন)—এই ইয়ে—আমাকে একখানা হীরে দিতে পারো তুমি? বেশি নয়—মাত্র একখানা? লটারীর টিকিট কিনে কিনে প্রায় পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু ভাগ্য একবারও তাকালো না আমার দিকে। একখানা হীরে তুমি আমাকে দেবে?

তরুণ। কারো একার দুঃখের কথা ভাববার সময় আমার নেই। সারা দেশের কান্না আমি শুনেছি। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। অন্যায় অনুরোধ আমায় করবেন না—আমি চললুম। (যেতে উদ্যত)

মাধব। আহা শোনো—একটা কথা শোনোই না। দেশের আমিও তো একজন। দেনায় ডুবে আছি, বড় মেয়ের বিয়ে দিতে মাথার চুল পর্যন্ত বন্ধক পড়েছে—

তরুণ। তবু তো আপনার মাথার ওপর ছাদ আছে, তবু আপনি দু'মুঠো খেতে পাচ্ছেন। আর ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কথা ভেবেছেন একবার?

ভাবেননি। নিজেকে ছাড়া কাউকে দেখতে পান না আপনারা। কেউ দেখতে পায় না। আমি যাই—(যেতে চাইল, এর মধ্যে ঘরে এল ইরা। আগন্তুক তার দিকে তাকাল)

ইরা। আর কখন বাজারে যাবে বাবা? বেলা যে নটা—(বলতে বলতে আগন্তুকের দিকে তার চোখ পড়ল) এ কে! কুণালদা না?

[আগন্তুক ও মাধব দুজনেই চমকে উঠলো]

মাধব। কুণালদা! কে কুণালদা?

ইরা। বাঃ—তুমি ভুলে গেলে? এই তো কুণালদা। সেই চার-পাঁচ বছর আগে যখন আমরা পাটনায় থাকতুম, তখন আমাদের রাস্তার ওপারেই তো ওঁদের বাড়ী ছিল। কুণালদা কত আসতেন যেতেন, কত অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তোমার মনে নেই? আর কুণালদা—তুমিও আমাকে ভুলে গেলে?

আগন্তুক। (আস্তে আস্তে) ইরা!

মাধব। তাই তো—কুণালই বটে! ঠিক মনে পড়েছে। তাই তখন থেকে ভাবছিলুম, কোথায় যেন তোমায় দেখেছি। আরে বোসো—বোসো, তুমি তো ঘরের ছেলে!

কুণাল। আপনি মাধব কাকা! (পায়ের ধুলো নিয়ে) ঠিক চিনতে পারিনি। এত বুড়িয়ে গেছেন!

মাধব। বুড়িয়ে যাওয়ার দোষ কী বাবা? সামান্য মাইনের চাকরি। ধার-দেনা ক'রে বড় ঘরে নীরার বিয়ে দিলুম—নীরাকে মনে আছে তো? অথচ মেয়েটা সুখী হ'ল না। চামারের ঘরে পড়েছে বুঝেছ, চামারের ঘরে! যাক সে-সব পরে হবে। এখন বোসো, চা খাও।

কুণাল। হাঁ, একটু চা পেলে ভালোই হয়। ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছি। একটা হোটেলে যাব ভাবছিলুম। পথে কী করে যে আপনার ঘরে ঢুকে পড়লুম নিজেও বুঝতে পারছি না!

ইরা। তাই বুঝি? বেশ মজা হয়েছে তো। বোসো, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি। (ইরা চলে গেল)

মাধব। বোসো—বোসো—দাঁড়িয়ে কেন? (কুণাল বসল) তা তোমাদের বাড়ীর খবর কী? সবাই ভালো আছেন?

কুণাল। হাঁ, সবাই ভালো আছেন।

মাধব। তোমার বাবা প্র্যাকটিস করছেন এখনো?

কুণাল। করছেন বৈকি! সমানে মক্কেলদের গলা কাটছেন।

মাধব। ছি—ছি, কী যে বলো! তোমার বাবার কত সুনাম ওখানে। সে যাক, তোমার ব্যাপার কী? তুমি তো এম, এস্-সি পাস করেছিলে। তা হীরে-টিরের সন্ধান হঠাৎ পেলে কী করে?

কুণাল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার কাকা। জিয়োলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করছিলুম। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক দুর্গম জায়গায় হঠাৎ দেখি এক হীরের খনি। চুনী—পান্না—পদ্মরাগ—চন্দ্রকান্তমণি—(বলতে বলতে দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো) তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়। সারা ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায় এত ঐশ্বর্য! (ঘরে পায়চারি আরম্ভ করল অস্থিরভাবে—মাধব তাকিয়ে রইলেন মূঢ়ের মতো—কুণাল তাঁর কাছে চলে এল, গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল) কাউকে বলিনি—কাউকে সন্ধান দিইনি। গবর্ণমেণ্ট জানতে পারলে অমনি কেড়ে নেবে। তাই কলকাতায় এসেছি উপযুক্ত লোকের খোঁজে। তার সাহায্য নিয়ে হীরে তুলে আনব, বিশ্বাসী লোক দিয়ে কাটাবার ব্যবস্থা করব, তারপর—(হঠাৎ চমকে) দাঁড়ান—দাঁড়ান! দেখুন তো বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা! কেউ শুনতে পেলো কিনা!

[মাধব উঠে গিয়ে দেখলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন]

মাধব। না-না, কেউ নেই। (একটু থেমে) আচ্ছা কুণাল, তোমার বিশ্বাসী লোক চাই তো? আমি—আমি কি সাহায্য করতে পারি না তোমাকে?

[দরজার কড়া নড়ে উঠলো]

কুণাল। কে—কে?

মাধব। দেখছি, আমি দেখছি (উঠে দরজা খুললেন)।

[দুটি ছোকরা প্রবেশ করল। আঠারো-উনিশ বছরের মতো বয়েস, একজনের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, অপরের ট্রাউজার বুশশার্ট।]

মাধব। কী চাই?

খাঁদু। চাঁদার জন্য এলুম স্যার।

মাধব। চাঁদা? এখন কিসের চাঁদা? সেদিনও তো দু টাকা নিয়ে গেলে সরস্বতী পুজোর জন্যে।

হেবো। সরস্বতী পুজো তো কবে মিটে গেছে স্যার। আমরা এখন এসেছি ঘণ্টাকর্ণ পুজোর চাঁদা চাইতে।

মাধব। ঘণ্টাকর্ণ!

হেবো। ভারী জাগ্রত দেবতা স্যার—যাকে বলে কাঁচাখেকো। ছুটো একটা বসন্ত সুরু হয়েছে কিনা এদিকে-ওদিকে। সেইজন্য বেশ ঘটা করেই আয়োজন হচ্ছে।

মাধব। তা ঘণ্টাকর্ণ পূজো কেন? বসন্ত হচ্ছে, টীকে নিলেই হয়!

খাঁদু। টীকে! (ব্যঙ্গের হাসি) দেবতার নজরে পড়লে স্যার, ও সব ম্লেচ্ছ টীকা-টিপ্পনী কিছুই করতে পারবে না। চাই বাবা ঘণ্টাকর্ণের দয়া। সেই যে সেই শ্লোকটা কি রে? সেই যে আসবার সময় মুখস্ত করে এলুম? (সঙ্গীকে) বল্ না ছাই—সেই যে "ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধিবিনাশন"—

হেবো। "বিস্ফোটক-ভয়প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ"—

মাধব। রক্ষা করো, রক্ষা করো—আর দরকার নেই। ঘণ্টাকর্ণ—ঢাকপৃষ্ঠ—এ সব পূজোর চাঁদা আমি যোগাতে পারব না। সরে পড়ো।

খাঁদু। 'দেবতা'র কোপকে ভয় করেন না?

মাধব। না।

হেবো। বোমাকে ভয় করেন?

মাধব। বোমা!

হেবো। হয় চাঁদা—নয় বোমা, মাঝখানে তো কোনো পথ নেই স্যার। যদি বলেন অ্যাসিডের ব্যবস্থাও করতে পারি।

মাধব। তোমরা ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করতে চাও নাকি?

খাঁদু। কী আর করা যায় স্যার! দেবতাকে যদি ভয় না করেন, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরই ভয় দেখাতে হয়। মানে আমরাই দেবতার এজেন্ট, কিনা! যাই হোক, ভেবে দেখুন। একটু পরেই আবার আসছি আমরা।

মাধব। (বিবর্ণ) পুলিসে খবর দেব আমি।

খাঁদু। দিতে পারেন। পুলিশ একটা দিন বাঁচাবে—তারপর আরও অনেকগুলো দিন রইল আমাদের হাতে। হাওয়ায় তো আর বাস করবেন না মোশাই, পাড়াতেই থাকতে হবে। চলে আয় হেবো—(যাওয়ার উপক্রম করল)

কুণাল। (এগিয়ে এল) ওহে ঘণ্টাকর্ণের দল, একটু দাঁড়াও তো। ছুটো কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

খাঁদু। কে মশাই আপনি?

কুণাল। আমি? আমি হচ্ছি মর্দন কর্ণ। আরো জাগ্রত দেবতা। তোমাদের মতো দেবতার যে সব সোল এজেন্ট, পূজোর নামে চাঁদা তুলে বাঁদরামো করে, তাদের কর্ণ মর্দনই আমার পেশা।

হেবো। (বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তাই নাকি? লে খাঁদু—কথাটা একবার শুনে লে। খুব যে মস্তান মালুম হচ্ছে রে!

খাঁদু। ('চু' করে একটা শিস্ টানল) হম-ডম-ডিগা-ডিগা! একেবারে মুচ্‌মুচে ঝাল চানা দেখছি যে। তা ইয়ার—তা হলে তোমায় একটু দেখেই যাই। (কুণালের দিকে এগোল)

কুণাল। তা দেখে যাও—ভালো করেই দেখে যাও। আর দেখে যাও জাপানী কুস্তি, যার নাম যুযুৎসু। (চট করে হেবোর কাঁধে হাত দিল—আর্তনাদ করে সে বসে পড়ল। খাঁদু পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল, কুণাল অবিলম্বে তার হাত মুচড়ে ধরল) কী আছে চাঁদ পকেটে? বোমা? ছোরা? অ্যাসিড্? রিভলবার? কিন্তু যুযুৎসুর প্যাঁচটা দেখে নাও তার আগে—

খাঁদু। (গগনভেদী চিৎকার তুলল) ছেড়ে দিন স্যার—মরে গেলুম স্যার—পায়ে পড়ছি স্যার—উঃ, গেলুম স্যার—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে স্যার—

কুণাল। শিক্ষার এখনো একটু বাকী আছে। তবে আজ আর নয়। এরপরে কোনোদিন যদি বোমার ভয় দেখাতে আসো—তা হ'লে ডান হাতের মায়া ছেড়ে দিয়েই এসো। যাও—বেরিয়ে যাও—

[ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো ছোকরা দুটো]

মাধব। কী করলে কুণাল! রাস্তায় বেরুলে যে—

কুণাল। কোনো ভয় নেই কাকা। ওরা জোর খাটায় ভীরুর ওপর। যেখানে ঘা খায় সেখানে ওরা আর পা বাড়াতে সাহস পায় না। কিন্তু মজাটা দেখুন, সাত বছর আগে যুযুৎসু শিখেছিলুম—প্যাঁচগুলো এখনো চমৎকার মনে আছে!

মাধব। দুটো টাকা ওদের দিলেই ভালো হত বোধ হয়। মিথ্যে হাঙ্গামা বাড়ানো হ'ল।

কুণাল। বলেছি তো কাকা, ওরা কিছু বলবে না আপনাকে। আর টাকা দেবার জায়গা অনেক আছে সংসারে—ওদের জন্য সেটা অপচয় না করলেও ক্ষতি নেই। সবচেয়ে দুঃখ কী জানেন—দেশের তরুণ শক্তি এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—অথচ ওদের বাঁচাবার দায়িত্ব কেউ নেয় না! (একটু থেমে) পারব, আমিই পারব। হীরে—অজস্র হীরে! ইন্দ্রনীল-পদ্মরাগ-চন্দ্রকান্ত মণি! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। দেশ জুড়ে আমি কারখানা তৈরী করব, এদের কাজ দেব, লাইব্রেরী করব এদের জন্য, গড়ে দেব ক্লাব, মানুষ করে তুলব—[ইরা চা আর জলখাবার নিয়ে এল]

ইরা। তোমার চা আর খাবার এনেছি কুণাল দা।

কুণাল। খাবার এনেছ ? That's like a good girl। বড্ড খিদেটাই পেয়েছিল। কাল রাত্রে ট্রেনেও কিছু খাওয়া হয়নি। (খেতে আরম্ভ করল)

ইরা। এখানে কিসের একটা হুটোপুটির আওয়াজ পাচ্ছিলুম বাবা ?

মাধব। পাড়ার দুটো হতচ্ছাড়া ছেলে এসে—

কুণাল। কিচ্ছু না—ও সব কিছু না। একটুখানি যুযুৎসু প্র্যাক্টিস করছিলুম কেবল। ওসব কথা শুনে তোমার দরকার নেই।

ইরা। কিন্তু যুযুৎসু কেন ?

কুণাল। বললুম তো শুনে কাজ নেই। তবে ভাবছি বিদ্যেটা তোমাকে শিখিয়ে দেব। তোমার মতো অবলাদের একটু-আধটু আত্মরক্ষার উপায় জেনে রাখা ভালো।

ইরা। (হেসে) বেশ তো, শিখে নেব এখন। কিন্তু বাবা, তুমি কি সত্যিই বাজারে বেরুবে না ঠিক করেছ ?

মাধব। হাঁ যাচ্ছি—(একটু দ্বিধা করে) তা বলছিলুম কি কুণাল, তুমি এবেলা বরং এখানেই খেয়ে যাও। পাটনায় তো আমাদের ঘরের ছেলের মতোই ছিলে —তাই এখন আর হোটেলে না গিয়ে—

কুণাল। অত দ্বিধা করছেন কেন ? আমার কোনো চক্ষুলজ্জা নেই। যেখানে হোক খেতে পেলেই হ'ল।

মাধব। বেশ, বেশ, ভারী সুখী হলুম। ইরা মা, আমার জামা আর বাজারের থলেটা—

ইরা। এনে দিচ্ছি বাবা—(চলে গেল)

মাধব। তুমি কদিন কলকাতায় থাকবে কুণাল ?

কুণাল। দুদিন—দুদিনের বেশি নয়। (খাবার শেষ করে চায়ে চুমুক দিল) জানেন মাধবকাকা, আমার একেবারে সময় নেই। সাত রাজার ধন পড়ে আছে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে। আমার একেবারেই দেরি করা চলবে না।

মাধব। তা হ'লে—এই বলছিলুম কি—তুমি এই দুটো দিন বরং আমার এখানেই থাকো। ঘরের ছেলে—কেন আর হোটেলে যাবে ? আর বলছিলুম—তোমার কাজে যদি আমিও কিছু সাহায্য করতে পারি—

[ইরা জামা আর থলে নিয়ে এল]

ইরা। একটু ভালো দেখে কিন্তু মাছ এনো বাবা।

মাধব। (জামা পরতে পরতে) সে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক দেখে আনব।

একটু বোসো বাবা কুণাল, আমি আসছি—(বেরিয়ে গেলেন)

কুণাল। (চা শেষ করে) কিভাবে যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইরা !

ইরা। তাই ভাবছি। আচ্ছা কুণালদা—সত্যিই কি হঠাৎ তুমি এসে বাড়ীতে ঢুকে পড়লে ?

কুণাল। ঠিক জানি না। হয়ত হঠাৎ ঢুকে পড়েছি—হয়ত কোথাও একটা চেতনা ছিল। Instinct ! সেই Instinct-ই হয়তো এই আকস্মিক ঘটিয়ে তুলল।

ইরা। তাই হবে। (একটু চুপ করে থেকে) আমাদের কথা তোমার মনে আছে কুণালদা ?

কুণাল। বিলক্ষণ ! মনে আছে বৈকি। দুটি বোন। নীরা আর ইরা। দুটিই ফুলের মতো দেখতে। নীরা খুব কথা বলতে পারত—হাসতে পারত, ফরমাস করলেই গান গাইত একটার পর একটা। আর ইরা ছিল ভারী শান্ত, ভারী ছেলেমানুষ। সবে শাড়ী পরতে শিখেছে তখন—চলতে সে শাড়ী তার পায়ে জড়িয়ে যেত। মনে আছে—সব মনে আছে।

(আশ্চর্য শোনালো কুণালের গলার স্বর। যেন ঘুমের ঘোরে কথা কইছে—যেন স্বপ্ন দিয়ে জড়ানো ; ইরা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।)

ইরা। মনে আছে—সেই যেবারে আমরা নালন্দায় গিয়েছিলুম ?

কুণাল। সব মনে আছে—কিছুই ভুলিনি। বিহারের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তুমি পথ হারিয়েছিলে। গোলক-ধাঁধার মতো ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরগুলোর ভেতরে আর পথ খুঁজে পাও না। তারপর আমি তোমাকে আবিষ্কার করলুম। একটা আধভাঙা বীভৎস তান্ত্রিক মূর্তির সামনে চোখ বুজে তুমি দাঁড়িয়ে। কী ভয় তোমার চোখেমুখে !

ইরা। সেই ভয় আজও তো গেল না কুণালদা। এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। অদ্ভুত হালকা অন্ধকার—হাজার হাজার বছরের স্মৃতি জড়ানো, সারি সারি পাতাল-কুঠুরী। যতই চলি, বেরুবার পথ আর খুঁজে পাই না। তারপর কোথা থেকে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারপর—(আর বলতে পারল না—দু'হাতে মুখ ঢাকল। কুণাল এগিয়ে এসে ইরার মাথায় হাত রাখল)

কুণাল। এত ভয় কেন ইরা ? কিসের এত ভয় ?

ইরা। সে তুমি বুঝবে না কুণাল দা, সে ভয় থেকে আজ আর তুমি বাঁচাতে পারবে না। তুমি জানো না—আজ চোখের জল না মিশিয়ে দিই একমুঠো ভাত

খেতে পায় না—দেনার দায়ে বাবার মাথার ঠিক নেই—আই, এ পড়তে পড়তে আমায় কলেজ ছাড়তে হ'ল। সেই অন্ধকার বীভৎস মূর্তিটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কুণালদা—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে। আজ আমাদের বাঁচাবার কেউ নেই—কেউ নেই!

কুণাল। আমি আছি ইরা—আমি আছি। শুধু আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো। হীরে—অসংখ্য হীরে। চক্‌মক্ করছে—ঝক্‌ঝক্ করছে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তার দাম! দাঁড়াও দাঁড়াও (দরজায় ঘা পড়ল, চমকে উঠল) কে—কে?

[বাইরে থেকে : আমি হরিবল্লভ গোস্বামী]

ইরা। কী সর্বনাশ—বাড়ীওলার সরকার! ভাড়া চাইতে এসেছে। অথচ বাবার হাত এ-মাসে একেবারে খালি।

কুণাল। বেশ তো, সে কথাটা ওকে স্পষ্ট করে বলে দিলেই হয়।

ইরা। (ম্লান হেসে) ওর কথা আরো স্পষ্ট কুণালদা। কী বিশ্রী করে যে বলে সে তুমি ভাবতেও পারবে না।

কুণাল। ভাবতে পারব না? তবে ভাবা যাক একটুখানি। তুমি ভেতরে যাও—আমি দেখছি। (বাইরে কড়া নাড়ল হরিবল্লভ। ডেকে বলল—দরজাটা খুলুন স্যার, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব রাস্তায়) দরজা খোলাই আছে, ঢুকে পড়ুন। (হরিবল্লভ দরজা ঠেলে ঢুকল। কুণাল তাকে অভ্যর্থনা জানাল) আসুন প্রভুপাদ, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

হরিবল্লভ। (থতমত খেয়ে) এর মানে?

কুণাল। মানে পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে পারব না· মৃগচর্মও নেই—এই তক্তপোশেই আসীন হোন।

হরিবল্লভ। কে মশাই আপনি? আপনার এয়ার্কী শুনতে আমি আসিনি। মাধববাবু কোথায়?

কুণাল। মাধববাবু বাজারে গেছেন। তিনি গৃহী মানুষ কিনা—তাই তুচ্ছ সংসারের ভাবনাও তাঁকে অল্প-সল্প ভাবতে হয়। আমাকে তাঁর—হ্যাঁ—ভাইপো বলতে পারেন। তা প্রভুপাদ দণ্ডায়মান কেন? পাড়ার কারুর বাড়ী থেকে কুশাসন চেয়ে আনব কি?

হরি। (একটু চটে) এ রকম করে কথা বলবার মানে কী?

কুণাল। মানে অতি পরিষ্কার। গোস্বামী মানুষ—কপালে ফোঁটা-তিলকও দেখতে পাচ্ছি। তাই একটু সাধুভাষায় অভ্যর্থনা করছিলুম।

হরি। অভ্যর্থনার দরকার নেই। টাকাটা পেলেই চলবে। নিন্—বের করুন।

কুণাল। প্রভু দেখছি বৈষ্ণব মানুষ—তা ভাষাটা শাক্তের মত এমন শক্ত শক্ত কেন? ক' মাসের বাকী?

হরি। ক' মাসের থাকবে আবার? আমাদের মনিব কড়া লোক। ভাড়া তাঁর বাকী থাকতে পায় না।

কুণাল। হুঁ—আপনাকে দেখেই সেটা বোধগম্য হচ্ছে। তা দেবতা, এ মাসে তো টাকাটা পাচ্ছেন না।

হরি। পাচ্ছি না?

কুণাল। না। (মাথা নেড়ে) কোনো চান্সই দেখছি না!

হরি। আহা-হা, শুনে যে শেতল হয়ে গেলুম! ভাড়া দিতে যারা পারে না তাদের বাড়ীতে থাকবার এত সখ কেন, শুনি? গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেই তো পারে।

কুণাল। তাও পারে। তবে কিনা কলকাতা শহরে দাঁড়াবার মত গাছের চাইতে বাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশী। তাই গাছতলার চাইতে বাড়ীই প্রেফার করা ভালো—কী বলেন?

হরি। বাজে বকবেন না মশাই। টাকা আজ না দিলেই চলবে না।

কুণাল। কেন চলবে না প্রভু? যেহেতু কাল শনিবার? রেসে যেতে হবে?

হরি। (দারুণ চমকে উঠলেন) কে—কে বলেছে আমি রেসে যাই?

কুণাল। আপনার বাঁ পাশের পকেটে যে বইখানি উঁকি মারছে প্রভু, ওটিকে তো ঠিক ভাগবত বলে মনে হয় না। ওতে ঘোড়ার মুখ আঁকা আছে। ওর নাম বোধ হয় অশ্বভাগবত? (হরিবল্লভ সচকিতে পকেটে হাত দিয়ে লুকোতে চেষ্টা করল) এখন আর ঢাকা চলবে না দেবতা, রহস্যটি ফাঁস হয়ে গেছে। মনিবের টাকার সদ্গতি যে ভালোভাবেই হয় সে বুঝতেই পারছি। এখন বলুন তো বাড়ীর মালিক কে? কোন্ বিধবা? কোন্ নাবালক? কোন্ বে-হেড্ মাতাল?

হরি। (বিভ্রান্ত) আমি—আমি এখন যাই। পরে এসে মাধববাবুর সঙ্গে দেখা করব।

কুণাল। (পথ আটকালো) দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। জবাবটা দিয়েই যান। কার সর্বনাশ করছেন? কাদের ঘরে তুলসীবনের বাঘ হয়ে চেপে বসেছেন? মনিবের নামটা একটু বলে যাবেন দয়া করে?

হরি। কী পাগলামো করছেন? আমি যাই—

কুণাল। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা? আরে মশাই, মিথ্যা ঘাবড়াবেন না। আমি

কি সত্যিই যাচ্ছি নাকি আপনার মনিবের কাছে ? আমরা যে একই পথের পথিক। রেসের মাঠে আমারও কিঞ্চিৎ আনাগোনা আছে। বললে বিশ্বাস করবেন না—এই দু বছরে এক লাখ টাকার বর পেয়েছি অশ্ব-দেবতার কাছে।

হরি। (বিচলিত) দু'বছরে এক লাখ টাকা ? বলেন কি !

কুণাল। কিছু বেশিও হতে পারে। আর এই নিয়েই তো মশাই কাকার সঙ্গে আমার বনে না। সম্পর্কই রাখতে চান না আমার সঙ্গে। তার ফল দেখুন। কাকা আপনাদের এই এঁদো বাড়ীতে মরছেন—আর আমি লাখ লাখ টাকার হীরে—(জিব কেটে) ছি-ছি, বলে ফেললুম যে।

হরি। হীরে, হীরে কী ?

কুণাল। উঁহু, বলতে পারব না, বলবার জো নেই। হ্যাঁ রেসের মাঠ—রেসের মাঠই আমার বরাত ফিরিয়েছে।

হরি। ইয়ে, কিছু মনে করবেন না। খুব ভালো 'টিপ্‌স' জানা আছে বুঝি আপনার ? (একটু ইতস্তত) মানে, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন ? (গলা নামিয়ে) পর পর চারটে শনিবার যা হেরেছি—জানেন—

কুণাল। জানি বইকি। বাড়ীভাড়া আদায়ের নমুনা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

হরি। তাই বলছিলুম কি—আপনারা তো কপালে লোক স্যার—যদি একটু হেল্‌প করতেন—

কুণাল। হেল্‌প—?

হরিবল্লভ। মানে, গরীবকে দয়া যদি একটু করেন—মানে—

কুণাল। মানে আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার যা কথাবার্তার ধরণ—কাকাকে যে ভাবে আপনি অপমান করেন, তাতে কোন মায়া হয় না আপনার ওপর।

হরি। দেখুন—উপায় নেই যে ! পরের চাকরি করি—

কুণাল। Shut up ! আবার মিথ্যে কথা ! কোন্ নাবালক কিংবা বিধবার মাথায় কাঁঠাল ভাঙছেন আপনিই জানেন। যাক, পরে দেখা করবেন, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।

হরি। বলছিলুম কি স্যার—এক-আধটা ইয়ে যদি—

কুণাল। বললুম তো, পরে দেখা করবেন। আর টিপ্‌স তো অমনি হয় না দেবতা—ও হ'ল Give and take-এর-ব্যাপার। সে কথাটাও ভেবে রাখবেন। আচ্ছা আসুন এখন—

হরি। তা তো বটেই। Give and take-এরও একটা বন্দোবস্ত—

কুণাল। পরে—পরে। এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না। আচ্ছা আসুন নমস্কার—

হরি। ন্‌-নমস্কার—(কেমন বিচলিত হয়ে বেরিয়ে গেল)।

কুণাল। (এগিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। ডাকল) চলে এসো ইরা—অল ক্লিয়ার—(ইরা ফিরে এল)

ইরা। (স্বর একটু সন্দিগ্ধ) দরজার ওপার থেকে সব শুনেছি আড়ি পেতে। কিন্তু কুণালদা, তুমি কি সত্যিই রেসের মাঠে—

কুণাল। (আবার হেসে উঠল) রেসের মাঠ! ট্রামে যেতে দূর থেকে দেখেছি।

ইরা। তবে এসব কথা—

কুণাল। কিছু না, কিছু না, গোসাঁইজীর সঙ্গে একটু শাস্ত্র-চর্চা করছিলুম আর কি। ভগবানের নাম করলে দিনটা ভালো যায়।

ইরা। কিন্তু ও যে সত্যিই বিশ্বাস করল?

কুণাল। করবে বৈকি। পৃথিবীর সমস্ত চালাক লোকেরই একটা দুর্বল জায়গা আছে। সেখানটায় সে একেবারেই নির্বোধ। গোসাঁইজীর মুখের চেহারা দেখেছিলে?

ইরা। দেখেছি বই কি। আবার আসবে মনে হল।

কুণাল। হ্যাঁ, তা আসবে। কিন্তু টাকা চাইতে নয়। এরপরে যখন আসবে, তখন ছ'মাস যাতে বাড়ীভাড়া দিতে না হয়, তার ব্যবস্থাই করে দেব।

ইরা। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে) কুণালদা, তোমাকে যে কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাঁচাবার জন্যই তুমি আজ আমাদের বাড়ী এসে পা দিয়েছ। নইলে হরিবল্লভবাবু—

কুণাল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। সেই হীরেগুলো যদি একবার তুলে আনতে পারি—

ইরা। তখন থেকে খালি হীরের কথা বলছো তুমি। কিসের হীরে কুণালদা?

কুণাল। ওঃ, তোমাকে এখনো বলিনি বুঝি? বলব—বলব, কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্যের কথা, সব বলব তোমাকে। সময় হোক, সমস্ত জানবে তখন। তার আগে একটু স্নান করতে চাই, মাথাটা বড়—

ইরা। বেশ তো, এস ভেতরে—

[ইরা আর কুণাল ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেল; একটু পরে রাস্তার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল পূর্ণেন্দু। বছর ছাব্বিশ বয়স হবে। ভীরু নির্জীব ধরণের চেহারা। সম্প্রতি একটু উত্তেজিত ভঙ্গী। পূর্ণেন্দু এসে তাকালো এদিক-ওদিক। কাউকে দেখতে পেল না। ইজিচেয়ারে বসে আড়মোড়া

ভাঙল, খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পরে ইরা এল]

ইরা। পূর্ণেন্দুদা যে!

পূর্ণেন্দু। (কাগজ থেকে মুখ না তুলেই) হুঁ!

ইরা। কখন এলেন? ডাকেননি কেন?

পূর্ণেন্দু। হুঁ!!

ইরা। দিদিকে একবার নিয়ে এলেন না কেন? আজ ছ'মাসের ভেতরও দিদিকে দেখিনি।

পূর্ণেন্দু। (কাগজে চোখ রেখেই) দেখবে। রোজই দেখতে পাবে এরপর থেকে। সারাজীবন।

ইরা। সে কি!

পূর্ণেন্দু। সেই কথাই বলতে এসেছি শ্বশুরমশাইকে। ও স্ত্রীকে নিয়ে আমার আর ঘর করা চলল না।

ইরা। পূর্ণেন্দুদা!

পূর্ণেন্দু। আমার কোনো হাত নেই। বাবা বলেছেন, জুয়াচোরের মেয়ের জায়গা হবে না আমার বাড়ীতে।

ইরা। আমার বাবাকে আপনারা জুয়াচোর বললেন পূর্ণেন্দুদা!

পূর্ণেন্দু। আমি বলিনি—সবাই বলছে। বিয়ের সময় যে ঘড়িটা দিয়েছেন, বাবা যাচাই করে দেখেছেন তার দাম আটচল্লিশ টাকা। চুড়ি দিয়েছেন ব্রোঞ্জের ওপর সোনার রং ধরিয়ে। ফার্নিচারগুলো—

ইরা। থাক থাক, আর বলতে হবে না। কিন্তু আপনারা কি মনে করেন, ইচ্ছে করে বাবা ঠকিয়েছেন তাঁর নিজের মেয়েকে? আপনারা কি জানেন, দিদির বিয়ের দেনায় বাবার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে? জানেন আমরা সেজন্যে আজ পথে বসতে চলেছি?

পূর্ণেন্দু। সে আমাদের জানবার কথা নয়। বামন হয়ে চাঁদে হাত না বাড়ালেই তো পারতেন।

[ভেতরের দরজার সামনে দেখা দিল কুণাল—সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল]

ইরা। ঠিক কথা—বাবাই ভুল করেছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর সর্বস্ব বিকিয়ে মেয়েকে এমন ঘরে দিয়েছেন যেখানে সে সুখে থাকবে। কিন্তু জানতেন না, তেলে আর জলে মিশ খায় না।

পূর্ণেন্দু। ঠিক। সেইজন্যেই জলটাকে ফিরিয়ে দিতে চাই। শ্বশুরমশাইকে জানিয়ে

—ঘড়ি আর চুড়ির ব্যাপারটা যদি এ মাসের মধ্যেই মিটিয়ে না দেন—তাহলে তাঁর মেয়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসবে।

ইরা। কিন্তু দিদির কী হবে ? এমন লেখাপড়াও শেখেনি যে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে।

পূর্ণেন্দু। সে আমার ভাববার কথা নয়। বাবা আমাকে যা বলতে বলেছেন—তাই জানিয়ে গেলুম।

ইরা। (আর্তস্বরে) বিনা দোষে দিদির কত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন—সেটা কি একবারও চিন্তা করবেন না আপনারা ? আপনাদের কিসের অভাব পূর্ণেন্দুদা ? অত বড় বাড়ী—অত টাকা ! আপনিও তো নিজে ভালো রোজগার করেন। কেন এমন করে—

পূর্ণেন্দু। আমি জানি না—বাবা জানেন। (একটু ইতস্তত করে) কথাটা কি জানো, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে আমারও বিশেষ ইচ্ছে নেই। কাল যখন সে আমার পায়ে ধরে কাঁদছিল—সত্যি বলতে কি, খুব মায়াই হচ্ছিল আমার। কিন্তু কি করি বলো। বাবার এক কথা। সে যাক। আমার যা বলবার তা বলেছি, এবার আমি চললুম—

ইরা। কিন্তু আইনত—

পূর্ণেন্দু। খোরপোষ ? বাবা বলেছেন, কোর্ট থেকে মামলা করে নিতে। আরো বলেছেন, উকিলকে টাকা না খাইয়ে তা দিয়ে ঘড়ি আর চুড়ির ব্যবস্থা করে দিলেই শ্বশুরমশাই বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। আচ্ছা, চলি—

কুণাল। একটু দাঁড়ান মশাই—আলাপ করা যাক আপনার সঙ্গে।

[ইরা ও পূর্ণেন্দু দুজনেই চমকে উঠলো]

পূর্ণেন্দু। (ভ্রূকুটি করে) আপনি আবার কে ?

কুণাল। সেটা আপাতত না জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনিই বুঝি নীরার পতি-দেবতা ? তা ভালো—চেহারাটি জামাই হওয়ার মতোই বটে। কিন্তু পিতৃভক্তিতে যে দেখছি সাক্ষাৎ রামচন্দ্র !

ইরা। (কাতর ভাবে) কুণালদা—দোহাই তোমার—এসব কথার ভেতরে—

কুণাল। Wait—wait a minute ! ভালো কথা—কী নাম যেন শুনলুম আপনার ? পূর্ণেন্দু ? তা পূর্ণিমার চাঁদই বটে ! নির্মল—নিষ্কলঙ্ক একটি আদর্শ পূর্ণচন্দ্র —I mean পুত্রচন্দ্র। বেশ সেই কথাই ভালো। তা পুত্রচন্দ্র—তোমাকে আর আপনি বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। নীরাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা শোভা পায় না।

পূর্ণেন্দু। দেখুন মশাই—

কুণাল। তেজ দেখিও না—সাত বৎসর পরেও যুযুৎসুর একটা প্যাঁচও আমি ভুলিনি। অপদার্থ, ব্যাকবোনলেস, কাওয়ার্ড! নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারো না, তাকে মর্যাদা দিতে পারো না—বিয়ে করবার 'রাইট'ই তোমার নেই। ফিরিয়ে দিও নীরাকে—তাকে মাথায় করে নিয়ে যাবে এমন লোকও সংসারে আছে!

পূর্ণেন্দু। কী বললেন? আমার স্ত্রীকে পরপুরুষ—

কুণাল। চোপরাও! তোমার স্ত্রী! তোমার মতো Imbecile-এর কোনো স্ত্রী থাকতে পারে না। নীরা তোমার কেউ নয়। এক পয়সার খোরপোষ সে ভিক্ষে চায় না—বরং মামলা করে সে legal seperation আদায় করে নেবে। হ্যাঁ—টাকা চাইছিলে না? কত টাকা হলে তোমার ঘড়ি-আংটি হয়? পাঁচশো—হাজার? দাঁড়াও—(পকেট থেকে চেক-বই বার করে টেবিলের সামনে গিয়ে খসখস করে লিখল, তারপর চেকটাকে ছুঁড়ে দিল পূর্ণেন্দুর মুখে) দু'হাজার টাকা দিচ্ছি তোমার স্ত্রীর দাম। আশা করি এবার স্ত্রীটিকে আমার কাছে পৌছে দিয়ে যাবে। ট্যাক্সি করেই এনো—ভাড়াটা আমিই দেব।

পূর্ণেন্দু। (অপমানে সাদা হয়ে গেল) দেখুন—

কুণাল। (চিৎকার করে) আর একটা কথাও নয়। গো—গো আউট—(পূর্ণেন্দু চমকে বেরিয়ে যাচ্ছিল) তুলে নিয়ে যাও চেকখানা (বিভ্রান্ত পূর্ণেন্দু তুলে নিল)—বেরোও—

[প্রায় ছুটেই পালালো পূর্ণেন্দু; বাজার নিয়ে ঢুকছিলেন মাধববাবু—একটা ধাক্কা খেলেন তিনি—পড়তে পড়তে সামলে নিলেন]

মাধব। (বিভ্রান্ত) এ কি—এ কি! কী হয়েছে ইরা?

কুণাল। ও কিছু না কাকা—কেবল একটুখানি শক্-থেরাপি—হা-হা-হা—(গলা খুলে হেসে উঠল)

—পর্দা—

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সেই ঘর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছোট টেবিলটির সামনে বসে ইরা পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'। কবিতাটি 'সবলা']

ইরা। (আবৃত্তির ভঙ্গিতে)

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগ
ক্লান্ত ধৈর্যে প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ—

(অন্যমনস্ক ভাবে) ঠিক। এই কথাই তো কুণালদা বলছিল।

[মাধব ঢুকলেন। খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরছেন মনে হল। ইজি-চেয়ারটাতে শুয়ে পড়লেন। ইরা তাকালো তাঁর দিকে]

ইরা। কোথায় গিয়েছিলে বাবা?

মাধব। কোথায় আর যাব? একটু (ইতস্তত করে) খবরের কাগজের আপিসটা একবার ঘুরে এলুম।

ইরা। কাগজের অফিস? কেন?

মাধব। কিছু না—সেই পাগলামি। মানে সেই নম্বরটা। দেখলুম ভুল ওদের হয়নি—সেটা আমার কপালেই বিধাতাপুরুষ লিখে রেখেছেন। ভাবলুম একবার গঙ্গার ধারে যাই—মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। তা-ও হল না। কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছে। (গলা নামিয়ে) হাঁ রে, পূর্ণেন্দু নীরাকে এনে রেখে দিয়ে যায়নি?

ইরা। না, বাবা।

মাধব। তা হলে আজ সারাদিন দুঃখ দেবে মেয়েটাকে—সারারাত কাঁদাবে। ফিরিয়ে দেবার আগে যত পারে লাঞ্ছনা করবে। ওর শ্বশুরকে তো জানি—এ অপমান সইবার লোক সে নয়। (একটু চুপ করে থেকে) কুণাল এখানে কেন এল বল দিকি? কেন সে আমাদের সর্বনাশ করতে চায়?

ইরা। ছিঃ বাবা, কেন বলছ এ-কথা? কুণালদা তো আমাদের ভালোই করেছেন।

মাধব। ভালোই করেছে? তোকেই আমি দুবেলা পেটপুরে তো খেতে দিতে পারি

না মা, আর নীরা এলে—

ইরা। (বাধা দিয়ে) ও বাড়িতে অমন করে পড়ে থাকার চাইতে এখানে সবাই মিলে না হয় আধপেটা করেই খাবো বাবা, সে অনেক ভালো।

মাধব। কথাটা শুনতে মন্দ নয় মা—কিন্তু—

ইরা। কেন তুমি ভাবছ বাবা? আই-এ পর্যন্ত তো পড়েছি। কাজ একটা আমিও জুটিয়ে নেব। নইলে টিউশন। যতটা পারি সাহায্য করব তোমাকে।

মাধব। চাকরি করবি? তুই? তুই যে বড্ড লাজুক মা। কলকাতার পথ-ঘাটে কখনও একা বেরুতে পর্যন্ত শিখিসনি।

ইরা। সেইখানেই তো ভুল হয়েছে বাবা। এ যুগের সব মেয়ে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, তখন ঘরে বসে আমি কেবল দুঃখের ভারই বাড়িয়েছি তোমার—কেবল আড়ালে চোখের জলই ফেলেছি। এ লজ্জা আমারও আর সইছে না।

মাধব। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। সারা দুপুর বসে তোর কাছে এই সবই লেকচার দিয়েছে কুণাল!

ইরা। হ্যাঁ বাবা, কুণালদাই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আর পূর্ণেন্দুদাও। দিদির অবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছি, নিজের জোর না থাকলে, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে মেয়েদের দাঁড়াতে হয়।

মাধব। ভালো, ভালো। চমৎকার কথা। (গলায় ব্যঙ্গের সুর) তা চাকরিটা পাওয়া যাবে কোথায়?

ইরা। জানি না, কাল থেকে খুঁজব।

মাধব। কোথায় খুঁজবে? তুমি কোনোদিন একা রাস্তায় পা দাওনি। কিছুই চেনো না।

ইরা। পা বাড়ালেই চেনা হয়ে যাবে। অনেক মেয়েকেই এমনি করে চিনতে হয়েছে।

মাধব। হুঁ, কুণালের হাতযশ আছে দেখছি। বেশ, যা ভালো বোঝো করো। আমি আর ভাবব না, আমার সব ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।

ইরা। সেই কথাই ভালো বাবা। এবার তোমার ভাবনা আমাদেরও ভাগ করে দাও।

মাধব। কুণাল কোথায়?

ইরা। বিকেলে বেরিয়ে গেছে। এখুনি হয়তো ফিরবে।

মাধব। কোথেকে যে ধূমকেতুর মত এল। জানি না আমার কী সর্বনাশ করে ও...

এখান থেকে যাবে !

ইরা। ছি: বাবা—আবার ওই কথা ? বৃন্দাবনদা আমাদের সর্বনাশ করতে আসেনি —বাঁচাতে এসেছে।

(বাইরে থেকে বৃন্দাবনের ডাক : মাধববাবু, আছেন নাকি মশাই ?)

মাধব। আঃ, আবার সেই শকুনটা এসেছে—সেই বৃন্দাবন। গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেতে চায়। তুই ভেতরে যা ইরা। (ইরা চলে গেল) আসুন—(বৃন্দাবন ঢুকলেন) এই যে, তা কী ঠিক করলেন ? জেলেই দেবেন আমাকে ?

বৃন্দাবন। কী যে হয়েছে মশাই আপনার ! সকাল থেকে কেবল পাগলামো করছেন। আমি একটা ভালো প্রস্তাবই এনেছি আপনার কাছে।

মাধব। ভালো প্রস্তাব ? Merchant of Venice পড়েছেন ?

বৃন্দাবন। না, সে আবার কী ?

মাধব। লক্ষ্মীর পায়ে তাঁর প্যাঁচাটি হয়ে বসে আছেন—সরস্বতীর ছায়াও তো কোনোদিন মাড়াবেন না। ও একখানা নাটক। শেক্সপীয়র নামে এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন।

বৃন্দাবন। আপনার হল কী মশাই ? বুড়ো বয়েসে আবার থিয়েটার করবার সখ চাগালো নাকি ? হা-হা-হা ! (হাসি)

মাধব। কথাটাকে উড়িয়ে দেবেন না—কান দিয়ে শুনুন। সেই নাটকে আছে, একজন মহাজন শর্ত করেছিল সময়মতো টাকা দিতে না পারলে খাতককে আধসের গায়ের মাংস কেটে দিতে হবে। আপনি তাই করুন না। আপনারও ক্ষোভ মেটে—আমিও দায়মুক্ত হই। তা যদি অনুমতি করেন তাহলে ছুরি আনাই ভেতর থেকে।

বৃন্দাবন। রাম রাম। কী যে বলেন ! বিষ্ণু বিষ্ণু। আমাকে কি কশাই পেলেন আপনি ? আরে মশাই, টাকার কথা বলতে আমি আসিনি। আপনার উপকারের জন্যই এসেছিলুম।

মাধব। উপকার ? আমার ? (হেসে উঠলেন)

বৃন্দাবন। ওই দেখুন—আবার হাসতে শুরু করলেন ! কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

মাধব। সকাল থেকে ভাবছিলুম একটা মিরাক্‌ল্ কোথাও ঘটবে ! নইলে আপনি বৃন্দাবন ঘোষ—আপনিও আমার উপকার করতে চান ?

বৃন্দাবন। কেন—করিনি নাকি ? বিপদে টাকা ধার দিয়েছিলুম, সেটা চাইতেই বড় অপরাধ হয়ে গেল ! দুনিয়াটা এমনি নিমকহারামই বটে। সে যাক— কাজের কথা শুনুন। বেশ মন দিয়ে শুনুন।

মাধব। মন-প্রাণ-কান সব খাড়া করেই রেখেছি। বলে ফেলুন দয়া করে।

বৃন্দাবন। বলছিলুম কি, আপনার ছোট মেয়েটির বিয়ে দেবেন না?

মাধব। তাতে আপনার কী? পণ দিয়ে তো কেউ আমার মেয়ে নেবে না যে তাই দিয়ে আপনার দেনা শোধ করব।

বৃন্দাবন। আঃ, কথাটা বলতেই দিন না। শুনুন—একটা ভালো সম্বন্ধ এনেছি। খুব অবস্থাপন্ন ঘর—আর এক পয়সাও পণ দিতে হবে না।

মাধব। বটে—বটে! কে এমন রাজপুত্তুর, আমার ভাঙা ঘরের দিকে যার হঠাৎ নজর পড়ল?

বৃন্দাবন। আমার ছেলের কথাই বলছি। নিতাই।

মাধব। কী বললেন? (প্রচণ্ড চমকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন) কী বললেন?

বৃন্দাবন। বললুম তো—আমার ছেলে নিতাই। মানে নিত্যানন্দ।

মাধব। এতক্ষণে বোঝা গেল। (তিক্ত হাসিতে ভরে উঠল মুখ) তা চমৎকার ছেলেটি আপনার। শুনেছি—মদ-টদ তার ভালোই চলে।

বৃন্দাবন। মায়ের আদুরে ছেলে—বাপের পয়সা আছে—তায় অল্প বয়েস—ওসব ধরতে আছে নাকি? বড় হলেই শুধরে যাবে।

মাধব। লেখাপড়াও বোধ হয় শেখেনি।

বৃন্দাবন। কী দরকার মশাই? বলি দরকারটা কী? বি-এ, এম-এ সব পাস করে কী জন্যে? স্রেফ চাকরি করবে বলেই তো? আমার ছেলেকে চাকরি করতে হবে না। চোখ বুজে শুধু বড়বাজারের গদীতে বসে থাকবে—ব্যাস, আর কিছু ভাববার নেই।

মাধব। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আরো দু'একটা কথা আছে। আপনার এই ছেলেই না চৌরঙ্গীর হোটেলে কী একটা কেলেঙ্কারি করে তিন মাস জেল খেটেছিল?

বৃন্দাবন। খেটেছিল তো কী হয়েছে? পুরুষমানুষের একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ই। ও নিয়ে অত ধরতে আছে নাকি? একটু বড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মেয়েটি মশাই দেখতে বেশ, স্বভাবটি ভালো—দুদিনেই ছেলেকে ঘরমুখো করতে পারবে। রাজী হয়ে যান মশাই—রাজী হয়ে যান। শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে সম্প্রদান করবেন—একটি পয়সাও খরচ নেই। আর আপনার হ্যাণ্ডনোটটাও আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।

মাধব। চমৎকার—অতি চমৎকার প্রস্তাব!

বৃন্দাবন। আপনার উপকারের জন্যই বলা। নইলে আমার ছেলের কি আর পাত্রী জুটছে না?

মাধব। কেন জুটবে না? বাংলা দেশের কশাইখানার জন্যে পাঁটা, আর বিয়ের জন্য মেয়ের কখনো অভাব হয় না। আসল কথাটা কি জানেন, আপনার ছেলের এমন সুনাম রটেছে যে বড় ঘরের কেউ ও ছেলেকে মেয়ে দেবে না— তাই আপনি আমাকে অনুগ্রহ করতে এসেছেন!

বৃন্দাবন। খুব বুঝলেন! ভালো করতে চাইলে এমনিই হয়!

মাধব। হাঁ, ভালো করতে চাইছেন—সন্দেহ কী! সেই জন্যেই তো Merchant of Venice-এর কথা বলছিলুম। সে লোকটা কেবল বুক থেকে একবারেই মাংস নিতে চেয়েছিল, আপনি সারা জীবনের জন্যে গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেবার ব্যবস্থা করছেন।

বৃন্দাবন। আবার পাগলামো করছেন? মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবেই দেখুন না। অল্প বয়সে একটু-আধটু বখামো কত লোকেই তো করে—তাই বলে তারা কি আর শুধরে যায় না? আপনাকে ঋণমুক্ত করবার জন্যেই কুটুম্বিতা করতে চেয়েছিলুম। তা আপনি এমন আরম্ভ করে দিয়েছেন—

(ইরা ঢুকল। দুজনেই চমকে উঠলেন)

ইরা। আমার একটা কথা শুনবেন?

মাধব। তুমি এখানে কেন ইরা? ভেতরে যাও।

ইরা। ভেতরেই তো ছিলুম বাবা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলুম না। (বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে) আপনি তো বাবাকে ঋণমুক্ত করতে এসেছেন, একটা কথার জবাব দেবেন আমার?

মাধব। ইরা—

ইরা। বাধা দিও না বাবা, আমি শুধু একটা—একটা কথাই জিজ্ঞাসা করব। (বৃন্দাবনকে) শুনুন, আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হতুম—তাহলে কি আপনি এমন একটি পাত্রের হাতে আমায় তুলে দিতে পারতেন?

বৃন্দাবন। (ঘাবড়ে গিয়ে) আমি—আমি—

ইরা। বলুন—জবাব দিন। আমি আপনার মেয়ে হলে পারতেন এ-কাজ করতে? শুধু একবার বলুন, তাহলেই এ বিয়েতে আমি রাজি আছি। বলুন—

(ইরার চোখ জলতে লাগল। মাধববাবু হতবাক। ইরার চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ছট্‌ফট করে উঠলেন বৃন্দাবন)

বৃন্দাবন। (উঠে দাঁড়িয়ে) মাধববাবু, আমি বরং আজ—(যাওয়ার উপক্রম, ইরা পথ আটকালো)

ইরা। একটু দাঁড়ান। আমাকে দিয়েই বাবার ঋণ শোধ করতে চান, এই তো ? বেশ, সেই সুযোগই আমায় দিন। আমি আই-এ পর্যন্ত পড়েছি। আপনি বড়লোক—কত জানাশুনো আছে আপনার—দিন না আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে। একশো, আশী, পঞ্চাশ, ষাট—যে কোনো মাইনে। সেই টাকার অর্ধেক দিয়ে আমি মাসে মাসে বাবার দেনা শোধ করে দেব।

মাধব। ইরা—

ইরা। না, বাবা, না। উনি আমাদের দয়া করতে এসেছেন। সে সুযোগ ছাড়ব কেন ? পারেন না আপনি ? আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন না ? না আমরা অসহায় বলে কেবল হাড়িকাঠে ফেলে আমাদের বলিই দিতে পারেন ? (ইরার চোখে জল এসে গেল)

বৃন্দাবন। থাক, মা, থাক। আর আমায় বলতে হবে না—আর আমায় লজ্জা দিও না তুমি। আমি কথা দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যেই একটা চাকরি তোমার যোগাড় করে দেব। তারই মাইনের টাকায় তুমি আমার দেনা শোধ কোরো। তোমার ভালো হোক মা—তুমি সুখী হও। (বৃন্দাবন দ্রুত বেরিয়ে গেলেন)

মাধব। (স্তম্ভিত ভাবে) এ কী করলি মা—এ কী হল !

ইরা। কুণালদা আমাকে শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলছিলেন বাবা। বলো—আমি কি অন্যায় করলুম ?

মাধব। জানি না—কিছু জানি না। আমার মাথা ঘুরছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু শোবো।

ইরা। (কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহে) তাই শোও গে বাবা। একটু বিশ্রাম করো। খাবার তৈরি আছে, একটু পরেই তোমায় আমি খেতে দেবে।

মাধব। তাই যাচ্ছি। কিন্তু কুণাল—কুণাল কোথায় গেল ?

ইরা। কুণালদা আসবে এখন, ভেতরে যাও।

(মাধব চলে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইরা। তারপর এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। বসল। 'সঞ্চয়িতা' খুলে আবার পড়তে আরম্ভ করল : "হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা। রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা। উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে, নির্বারিত স্রোতে"—দরজায় ধাক্কা পড়ল। ইরা দাঁড়িয়ে উঠল। একটা সুটকেস হাতে ধরে ঢুকল নীরা।

নীরার বয়েস বছর-কুড়ি। চেহারায়, মুখের গড়নে তাকে দেখলে

ইরার বোন বলে চেনা যায়। ইরার চাইতে নীরা একটু লম্বা। মুখ শুকনো, রুক্ষ চুল। পরনে আধময়লা রঙীন শাড়ী। ইরা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।)

ইরা। দিদি !

নীরা। চলে এলুম বোন। তাড়িয়ে দেবার আগেই পালিয়ে এলুম। (শুকনো শান্ত গলায় বলে চলল) ছাখ্, ও বাড়ির একটুকরো কাপড়ও আমি সঙ্গে করে আনিনি।

(ইরা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেলল)

ইরা। দিদি—দিদি, তোর কী হবে দিদি ?

নীরা। কাঁদিসনি বোন—কাঁদিসনি। (ইরাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল) পথে নামলেই এগিয়ে যাওয়া যায়। আমিও নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করব। তুই শান্ত হ।

(দুই বোন তক্তপোশে বসল)

ইরা। (চোখ মুছতে মুছতে) তুই কী করবি দিদি ? লেখাপড়া তো কিছু শিখিস নি ?

নীরা। গান শিখেছিলুম। কোনো স্কুলে গানের টিচারী খুঁজব। নইলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখাব। তা-ও যদি না জোটে, ঠোঙা তৈরি করে বেচব, ক্যানভাসারের কাজ করব। আজ বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই তো এমনি করে বাঁচতে হয় ইরা।

ইরা। এত বড়লোকের স্ত্রী হয়ে শেষে তুই—

নীরা। না বোন, সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। গরীবের মেয়ে কখনো বড়লোকের স্ত্রী হতে পারে না—দুটো জাতই একেবারে আলাদা। শোন্—বাবা কই রে ?

ইরা। ভেতরে। শরীর ক্লান্ত—শুয়ে পড়েছেন। যাবি বাবার কাছে ?

নীরা। যাব—একটু পরে। তার আগে তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।

ইরা। কী পরামর্শ দিদি ?

নীরা। তুই আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলি। আমি গান জানি। (কুণাল নিঃশব্দে ঢুকল—দাঁড়িয়ে পড়ল। ইরা-নীরা তাকে লক্ষ্য করল না) ধর—দু-বোনে মিলে যদি পাড়ার বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল করি ? তুই পড়াবি—আমিও অ আ ক খ দেখিয়ে দেব, গান শেখাব। যদি দশ-পনেরোটি বাচ্চাও আসে—পাঁচ টাকা করে দেয়, তা হলেও আমরা দু-বোনে ষাট-সত্তর টাকা

রোজগার করতে পারি। কী বলিস ?

ইরা। মন্দ নয়—চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ঘর কোথায় পাবি ?

নীরা। একটা খুঁজতে হবে। আপাতত আমাদের এই বাইরের ঘরটাতেই তো শুরু করা যায়। সকালে ঘণ্টা চারেক। বাবার মত নিশ্চয় পাওয়া যাবে, না রে ?

ইরা। তা পাওয়া যাবে—বাবা হয়তো খুশিই হবেন। কিন্তু—

(কুণাল এগিয়ে এল)

কুণাল। কিন্তু নেই। চমৎকার প্রস্তাব। আমি দারুণভাবে সমর্থন করছি। এবং আরো বলছি, ভালো কাজে দেরি করতে নেই।

(দুই বোনই চমকে উঠল, বেশি করে চমকালো নীরা।)

নীরা। কে আপনি ? ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছেন কেন ?

কুণাল। ইরা, জবাব দাও।

ইরা। চিনতে পারলিনে দিদি ? ও যে আমাদের কুণালদা। পাটনার সেই কুণালদা। একটু কাজে কলকাতায় এসেছেন। আজ সকালেই।

নীরা। পাটনার কুণালদা ! (থমকে গিয়ে পরক্ষণেই চিনতে পারল) তাই তো ! আমি তোমাকে একেবারেই—(এগিয়ে প্রণাম করতে চেষ্টা করল, কুণাল বাধা দিলে)

কুণাল। উঁহু উঁহু, আমাকে নয়। প্রণামটা দামী জিনিস, যত্রতত্র বাজে খরচ করতে নেই ভাই। (হেসে) তা ছাড়া শ্রীপাদপদ্ম তো দেখছ—হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। ভক্তিটা ভালো, কিন্তু রোগের ব্যাক্টিরিয়া ভালো জিনিস নয়।

(নীরার শুকনো মুখেও একটু ম্লান হাসি ফুটল)

নীরা। তুমি এখনো তেমনি রয়েছ কুণালদা। একটু বদলাও নি।

কুণাল। বদলাইনি ? কিন্তু তোমরা তো কেউ আমায় চিনতে পারোনি ! তা ছাড়া—তা ছাড়া ওরা যে বলে, আমার—আমার—

ইরা। কারা বলে কুণালদা ? কী বলে তোমাকে ?

কুণাল। কিছু না—কিছু না। (হঠাৎ তীব্র স্বরে) They say—let them say ! আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না—কাউকে নয়। আমি জানি, সকলেই আমার গোপন—না—না। (হঠাৎ থেমে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এল) ও কিছু নয়। আমি বলছিলুম কি, তোমাদের দু'জনের প্ল্যান আমি শুনেছি। খুব ভালো প্রস্তাব—কাল থেকেই কাজ শুরু করো। নীরা, start life anew !

নীরা। (সংকুচিত হয়ে) কুণালদা, আমার সম্পর্কে তুমি—

কুণাল। কোন লজ্জা নেই নীরা—আমি সব জানি। কারণ এই ঘরে কয়েক ঘণ্টা আগেই তোমার সেই পূর্ণচন্দ্র স্বামী—সরি—পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ রসালাপ হয়ে গেছে।

নীরা। (শুকিয়ে গিয়ে) তাঁর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে? কী বলেছেন তিনি?

ইরা। (সভয়ে) থাক থাক কুণালদা—ওসব থাক এখন।

কুণাল। হ্যাঁ, সে-সব কথা না হয় পরেই হবে। তিনি যখন তোমাকে কিছু বলেননি, তখন আমিও না হয় সে কথাগুলো আপাতত না-ই শোনালুম। তা সেই গ্রেট ম্যানটি কোথায়?

নীরা। আমি পালিয়ে এসেছি। (মাথা নীচু করে) কেউ জানতে পারেনি।

কুণাল। A fugitive from the chain gang! পালিয়ে আসোনি—মুক্তি পেয়েছ! শেকল-কাটার যন্ত্রণা হয়তো কিছুদিন থাকবে—তারপরেই মুছে যাবে সমস্ত। আর আমি বলছি—ছ'মাস সময় দাও আমাকে। এক লাখ টাকা এনে দেব তোমাদের, গড়ে দেব প্রকাণ্ড কিণ্ডারগার্টেন স্কুল—দেব সমস্ত মডার্ন ইকুয়িপমেণ্টস্—পাড়ার সব ছেলেমেয়ে সেখানে বিনি পয়সায় পড়তে পারবে।

নীরা। এক লাখ টাকা দেবে কুণালদা? বলো কি!

কুণাল। এক লাখে না হয়, দু লাখ। দু লাখে না কুলোয়—তিন লাখ। সেই কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য তো সারা ভারতবর্ষের জন্যেই। এডুকেশন—ইন্‌ডাস্ট্রি—কালচার—

নীরা। (অবাক হয়ে) তুমি বড়লোকের ছেলে তা জানি, কিন্তু কোটি কোটি টাকা—

কুণাল। জানি—জানি। (হাসল) কেউ বিশ্বাস করে না, তুমিও করবে না। তবু বলছি। আর ক'দিন আমায় সময় দাও—তারপর সারা দেশের আইডিয়াল হয়ে উঠবে তোমাদের এই কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আজ এখনি তার শুভ—কী বলে, শুভ উদ্বোধন হয়ে যাক। নীরা, ওপেনিং সং! আর আপাতত আমিই সভাপতির আসন গ্রহণ করছি। (ধপাস্ করে ইজি-চেয়ারটায় বসে পড়ল) কই নীরা, গান ধরো!

নীরা। গান গাইব? এখন? তুমি কি ঠাট্টা করছ কুণালদা?

কুণাল। ঠাট্টা? কুণাল দত্ত জীবনে এর চাইতে সিরিয়াস হয়নি। ধরো নীরা!

নীরা। আমি পারব না কুণালদা—মাপ করো। গান গাইবার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নয়।

কুণাল। কী, মন খারাপ করছে? যে খাঁচা থেকে পালিয়ে এসেছ—তার জন্যে? Well, this is opium! বাঙালী মেয়েদের জন্ম-জন্মান্তরের অভিশাপ! সেই পূর্ণেন্দু—সেই রাস্কেল—

নীরা। বোলো না কুণালদা—দোহাই তোমার, অমন করে বোলো না। আমি আর সইতে পারছি না—

(আঁচলে মুখ ঢাকল)

ইরা। দিদি—দিদি—

কুণাল। (ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো) আই অ্যাম সরি। আশ্চর্য মেয়েদের মন! তোমরা কুষ্ঠরোগী স্বামীকেও পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাও তার বিকৃত লালসা মেটাতে! তোমাদের শ্রদ্ধা করব, না ঘৃণা করব তা আমি এখনো বুঝতে পারি না! (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু গান যে গাইতেই হবে—হাঁ. নতুন করে বাঁচবার গান! যে গান মোহ দূর করে—যে গান শক্তি দেয়—যে গান সমস্ত পঙ্কের মধ্য থেকে এক-একটি পাপড়ি মেলে দেয়—আলোর পদ্মের মতো ফুটে ওঠে। ইরা, উদ্বোধন সঙ্গীত কি তাহলে হবে না?

(কিছুক্ষণ স্তব্ধতা)

ইরা। হবে কুণালদা। আমিই গাইছি—

(গান ধরল)

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে-বার—"

(জলে ভেজা চোখ তুলে নীরা ইরার দিকে তাকালো; কুণাল চেয়ারের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ইরা গেয়ে চলল:)

"খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তি নিশীথ করিস যাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার—"

(গানটা শেষ হল না, ধড়াস করে দরজাটা খুলে গেল; ঝড়ের বেগে ঢুকল পূর্ণেন্দু।)

পূর্ণেন্দু। বাঃ—বাঃ, চমৎকার! এ যে রীতিমতো জলসা দেখছি (কঠিন স্বরে) নীরা!

নীরা। (নীরস গলায়) কী বলছ?

পূর্ণেন্দু। আমাকে না বলে কেন এসেছ এখানে? আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি, চলো।

নীরা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কেন ফিরিয়ে নিতে এসেছ? আমাকে তো তোমরা তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিলে! আবার সেই অপমানের মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে যাবে?

পূর্ণেন্দু। না নীরা, ও বাড়ীতে নয়। আজ বাবার সঙ্গে আমার ফাইনাল ব্রেক হয়ে গেছে। আমি তোমাকে কাকার ওখানে নিয়ে যাব—তারপর দু'এক দিনের মধ্যে একটা আলাদা বাসার ব্যবস্থা করব। বাবাকে স্পষ্ট বলেছি, আপনার টাকার লোভের জন্যে রাস্তার লোক এসে আমার স্ত্রীকে আর আমাকে অপমান করবে—সে আমি কিছুতেই সইব না। আমিও পূর্ণেন্দু গোম—অ্যাড্‌ভোকেট, নিজের স্ত্রীকে ভরণপোষণের মতো শক্তি আমার আছে। চলো নীরা—

(কুণাল এগিয়ে এল)

কুণাল। না, নীরা যাবে না।

পূর্ণেন্দু। (রেগে আগুন হয়ে) হোয়াট! ও, তুমি! আই ওয়ার্ন ইউ, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে আর একটা কথা যদি বলো, then I will teach you a very good lesson!

কুণাল। সর্বনাশ! পূর্ণচন্দ্র ফোঁস করে উঠল যে! কিন্তু ঢোঁড়া না কেউটে, তা তো বুঝতে পারছি না!

পূর্ণেন্দু। (চিৎকার করে) এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। (পকেট থেকে রিভলবার বের করল) এটা দেখতে পাচ্ছ?

(ইরা আর নীরা অস্ফুট চিৎকার করল, কৃত্রিম ভয়ে দু হাত তুলে দাঁড়ালো কুণাল)

কুণাল। হ্যাণ্ড্‌স্ আপ্‌ করেছি স্যার, আপনাকে বলতে হবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? ওটা কি পাঁচসিকের টয়-রিভলবার, না রিয়্যাল?

পূর্ণেন্দু। শাট আপ! আর একটা কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে এটা আসল না নকল! ইম্‌পার্টিনেন্ট্‌—ইতর কোথাকার! এত টাকার গরম হয়েছে যে পূর্ণেন্দু গোমের স্ত্রীকে তুমি কিনতে চাও? Here is your cheque—(পকেট থেকে চেকটা বের করে তাল পাকিয়ে কুণালের নাকে ছুঁড়ে দিল। কুণাল হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইল) চলে এসো নীরা—

নীরা। রিভলবার দেখিয়ে কুণালদাকে ভয় দেখাতে পারো, কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তার চাইতে আমায় গুলি করে মেরে যাও।

আমারও শান্তি হোক, তোমরাও বাঁচো।

পূর্ণেন্দু। আমাকে ক্ষমা করো নীরা। অন্যায় আমি করেছিলুম—আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। তোমার জন্যে বাড়ী ছেড়েছি, বাবাকে ছেড়েছি—সবাইকে ছেড়ে এসেছি। আমি প্রমাণ করব পূর্ণেন্দু সোম বাপের ছায়া নয়—সে মানুষ, নিজের স্ত্রীকে সে রক্ষা করতে জানে। আমাকে মাপ করো নীরা—চলে এসো। (নীরার হাত ধরল)

কুণাল লাভলি—অতি চমৎকার দৃশ্য। এক মিনিটের জন্যে হাত নাড়াতে পারি পূর্ণেন্দুবাবু স্যার? মানে, একটু ক্ল্যাপ দেব!

পূর্ণেন্দু। আবার! (রিভলবার তুলল)

কুণাল। ও বাবা! (বিদ্যুৎবেগে হাত উঁচিয়ে ফেলল)

পূর্ণেন্দু। চলে এসো নীরা। আমি ক্ষমা চাইছি। (নীরার সুটকেসটা তুলে নিলে)

ইরা। সে কি পূর্ণেন্দুদা, এসেই এভাবে চলে যাবেন! বসুন, চা খান—বাবার সঙ্গে দেখা করে যান।

পূর্ণেন্দু। আজ সময় নেই ইরা, খুব ব্যস্ত আছি। দেখতেই তো পাচ্ছ আমার অবস্থা। ওদিকে সব গোছানো হয়ে যাক, তারপর একদিন তোমার দিদিকে নিয়ে আসব। নীরা চলো—ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।

(নীরাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল। আর একটু পরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কুণাল)

কুণাল। হুররে হুররে! শক্-থেরাপির গুণ দেখলে ইরা? হাতে হাতে ফল! (হেসে চলল। তারপর চেকটা কুড়িয়ে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগল)

ইরা ও কি—চেকটা ছিঁড়ে ফেলছ কেন?

কুণাল। কারণ ওর দাম ছেঁড়া কাগজের দামের চাইতে বেশি নয়। কারণ ব্যাঙ্কে আমার একটা পয়সাও নেই। (উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার হাসতে শুরু করে দিলে।)

ইরা আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। সব যেন স্বপ্নের মতো। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণেন্দুদা যে এমন বদলে যাবে, এ আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

কুণাল ইরা, মানুষের মন ঝর্ণার মতো। কখনো কখনো পাথরে চাপা পড়ে যায়। সেই পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিতে পারলেই তার মুক্তি—তার প্রকাশ। একটুখানি অপমানের ছোঁয়া দিয়ে আমি পূর্ণেন্দুকে সেই মুক্তি এনে দিয়েছি। নীরার জন্যে তুমি আর ভেবো না।

ইরা। আচ্ছা কুণালদা, তোমার কিছুই যেন বুঝতে পারছি না—তুমি কী বলো তো!

কুণাল। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আমি? নিজেই জানি না। ওরা বলে—ওরা বলে, আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাকেই বলেছি হীরের কথা—সেই রাশি রাশি হীরে—সেই পদ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি—পাহাড়ের সাতরঙা নক্ষত্রের মতো ঝিলমিল করছে—কেউ তা বিশ্বাস করে না। বলে অসম্ভব—বলে, হতেই পারে না!

ইরা। অন্যায় তো বলে না কুণালদা। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে হীরের খনি আছে, লোকে তা মানবে কেন? থাকলে কি এতদিন কারো চোখে পড়ত না?

কুণাল (চটে) Thou too ইরা! তুমিও অবিশ্বাস করো? বেশ—(ঘরের কোণ থেকে ব্যাগটা তুলে নিল)

ইরা। ও কি করছ?

কুণাল চলে যাব। তুমিও বিশ্বাস করলে না—থাকব না, আর এক মুহূর্তও আমি থাকব না এখানে।

ইরা। (ব্যাকুল হয়ে হাতটা চেপে ধরল) বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করি কুণালদা, আমি কেবল একটু ঠাট্টা করেছিলুম।

কুণাল। না, ও-রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ইরা। অন্যায় হয়েছে—ক্ষমা করো আমাকে।

কুণাল (একটু পরে) জানো ইরা, এতক্ষণ আমি চৌরাস্তার মোড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলুম জানো? (ইরা মাথা নাড়ল) মানুষের মুখ।

ইরা। মানুষের মুখ?

কুণাল হ্যাঁ, মানুষের মুখ। কত লোক চলেছে—হাজার হাজার লোক, বাঙালী—বিহারী—পাঞ্জাবী—মাড়োয়ারী — গুজরাটী — পুরুষ-মেয়ে-ছেলে-বুড়ো। কিন্তু কাউকে আমি ভরসা করতে পারলুম না—কাউকে বলতে পারলুম না, পাহাড়ের কালো অন্ধকারের ভেতর আমি কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য দেখেছি, সারা ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায়, এত ঐশ্বর্য! কাউকে মনে হল স্বার্থপর, কেউ বা লোভী, কেউ ভীরু, কেউ দুর্বল। কাউকে পেলুম না—আমার সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে পেলুম না!

ইরা। আচ্ছা, সে হবে এখন। সাহায্য করবার লোক তুমি অনেক পাবে। এখন

যাও দেখি—হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে

কুণাল। রাত্রে তো আমি কিছু খাই না!

ইরা। খাও না?

কুণাল। দেশের বারো আনা মানুষ যখন উপোস করে আছে, তখন দু'বেলা খাওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি।

ইরা। এ আবার কী কথা! এমন করে ভাবতে গেলে তো—সত্যি খাবে না?

কুণাল। না। খাই না, খেতে পারি না। ঘণ্টাখানেক পরে এক পেয়ালা চা শুধু আমাকে এনে দিও—যদি সম্ভব হয়।

ইরা। সে আর এমন কি অসম্ভব ব্যাপার! তার সঙ্গে দুটো মিষ্টি—

কুণাল। (তীব্র গলায়) না-না-না। কেন মিথ্যে আমায় বিরক্ত করছ?

ইরা। (সভয়ে) আচ্ছা। তবে তুমি ভালো হয়ে বোসো, আমি বাবাকে খেতে দিয়ে আসি।

(ইরা চলে গেল। কুণাল এসে বসল ইজি-চেয়ারটায়। তারপর 'সঞ্চয়িতা'-খানা তুলে নিলে। কয়েকটা পাতা উলটে চলল কিছুক্ষণ। বই-এর এক জায়গায় কুণালের চোখ থমকে গেল)

কুণাল। (পড়তে লাগল)—

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—

(বাইরে দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হ'ল)

কুণাল। (ভ্রূ কোঁচকালো) কে?

(বাইরে থেকে হরিবল্লভের গলা: আসতে পারি স্যার?)

কুণাল। কে আপনি?

হরিবল্লভ। (বাইরে থেকে) আমি স্যার, হরিবল্লভ গোস্বামী।

কুণাল। ওঃ, প্রভুপাদ স্বয়ং? তা পদার্পণ করুন—

(এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঢুকল হরিবল্লভ। কুণাল হাসল)

কুণাল। ভীরু মাধবী, তোমার দ্বিধা কেন? আসিবে কি—ফিরিবে কি—দ্বিধা কেন?

হরিবল্লভ। (বোকার মতো) আজ্ঞে ?

কুণাল। ও কিছু না। আসুন—আসুন—আসন গ্রহণ করুন।

হরিবল্লভ। হে হে—আপনার সব তাতেই ঠাট্টা। তা আপনার কাকা কোথায়—মাধববাবু ?

কুণাল। কোনো দরকার আছে তাঁকে ? ডাকব ?

হরিবল্লভ। না-না—তাঁকে কোনো দরকার নেই। আমি আপনার কাছেই এসেছিলুম।

কুণাল। (জোরে) Fire it !

হরিবল্লভ। (ভীষণ চমকে) Fire কী মশাই ? এসব গুলিগোলার কথা আবার কেন ? এ তো ভালো নয় !

কুণাল। Shoot !

হরিবল্লভ। (সভয়ে) কী সর্বনাশ ! গুলি করবেন নাকি ?

কুণাল। আঃ, আপনি একেবারে ইংরেজী জানেন না ! হোপলেস ! বলছিলুম—বলে ফেলুন !

হরি। বাঁচালেন। (হাত কচলে) কী আর বলব স্যার মানে সেই টিপ্‌সের কথাটা—এখন পর্যন্ত অনেককেই তো ধরলুম, শেষে দেখি সব ব্যাটাই জোচ্চোর। এবার যদি আপনার দয়ায় উদ্ধার পাই স্যার—মানে এমন প্যাঁচে পড়ে গেছি যে কী বলব !

কুণাল। তার মানে পাকা ঘোড়েল হয়েও কেঁসে গেছেন—স্রেফ একটি সজারুকে আস্তো গিলে বসে আছেন ! তা আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

হরি। কালকের রেসের টিপ্‌স্ যদি একটুখানি দিতেন—

কুণাল। রেস্ ! রেস্‌ফেস্ কি বলছেন মশাই—আমি ওসব ব্যাপারের কোনো খবরই রাখি না।

হরি। কেন আর ছলনা করছেন স্যার, শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায় ! আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি দারুণ গুণী লোক।

কুণাল। দেখেই বুঝতে পেরেছেন ? (হেসে উঠল)

হরি। মানুষ নিয়েই কারবার করি মশাই, লোক চিনতে বেশি দেরি হয় না। একবারটি দয়া করুন স্যার। যা হয় একটা বাতলে দিন। কত লোক তো বরাত ফিরিয়ে ফেলল—কেবল আমারই কিছু হল না। একটু যদি—

কুণাল। কিন্তু সে তো এমনিতে হবে না। বলেইছি তো, Give and take ছাড়া এসব হয় না।

হরি। সেজন্য তৈরী হয়েই এসেছি আমি। এই কুড়িটা টাকা—

কুণাল। কুড়ি টাকা! অত সস্তায়? তা হলে মাঠের আশেপাশে যারা ঘুরছে তাদের কাছে যান না কেন? হাতুড়ে ডাক্তারের ফী দিয়ে বিলেত-ফেরৎকে ডাকতে চান? ছোঃ!

হরি। পঁচিশটা টাকাই নিন তা হলে—

কুণাল। মাছের দর করছেন নাকি? সরি, আপনি তো আবার বোষ্টম—মাছ-টাছ নিশ্চয় খান না। যান-যান, ও-সব চলবে না। রাত হয়েছে—কেটে পড়ুন এখন!

হরি। ইঃ, আপনার তো দেখছি দারুন খাঁই! তবে আরো কিছু না হয় নিন। পঞ্চাশ?

কুণাল। পঞ্চাশ! দরজা খোলা আছে—রওনা হোন, ট্রামে উঠে পড়ুন।

হরি। রাধেকৃষ্ণ! আচ্ছা আখ-মাড়াই কলটি কবেছেন স্যার, ছিবড়ে বের না করে আর ছাড়বেন না দেখছি! তা হলে আপনিই বলুন স্যার—কিসে আপনার খাঁই মেটে!

কুণাল। এ বাড়ীর ছ'মাসের ভাড়ার রসিদ কাটুন। মানে পাঁচ মাস অ্যাড্‌ভান্স!

হরি। বলেন কি! পঁয়ত্রিশ টাকা করে—সে যে দুশো টাকার ওপরে!

কুণাল। কোন্ নাবালক—কোন্ মাতালের সম্পত্তির সর্বনাশ করছেন—কত হাজার হাজার টাকা লোপাট করেছেন সে খবর আপনিই জানেন। দুশো টাকায় কি হবে আপনার?

হরি। মারা যাব স্যার—মারা যাব।

কুণাল। তা হলে সরে পড়ুন। সস্তার কারবার আমার কাছে নেই।

হরি। আমি বলছিলুম কি—মাস তিনেকের টাকাটা—

কুণাল। আবার মাছের—থুড়ি মালপোর দরাদরি? যান, বেরোন—

হরি। যদি একটু দয়া না করেন স্যার—

কুণাল। দশ হাজার টাকা পাইয়ে দেব—দুশোখানেক দিতেই আপনার প্রাণ বেরিয়ে গেল মশাই? এমন ছোট লোকের সঙ্গে আমি কারবার করি না।

হরি (দীর্ঘশ্বাস ফেলল) আমি ঘোড়েল, আপনি, আপনি স্যার ঘোড়েলকেও গিলতে পারেন—যাকে বলে তিমি। (আবার দীর্ঘশ্বাস) বেশ, ছ' মাসের রসিদই লিখে দেব। এবার—

কুণাল। উহুঁ—রসিদটি আগে লিখুন। দরকারী খবর জেনে নিয়ে আপনি সরে পড়বেন না—এতখানি বিশ্বাস আপনাকে কেমন করে করব? রসিদ লিখুন

ফেলুন আগে—

হরি। আপনি স্যার তিমিকেও গিলতে পারেন! যাকে বলে—

কুণাল। তিমিঙ্গিল। শব্দটা জানতেন না, শিখিয়ে দিলুম। লিখুন—

হরি। হরি হে, তুমিই সত্য—(রসিদ লিখতে লাগল।)

কুণাল। (উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। নিজের মনেই) হীরে—অসংখ্য হীরে। তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়। যদি একবার আনতে পারি—যদি—

হরি। (কলম থেমে গেল) হীরে! হীরের কথা কী বলেছেন?

কুণাল। না-না—ও সব কিছু না। ও আপনার শুনে কাজ নেই।

হরি। কাজ নেই কি রকম? আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক, রাশি রাশি হীরের কথা বলছেন—

কুণাল। (গর্জন করে)—একেবারে চুপ! আর একবার হীরের নাম করবেন তো ঘর থেকে আপনাকে বার করে দেব।

হরি। (থতমত খেয়ে) আচ্ছা থাক থাক। আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কী? (রসিদ লিখে ফেলল) এই নিন। (কুণাল নিয়ে পড়ে দেখল) কিন্তু স্যার আমার ব্যবস্থাটা—

কুণাল। বার করুন বই। (হরিবল্লভ বই বার করল। কুণাল উল্টেপাল্টে দেখল) এই যে তিনটে। 'লাকি স্ট্রাইক', 'কিস্মি কুইক', 'গে বার্ড'। যান চলে যান।

হরি। বলেন কি! এই তিনটে? 'লাকি স্ট্রাইক' অবশ্যি হট ফেভারিট, কিন্তু 'গে-বার্ড' আর 'কিস্মি কুইক'—মানে, এরা তো—

কুণাল। বিশ্বাস হচ্ছে না?—কাল প্রমাণ পাবেন।

হরি। কিন্তু স্যার—

কুণাল। যান—আসুন—

হরি। আমি বলছিলুম স্যার—

কুণাল। অনেক রাত হয়েছে এখন। আর জ্বালাবেন না—যান—(প্রায় ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে নিয়ে এল)।

হরি। দেখবেন স্যার, কেন মারা না যাই—

কুণাল। আপনাদের মারে কে? আপনারা তো রক্তবীজ। যান, যান—এবার।

(হরিবল্লভ কেমন নিরাশভাবে বেরিয়ে গেল।)

কুণাল। (দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর নিজেই)—ঠকালুম লোকটাকে।

বিবেকে একটু বাধছে। কিন্তু ওকে ঠকানোর পাপ নেই—ও অনেকের সর্বনাশ করে বেড়ায়।

(মাধব ঢুকলেন)

মাধব। এই যে কুণাল—ইরা বলছিল, তুমি নাকি রাতে কিছু খাবে না ?

কুণাল। আমার রাত্রে খাওয়ার অভ্যাস নেই কাকাবাবু।

মাধব। উপোস করে থাকবে ? সেও কি একটা কথা হল ?

কুণাল। উপোস করে থাকব কেন ? ইরাকে তো বলেছি, এক পেয়ালা চা হলেই আমার চলবে। ভালো কথা—এইটে নিন্—(বাড়ী ভাড়ার রসিদখানা এগিয়ে দিলে)

মাধব (সেটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে) এ কি ! ছ' মাসের বাড়ী ভাড়ার রসিদ ! এক মাসের বাকী মিটিয়ে, আরো পাঁচ মাস আগাম। তুমি—তুমি এতগুলো টাকা—

কুণাল আমি এক পয়সাও দিইনি। হরিবল্লভ গোসাঁই দিয়েছে।

মাধব। কী বললে, হরিবল্লভ ! বাড়ীওলার সরকার হরিবল্লভ !

কুণাল। হ্যাঁ, সে-ই দিয়েছে।

মাধব। তুমি—তুমি ঠাট্টা করছ কুণাল ?

কুণাল। আমি কি আপনাকে ঠাট্টা করতে পারি কাকাবাবু ? সত্যিই হরিবল্লভ দিয়েছে।

মাধব সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হরিবল্লভ—হরিবল্লভ নিজে আমার ছ' মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিলে ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না !

কুণাল ইয়ে—একটু ব্যাপার আছে ওর ভেতরে—তা সেকথা আপনি নাই বা শুনলেন। তবে এর জন্যে আপনার হরিবল্লভকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

মাধব তা হলে লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছিলুম সে তা নয়। আমার দুঃসময় বুঝে, সেও আমাকে সাহায্য করতে চায়। আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! দুনিয়াটাই যেন বদলে যাচ্ছে। ইরা—ইরা—(ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেলেন)

[কুণাল আরো ক্লান্ত ভাবে এসে চেয়ারে বসে পড়ল। আস্তে আস্তে আবার তুলে নিলে "সঞ্চয়িতা"।]

কুণাল। (পড়তে লাগল)

নিজের গানেরে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে যেন বাঁশি মম

উতলা পাগল সম।

যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—

(থামল। একটু হাসল নিজের মনেই) পাগল! সবাই বলে—পাগলামো! কিন্তু সে পথটাকে আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাই। শালবনের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না। ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে। আমি একা চলেছি সেই পথ দিয়ে। যেন এগিয়ে যাচ্ছি স্বপ্নের ঘোরে। হঠাৎ—

[ভেতরের দরজা দিয়ে চা নিয়ে পা বাড়িয়েছে ইরা। ডাকল—কুণালদা! আর সেই ডাকে ভয়ানক চমকে উঠল কুণাল]

কুণাল কে-কে-কে?

ইরা। আমি ইরা।

কুণাল ওঃ ইরা! এসো—

ইরা। তোমার চা এনেছি। কিন্তু চমকালে কেন এমন করে?

কুণাল না—না, চমকাইনি তো। একটা কথা ভাবছিলুম কেবল।

ইরা। (চা-টা সামনে রেখে) মধ্যে মধ্যে তুমি যেন কেমন হয়ে যাও কুণালদা। তোমাকে বুঝতে পারি না।

কুণাল। ঠিক বলেছ। আমি নিজেও নিজেকে বুঝতে পারি না। সব যেন কি রকম মনে হয়। ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছা। কেমন যেন জট পাকিয়ে যায় মাথার ভেতর। জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি বুঝতে পারি না। কিছুই বুঝতে পারি না ইরা।

ইরা। (একটু চুপ করে থেকে) তোমাকে ভারী ক্লান্ত মনে হচ্ছে কুণালদা। চা-টা খেয়েই তুমি শুয়ে পড়ো।

কুণাল। হ্যাঁ, তাই শোবো। ভয়ানক মাথা ধরেছে।

ইরা। আমি তোমার জন্যে বালিশ আর চাদর নিয়ে আসছি।

কুণাল। কিছু দরকার নেই। ওই ব্যাগটা মাথায় দিয়েই আমি ঘুমুতে পারব।

ইরা। কী যে পাগলামো করো ঠিক নেই—(ভেতরে চলে গেল)

কুণাল। (চায়ে চুমুক দিয়ে) পাগলামো! তাই-ই বটে। নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়। (অন্যমনস্ক) সেই শালের বন—সেই জ্যোৎস্নায় ঝিলমিলে পথ, চলেছি তো চলেইছি। পাথরের উপর আমারই ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছে কেবল। রাত ঘুমোচ্ছে, পাখিরা ঘুমোচ্ছে, বন ঘুমোচ্ছে। আমি যেন কোনো স্বপ্নের যাত্রী, মনে হচ্ছে আমার চলা কোনোদিনই বুঝি শেষ হবে না। তারপর—তারপর সাদা কুয়াসার মত খানিক শূন্যতা—তারপর—

(হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল) কেউ যদি টের পায়? কেউ যদি দেখে ফেলে থাকে? তা হলে—তা হলে—(মুখ হিংস্র হয়ে উঠল—উঠে দাঁড়ালো) তা হলে আমি দু হাতে তার গলা টিপে—(বালিশ আর চাদর নিয়ে ঢুকল ইরা) অ্যাঁ—ইরা?

ইরা। তুমি যেন কিরকম করছ কুণালদা! আমার ভালো লাগছে না।

কুণাল। কিছু না—কিছু না। কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি কিনা তাই নার্ভগুলো একটু উত্তেজিত হয়ে আছে। (চা-টাদু' তিন চুমুকে শেষ করল) একটু বিশ্রাম করতে চাই—বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত আমি।

ইরা। (বিছানাটা পেতে দিয়ে) এই তো বিছানা করে দিয়েছি, শুয়ে পড়ো।

[কুণাল ব্যাগ খুলে একটা চাদর বের করল, তারপর সেটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল]

ইরা। ও কি—জামা খুললে না?

কুণাল। না, জামা গায়ে না থাকলে আমার ঘুম হয় না।

ইরা। গরমে কষ্ট হবে যে। ঘরে পাখা নেই—তার ওপর আবার চাদর জড়ালে।

কুণাল। আমার অভ্যেস আছে।

ইরা। (বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো) যে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভাবছি। হরিবল্লভবাবুকেও চেক দিয়েছ নাকি একখানা?

কুণাল। হরিবল্লভ কাঁচা লোক নয়। চেক ভাঙানো না হলে সে রসিদ দেয় না।

ইরা। সত্যিই কি হরিবল্লভ টাকাটা নিজেই দিয়েছে?

কুণাল। কাকাবাবুকে তো মিথ্যে কথা বলিনি। আমি ওকে ঘোড়ার সন্ধান দিয়েছি—ও আমাকে রসিদ লিখে দিয়েছে।

ইরা। তুমি তো ঘোড়ার খবর কিছু জানো না।

কুণাল। না, আন্দাজে মুখে যা এল বলে দিলুম।

ইরা। বিশ্বাস করল?

কুণাল। তোমাকে তো বলেইছি ইরা। পৃথিবীর সব চাইতে শয়তান লোকেরও দুর্বল জায়গা আছে একটা। সেখানে সে শিশুর মত অবোধ।

ইরা। একটুও সন্দেহ হল না লোকটার?

কুণাল। নিঃসন্দেহ হওয়ার লোক সে নয়। কিন্তু নাস্তিকেও কেন হাত দেখায় ইরা? সামনে 'জুয়াচোর' বলে আড়ালে কেন ধর্ণা দেয় সাধুর কাছে? মানুষ ভারী আশ্চর্য জীব ইরা—সহজে তাকে বুঝতে চেয়ো না।

ইরা। কিন্তু কাজটা কি উচিত হল?

কুণাল। উচিত অনুচিত জানি না। একে বলতে পারো পলিসি। এখনকার মতো তো ওকে ঠেকানো গেল। সময় পেলে ওকে টাকাটা শোধ করে দিও, তা হলেই মনের কাছে তার দায় থাকবে না।

ইরা। কুণালদা—তোমাকে যে কী বলব—

কুণাল। আমাকে কিছু বলতে হবে না—কিছু বলবার ইচ্ছে হলে বোলো গোসাঁই-জীকেই—(মুখ বিকৃত করে) আঃ, কী যে লাগছে শরীরটা। ক্লান্তিতে যেন ভেঙে আসতে চাইছে।

ইরা। তুমি ঘুমোও। আমি আলো নিভিয়ে চলে যাচ্ছি—(সুইচ-বোর্ডের কাছে গেল)

কুণাল। (হঠাৎ ডাকল) ইরা!

ইরা। (ফিরে দাঁড়ালো) কী বলছ?

কুণাল। ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। হাত বুলিয়ে দেবে একটুখানি? (ইরা ইতস্ততঃ করল; আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল কুণাল) থাক থাক, দরকার নেই। আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে যাও।

ইরা। তোমার কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই কুণালদা। তোমাকে অবিশ্বাস করবার মত অপরাধ আমি করব না। (কুণালের মাথার পাশে এসে বসল)

কুণাল। না, না থাক। আমার সত্যিই দরকার নেই। তাছাড়া হয়তো কাকাবাবু—

ইরা। তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে। বাবার জন্যে ভেবো না। (কুণালের কপালে হাত রাখল) সেই ছেলেবেলায়—নালান্দার সেই অন্ধকার বিভীষিকার হাত থেকে, তুমি আমায় উদ্ধার করেছিলে। আজকেও তুমি আমায় যেন অতল অন্ধকার থেকে টেনে তুলছ। তোমাকে একটুখানি সেবা করতে পারা, আমারই যে ভাগ্য কুণালদা!

কুণাল। আঃ, কী ঠাণ্ডা তোমার হাত ইরা। মাথাটা জুড়িয়ে গেল।

ইরা। তুমি যে হীরের সন্ধানে রাতদিন ঘুরছ কুণালদা—বাড়ীতে মা বাবা কিছু বলেন না?

কুণাল। মা নেই। আজ দু'বছর হল চলে গেছেন।

ইরা। বুঝেছি। মা থাকলে অন্য রকম হত।

কুণাল। সত্যি—সব অন্যরকম হত। এত ক্লান্ত হয়ে এমন করে আমায় ঘুরে বেড়াতে হত না। মার হাতখানা একবার কপালে পড়লে সব জালা

আমায় জুড়িয়ে যেত। আজ তোমার এই ছোঁয়াটুকু আমায় মায়ের হাতের মনে হচ্ছে। আঃ—

ইরা। তুমি কেন ঘরসংসার করলে না কুণালদা ?

কুণাল। ঘর সংসার ? (হাসল)

দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া

সারা ভারতবর্ষই আমার দেশ। তারই সন্ধানে আমি বেরিয়েছি।

ইরা। কাজকর্ম তো কিছু করলে না।

কুণাল। করতেই তো চেয়েছিলুম। সেই জিওলজিক্যাল সার্ভের চাকরি। তাই তো একদিন আবিষ্কার করলুম, একটা অতল কালো গুহার ভিতর, সেই হাজার হাজার মণিমাণিক্য জ্বলছে। অসংখ্য। তাকানো যায় না—চোখ জ্বলে যায়। শুধু উদ্ধার করাই বাকী। কিন্তু একজন কাউকেই আমি সঙ্গী পেলুম না। পেলুম না এমন কাউকে, যে শুধু নিজের স্বার্থকেই চায় না—সারা ভারতবর্ষের মানুষকে যে ভালোবাসে। (হঠাৎ) ইরা, ইরা তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

ইরা। কোথায় ?

কুণাল। (আত্মগত ভাবে) সেই পাহাড়ে। রাত হয়ে গেছে, অনেক রাত। সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পাহাড়—শালবন—ফুলেরা—সবাই। শুধু ঝিরঝির ঝুরঝুর করে ঝর্ণারা ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে চলেছে। ঝিঁঝিরা থেমে গেছে। একটা রাতজাগা পাখী পর্যন্ত কুলকুল করে উঠছে না কোথাও। সাপের মত আঁকাবাঁকা পথটা জ্যোৎস্নায় লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ কেমন একটা কুয়াশা দেখা দিল সামনে—যেন পায়ের তলা থেকে একটা রুপালী মেঘ নেমে এল। আমার ঘোড়াটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই মেঘের ভেতর। তারপরই—

ইরা। (সেও যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেছে) তারপরই—

কুণাল। দেখলুম। দেখলুম সেই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারকে। পৃথিবী তার গোপন সম্পদ, সব যেন সেখানে মেলে রেখেছে। কিন্তু কত নীচে—সে সে যেন পাতালের গোপন মণিকোঠা ! একা তো সেখানে নামা যায় না। কেউ যদি সাহায্য করত—যদি কাউকে সঙ্গী পেতুম। ইরা—যাবে তুমি ? যাবে আমার সঙ্গে ?

ইরা। যাব। (স্বর নামিয়ে) তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাইবে। তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে আমার ভয় নেই।

কুণাল। আঃ—একটা ভাবনা আমার মিটল। কতদিন ধরে কারো মুখ থেকে এই কথাটা শোনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি। আজ অনেকদিন পরে আমি ঘুমুতে পারব—শান্তিতে ঘুমুতে পারব।

ইরা। সেই ভালো। তুমি ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

কুণাল। তুমি একটা গান শোনাবে ইরা? ছেলেবেলায় মা আমায় গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াত। গাইবে একটা গান?

ইরা। গাইছি। তুমি শান্ত হয়ে ঘুমোও। (গান আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথের গান)

"আসিতে তোমার দ্বারে
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ"

[গান শেষ না হতেই গভীর ঘুমের মধ্যে শিশুর মতো ডুবে গেল কুণাল। ইরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কুণালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গভীর মমতায়। তারপর গিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মঞ্চ অন্ধকার। কিছুক্ষণ সময়ের বিরতি।

নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতে ইরার গানের সুরটাই বেজে চলল। তারপর বাজনা থামলে খুটখুট করে আওয়াজ। অন্ধকার মঞ্চ। ঘরের জানালার উপর ফোকাস পড়ল। জানালার শিক বাঁকানো। জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সেই ছেলে দুটি—যারা ঘণ্টাকর্ণ পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল। হিংস্র বীভৎসতায় জ্বলছে তাদের চোখমুখ। ট্রাউজার পরা ছোকরার হাতে ছোরা]

খাঁদু। (চাপা গলায়) সেই লোকটাই তো? ঠিক জানিস?

হেবো (আরো নীচু গলায়) আমি খানিক আগেই উঁকি দিয়ে দেখে গেছি। লোকটা শুয়ে আছে—বুড়োর মেয়ে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। বুঝলে খাঁদুদা, লব্‌ হচ্ছিল।

খাঁদু। (বিকৃত মুখে) দিচ্ছি এবার সব লব্‌ শেষ করে। আমি খাঁদু সাঁতরা—আমার সঙ্গে মামদোবাজী! ব্যাটা ঘুঘুই দেখেছে, শেষবার ফাঁদটাও দেখে নিক্।

[হিংস্রভাবে গুঁড়ি মেরে এগোল কুণালের বিছানার দিকে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে কুণালের ছায়ামূর্তি। খাঁদু সাঁতরা ছোরা তুলল —তারপর বসিয়ে দিল সজোরে। আর তৎক্ষণাৎ তক্তপোশের ওপাশ থেকে

বিদ্যুতের মত মাথা তুলল কুণাল। মৃদু একটুখানি আলো হয়ে উঠল। দেখা গেল কুণাল খাঁদুর হাতখানা মুচড়ে ধরেছে।]

কুণাল। (হেসে উঠল) মানুষ খুন করার ইচ্ছে থাকলে অত সাড়াশব্দ করে আসতে নেই ব্রাদার। ও-কাজে তোমার চেয়ে পাকা লোক দরকার।

[এই ফাঁকে দরজা খুলে টেনে দৌড় দিলে হেবো। খাঁদু যন্ত্রণাবিস্ফারিত মুখে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল]

কুণাল। বৃথা চেষ্টা বন্ধু। গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। শোনো, তোমাকে একটা খবর দিই। কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন আছে আমার—পাছে কেউ তার খবর পায়—এই ভয়ে আমার ভালো ঘুম হয় না—ঘরে একটু শব্দ পেলেই আমি জেগে উঠি। তোমার শিক বাঁকানোর আওয়াজ আমি পেয়েছিলুম—অন্ধকারে দেখেছিলুম তোমার হাতের ধারালো ছোরা—তাই বালিশে চাদর জড়িয়ে তক্তপোশের পাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। শেষকালে বালিশ খুন করলে—তাও দেখলুম।

খাঁদু। (নির্বাক)

কুণাল। এবার বলো আমাকে ছোরা মেরে তোমার কী লাভ হত? বলো—জবাব দাও।

খাঁদু। আপনি—আপনি কেন আমার গায়ে হাত তুলেছিলেন সকালে?

কুণাল। গায়ে হাত তুলেছিলুম? দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। (পাশের সুইচ্ টিপে আলো জাললো) I see—সেই ঘণ্টাকর্ণের চ্যালা! রাগে একেবারে খুন করতে বেরিয়ে পড়েছো? মানুষের জীবনটা কি এতই সস্তা হে?

খাঁদু। লেকচার দেবেন না স্যার। আপনি খলিফা লোক—জুৎ পেয়ে আমায় কায়দা করে ফেলেছেন। পুলিশে দিন এবার—কিন্তু ভালো কথা বলবেন না।

কুণাল। ভালো কথা শুনতে চাও না?

খাঁদু। না।

কুণাল। আমাকে খুন করতে চাও? তাতেই খুশি হবে? বেশ—আমি তোমায় নিরাশ করব না!

[খাঁদু চুপ; কুণাল তার হাত ছেড়ে দিল। তারপর বিছানার উপর থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল তার হাতে]

কুণাল। নাও, কাজ শেষ করে ফেল। বেশি দেরি কোরো না—চটপট। কেউ

আবার এসে পড়তে পারে—নাও—

খাঁদু। (ছোরাটা হাতে নিয়েই ফেলে দিলে। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করলে)

কুণাল। কী হ'ল? কাঁদছ কেন?

খাঁদু। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি এত খারাপ ছিলুম না স্যার—সত্যিই এত খারাপ ছিলুম না। বাবা মরে গেল—লেখাপড়া শিখতে পেলুম না—বিধবা মা লোকের বাড়ীতে ঝি হয়ে খাটতে খাটতে যক্ষ্মায় মরে গেল। একটু ওষুধ জুটল না—কেউ তাকিয়ে দেখলে না। বেয়ারাগিরি থেকে শুরু করে সব রকম চাকরির চেষ্টা করেছি—কেউ দেয়নি। সবাই কেবল ভালো কথাই শুনিয়েছে। শালার দুনিয়া আর যত ভদ্দরলোকের ওপর একেবারে ঘেন্না ধরে গেল, স্যার। শেষে এসে ভিড়লুম এদের দলে। নইলে এত খারাপ আমি ছিলুম না। (কান্না)

কুণাল। শোনো—

খাঁদু। শোনাবার কিছু নেই স্যার—আপনার যা খুশি করুন। পুলিসে দিন আমায়।

কুণাল। না, পুলিসে দেব না। এখনো তোমার চোখে কান্না আছে—এখনো তোমার আশা আছে। তোমাকে পুলিসে দিয়ে সে কান্নাকে শুকিয়ে ফেলতে চাই না আমি। শোনো আমার কথা। তোমার মতো দুঃখ অনেকেই পায়—আবার অনেকেই বুক ফুলিয়ে বলে—মানব না, এ দুঃখকে কিছুতেই মানব না। মরতে মরতে তারা বেঁচে ওঠে—সমস্ত দুঃখের মূল উপড়ে ফেলবার জন্যে তৈরী হয় তারা—তাদের হাতের মুঠোকে বজ্রের মতো কঠিন করে তোলে। পারবে না, তুমিও পারবে না?

খাঁদু। একটা কাজ—একটা কাজ যদি কোথাও পেতুম—

কুণাল। পাবে—পেতেই হবে তোমাকে। যে হাল ছাড়ে না—সে হারে না। চেষ্টা করো, পাবেই। আর হ্যাঁ—তোমাকেও চুপি চুপি বলে রাখি—আমি সন্ধান পেয়েছি। কোটি কোটি টাকার হীরে—মাটির তলায় পৃথিবীর কী বিশাল—কী বিরাট ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। তুলে আনব—সব তুলে আনব। তখন সারা ভারতবর্ষের কোথাও আর একটি মানুষও বেকার থাকবে না—এতটুকুও অভাব থাকবে না (খাঁদুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল; কুণাল বলে চলল স্বপ্নাতুরের মত) তখন আমার দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি সোনার ফসল ফলাবে—উঠবে কারখানার গান—স্বাস্থ্যবতী মায়ের বুকে সুখী শিশুর হাসি

উছলে পড়বে—প্রেমের পেছনে থাকবে না ক্ষুধার কালো ছায়া। অপেক্ষা করো, আর কদিন অপেক্ষা করো।

খাঁদু। সত্যি বলছেন?

কুণাল। সত্যি বলছি। সেদিন অনেক কাজ। তোমার, আমার—সকলের কাজ। পারবে না তার জন্ত তৈরী হতে?

খাঁদু। পারব স্তার। কাল থেকেই তৈরী হবার চেষ্টা করব। যখন সময় হবে—এই খাঁদু সাঁতরাকে একটা ডাক দেবেন। (প্রণাম করে বেরিয়ে গেল)।

কুণাল। (কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আবৃত্তি করতে লাগল:)

জানি, জানি—
এ জীবন ভরে আছে সোনার ফসলে।
এসো দলে দলে—
পূর্ণতার সেই শস্য ভরে তোলো খামারে খামারে।
বলো বারে বারে—
ভয় নয়—মৃত্যু নয়—নয় পরাজয়—
প্রাণের অমৃত-পাত্র প্রতি নিত্য উচ্ছল অক্ষয়।
বাধার প্রাচীর ভাঙো গতি হোক দুরন্ত উদ্দাম—
ফেনিল সমুদ্র এসে পদতলে করুক প্রণাম—
কালরাত্রি হোক অবসান।
সূর্যের হিরণ্য-শিখা ললাটিকা থাক দীপ্যমান!

[বলতে বলতে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। সেই অন্ধকারে শোনা যেতে লাগল কুণালের স্বর]

বিশ্বের গোপন কেন্দ্রে যে সম্পদ নিয়ত সঞ্চিত—
কার সাধ্য করিবে বঞ্চিত
সে সঞ্চয় হতে?
খনির তিমির-গর্ভে মশালের উজ্জ্বল আলোতে
দুঃসাহসী মানুষের দুঃখজয়ী চির-অভিযান
আমার বন্দনা লহো চিরঞ্জীব বিশ্বজিৎ প্রাণ—

[আবৃত্তির শেষাংশ হারিয়ে গেল সঙ্গীতে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের অনুরণন চলতে লাগল। সময় চলল। কিছুক্ষণ এই সঙ্গীত-বিরতির পর আবার ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল রঙ্গমঞ্চ। ভোরের আভাস। দেখা গেল কুণাল জানলার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ইরা ঢুকল]

ইরা। এ কি কুণালদা—রাত্রে শোওনি নাকি ?

কুণাল। (হাসল) একজন অতিথি এসেছিল। তাইতেই সামান্য একটু ব্যাঘাত হয়েছিল ঘুমের। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলুম—কি ভাবে একটু একটু করে ভোর হয়ে আসছে। কেটে যাচ্ছে অন্ধকার, সূর্য আসছে। আমাদের এই দেশেও কবে এমন করে জীবনের সূর্য উঠবে বলতে পারো ইরা ?

ইরা। (ইরা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছোরাটা দেখতে পেল) ছোরা ! কী সর্বনাশ ! ছোরা কোত্থেকে এল ? জানালার শিকও বাঁকানো দেখছি ! এ সব কী কুণালদা ?

কুণাল রাতের অতিথি উপহার দিয়ে গেছে। ছোরাটা রেখে দাও—তরকারী কুটতে কাজে লাগবে।

ইরা। হেঁয়ালি রাখো কুণালদা ! কী ভয়ানক কাণ্ড এ সমস্ত !

কুণাল। ভয় পাবার আর কিছু নেই ইরা। যে খুন করতে এসেছিল সে আমায় কথা দিয়ে গেছে নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করবে। আর জানো—জানো—সে আমায় বিশ্বাস করেছে। বলেছে—যেদিন আমার কাজের সময় আসবে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

ইরা তোমার পাগলামি রাখো। নিশ্চয়ই পাড়ার সেই ছেলেগুলো—রাগ করে তোমায় ছোরা মারতে এসেছিল। আমি বাবাকে ডাকি—(ভেতরে গেল)

কুণাল পাগলামো ? ইরা ভাবছে—আমি পাগল ! আসবে—সময় আসবে। যেদিন দেখিয়ে দেব—(দরজায় ঘা পড়ল) কে—কে ?

(বাইরে অপরিচিত কণ্ঠ—দরজা খুলুন।)

[কুণাল দরজা খুলল। ঘরে ঢুকলেন সাদা পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক ; সঙ্গে জনতিনেক কনস্টেবল]

কুণাল (চমকে) কাকে চাই ?

ভদ্রলোক। আপনাকে ?

কুণাল। আমাকে ?

ভদ্রলোক। হাঁ—আপনাকেই। আপনি কুণাল দত্ত—আপনাকে আমরা চিনেছি।

কুণাল (উত্তেজিত) কী দরকার আমাকে দিয়ে ?

ভদ্রলোক। যেখানে যাওয়ার পথে আপনি পালিয়ে এসেছেন সেখানে নিয়ে যাব। চলুন চলুন, আর দেরি করবেন না।

কুণাল। (হঠাৎ চিৎকার করে) কী, আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন ? ভেবেছেন আমি পাগল ? যাব না—কিছুতেই যাব না আমি—

[ভদ্রলোক চোখের ইঙ্গিত করলেন, তিনজন কনস্টেবল এগোল তার দিকে]

কুণাল। সাবধান, আমি যুযুৎসু জানি। আমার গায়ে হাত দিলে—

[তিনজন কনস্টেবল একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুণালের ওপর ; ধস্তাধস্তি।]

কুণাল। (চিৎকার) ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি। আমি যাব না—আমি পাগল নই—ছাড়ো—

[ইরা আর মাধববাবু ছুটে এলেন]

মাধব। এসব কী কাণ্ড!

ভদ্রলোক। নমস্কার। আপনাদের বিরক্ত করলুম বলে কিছু মনে করবেন না। আমি পুলিস অফিসার। আপনাদের এই অতিথিটি পাগল। পাটনা থেকে রাঁচি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—পথে পালিয়ে আসে। (কনস্টেবলরা তখন কুণালকে শক্ত করে ধরেছে, কুণাল চিৎকার করছে : আমি পাগল নই—না আমি পাগল নই—না—না—) আমরা পাটনা থেকে ইন্‌টিমেশন পেয়ে খুঁজতে থাকি। তারপর একজন ট্রাফিক্ পুলিসের কাছে খবর পাই—এমনি চেহারার একটি লোককে দু'ঘণ্টা সে অদ্ভুতভাবে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সেখান থেকে ট্রেস করে—

কুণাল। না—না—আমি কক্ষনো পাগল নই—

ইরা। আপনারা ভুল করছেন। উনি কখনই পাগল হতে পারেন না।

ইন্সপেক্টার। (হেসে) তাই মনে হয় বটে। এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এঁর খুব Interesting fixation আছে। মজা দেখবেন একটা? এই যে কুণালবাবু—শুনেছেন নাকি? আপনার হীরের খনির খবর নাকি একটা লোক জেনে ফেলেছে! সে বলছে হীরেগুলো তুলে নিয়ে—

কুণাল। (প্রচণ্ড উন্মত্ত চিৎকারে) কে—কে—কে—কে? আমি তাকে খুন করব! এক্ষুনি খুন করব, দু'হাতে তার গলা টিপে মারব—

ইরা। কুণালদা—কুণালদা—

কুণাল। কে—কে কুণালদা? তোমরা সবাই—তোমরা সবাই চক্রান্ত করেছ। আমার সব হীরে তোমরা লুট করে নেবে। খুন করব—

[ইন্সপেক্টরের চোখের ইঙ্গিতে ওরা কুণালকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার চিৎকার : খুন—খুন করব। ইরা ও মাধববাবু স্তব্ধ]

ইন্সপেক্টর। দেখলেন তো? ভারী ট্র্যাজিক। জিয়োলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি

করতেন ছোটনাগপুরে। সেই সময় মাথায় ঢোকে কী করে ভারতবর্ষের দুঃখ দূর করা যায়। দিনরাত প্ল্যান, প্রোগ্রাম, স্ট্যাটিস্টিক্স। একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন—হঠাৎ ঘোড়াশুদ্ধ একটা খাদের মধ্যে পড়েন। ঘোড়াটা মারা যায়। কুণালবাবু প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু সেই "শকে"—! ভারী দুঃখের ব্যাপার—very sad story। আপনাদের বোধ হয় খুব বিব্রত করেছেন ?

[ইরা মাধববাবু নির্বাক]

ইন্সপেক্টর। আচ্ছা নমস্কার—(বেরিয়ে গেলেন।)

[স্তব্ধতা। একবার কুণালের চিৎকার উঠল "কে সে ? কোথায় সে ? তাকে আমি খুন করব—" পুলিস-ভ্যানের আওয়াজ। গাড়ীটা চলে গেল। ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে উচ্ছ্বসিত কান্নায় কুণালের বিছানার উপর ভেঙে পড়ল ইরা।]

ইরা (রুদ্ধ স্বরে) সত্যি-সত্যিই কে পাগল বাবা ? কুণালদা, না আমরা সবাই ?

[মাধব তার মাথায় হাত রাখলেন। ইরা কেঁদে চলল—]

—য ব নি কা—